এখন আমি জেলে

চিন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই কার্তিক, ১৩৬৩

ছ' টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ফাঁসীর দড়ির ঝুঁকি নিয়ে যখন বিপ্লবী দলে যোগদান করেছিলাম, তখন থেকেই দুঃখ দিয়েছি অনেককে। আত্মীয়, বন্ধু, পড়শী, শুভানুধ্যায়ী এবং সবার উপর বাবা ও মাকে। সে দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই! বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথ তাঁদের অশ্রুজলে পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে, তাঁদের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সৃষ্টি করেছে বৈশাখী ঝড়, তাঁদের বুকভাঙ্গা ক্রন্দনরোলে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ!……

সেদিন কোনো দিকে দৃক্পাত না করেই এগিয়ে গিয়েছিলাম সত্য, কিন্তু আজ পরিণত বয়সে সে দিনের হাসিকান্নাভরা স্মৃতি দু চোখ ঝাপ্‌সা করে তোলে।

যে সব কথা ঘুণাক্ষরেও বলিনি কাউকে কোনোদিন, আজ সেই অনুচ্চারিত কাহিনীর শুভ্র মালাখানি অঞ্জলী নিবেদন করলাম বাবা ও মার পুণ্য স্মৃতির বেদীমূলে!……

আমার জবাব

এই কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে মাসিক বসুমতী-তে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে চেনা ও জানাদের কাছ থেকে যেমন পেয়েছি অসংখ্য আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন-পত্র, তেমনি বহু অপরিচিতের কাছ থেকেও এসেছে অবিমিশ্র প্রশংসার বাণী। কাহিনীর গতি যাঁরা নিরীক্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ এর সঙ্গে তঁদের সংযোগের সম্ভাবনাটুকু উল্লেখ করে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁদের যেন বাদ না দেওয়া হয়। এ সবের বিপরীত দিকের কথাও যে একেবারে নেই, তা নয়। সংবাদ পেয়েছি কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট সদস্য মন্তব্য করেছেন যে, এতে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের ইতিহাস তেমন সুষ্ঠুভাবে ও অভ্রান্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, কেউ বলেছেন বি ভী-র দুঃসাহসিক কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এতে নেই, কেউ বলেছেন ক্রোনোলজি ব্যাহত হয়েছে, এ ছাড়া দুএকজন সমালোচক নাকি এমনি প্রশ্নও তুলেছেন : সে যুগের বিপ্লবীদের কি কখনও নারীর প্রতি আকর্ষণ ছিল ?

এর কোনো প্রশ্নই আমার হাতে এসে পৌছোয়নি বটে, কিন্তু বারবারই মনে হয়েছে আমার দিক থেকে এই সব জিজ্ঞাসার একটা জবাব দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তার পূর্ব্বে এই কাহিনীর সূচনাটুকু উল্লেখ না-করে পারছি না।

১৩৫৮ সালের পূজোর পরই অকস্মাৎ বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক মহাশয় আমায় বললেন : একটা কাজ করুন না দ্বিজেনবাবু। আপনার বন্দী জীবনের অনেক থ্রিলিং কাহিনীই তো শুনেছি। সেগুলোই একটু গুছিয়ে লিখুন না, যাতে মাস চারেকে শেষ হয়ে যায়।

আরও বললেন তিনি : কিন্তু একটা কথা। কারাকাহিনী অনেক পেয়েছি আমরা। কতকগুলি মনে হয়েছে রসহীন, প্যারাগ্রাফহীন, যেন দাঁড়ি-কমাহীন একটানা বিবরণ। Facts বটে, কিন্তু তাতে ড্রামা নেই, নেই টেম্পো! অমূল্য সত্য ঘটনা হলেও বোধহয় লিখন-কৌশলের দীনতায় সাধারণ পাঠকের মনে তা আগ্রহ জিইয়ে রাখতে পারে না। আর কিছু পেয়েছি, যা অত্যন্ত সুললিত ভাষায় রচিত দার্শনিকের তথ্য, অতুলনীয় হলেও সাধারণের পক্ষে যা দুর্ব্বোধ্য। আপনি কিন্তু এ দুয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে লিখবেন, fiction-এরই মতো, অথচ facts!

সম্মত হলাম বটে, কিন্তু লেখা কি কখনো made to order হয়? ছোট গল্প অনেক লিখেছি, অনেক প্রবন্ধও, তাতে ছিল কলমের স্বাধীনতা, কিন্তু facts, অথচ fiction-এর মতো......

তারপর থেকেই লেখা প্রকাশিত হতে লাগলো মাসিক বসুমতীতে এবং

মাস দুয়েক পরই ধন্যবাদ জানিয়ে সম্পাদক আমায় আরও লিখতে অনুরোধ জানালেন, বললেন : আর সংক্ষেপে নয়, আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলী চাই।

তাই সর্ব্বাগ্রে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই মাসিক বসুমতীর সম্পাদক বন্ধুপ্রতিম প্রাণতোষ ঘটককে। তারপর ধন্যবাদ জানাই লব্ধ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়কে, পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যাপারে যাঁর অমূল্য সাহায্য পেয়েছি। তারপর কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার এই প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যাঁর সংস্পর্শে এসে লাভ করেছি একজন দরদী বন্ধুকে। আমার এই বৃহৎ গ্রন্থের যিনি প্রুফ দেখে দিয়েছেন, সেই পবিত্রকুমার রায়চৌধুরীকেও ধন্যবাদ জানাই। সর্ব্বশেষে ধন্যবাদ জানাই সংখ্যাতীত পরিচিত ও অপরিচিতদের—পত্র দিয়ে, সংবাদ পাঠিয়ে, নিজে এসে যাঁরা আমার এই দুরূহ কাজে প্রেরণা দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

আমার এই কাহিনী কোনো বিপ্লবী দলেরই ইতিহাস নয়। কোনো দলের গোড়াপত্তন, কর্ম্মসূচী সংগঠন, বিস্তার ও পরিণতির বিবরণ এতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। সে যুগের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (জনপ্রিয় নাম বি ভী) বিপ্লবী দলের আমি একজম কর্ম্মী ছিলাম। এই কাহিনী সে দলেরও ইতিহাস নয়। কাজেই বি ভী-র সেকালের নায়কগণের ও কর্ম্মীগণের তালিকা কেন প্রকাশিত হয়নি, বি ভী-র অগণিত কার্য্যাবলীর প্রত্যেকটি কেন এতে সন্নিবেশ করা হয়নি, সে প্রশ্ন আসে না। আমি লিখেছি আমারই কাহিনী, সম্পূর্ণ আমার। একটানা প্রায় সাড়ে ছয় বৎসরের রাজবন্দী জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ যে দলের যতটুকু কথা এসে গেছে ও তাতে যাঁদের নাম না-বললেই নয়, ঠিক ততটুকুই লেখা হয়েছে ও ততটুকুই বলা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমার এই কাহিনীতে বহু নরনারীর ছায়া পড়েছে, কিন্তু অস্তগামী রবির মতো আবার তা একসময় মিলিয়েও গেছে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে। তার একমাত্র কারণ, এখানা উপন্যাস নয়, তাই চরিত্র সৃষ্টির দায়িত্ব এতে নেই। প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিবৃতিতে যদি কোথাও ত্রুটি থেকে থাকে, তা আমারই এবং তা অনিচ্ছাকৃত ও অভিসন্ধিহীন।

কোনো ডায়েরী ছিল না আমার। তাই ত্রিশ বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বের কথা বলতে গিয়ে একান্তভাবে নির্ভর করতে হয়েছে আমার স্মৃতির ওপর। ক্রোনোলজির সামান্যতম ব্যতিক্রম কোথাও ঘটেনি, এমনি ঘোষণার স্পর্দ্ধা আমার নেই। প্রায় সবারই নাম ঠিক-ঠিক উল্লেখ করেছি। তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে বহু দিন পূর্ব্বেই আমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। দু'একজনের নাম

হয়তো ভুলে গেছি, যা ভুল করেছি এবং মাত্র দু'একটি ক্ষেত্রে অনিবার্য্য কারণে নাম বদলে দিতে হয়েছে।

সে যুগের বিপ্লবীরা নারীকে শুধু ভগিনী মনে করতো না, মনে করতো মাতা। অবিসংবাদিত এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু দেশকে ভালবাসতো তারা সবার ওপরে। কোনো যুক্তি, কোনো তর্ক, কোনো হিসেবের বালাই ছিল না তাদের এই একটি ক্ষেত্রে। একেবারে স্বার্থপরের মতো, নির্লজ্জের মতো, নেশাখোরের মতো ভালবাসতো তারা দেশজননীকে। শৃঙ্খলভাঙ্গার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিল তারা শুধু ছিন্নমস্তার মতো নয়, নিজের সততা, নীতিবোধ, এমন কি নিজের বিবেক পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে। দেশপ্রেমের কাছে সতীত্বও ছিল তুচ্ছ! উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গের মতো দেশপ্রেমের বন্যায় তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছিল অপরিসীম আবেগে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ষ্ট্র্যাটেজীকেই তারা হেয় মনে করতো না। নারীর প্রতি তারা পুরুষের আকর্ষণ অনুভব করতো না সত্য, কারণ দেশ ব্যতীত আর কিছুই ভাববার অবসর কোথায় ছিল তাদের? কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে নারী কেন পুরুষ-বিপ্লবীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করবে না? এবং দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হলে এই আকর্ষণকেও কেন বিপ্লবীরা কাজে লাগাবে না? এই আকর্ষণে মায়া নেই, দাসখৎ নেই। এই আকর্ষণই তাদের বেহিসাবী করে তোলে, মৃত্যুকে শ্যামের মতো বরণ করে নেবার সাহস জোগায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছিল তাঁদের ইষ্টমন্ত্র: পাঁকাল মাছের মতো কাদায় বাস করবি, কিন্তু গায়ে যেন একছিটে কাদা না লাগে!

তাই, আমার এই কাহিনীতে যদি কোথাও, কোনো ক্ষুদ্রতম ঘটনাতে, কোনো সূত্রে আমার সামান্যতম দুর্ব্বলতারও আঁচ পাওয়া গিয়ে থাকে, তাহলে তা আমাকেই খাটো করা হয়েছে, সে যুগের কলঙ্কহীন বিপ্লবীদের সম্বন্ধে তা আদৌ প্রযোজ্য নয়।

পূর্ব্বে যা বলেছি আবারও তাই বলছি নিঃসঙ্কোচে, হয়তো অনেকটা লজ্জাহীনের মতোই যা সত্য, তাই লিখে গেছি, কোনো দিকে ফিরে চাইনি, কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিনি, কারুর প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিনি। এমন কি, নিজের প্রতিও নয়।

এই আমার জবাব!

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

"বিশ্বনাথ ধাম"
পি-৪ চণ্ডীতলা লেন, কলিকাতা-৪০

তখন
আমি
জেলে

এক

গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট গ্রামের শুকনো পাতায় আকীর্ণ মেঠো পথে পা ফেলে যখন যাত্রা সুরু করেছিলাম, পথের নেশায় তখন পেয়ে বসেছিল। পশ্চাতে রেখে এলাম শৈশব ও কৈশোরের লীলাভূমি আমার গ্রামখানি, রেখে এলাম ফেলে আত্মীয়জনের স্নেহ ও মমতা, পড়শীদের প্রীতি ও সহযোগিতা, সকল বন্ধন অস্বীকার করে বন্ধুর পথে এগিয়ে চললাম বেদুঈনের মতো বুকে নিয়ে অদম্য সাহস ও অন্তরে নিয়ে অটল বিশ্বাস। গ্রামের গণ্ডী এক লম্ফে পেরিয়ে এসে পড়লাম শহরে, শহরের ঝকঝকে রাজপথে নিজেকে মনে হলো আমি হারকিউলিস কিংবা জুলিয়াস সীজার। তার পর দুর্নিবার বেগে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে যখন শহরতলীতে এসে পৌছলাম, তখন একেবারে অকস্মাৎ—অপ্রত্যাশিত ভাবে পথের ধারে একটি শিউলী গাছের চারা দেখে মনে পড়ে গেল আবার আমার সেই ফেলে-আসা গ্রামের কথা, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ-পুব কোণের সেই শিউলী গাছের কথা, যার তলায় সৃষ্টি হয়েছে শৈশবের কত উপাখ্যান, কৈশোরের কত আখ্যায়িকা।...

আমার পুরোনো আখ্যায়িকার যবনিকা উত্তোলিত হলে দেখতে পাওয়া গেল, কলকাতায় আমি গা-ঢাকা দিয়ে বাস করছি পুলিশের নাগপাশ এড়াবার জন্য। আই-বি'র ছদ্মবেশী গুপ্তচর আমাদের কালিঘাটের বাড়ীতে সময়ে ও অসময়ে বহুবার বহু ওজর দেখিয়ে আসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য। কিন্তু বৌদিরা বা বাড়ীর অন্যান্য সবাই প্রতিবারই তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়ে জবাব দিয়ে দেন: দ্বিজেন? তা থাকে তো এখানেই। নিজেদের বাড়ী ছেড়ে থাকবে কি মেসে? কিন্তু কি কাজে জানি নে, এই একটু আগে বেরিয়ে গেছে। কি আপনার নাম বলুন না, আর কি দরকার? এলে বলবো'খন।

আগন্তুকদের মধ্যে যিনি তত দড় নন, তিনি হয়তো আমতা আমতা করে সরে পড়েন। আর যিনি পাকা, তিনি ফস্ করে জবাব দেন: বলবেন রবি হালদার এসেছিল। কাল সকালে আমি আবার আসবো। ওঁকে থাকতে বলবেন। ভারী দরকার ওঁকে, অথচ—

বলতে বলতে মুখখানা চিন্তার মেঘে একেবারে কালো করে এক পা-দু'পা করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন। আশ্চর্য্য! 'কাল সকালে' আর রবি হালদারকে দেখা যায় না। আসেন অপর ব্যক্তি।

দ্বিজেনবাবু বাড়ী আছেন কি?

হয়তো বেরিয়ে আসেন এবার স্বয়ং মেজদা। মেজদা সরকারী চাকুরে। তিনি যে শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দেন আমায় নেহাৎ রক্তের সম্পর্ক আছে

বলে এবং না দিলে অনাহারেই যে আমায় থাকতে হবে, এই কথা একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করে দিয়ে তবে তাঁর চাকরি বজায় রাখতে পেরেছেন।

জিজ্ঞেস করেন: কোথা থেকে আসছেন?

আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে আগন্তুক অকস্মাৎ আমার প্রতি বন্ধুত্বের আবেগে একেবারে গলে পড়েন: বুঝলেন না, দ্বিজেন আমার সেই ছোট-বেলাকার বন্ধু। আরে মশাই, চারিদিকে যেমন ধর-পাকড় চলছে, পুলিশের টিকটিকি যেমন ঘুরছে চারিদিকে, তাতে করে ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন। দিনের বেলা বাড়ীতে না আসাই ভাল।—বলতে বলতে আরো একটু কাছে এগিয়ে এসে তিনি চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে কণ্ঠস্বর সহসা আরো একটু খাটো করে নিয়ে বলেন: আপনার এই সামনের বাড়ীটাকেই বিশ্বাস নেই। কুণ্ডুদের ঐ সেজ ছেলেটাকে কাল দেখছিলাম থানায় ঢুকতে। ওর কি দরকার বলুন তো? আমাদের এসব বাছাধনদের চিনতে আর দেরী হয় না। বুঝলেন? তা দিনের বেলায় দ্বিজেন আসে না তো?

মেজদা আলীপুর দায়রা জজের আদালতের বিশ বছরের চাকুরে। সেই দায়রা জজ ছিলেন এককালে গার্লিক, এ. এন. সেন প্রভৃতি। ঝানু লোক। আগন্তুকের বক্তৃতায় তাঁর বিন্দুমাত্রও ভাবান্তর ঘটে না। তিনি পুরাতন জবাবেরই পুনরাবৃত্তি করেন: থাকে তো এখানেই। এই তো এতক্ষণ বাড়ীতেই তো ছিল। আপনি আসবার একটু আগেই কোথায় বেরিয়ে গেল। একটু বসবেন কি?—তা দেখুন, ইংরেজের আমরা নুণ খাই, বিশ বছর ধরে সরকারী চাকরি করছি। ও যে কি করে, কোথায় যায়, এসব খবর আমি কোন দিনই রাখি নে, রাখবার প্রবৃত্তিও আমার নেই।

অর্থাৎ চাকরি বজায় রাখবার জন্ম যে চুক্তিপত্রে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাঁকে স্বাক্ষর দিতে হয়েছে, আমার বন্ধুটির কাছে বেশ উৎসাহের সঙ্গে তাতেই লিখিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। শুধু তাই নয়। রাজভক্তির আতিশয্যে অকস্মাৎ মেজদা যেন ফেটে পড়েন: আরে মশাই, এই সব হুজুগেরা কি করতে পারবে বলুন তো? স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার কর, ব্যস, তাহলেই কাজ হবে। তা না করে দু'টো বোমা আর রিভলভার দিয়েই যদি দেশ স্বাধীন করা যেত ইংরেজদের সাগরপারে তাড়িয়ে দিয়ে, তাহলে তো আর ভাবনা ছিল না—কি বলেন, অ্যাঁ?

বলে মেজদা খুব বিজ্ঞের মতো হেসে ওঠেন। আমার বন্ধুর কানে তা বিদ্রূপের মত গিয়ে আঘাত হানে।

হাল ছেড়ে দেবার মতো মুখ করে বন্ধু বলেন: বুঝলেন না, অনেক দিনের বন্ধু তো, তাই সাবধান করে গেলাম। ও যদি এখনো এই বাড়ীতে থেকে যাওয়া-আসা করে সাধ করে হাতকড়ি পরতে চায়, তাহলে আমি আর কি করে ঠেকাই বলুন?

তা তো বটেই, তা তো বটেই—বলে মেজদা সদর দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসতেই মেজ বৌদি জিজ্ঞেস করেন : কে এসেছিল গো ?

মেজদা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন : আর একটা টিকটিকি !

এমনি দিবা-রাত্র আসতেন আমার পরম সুহৃদেরা, আমার শুভানুধ্যায়ীরা আমার সংবাদ সংগ্রহ করে আমায় আপ্যায়িত করবার জন্য।

সেটা ১৯৩১ সাল। কিন্তু উনিশশো একত্রিশ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকা সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২৮ সালে। তার একটুখানি আভাস এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

কংগ্রেসী আন্দোলনের মতই বিপ্লবী আন্দোলনেরও সুত্রপাত, পরিণতি ও সাময়িক ভাবে মন্থর হয়ে আসার ইতিহাস আছে। আইন অমান্য আন্দোলনের মতই বিপ্লবী আন্দোলন এক-একটি রক্ত-রাঙা অধ্যায় সৃষ্টি করে রেখেছে ভারতের ইতিহাসে। ঠিক এমনি একটি লাল অধ্যায়ের গোড়াপত্তন হয় সাইমন কমিশন এদেশে আসবার সময় থেকে। যেদিন বোম্বাই বন্দরে তাঁরা জাহাজ থেকে মাটিতে পদক্ষেপ করলেন, সেদিন থেকেই সমগ্র ভারতে কমিশন বয়কট আন্দোলন এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, দিশেহারা ইংরেজ সরকারের আদেশে লাহোরে স্কট সাহেব নির্দ্দয় ভাবে লাঠির আঘাত চালান ভারতের অন্যতম নেতা লালা লাজপৎ রায়ের দেহে। এরই ফলে আহত নেতা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মতিলাল নেহরু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনেই ভারত তখনকার মতো শান্ত হবে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। সুভাষ ও স্বরাজ্য দলের অপরাপর নেতারা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। বেরিয়ে এলেন চট্টগ্রামের সূর্য্য সেনও। কমিশন বয়কট আন্দোলনে যোগদানকারীদের ওপর তখন চলেছে নির্দ্দয় অত্যাচার। লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের ওপর যে লাঠি চালনা করা হয়েছে, বাংলার বিপ্লবী নেতারা তার আঘাত যেন নিজেদের দেহে অনুভব করলেন। সুভাষের নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হলো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের পরই এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নেতা সুভাষের নির্দ্দেশ অনুসারে বাংলার শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে কুচকাওয়াজ সুরু করে দিল। ঘুমিয়ে-পড়া ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণে আশার দেওয়ালি জ্বালিয়ে অনাগত সুদিনের জন্য যারা অধীর আগ্রহে দিন গুণতে থাকে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স তাদের শুভেচ্ছা ও অকপটতা স্বীকার করে নিয়ে দেশের যুবশক্তির রক্তে সামরিক অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলবার ব্রত গ্রহণ করে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের মুখপাত্ররূপে সুভাষ ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্যারালেল গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী দলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল

পূর্ব্বেই। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মঞ্চ ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়েই ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হলেন। পাঞ্জাবে প্রতিষ্ঠিত হলো হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাব্‌লিক্যান পার্টি আর নওজোয়ান ভারত সভা। সর্দ্দার ভগৎ সিং, চন্দ্রসিং আজাদ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাসের নেতৃত্বে এঁরা শুধু পাঞ্জাবে কেন, সমগ্র ভারতেই সফর করে বেড়াতে লাগলেন। ইংরেজ সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য সর্দ্দার ভগৎ সিং দিল্লীর পরিষদ-কক্ষে বোমা নিক্ষেপ করে ধরা দিলেন এবং ভীতিহীন বিবৃতিতে যা বললেন, তার মর্ম্মার্থ এই : যে বিপ্লবের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠেছে, জনগণের আপাত-নীরবতা যে সেই তুফানেরই উপক্রমণিকা, শেষবারের মতো বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আমরা সে সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছি মাত্র।

লালা লাজপতের ওপর যে লাঠি চালিয়েছিল, সেই স্কট সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে নিহত হলেন সণ্ডার্স সাহেব। লাহোরে সুরু হলো বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং তার অন্যতম নেতারূপে বাংলা থেকে গ্রেপ্তার হলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর যতীন দাস। লাহোর বোর্ষ্টাল জেলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। মামলার প্রথম দিনের শুনানী কালেই সুরু হলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া, অবশেষে চ্যালেঞ্জ। যতীন দাস আমরণ অনশন সুরু করলেন এবং ৬২ দিন পর ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ১২টা ৫৫ মিনিটে মহাপ্রস্থান করলেন। মেজর যতীন দাসের শবদেহ সুদূর লাহোর থেকে ট্রেনযোগে কলকাতায় আনবার অনুমতি দিয়ে ইংরেজ যে কী মহাভ্রম করেছিল সেদিন, তা বর্ণনার অতীত। এক কথায় সমগ্র ভারতের মাটিতে-মাটিতে যেন সেই অমর শহীদ লোকান্তরিত দেহ নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে পাগলা ভোলা যখন সমগ্র ভারতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে সেই দেহের যে-কোনো অংশ যেখানে পড়েছিল, সেইখানেই সৃষ্টি হয়েছিল এক-একটি তীর্থ। ঠিক তেমনি লাহোর থেকে কলকাতা আসার পথে যেন একটি অদৃশ্য যোগসূত্র টেনে দিয়ে গেল সেদিনকার তুফান মেল।

কলকাতায় যতীন দাসের শব নিয়ে যে শোকযাত্রা বেরিয়েছিল, ইংরেজ জাতি কোনোদিন তা ভুলতে পারে না। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার অন্তরঙ্গতাই যে সেদিন দৃঢ়তর হয়ে উঠলো, তাই নয়, সমগ্র ভারতের বিপ্লবী দলই সেদিন পেল নতুন উদ্দীপনা, নতুন অনুপ্রেরণা। তাই বাংলার শহরে-শহরে, পল্লীতে-পল্লীতে সেদিন ছড়িয়ে পড়লো বৈপ্লবিক ইস্তাহার : রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা।

সত্যই সর্ব্বনাশ, তিলে তিলে আত্মাহুতি, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত, রঙীন সম্ভাবনাময় জীবনের ওপর টেনে আনা কালো যবনিকা।

*

বিপ্লবীরা আর আত্মগোপন করে থাকতে চাইলো না। কংগ্রেসী আন্দোলনের পাশাপাশি সুরু হলো বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটি রেজিমেণ্ট অস্ত্র আইন ও ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতা থেকে সুভাষের পৈতৃক গ্রাম কোদালিয়ায় রুট মার্চ্চ করে গেল।

১৯৩০ সাল পড়তে-পড়তেই ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী সুরু করলেন ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান। তারপর ১৮ই এপ্রিল হলো চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান। সুভাষ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তখন ছিলেন আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে এক দিন কারাসমূহের ইন্সপেক্টার-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন ও জেল-সুপার সোম দত্তের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সুভাষ, সেনগুপ্ত, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর সত্য গুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ওপর লাঠি-চালনা করে। বাইরে সমগ্র ভারতে তখন চলছে তীব্রভাবে আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে অংশ-গ্রহণকারীদের ওপর যে অথবা যারাই অত্যাচার করছিল, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের Suicide Squad বেছে-বেছে তাকে বা তাদেরকে এক-এক করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করে। কলকাতায় টেগার্ট ও গর্ডন সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশ নির্ব্বিবাদে অত্যাচার চালাচ্ছিল প্রকাশ্য জনসভায় মহিলাদের ওপরেও। আইন অমান্য আন্দোলনের কেন্দ্র-স্থল ঢাকা শহরে যেমন চলছিল পুলিশ-সুপার হডসনের তাণ্ডব, তেমনি মেদিনীপুরে চলছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডির অমানুষিক অত্যাচার আর সমগ্র বাংলার পুলিশী নৃশংসতার পশ্চাতে ছিল পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল লোম্যানের অদৃশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা!

অকস্মাৎ ২৫শে আগষ্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট সাহেবের মোটর গাড়ীর ওপর দু'টি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ২৬শে আগষ্ট জোড়াবাগান আদালত-গৃহে ও ২৭শে ইডেন গার্ডেন পুলিশ ফাঁড়ির ওপর বোমা পড়ে। ২৯শে আগষ্ট লোম্যান হডসনের সঙ্গে যখন ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করছিলেন, তখন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মেজর বিনয়কৃষ্ণ বসু তাঁদের দু'জনকেই গুলীর আঘাতে ভূপাতিত করেন। লোম্যান মারা যান, হডসন বেঁচে থাকেন অর্দ্ধমৃতবৎ। তারপরও চলতে থাকে নানা স্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি ও নরহত্যা। অবশেষে ৮ই ডিসেম্বর কলকাতা শহরে সরকারী দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিং-এ হানা দেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তিনটি অফিসার—মেজর বিনয় বসু, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত ও লেফটেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত। প্রকাশ্য দিবালোকে ডালহৌসী স্কোয়ারের মতো জনবহুল স্থানে রাইটার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় "অলিন্দ যুদ্ধে" প্রাণ হারান কারাসমূহের ইন্সপেক্টার-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন। ২৩শে ডিসেম্বর লাহোরে ইউনিভারসিটি হল-এ পাঞ্জাবের গভর্ণর মণ্টগোমারির ওপর উপর্য্যুপরি ছ'বার গুলী নিক্ষেপ করেন হরিকিষেণ।

এই প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে এল ১৯৩১ সাল। এর সুরুটা বেশ মন্থর,

খানিকটা স্বস্তিজনকও বলা যেতে পারে। ৫ই মার্চ্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হলো। আইন অমান্য আন্দোলন হলো প্রত্যাহৃত, গভর্ণমেণ্টও এই আন্দোলনের বন্দিগণকে মুক্তি দিতে লাগলেন। বাংলার গভর্ণর তখন স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন। অহিংস কংগ্রেসী আন্দোলনের বন্দিগণ মুক্তি পেলেও বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের ভাগ্যে আদৌ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কিন্তু এক দিকে সত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্য এবং অপর দিকে বৈপ্লবিক আঘাতের চাপে জর্জ্জর হয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন এতখানি মুষড়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মারফৎ বক্‌সা বন্দিশিবিরে আবদ্ধ রাজবন্দী নেতাদের কাছে আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব পাঠাতেও দ্বিধাবোধ করলেন না। রাজবন্দীরা দাবী জানালেন দু'টি: এক, চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়ক ফেরারী সূর্য্য সেনের ওপর থেকে সর্ব্বপ্রকার অভিযোগ প্রত্যাহার এবং দুই, আপোষ-আলোচনার সময়ে পুলিশের অনুপস্থিতি। গভর্ণমেণ্ট এই দু'টি সর্ত্ত মেনে না নেওয়ায় আপোষ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

গান্ধীজীর সর্ব্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৩শে মার্চ্চ সর্দ্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসী হয়ে গেল। দেশময় সুরু হলো বিক্ষোভ প্রদর্শন, তেমনি আবার সুরু হলো সরকারী অত্যাচার। কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যেই ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডি বিপ্লবীর গুলীর আঘাতে নিহত হন। ৭ই জুলাই মেজর দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে যায়। তার পরই হয় রামকৃষ্ণের ফাঁসী। যে স্পেশাল ট্রাইবিউন্যাল দীনেশ গুপ্তকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে, আলীপুরের দায়রা জজ গার্লিক ছিলেন তার সভাপতি। ২৭শে জুলাই এজলাসে যখন তিনি কার্য্যরত, সেই সময় কানাই ভট্টাচার্য্য নিঃশব্দে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে রিভলভারের গুলীতে তাঁকে হত্যা করেন।

পুলিশ এবার মরিয়া হয়ে উঠলো। হাতের কাছে যাকে পেতে লাগলো, তাকেই গ্রেপ্তার করতে লাগলো। বাংলা দেশে, বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গে এমন পরিবার খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে উঠলো যা থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে গভর্ণমেণ্ট তাঁর অতিথি করে নেননি। ব্যায়ামাগারে, লাইব্রেরীতে, ক্লাব-গৃহে, কুস্তির আখড়ায়, আড্ডা-ঘরে সর্ব্বত্র পুলিশ হানা দিয়ে ফিরতে লাগলো। ছাত্রদের মধ্যে যে বক্তৃতা দিতে পারে, যুবকদের মধ্যে যার স্বাস্থ্য ভালো, পাড়ায় যে নেতৃস্থানীয়, তার আর কারার বাইরে থাকবার উপায় নেই। সরকারী চাকুরের ছেলেই হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে গেল মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে। তাঁদের চাকরি নিয়ে যখন টানা-হেঁচড়া পড়ে গেল, তখন অনেকেই আমার মেজদা'র মতোই একটি বণ্ডে স্বাক্ষর করে রাজভক্তির নতুন করে পরিচয় দিয়ে রক্ষা পেয়ে গেলেন। বহু যুবকের নামে 'হুলিয়া' বেরুলো, অনেকের নামে মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। পথে-ঘাটে, রেস্তোরাঁয়, ট্রামে-বাসে ও ট্রেনে অসংখ্য টিকটিকি বা স্পাই কিলবিল

করতে লাগলো। বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার বন্ধনও বুঝি অবিশ্বাস ও আশঙ্কার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

সর্ব্বত্র আতঙ্ক ও নিরাশার থমথমে আবহাওয়া! কখন কার ঘাড়ে অকস্মাৎ সরকারী হুকুম এসে ভূতের মতো চেপে বসবে, কে জানে!…

দেশের এমনি নিদারুণ সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যার সামান্যতম সংস্পর্শ আছে, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? 'হুলিয়া' না বেরুলেও সরকারের একখানা আমন্ত্রণ-লিপি যে আমারও নামে লিখিত হয়ে পিওন বুকে বসে আমারই প্রতীক্ষা করছে, সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার হয়েছিল। তাই পারিবারিক খাতায় আমার নাম থাকলেও লগ্ বুকে কখনো আমার স্বাক্ষর পড়তো না।

থাকতাম শহরতলীর এক বন্ধুর বাসায়। ইটের দেয়ালের ওপর টিনের চাল-দেওয়া খানচারেক কামরার ছোট একখানা গোটা বাড়ী। বন্ধু নেপাল পড়েন যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, তাঁর দাদা গোপাল কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক, ছোট ভাই মনু তখনো স্কুলে পড়ে। বিধবা মা। আর থাকেন একজন সহ-ভাড়াটিয়া। বিধবা মা ও ছেলে। অর্দ্ধেন্দু সেই সকাল আটটায় কোন্ কারখানায় গিয়ে মোটরের নীচে শুয়ে শুয়ে যখন একবার একটি বল্টু আঁটেন ও আর একবার একটি স্ক্রু ঢিলে করেন, তখন জানতেও পারেন না, কখন সকালের উজ্জ্বল রোদ বিকেলের স্নিগ্ধতায় ম্লান হয়ে এসেছে। তারপর সম্মুখের কেমিক্যাল কারখানায় ঢং ঢং করে ছটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। কালিমাখা দেহ নিয়ে ফিরে আসেন অর্দ্ধেন্দু। মা কিন্তু তাঁর ছেলের সম্বন্ধে যেমন আশাশীলা, তেমনি অর্থের যে তাঁর আদৌ প্রয়োজন নেই, একটি অঙ্গুলি হেলনেই যে তিনি তাঁর হাজরা রোডের স্বামীর গৃহ থেকে ছোট জা-দের ও তাদের ভেড়ুয়া স্বামীদের বহিষ্কৃত করে দিয়ে অর্দ্ধেন্দুকে নিয়ে দিব্য সেখানে চলে যেতে পারেন, একথা দিনের মধ্যে প্রায় একশো বার উচ্চারণ করে থাকেন।

অত্যন্ত কটুভাষিনী হলেও ইনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমায়। বন্ধুদের বাড়ী খেলেও প্রায়ই ইনি এটা-ওটা-সেটা করে আমায় একটুখানি পাঠিয়ে দিতেন রন্ধনে তাঁর কৃতিত্বের নমুনাস্বরূপ। খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের প্রশস্তি এতখানি গলাধঃকরণ করতে হতো যে, তারপর রন্ধনের শতমুখে সুখ্যাতি না করে আর পথ থাকতো না।

বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ, আম, কাঁঠাল ও নারিকেল গাছে ছাওয়া। একটু দূরে একটা পুকুর, তার তীরে গোটাকয়েক বাতাবী নেবু ও পেয়ারা গাছ। বড় রাস্তা কয়েক শত গজ দূরে।

চাকর বা ঠিকে ঝি আমরা রাখিনি। কারণ ওদের মধ্যেই যে পুলিশের গুপ্তচরের সংখ্যা বেশী! খাওয়া শেষ হলে এঁটো-কাটা সাফ্ করে নিজেরাই পুকুরে যেতাম থালা-বাটি নিয়ে।

দিনের বেলা বেরুনো নিষিদ্ধ ছিল। রাত্রে, তাও আবার ট্রামে বা বাসে নয়, সাইকেলে। সাইকেলে চড়লে কেউ আমায় অনুসরণ করছে কিনা, তা সহজে ধরা যায়। মনে করুন, সে যুগের খোলা ময়দান রাসবিহারী এ্যাভিনিউ দিয়ে বেগে সাইকেল চালিয়ে চলেছেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে। অকস্মাৎ দেখলেন একখানা সাইকেল বা মোটর আপনার পেছন-পেছন ছুটে আসছে। কে এ? কী এর মতলব? পুলিশের স্পাই? অনুসরণ করছে আপনাকে? কুছ পরোয়া নেই! অকস্মাৎ ব্রেক কসে নেমে পড়ুন। হয় সাইকেলখানা রাস্তার গায়ে শুইয়ে রেখে মূত্রত্যাগের ভাণ করে বসে পড়ুন কিংবা ওখানা ফস্ করে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক উল্‌টো দিকে যাত্রা করুন। অত শীগগির মোটর উল্‌টো দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া যায় না, আর সাইকেল ঘোরাতে পারলেও জানা গেল কোন্‌খানা ফেউয়ের মতো আপনার পেছনে লেগেছে!

কালীঘাটে আমাদের বাসায় আমি মাঝে মাঝে সংবাদ নিয়ে যেতাম সত্যি, কিন্তু কখন্ আসবো, যেমন কেউ জানতো না, তেমনি জানতেও চাইতো না থাকবো কতক্ষণ!

এমনিভাবে গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম ভালোই, কাজও চলছিল মন্দ নয়। এমন সময় একদিন বাল্যবন্ধু শ্রীপদর পত্র এল গোয়ালন্দ থেকে। গোয়ালন্দ ষ্টীমার কোম্পানীতে সে কয়েক বছর ধরে চাকরি করে, থাকে একা একখানা ফ্লাটে। বেচারা হয়ে পড়েছে দারুণ অসুস্থ। প্রথমতঃ রেলের হাসপাতালে আশ্রয় নিয়ে রোগ সারাবার চেষ্টা করেছে। না পেরে নিয়েছে এক মাসের ছুটি। আর আমায় লিখেছে তাকে দেশের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আসবার অনুরোধ জানিয়ে। আমারই গ্রামের আমারই পাড়ায় তার বাড়ী।

ছোটবেলাকার বন্ধু, তারপর পীড়িত আর আমায় খুঁজে বার করবার ব্যাপারে পুলিশের উৎসাহও মনে হলো কতকটা কমে এসেছে। তাই যাওয়াই স্থির হলো।

রওনা হলাম শিয়ালদহ থেকে চট্টগ্রাম মেলে। পরণে খাঁটি সাহেবের পোষাক, কাঁধের ওপর খাঁটি মিলিটারী ওভারকোট আর হাতে বিরাটকায় খাঁটি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ। ফেল্ট ক্যাপে কপাল ঢাকা। টিকিট আগেই কেনা ছিল, তাই ট্রেণ ছাড়বার ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে এই খাঁটি সাহেবটি ট্যাক্সিযোগে ষ্টেশনে এসে সোজা গিয়ে আরোহণ করলেন রিজার্ভ-করা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় এবং জানালার কাচগুলো তুলে দিয়ে একখানা বিলিতি সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতে লাগলেন।

ভোর সাড়ে ছটায় ছেড়ে চট্টগ্রাম মেল বেলা বারোটায় এসে পৌছলো গোয়ালন্দ ঘাটে। এবারে সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে নেমে এলেন গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি পরণে, গ্রিশিয়ান স্লিপার পায়ে একজন

দর্জিপাড়ার কাপ্তান, তুআঙ্গুলের মাঝে আলগোছে চেপে ধরে একটি সিগারেট। পেছনে গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ মাথায় কুলি।

পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই দেখা গেল শ্রীপদর প্রেরিত লোক অপেক্ষা করছে। সাবধানে তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কাপ্তান অস্ফুটস্বরে বলে গেলেন : আমি ষ্টীমারে ইণ্টার ক্লাশে যাচ্ছি।

সোজা গিয়ে হন্ হন্ করে ষ্টীমারে উঠলে পাছে টিকটিকিদের সন্দেহের উদ্রেক হয়, তাই অকস্মাৎ পথের মাঝখানে থেমে গিয়ে কাপ্তান কমলালেবুর দরদস্তুর করতে লাগলেন। তুঃখের বিষয় দরে বনলো না। না বনবারই কথা। তাই পাশের দোকান থেকে আর এক প্যাকেট কিনে নিয়ে কাপ্তান সোজা চললেন ষ্টীমারের দিকে।

সন্ধ্যার একটু আগে যখন ষ্টীমার কাদিরপুর ষ্টেশনে এসে থামলো, শ্রীপদ তখন বলে উঠলো : যাক্, এবার নিরাপদে তোকে আনতে পারা গেল। আর যা ছদ্মবেশ নিয়েছিস, তাতে পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই যে, তোকে চিনতে পারে।

সংবাদ নিয়ে জানা গেল, নৌকাযোগে আমরা ষোলঘর পর্য্যন্ত যেতে পারবো। সেখান থেকে আমাদের গ্রাম মাত্র দেড় মাইল। ষোলঘর পৌছুতে আমাদের বেশ রাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, কারণ গ্রামের পথঘাট আমাদের মুখস্থ, আর আমি তো রাত্রেই চাই গ্রামে পৌছুতে সবার অলক্ষ্যে, সবার অজ্ঞাতে। শ্রীপদকে রেখে পরদিনই আবার এমনি গভীর রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করে ফিরে আসবো কলকাতায়—এই ছিল আমার কর্ম্মসূচী।

তুধারে উঁচু পাড়, তার মাঝে ক্ষীণকায় খাল। অন্ধকার রাতে আমাদের নৌকো এগিয়ে চলেছে। ছইয়ের মধ্যে বিছানো বিছানায় শ্রীপদ সটান শুয়ে আছে আর আমি কেরোসিন ল্যাম্পের স্তিমিত আলোয় একখানা বই পড়ছি নিবিষ্টমনে। চোখ তুটো আটকে রয়েছে বইয়ের অক্ষরে, কিন্তু কানতুটো খাড়া রয়েছে বণ্যহরিণের মতো। বাইরের সামান্যতম শব্দও যেন না ফসকে যায়। গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা পায়ের কাছে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে ল্যাপডগের মতো।

বাইরে নিবিড় অন্ধকার। মাঝে মাঝে তুএকটা ঝিঁঝি পোকার বিকট একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে আর গাছের ডালে ডালে দেখা যাচ্ছে অসংখ্য জোনাকির চুমকি। জলছে আর নিভছে। ভিজে মাটির কেমন একটা গন্ধ!

শ্রীপদ যেন অনেকক্ষণ মনে মনে মহলা দিয়ে একসময় গম্ভীর গলায় ডাকলো : দ্বিজেন!

তৎক্ষণাৎ আমি তাকে সংশোধন করে দিয়ে বললাম : দ্বিজেন নয়, নরেন, তপেন, রাম, শ্যাম, যত্থ, হরি—যা খুশী তাই বল, শুধু দ্বিজেন নয়।

ম্লান হাসি হাসবার চেষ্টা করলো শ্রীপদ: ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ছাখ্, এমনিভাবে আর কতকাল পালিয়ে পালিয়ে থাকবি ?

বললাম: যতদিন না ধরা পড়ি।

বন্ধুর কোমল হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো: তা জানি। কিন্তু জ্যেঠাইমা আর জ্যেঠামশায়ের কথা একবার ভেবে ছাখ্। পুজোর সময় যখন এসেছিলাম, জ্যেঠামশায় আমায় কত বললেন, কত দুঃখ জানালেন, আর জ্যেঠাইমা তো কেঁদেই আকুল! তাঁদের কত আশা ছিল, তুই বিলেত থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসবি—

বাধা দিতে হলো: মানুষের মনে কত আশাই না বুদ্বুদের মতো ভেসে ওঠে শ্রীপদ, তার কটা পূরণ হয় ?

শ্রীপদ দমবার পাত্র নয়: বেশ, তাই যদি বল, তাহলে যে আশা নিয়ে তোমরা এই পথে পা বাড়িয়েছ, সে আশাও তো পূরণ নাও হতে পারে। তোমাদের পথই যে নির্ভুল, এই পথে এগিয়ে গেলেই যে অভীষ্ট লাভ হবেই, এর গ্যারাণ্টি তোমরা দিতে পারো কি ?—শ্রীপদ এবার লজিকের ওপর ভর করে যেন হাইকোর্টে মিঃ জাষ্টিসের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সাওয়াল সুরু করলো ব্যারিষ্টার সি আর দাশের মতো: যার গ্যারাণ্টি তোমরা দিতে পারো না, নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে তোমরাই নিশ্চিত নও। আর নিশ্চিতই যদি না হও, তাহলে আমি প্রশ্ন করতে পারি কি, এমনিভাবে অনিশ্চয় ও আলেয়ার পেছনে দেশের যুবকদের টেনে নেবার অধিকার তোমরা কোত্থেকে পেলে ? নিজের সম্ভাবনাময় জীবন যেমনি নষ্ট করছো, তেমনি নষ্ট করছো আরও দশজনের। এর জন্য তোমায় কি আমি অভিযুক্ত করতে পারিনে ?

চুপ করে গেলাম। জবাব দেবার কিছু নেই বলে নয়, জবাব দেবো না বলে। জানি শ্রীপদ আমায় কতখানি ভালবাসে, আমার মত ও পথের সঙ্গে তার এতটুকুও না মিললেও দূর থেকেই সে তার ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা জানায় আমার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের। যে সর্ব্বনাশা পথে আমরা বিচরণ করি, তার কাছে ঘেঁসতেও সে ভয় পায় জানি এবং তার আতঙ্কের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার কাছে প্রকাশ করতেও তার বাধে না সত্য, কিন্তু তার আদালতী লজিকের অন্তরালে স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ের যে নিরবকুণ্ঠ দরদ উৎসারিত হচ্ছিল, আর একবার নতুন করে তা সর্ব্বমন নিয়ে অনুভব করলাম।

আমি নীরব থাকলেও আমার বন্ধু নীরব থাকবার পাত্র নয়, বিশেষ করে যখন সে অনুভব করে যে, যুক্তি-বাণে সে আমায় কোণঠাসা করে ফেলেছে। সে জানে যে, পরাজয় আমি মেনে নিতে রাজী আছি শুধু যুক্তির কাছে, ভ্রূকুটি, হুমকি বা অশ্রুজলের কাছে নয়।

কিন্তু শ্রীপদ তার সওয়ালের উপসংহার টানবার আর সুযোগ পেল না। অকস্মাৎ বহিরদ্দী মাঝী লগি হাতে বসে পড়ে ফিসফিস করে বললো: দুষ্মে

দারোগার নাওয়ের মতন একখানা নাও দেখা যাইতে আছে।—বলেই সে আপন মনে আবার লগি মারতে লাগলো, মুখে বিচিত্র সুরে ধরলো একটি সরস জারিগানের সরসতম কলি :

তোমার লইগা মরলাম
কাঁইন্দা বন্ধুরে,
ডাইকা ডাইকা পলাইয়া
যাও ক্যান রে—

ফস্ করে ল্যাম্প ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া হলো। ছইয়ের একদিকে একখানা চাদর ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীপদ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে বোধহয় দুর্গানাম জপ করতে লাগলো। আর আমি গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা ভেতরে টেনে নিয়ে একখানা চাদর মাথায় ঘোমটার মতো করে টেনে দিয়ে বেড়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করে দিলাম।

বছিরদ্দী আমার পুরোণো মাঝি ও সাগরেদ পুরাতন ভৃত্যেরই মতো। এই সহজ কৌশলে বহুবার আমরা পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করেছি। ওর নৌকো ব্যতীত বিক্রমপুরে বর্ষাকালে আমি এক পাও যেতাম না কোথাও। পুলিশের নৌকোখানি যেই কাছে এসে পড়ে, অমনি বছিরদ্দী অগ্রণী হয়ে দারোগাকে সভক্তি সেলাম নিবেদন করে বলে : কাঁদবো আর কে? আপনার বৌমা কর্ত্তা। বাপের বাড়ী থিকা আসোনের সময় পেরতেক বারই এমন কইরা ফোঁপাইব। বুড়া হইয়া গেল, তবু বাপের বাড়ীর টান গেল না—অ্যাঁ?

দারোগারা সাধারণতঃ এই রসিকতায় বেশ কৌতুক অনুভব করে।

কিন্তু এবার রক্ষা পাওয়া গেল। পাশ দিয়ে গা-ঘেঁসে যে নৌকাখানা বিপরীত দিকে চলে গেল, সেখানা দারোগার নৌকো নয়। গানের সুর থামিয়ে বছিরদ্দী হি-হি করে হেসে উঠলো। বন্ধু শ্রীপদ তখন কম্বলের নীচে ঘেমে উঠেছে। আমার মাথার বালিশ দু'টো আমি কোল থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আবার কেরোসিন ল্যাম্পটি জেলে দিলাম।

পুঁটিমারা খালের এক জায়গায় নৌকো বাঁধলো বছিরদ্দী, বললো : আইসা পড়ছি কর্ত্তা।

প্রথমে নামলাম আমি, তারপর অসুস্থ শ্রীপদকে নামাবার জন্ম হাত বাড়িয়ে দিলাম। দেড় মাইল পথ পায়ে হেঁটে যখন বাড়ীতে এসে পৌছলাম, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে।

দুই

কিন্তু পরদিন রওনা হবার পথে দেখা দিল একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়।

দূর-সম্পর্কীয় বিলাস কাকার মেয়ে রেণুর সেদিন বিয়ে। আনন্দোৎসব বা কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছ' বছর পূর্ব্বেই চুকে গেছে। তাই গ্রামের বা পাড়ার কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানেই আমাকে পাওয়া যেত না। আত্মীয়-জনের বিবাহেও নয়। পুলিশ যেমন করে খুঁজছে আমায়, এমনি অবস্থায় তো একটি ঘণ্টা দেরী করাও বিপজ্জনক।—আমার এই যুক্তি দিয়ে সবাইকে শান্ত করে দিলেও কিছুতেই পারলাম না জেদ বজায় রাখতে যখন স্বয়ং রেণু এসে হাত ধরে ফেললো এবং বললো: সবাইকে ফিরিয়ে দিতে পারলেও আমায় পারবে না। তোমায় থাকতে হবে। রাত ৯টার মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। তারপর রওনা হয়ো—আমি আপত্তি করবো না।

সত্যিই রেণু আমার প্রিয় বোনটি। বড়ো-ছোটোর সম্বন্ধ নয়, আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কি করে জানি না একটা মধুর বন্ধুত্বের বন্ধন। বয়সে ও শিক্ষায় দু'জনে সমপর্য্যায়ের নই বলেই বোধ হয় আমাদের মধ্যে নীরস ফর্মালিটির অস্তিত্ব ছিল না।

রাজী হতে হলো এবং আগুনের মত সেই খুশীর সন্দেশ মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানেই যেন অধিকতর উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখা দিল এবং আমাকেই জড়িয়ে পড়তে হলো তার সঙ্গে। রান্না কে করবে, কি কি রান্না হবে, কোথায় বরযাত্রীরা এসে বসবেন, কি ভাবে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হবে, কতজন বরযাত্রী আসবেন, তাঁরা সবাই মাংসাশী কি না, তার পর বরপক্ষের দাবীমত সব জিনিষপত্র কেনা হয়েছে কি না, কোথায় বিবাহ-সভার আয়োজন হবে, কে সম্প্রদান করবেন, পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়েছে কি না, আলো কোথায়, বাইরের ঠাণ্ডা ঠেকিয়ে রাখবার মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সামিয়ানা এসেছে কি না—এমনি হাজারো ব্যাপারে মাথা গলিয়ে ও বিলি-ব্যবস্থা করে অঘ্রাণের শীতের মধ্যেই যখন পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্নানের জন্য, তখন পড়ন্ত রোদের আভা বটগাছের মাথায় চিকচিক করছে।

উপবাসী রেণু এসে আমায় চোখ রাঙ্গিয়ে গেল: আর যদি একটি মিনিটও দেরী কর, তাহলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি দাদা!

দুপুরের খাওয়া শেষ হলো বেলা চারটেতে। রেণুর শুকনো মুখখানা দেখে জিজ্ঞেস করলাম: তুই কি পরম নিষ্ঠাবতীর মতো বিয়ে করছিস নাকি রে?

কেন ?

না খেয়ে মুখখানা গেছে শুকিয়ে, এ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

ইস্ জানো কিনা তাই। এমনি উপোস তোমাকেও একদিন করতে হবে জেনো।

হা-হা করে হেসে উঠলাম : সে এক দিন আমার জীবনে আর আসবে না রে।

এখনই এত বিরাগ ? কত আর বয়েস হয়েছে, একুশ ? না হয় হলেই আমার চাইতে তিন বছরের বড়, তবুও তোমার চাইতে অনেক বেশী বুঝি, জানো ?

বল, কি-কি বুঝতে পেরেছ ?

মুচকি হেসে রেণু বলতে লাগলো : জানি একজনকে ভালবাসতে তুমি। মনে-মনে তাকেই বিয়ে করবার পুরোপুরি ইচ্ছে ছিল, শুধু একবার সাধিলেই —কিন্তু হায়, কেউ আর সাধলো না। তাই না দাদা ?

দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।—বলে উঠে ওর বেণী ধরতে যাবো, এমন সময় ওর দাদা গণেশ এসে বললো : দাদা, কারিগর-বাড়ী থেকে যে ডে-লাইটটা আনা হয়েছে, তেল ভরতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা থেকে তেল চুঁইয়ে পড়ে। এখন কি করা যায় ?

বাধা পড়লো। গণেশকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসেই গুরুদাসের সঙ্গে দেখা ; দাদা, দাদা, বরযাত্রীদের ঘরে আরো একখানা সতরঞ্চি না হলে সবটা ঢাকছে না।

চল যাচ্ছি।—বলে এদেরকে নিয়ে পশ্চিম-বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। রেণুদের বাড়ী থেকে পশ্চিম-বাড়ীর দুরত্ব বেশী না হলেও রাস্তার একটা বাঁক ঘুরে যেতে হয়। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে সেই বাঁকটি পেরিয়ে যেই দু'পা এগিয়েছি, অমনি দেখি সম্মুখে একজন একান্ত অপরিচিত ভদ্রলোক, সঙ্গে পাড়ার কতকগুলো ছোট ছেলে।

ওদের মধ্যেই একজন বলে উঠলো : এই তো উনি, ওঁরই নাম দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

আগন্তুক যেন বেশ ঘাবড়ে গেলেন। দু'-একবার কেশে গলাটা বৃথাই ঝাড়বার চেষ্টা করে, পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বৃথাই বার করে আবার তা পকেটে ভরে, অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করে প্রশ্ন করলেন : আপনার নাম দ্বিজেনবাবু ?

হ্যাঁ। কেন বলুন তো ? কোথা থেকে আসছেন আপনি ?

আবার সেই জড়তা : দেখুন, আমি, মানে আপনার কাছেই এসেছি। আপনি অবশ্য আমায় চেনেন না—কি করে চিনবেন বলুন। তা আমি আসছি শ্রীনগর থেকে।—চলুন, আপনার বাড়ীতে যাই, সেখানেই বরং—

ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেও কাঠখোট্টা স্বরে প্রশ্ন করলাম : আপনার প্রয়োজন কি বলুন না ?

না—তা প্রয়োজন বিশেষ কিছুই নয়। তা দেখুন, আমাদের কি দোষ বলুন ! আমরা হুকুমের চাকর বই তো নয়। মানে—

চারিদিকে যেমন লোক জমে গেছে, তেমনি একেবারে থমথমে ভাব। সবার কপালেই কুঞ্চন-রেখা, চোখে নিদারুণ বিরক্তি। একই প্রশ্ন তখন সবার মনে-মনে জ্বলন্ত লৌহ-শলাকা চালিয়ে ফিরছে : তবে কি—

এই 'তবে কি'র জবাব তিনি অনেকক্ষণ আমতা-আমতা করে যা জানালেন, তার মর্মার্থ এই : আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো। কাল ঢাকা থেকে পুলিশ-সুপার এসেছিলেন থানা পরিদর্শনে। তিনি বলে গেছেন যে আমি যে চট্টগ্রাম জেলে রওনা হয়েছি, সে সংবাদ তিনি পেয়েছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আমাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক্।

পুলিশ-সুপারের এই হুকুম তামিল করতেই এসেছেন রাজেনবাবু—থানার দ্বিতীয় অফিসার।

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে, গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ শিয়ালদহে অপেক্ষমান স্পাই-পুঙ্গবদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেনি। যদিও বা সংশয় ছিল, তাও একটি প্রশ্নেই রাজেনবাবু দুর করে দিলেন : বাড়ী যাবেন না ? চলুন। অবশ্য আপনার জামা-কাপড় বদলে নেবার জন্য, আমার বিশেষ কিছুই প্রয়োজন নেই। সার্চ্চ করবার আদেশ যখন দেয়নি—শুধু আপনার নাকি একটা গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ—সেটাই শুধু একবার, মানে—

দেখতে হবে, তা চলুন না। ঐ তো আমার বাড়ী।

ইতিমধ্যে দু'জন হিন্দুস্থানী পুলিশকে দেখলাম এসে হাজির। দেখলাম তারা মালকোছা এঁটে ধুতি পরে তার ওপরেই ছোট সাইজের খাকি প্যাণ্ট চাপিয়ে দিয়েছে, বোতামগুলো তখনো এঁটে দেয়নি। আর দু'হাতে লাল পাগড়ীর সুদীর্ঘ কাপড়টা মাথায় পাগড়ী নয়, ফাট্‌কার মতো করে কোন রকমে জড়িয়ে নিচ্ছে।

আসামী ধরবার বেলায় বিশেষ করে স্বদেশী আসামীর ক্ষেত্রে কী সব কৌশল অবলম্বন করলে কাজটা সহজ ও ক্ষিপ্র হয়ে আসে, সে সব মূল্যবান শিক্ষা এদের সমাপ্ত হয়েছে। তাই আমাদের পাড়ায় প্রবেশ করবার পুর্ব্বে রাজেনবাবুর মতই নিজেদের পোষাক এরা লুকিয়ে রেখেছিল স্কন্ধে লম্বমান ঝোলার মধ্যে। পাছে লাল পাগড়ীর শুভাগমন কেউ দেখতে পেয়ে সংবাদটি সোজা আমায় পৌঁছে দেয়, পাছে আসামী তাদের মূঢ়তার সুযোগ নিয়ে ভেগে যায়, তাই তারা সরকারী তক্‌মা ছেড়ে এসেছিল সিভিল পোষাকে। এখন, দুর থেকে যখন বুঝতে পেরেছে যে, কাজ হাসিল হয়েছে, তখন পোষাক পরে জবরদস্ত হয়ে তারা এসে হাজির।

কিন্তু, আমার আসবার খোশ-খবর কালকে যেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা

সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আমার মহাপ্রস্থানের দুঃসংবাদটি সমস্ত আয়োজনটাই যেন ম্লান করে দিল।

ডে-লাইটের তলাটা ফুটো হয়েছে, না একেবারেই ভেঙ্গে গেছে, গণেশ তা ভালো করে মনেই করতে পারলো না আর গুরুদাস যে কেন আমায় ডাকতে এসেছিল, সে কথা ভুলেই গেছে। রাজেনবাবু আমার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটির পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করে বিলাস কাকার বৈঠকখানাতে এসে বসতেই চারিদিক থেকে তাঁকে ছেলে-বুড়ো ও মেয়েরা-মহিলারা একেবারে ছেঁকে ধরলেন।

বিলাস কাকা পাড়ার অন্যান্য কাকাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ, বয়সে নয়, অভিজ্ঞতায় ও বুদ্ধিতে। তিনি বললেন: দেখুন, আজ আমার মেয়ে রেণুর বিয়ে। গ্রামের দূরের কথা, পাড়ার কোন শুভ কাজে, এমন কি আত্মীয়জনের কাজেও দ্বিজেনকে পাওয়া যায় না। কারণ ও যে কবে ও কখন এখানে আসবে আর বিনা নোটিশে কখনই বা ফস্ করে কোথায় চলে যাবে, তা দেবা ন জানন্তি। আজ বোধ হয় রেণুরই ভাগ্যগুণে ও অকস্মাৎ এসে হাজির। চলেই যাচ্ছিল, রেণুই হাতে-পায়ে ধরে ওকে নিরস্ত করেছে। এমনি শুভদিনের আনন্দে আপনি এসে বাধা সৃষ্টি করে বসলেন?...

মর্ম্মভেদী সংবাদটি ছেড়ে দেবার পর এক ঘণ্টা অতিক্রম হয়েছে। সুতরাং রাজেনবাবু হারানো সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন। ধীরে শান্ত স্বরে তিনি যুক্তি দিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন: দেখুন, বিশ্বাস করুন, এমনি দিনে আসছি জানতে পারলে অন্ততঃ আমি এই নির্ম্মম কাজের ভার নিতাম না। আমিও আপনাদেরই মত সামাজিক লোক, আমারও বাড়ীতে এমনি বিবাহাদি হয়ে থাকে। কিন্তু জানেন তো পরের চাকরি করি আর সে চাকরিই হচ্ছে অত্যন্ত নিরানন্দদায়ক। তাই আপনাদের বাধা সৃষ্টি করতে এসে আমিও কম দুঃখ পাচ্ছি না। কিন্তু আমার অসহায় অবস্থার কথাটা আপনারা একবার বিবেচনা করে দেখুন।

বলে তিনি করুণ দৃষ্টি একবার সভার চতুর্দ্দিকে বুলিয়ে নিলেন। কালু কাকা তাঁর কালো দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন, অশ্বিনী কাকা ধোঁয়া না বেরুলেও ভুড়ুক-ভুড়ুক করে হুঁকো টেনে চলেছেন, বৃদ্ধ ও বধির অখিল কাকা কিছু শুনতে না পেলেও সবই বুঝতে পেরে একবার এর মুখের দিকে, আর একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছেন, দেবেন কাকা এসব ব্যাপারে চিরকালই অগ্রণী, তাই বিলাস কাকার ব্রীফ নিয়ে যেন তাঁর পাশে অপেক্ষা করছেন সওয়ালের পয়েণ্টগুলো ঠিক-ঠিক ধরিয়ে দেবার জন্য। অতুল কাকা পুজো-অর্চ্চনা নিয়েই থাকেন; তাই অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে এক পার্শ্বে বসে সবই শ্রীলোকনাথের হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তিলাভের চেষ্টা করছেন।

কাকাদের ফাঁকে-ফাঁকে এসে বসেছে তাঁদের ছেলেরা, যুবকের দল, প্রয়োজন হলে জামার আস্তিন গুটিয়ে নিতে প্রস্তুত হয়ে। জানালার ঝাঁপগুলো ঠেলে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন কাকীমা, পিসিমা, মাসীমার দল ও

তাঁদের মেয়েরা। সম্মুখের প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে কারিগর-বাড়ীর রমজান, ইলিয়াস, রেজা আলী, সিরাজ প্রভৃতি। বছিরদ্দী ব্যাটাও কোথা থেকে সংবাদ পেয়ে এসেছে এবং পুলিশকে সর্ব্বদাই ডোণ্ট কেয়ার ভাব দেখাবার জন্য বেশ কেয়ারফ্রি ভাবে এর-ওর সঙ্গে হাসি-তামাসা করে বেড়াচ্ছে।

আমার বাবাও এসেছেন এবং ঘটনার পরিণতি দেখাই যে শুধু তাঁর উদ্দেশ্য, তা প্রমাণ করবার জন্য একটি চেয়ারে বসে হাঁটুর ওপর হাঁটু তুলে দিয়েছেন আর হাতে ধরে রেখেছেন স্বহস্তে নির্ম্মিত নিম গাছের ডালের একটি যষ্টি। তাঁর বিশ্বাস, নিমের ডাল হাতে থাকলে মানুষের কোনো অমঙ্গলই আসতে পারে না। অদ্ভুত ভাবে নীরব তিনি, এই সব আলাপ-আলোচনার সঙ্গে তাঁর যেন কোনো সম্বন্ধ নেই। পুত্রকে তিনি চেনেন, খুব ভালো ভাবেই জানেন ; তাই রেণুর বিবাহে আমায় হারিয়ে সবাই অজস্র দুঃখ পেলেও আমার মনে যে তার প্রতিধ্বনি মিলবে না, সে সংবাদ তিনি রাখেন।

আসেনি বন্ধু শ্রীপদ আর আসেননি আমার মা। শ্রীপদ অসুস্থ, জ্বরের প্রকোপটা বেশ বেড়ে গেছে। আর মা এই বিদায়-দৃশ্য সইতে পারবেন না বলে আর এদিকে আসেননি।

তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে। আর দু'টো ঘণ্টা পরেই বিয়ের লগ্ন। আসন্ন সেই উৎসবের প্রাক্কালে যেন একটি শোকসভা বসেছে।

কালু কাকা বললেন : কিন্তু রাজেনবাবু, ধরুন আমরা যদি সবাই মিলে আপনাকে লিখে দিই যে, কাল সকাল নয়টার মধ্যে আমরা দ্বিজেনকে থানায় পৌঁছে দোব, তাহলেও কি পারেন না ওকে আজ রেখে যেতে ?

বিলাস কাকা অকস্মাৎ যেন একটা পথ খুঁজে পেলেন : মনে করুন না, ওর সঙ্গে আপনার আজ দেখাই হয়নি, ওকে বাড়ী পাননি কিংবা আপনাদের আসবার সংবাদ পেয়ে পূর্ব্বাহ্নেই ও সরে পড়েছে, তাহলে ? অবশ্য, আমি বলছি না ওকে একেবারেই পাননি বলে রিপোর্ট দিয়ে নিজের চাকরি খারাপ করুন। কাল সকালে আপনিই আবার আসুন না সদলবলে। আমরা কথা দিচ্ছি, ও বাড়ীতে থাকবে এবং থানায় যাবে আপনাদের সঙ্গে।

এ যে কত বড় ঝুঁকি সেটা মনে-মনে উপলব্ধি করে রাজেনবাবু আর একবার কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন : দেখুন, আবারো বলি, আপনাদের দুঃখে আমি দুঃখ অনুভব করছি। কিন্তু দ্বিজেনবাবুকে পেয়েও পাইনি বলে কি ভাবে ডায়েরী লিখবো বুঝতে পারছি না। আর এই খবরটি ঘুণাক্ষরেও ওপরে গিয়ে পড়লে শুধু যে চাকরি যাবে তাই নয়, জেলও হয়ে যাবে। তারপর কালকে ওঁকে পাঠিয়ে দেবার কথা। কোন্ আইনে আমি এমনি অদ্ভুত জামিন দিতে পারি বলুন ? বিশেষ করে উনি তো আর আমাদের প্রিজনার নন। আই-বি'র হুকুমে আমরা ওঁকে নিতে এসেছি। আই-বি চীজটি যে কী বস্তু, তা তো আপনাদের অজানা নেই। ওরা ছেলেকে পর্য্যন্ত ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। এমনি অবস্থায়—মানে,—

মানে প্রাঞ্জল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমার যেতে হবে। সে আমি জানি দু'ঘণ্টা পূর্ব্বেই যখনই শ্রীমান্ রাজেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেছে, তখনই।

তথাপি আত্মীয়েরা, পড়শীরা ও গ্রামের লোকেরা বহু যুক্তির অবতারণা করলেন, বহু অনুরোধ জানালেন, যুবকেরা অজস্র বিতর্কের সৃষ্টি করলো এবং সমবেত মহিলা ও দর্শকেরা নীরবে জানালো তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু settled fact কার্জ্জন সাহেবের বেলায় unsettled হলেও শ্রীনগর থানার দ্বিতীয় অফিসার রাজেনবাবুর বেলায় তা হতে পারলো না। বিনয়ের ও সমবেদনার পরাকাষ্ঠা দেখালেও আসামীকে হাতছাড়া করবার প্রস্তাব তাঁর অন্তর স্পর্শ করলো না।

তার পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সভা ছত্রভঙ্গ হয়ে জনসমাবেশে পরিণত হলো। কারু মুখে কথা নেই। সন্ধ্যার অন্ধকারে মনে হতে লাগলো যেন অজস্র প্রেতাত্মা কালো ছায়া ফেলে-ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকাশেও এক ফালি কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ। সে স্তিমিত দ্যুতিতে অন্ধকার আদৌ দূর হয়নি। তারাগুলোও তৈলহীন প্রদীপের মত মিট্‌মিট্ করছে। ডে-লাইটের একটিও জ্বালা হয়নি তখনো। বরযাত্রীদের ঘর তখনো অন্ধকার।

রাজেনবাবুর পাশাপাশি আমি এগিয়ে চললাম। পশ্চিম-বাড়ীর বাঁকটার পাশে আসতেই মধুসূদন হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে গেল। খুলে দেখবার অবকাশ হলো না।

বরযাত্রীদের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় গুরুদাসকে খানিকটে উপদেশ দিলাম কি ভাবে ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

ধোপা-বাড়ী এসে পড়লো। এর পরই সদর রাস্তা। পশ্চাতে চেয়ে দেখলাম কয়েকটি লণ্ঠন হাতে দীর্ঘ নীরব শোকযাত্রা। কাকারা সবাই আছেন, কাকীমারাও আছেন, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আছে, কারিগর-বাড়ীর মুসলমানেরাও আছে, সবাই আছে। সবার উদ্দেশ্যেই যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে যখন সদর রাস্তায় পড়লাম, তখন অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল বাবাকে তো যেন দেখতে পেলাম না এঁদের মধ্যে, আর মাকে ?...

একটু পরেই দেখা গেল বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে বাংলার হাজারো রাজবন্দীদের একজন আর তাকে ঘিরে সাবধানে চলেছে বৃটিশ সরকারেরই এক জন এজেন্ট ও তার দু'জন সহচর।

কারু মুখে রা নেই।

তিন

আশ্চর্য্য, পুঁটিমারা খালের ঠিক যেখানটায় মাত্র দু'দিন পূর্ব্বে গভীর রাত্রে অসুস্থ শ্রীপদকে আমি হাত ধরে নৌকো থেকে নামিয়েছিলাম, আজ ঠিক সেখানটাতেই অপেক্ষা করছে দারোগার নৌকোখানি। আর ওঠবার সময় রাজেনবাবু সত্যিসত্যিই নৌকো থেকে একখানা হাত প্রসারিত করে দিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন : হাত ধরে উঠুন। পড়ে যাবেন না যেন।

জায়গাটির কথা ভোলবার নয়। কারণ এর অনতিদূরেই বড় আকারের যে একখানা এক-মাল্লাই নৌকো ডোবানো দেখে গিয়েছিলাম, আজও সেখানা তেমনি গলা ডুবিয়ে যেন আমার যাত্রাপথের পানে চেয়ে রয়েছে। বিক্রমপুরে বর্ষা শেষ হয়ে এলে নৌকোগুলো দিয়ে তখন মাছ ধরা হয়। প্রথমে কতকগুলো জাবনা বা ধানগাছের খড় নৌকোর খোলে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মাঝারী সাইজের গাছের কতকগুলো ডাল নৌকোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে ওখানা খালে, বিলে অথবা পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয় একেবারে গভীরতম স্থানে। দিন পনেরো পর দড়ি ধরে টেনে নৌকোখানি ঝটিতি ভাসিয়ে তোলা হয়। জাবনা ও ডালের পাতাগুলো নৌকোর খোলে জমায়েৎ হয়ে মাছের চমৎকার আস্তানা তৈরী করে। ছোট ছোট মাছ, যথা : কৈ, পুঁটি, ট্যাংরা, খলসে, টাকি, পাবতা প্রভৃতি ওতে প্রচুর পাওয়া যায়। অর্থাৎ বর্ষাকালের বাহন নৌকোকে বিক্রমপুরে শীতকালে মৎস্য-শিকারে নিয়োগ করা হয়। এমনি একখানা নৌকো দু'দিন পূর্ব্বে যেখানটায় যে ভাবে দেখে গিয়েছিলাম, আজও দেখি সেখানা তেমনি ভাবেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে।

নৌকো শ্রীনগরের পানে রওনা হলো। র‍্যাপারটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে বসলাম। রাজেনবাবু পাশেই বসলেন আর আমার দেহরক্ষীদের একজন ছইয়ের সমুখে আর একজন পশ্চাতে ঘাঁটি আগলে রইলো।

কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল যেন ভাল করে ঠাওরই করতে পারছিলাম না। বর, বরযাত্রী ও জনবহুল আলোক্রোজ্জ্বল বিবাহ-সভায় কোথায় আমি গ্রহণ করবো একচ্ছত্র নেতার ভূমিকা, হাঁক-ডাকে ও বচন-বিন্যাসে কোথায় আমি অগ্রাণের শীতল ও মন্থর রাত্রি উত্তপ্ত ও সরগরম করে তুলবো, ত্রুটিহীন বিলি-ব্যবস্থার জন্য কোথায় আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হবে অজস্র স্তুতিবাণী, আর কোথায় বন্দী আমি, একাকী নিঃশব্দে চলেছি কারাগারের পথে।...ছইয়ের সাথে ঝোলানো একটি ময়লা হারিকেন লণ্ঠন মৃদু-মৃদু দোল খাচ্ছে আর কানে ভেসে আসছে জলের ছল্-ছল্ একটানা শব্দ।

কে জানে, কারিগর-বাড়ীর ফুটো ডে-লাইটের পরিবর্ত্তে মজুমদারদের লাইটটা আনা হয়েছে কি না, বরযাত্রীদের ঘরে আরো একখানা সতরঞ্চির

ব্যবস্থা করা গেল কি না, গণেশ গুরুদাস নৃপেন ভূপেন পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে শুভ-কাজটা যাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যায়, কে জানে সেদিকে ওরা দৃষ্টি দিয়েছে, না এখনো ভাবছে যে দ্বিজেনদা যখন এসেছেন ও রয়ে গেছেন, তখন আর ভাবনা নেই, নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বরং মরণি পিসিমার সঙ্গে একটু খাতির জমাবার চেষ্টা করা যাক্, যদি ভাঁড়ারের চাবিটা পাঁচ মিনিটের জন্যও পাওয়া যায়। হাঁসাড়া গ্রামের বিখ্যাত ময়রা সুরেনের ওখান থেকে দই ও সন্দেশ এসেছে যে।

একটা অদ্ভুত চিন্তায় সমস্ত মন কেমন যেন কালো হয়ে গেল। হয়তো আলো জ্বালা হয়নি, বরযাত্রীদের ভালো করে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি, বিলাস কাকার সঙ্গে বরকর্ত্তার হয়তো যা-তা নিয়ে দারুণ বচসা বেধে গেছে, একটা বিশ্রী উত্তেজনাকর আবহাওয়ায় বিবাহ-সভা একেবারে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে, হয়তো রেণুই শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করে দিয়েছে যে, সে বিয়ে করবে না। রেণুর বিয়েটা পণ্ড হয়ে গেলে হয়তো আমি খুশী হই, কিন্তু কেন?...এই 'কেন'র জবাব সারা অন্তর খুঁজেও কোথাও পেলাম না।

চলে আসবার সময় মা বার বার আমার বিছানাটা আমার সঙ্গেই দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ভাবলেন, শোবার কষ্টটা অন্ততঃ বাঁচবে। কিন্তু মাথার বালিশ দুটো সঙ্গে করে পুলিশের খাঁচায় এসে প্রবেশ করা যে কতখানি বিপজ্জনক, মা তার কী জানেন? তাই বালিশ দুটিকে এড়িয়ে নিয়ে এসেছি শুধু একখানা সুজনী ও মশারি। রাজেনবাবুও রাজার হুকুমটুকুই শুধু তামিল করেছেন, তল্লাসী করেছেন শুধু আমার বিরাটাকায় গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি, সামান্য মাথার বালিশের মধ্যে যে একটা রিভলভার থাকতে পারে, সে বুদ্ধি তাঁর হুকুম-তামিল-করা মাথায় আসবে কোত্থেকে?

তাকিয়ে দেখলাম, শ্রীমান্ রাজেন একটা সিগারেট প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। আমার নীরবতায় তাঁর সহানুভূতি জাগ্রত হলো: কী unpleasant কাজ, একবার ভেবে দেখুন দ্বিজেনবাবু। আর এই শালা আই-বি-দের জ্বালায় আমাদের হয়েছে আরও মুস্কিল! আমরা মশাই, চোর-বদমায়েস নিয়েই ব্যস্ত, এর মধ্যে আবার ভদ্রলোকের ছেলেদের নিয়ে টানাটানির কাজটা আমাদের ওপর ঠেলে দিস্ কেন? তোদের প্রিজনার, তোরাই এসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যা না। আর ওদের গ্রেপ্তারেরও কোনো মাথা-মুণ্ডু নেই। যাকে খুশী ধরলেই হলো, সাক্ষ্য-প্রমাণ তো আর হাজির করতে হবে না আদালতে, নইলে হাঙ্গাম যে কত, বাছাধনরা ভালো করে টের পেতেন।—বুঝলেন না, কাজ দেখাতে হবে তো, তাই।

অর্থাৎ, আমার গ্রেপ্তারের একমাত্র কারণ যে ঢাকা শহরের গোয়েন্দা বিভাগ, এ কথাটা তিনি বার বার আমায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

আমি কোনো উৎসাহই প্রকাশ করলাম না। কারণ আই-বি হোক বা থানাই হোক, পুলিশকে আমরা সাপের মত খল ও বিশ্বাসঘাতক মনে করতাম।

সুবিধে ও সুযোগ পেলেই যে এরা ফণা উদ্যত করবে ও দংশনেও লজ্জা পাবে না, এ সত্য আমাদের জানা ছিল। বাপ ছেলেকে ধরিয়ে দিয়ে মোটা পুরস্কার লাভ করেছে, বন্ধু বন্ধুর সর্ব্বনাশ সাধন করেছে, এমনি অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাই আমাদের নীতিই ছিল চুপ করে থাকা। বেফাঁস একটি মাত্র কথা কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এসে যে কী বিপর্য্যয় বাধিয়ে দিতে পারে, দলের বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার পথে কী পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার সৃষ্টি করতে পারে, তা আমাদের জানা আছে।

কিন্তু, আমি নিরুত্তর থাকলেও রাজেনবাবু আদৌ নিরুৎসাহ বোধ করলেন না। তাঁর কণ্ঠ অনেকটা এ্যাপোলজীর মতো শোনাতে লাগলো: তারপর বললাম বড়বাবুকে যে, আপনি নিজে যান, দ্বিজেনবাবুকে আমি চিনি না, কোন দিন দেখিনি; আর সম্রাটের এত বড় একজন শত্রু, এঁকে তো আপনারই অভ্যর্থনা জানানো উচিত,—কিন্তু শুনলেন না। বড় হলে যা হয়, তাঁর কোন আত্মীয়ার আজ বিয়ে, সেই শেখরনগর গ্রামে। ব্যস্, তিনি চলে গেলেন। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন, তিনি নিজে আজ একটি বিয়েতে বেশ ফুর্ত্তি করছেন, আর আপনাকে কিনা এমনি একটি বিয়ে থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হলো।

চট্ করে একটা সুযোগ পাওয়া গেল। থানার অফিসারদের মধ্যে চাকরিগত রেষারেষি একটু-আধটু থাকেই জানি। এই রেষারেষির সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক বন্দীদের অনেক সময়ই অনেক রকম সুবিধে এসে যায়। তাই সর্ব্বদাই আমরা এদের ঝগড়া বা ঈর্ষা জিইয়ে রাখি নিজেদের কাজে লাগাবার জন্য। বললাম: অনেক দেখেছি রাজেনবাবু। থানার বড় দারোগা সহকর্ম্মীদের যে কী ঘৃণা করে, তাদের সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের মতো কী বিশ্রী ব্যবহার করে, তা আর আপনি আমায় কি বলবেন। নিজের ঘরে দরজা ভেজিয়ে বসে ওরা চোরের তল্পীদারদের কাছ থেকে মোটা ঘুষ নিয়ে হয়তো অনায়াসে আপনার ফাইলের একটা নির্ঘাত conviction-এর মামলাই দিল ফাঁসিয়ে। বন্ধ হয়ে গেল আপনার reward আর promotion, মাঝ থেকে পুলিশ-সাহেবের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে জান কাবার। তাই না?

যা বলেছেন, দ্বিজেনবাবু।—বলে রাজেনবাবু আরো একটু ভালো করে বসে এবার বড় দারোগার শ্রাদ্ধ করতে যেন এগিয়ে এলেন। আমার ও-সব কাহিনী শোনবার আদৌ ধৈর্য্য ছিল না, মাঝে মাঝে শুধু হুঁ-হ্যাঁ করে রাজেন-বাবুর উৎসাহ-প্রদীপের সলতেটা উস্কিয়ে দিচ্ছিলাম মাত্র। রাজেনবাবুর মুখে খই ফুটতে লাগলো।......

রাত প্রায় এগারোটায় এসে আমাদের নৌকো শ্রীনগর থানার ঘাটে ভিড়লো। থানার পুব দিকে এই ঘাট। খালের জল অনেক নীচে নেমে যাওয়ায় বাঁধানো ঘাটটার শেষে মাটি বেরিয়ে পড়েছে।

থানার বারান্দায় এসে উঠতেই বন্দুকধারী সিপাই এগিয়ে এসে মিলিটারী কায়দায় অভিবাদন জানালো। থানা একেবারে নীরব বলা যায়। উত্তর দিকের ব্যারাকে আলো জ্বালিয়ে কোন সিপাই তুলসীদাসের দোঁহা বিচিত্র সুরে পাঠ করছে, আর দক্ষিণ-পুব কোণের পোষ্ট-মাষ্টারের বাসায় একটি শিশুর বিরামহীন ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে।

বড় দারোগা শেখরনগর থেকে ফিরে এসে শয্যাগ্রহণ করেছেন, থানার অন্যান্য কর্ম্মীরা সবাই যাঁর-যাঁর বাসায় ফিরে গেছেন, থানার বারান্দায় একটা লম্বা টেবিলের ওপর ওভারকোট বিছিয়ে দু'টি সিপাই নিদ্রামগ্ন। এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করে রাজেনবাবু বললেন: চলুন আমার বাসায়, খাবেন।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললাম: বলেন কি, তাহলে বড় বাবু আপনারই নামে ডায়েরী করে রাখবে। চাকরিটি খোয়াবেন।

রাজেনের পৌরুষে ঘা লাগল বুঝি: রাখুন মশায়, ডায়েরী আমিও করতে পারি। আমিও থানার সেকেণ্ড অফিসার। প্রত্যেক সপ্তাহে আমারও confidential report পৃথক্ ভাবে এস-পি'র অফিসে যায়।—আসুন।

অতএব রাজেনবাবুর পশ্চাতে থানার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। নৈশ প্রহরীর সম্মুখে আমার বক্রোক্তি ও রাজেনবাবুর উচ্ছ্বাসে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে, থানায় স্পষ্ট দু'টি দল আছে বড় বাবু ও মেজ বাবুর। সেজো ও ন'দেরও কি এক-আধ জন স্তাবক নেই? খুশী হলাম। Divide and Rule—এ তো ইংরেজদেরই প্রথম নীতি এবং সফল নীতি।...

খেতে বসে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। ছেলে মেয়ে রাজেনবাবুর ক'জন কে জানে, এত রাতে হয়তো তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। দেখলাম, রাজেন বাবুর স্ত্রী অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে অতীব উপাদেয় সরস খাদ্যগুলি একই সাইজের প্রায় আধ ডজন বাটিতে সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। শুধু পোনা মাছ আর মুরগীর মাংসই নয়, আবার কয়েক রকমের পিঠেও। নাম বোধ হয় তার একটারও জানি নে, কিন্তু খেতে সবগুলোই চমৎকার।

আহারের পর এল পান, পান খাইনে শুনে আবার এল ভাজা মসলা। তার পর রাজেনবাবু বললেন: কী করবো বলুন, হাত-পা বাঁধা। নইলে আজ এখানেই আপনার শোবার ব্যবস্থা করে দিতাম। ঐ গারদে কি কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে থাকা সম্ভব?

এবার কিন্তু রাজেনবাবুর অকপটতায় আর সন্দেহ রইলো না। লোকটা সত্যই নেহাৎ গোবেচারা গোছের। জিজ্ঞেস করলাম: কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বাড়ীতে আপনি আগেই বলে গিয়েছিলেন আমার খাবার কথা। তা—ভালই করেছিলেন। কিন্তু খাবার ঝুঁকি নেয়া এক কথা, আর শোবার ঝুঁকি নেয়া একেবারে সাংঘাতিক। আমি কি আপনার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছি? কাজ নেই রাজেনবাবু, আমায় নিয়ে বড় বাবুর সঙ্গে আর

ঝগড়া বাধিয়ে দরকার নেই। আরে মশাই, থানার হাজতে বেশ থাকা যাবে'খন।—চলুন।

রাজেনবাবু তবু দমবার পাত্র নন। বাড়ী থেকে বেশ ভালো বিছানা মশারি ও লেপ নিয়ে এসে নিজে হাজতের মধ্যে প্রবেশ করে পরিপাটি করে শয্যা রচনা করে দিলেন, তারপর আর একবার বড় বাবুর শ্রাদ্ধ করে ও অজস্র সমবেদনা ও দুঃখ জানিয়ে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে গেলেন।

থানার হাজত কিন্তু একটু ভিন্ন রকমের। থানার ঘরখানা টিনের, তার মাঝখানকার বড় ঘরের মাঝে মোটা-মোটা কাঠের চৌকো শিকের তৈরী একটি খাঁচা। খাঁচার মাথায় থানার পুরোনো ডায়েরী, রেজিষ্টার ও অন্যান্য অজস্র খাতাপত্র একেবারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। ধুলোয় যে তা ভর্ত্তি, তাই নয়, তার মধ্যে ইঁদুরের আস্তানা। তারপর কাঠের শিক বলেই আছে তার জোড়া আর সেই জোড়ার ফাঁকে বাসা বেঁধে আছে অসংখ্য ছারপোকা।

একটু পরেই তা বেশ টের পেতে লাগলাম। ঘুম ভেঙে গেল। খোলা দরজার বাইরে বারান্দায় বন্দুকধারী প্রহরী সম্পূর্ণ সজাগ। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আজ বুঝি ও একটু বিশেষ রকম সচেতন। বাইরে অজস্র জ্যোৎস্না আর তেমনি ঘন কুয়াসা। উজ্জ্বল পশ্চাৎপটের সম্মুখে সিপাইয়ের শিলুট দেহখানা নড়াচড়া করছে।

...বিবাহ সভায় কিন্তু নিশ্চয়ই এখন আলোর ছড়াছড়ি—ডে-লাইটগুলো সব জ্বালানো হয়েছে, বরযাত্রীদের বসবার ঘরখানা সুদৃশ্য সতরঞ্চি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, আদর-আপ্যায়ন চলছে, খুশীতে উজ্জ্বল নরনারী হাঁকডাক করছে, সামিয়ানার নীচে হচ্ছে রেণুর শুভদৃষ্টি।... বরের চোখদুটিতে আলোর প্রতিবিম্ব, আর রেণুর? তার দুটি চোখে কী চক্‌চক্‌ করছে? দুটি মুক্তা? দুই বিন্দু অশ্রু?

...আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

সকাল বেলায় রাজেনবাবুর বাড়ী থেকে এল চা ও মুড়ি। থানা সরগরম হয়ে ওঠবার পুর্ব্বেই একখানা ছোট নৌকোয় আমায় রওনা হতে হলো লৌহজং অভিমুখে। গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ যাবার পথে লৌহজং একটি ষ্টীমার-ষ্টেশন। সেখানে সকাল দশটার মধ্যেই ঢাকা মেল-ষ্টীমার এসে পৌঁছে যায়। সেই ষ্টীমার ধরে আমায় যেতে হবে নারায়ণগঞ্জে, তার পর ট্রেনে ঢাকা।

এবার আমায় নিয়ে চললেন একজন সহকারী দারোগা, নাম সীতানাথ সেনগুপ্ত।

নৌকো শ্রীনগরের গণ্ডী পেরিয়ে মাঠে পড়তেই অকস্মাৎ অত্যন্ত নারস ভাবে প্রশ্ন করে বসলেন: আপনার নাম?

এই নাটকীয় প্রশ্নে লোকটার ওপর আমার ভারী বিরক্তি এল। আমি জানি,

ওরই সঙ্গে আছে একখানা কমাণ্ড সার্টিফিকেট, যাতে লেখা আছে ঠিক কোন্ সময় কি নামের কা'কে নিয়ে ও ঢাকা রওনা হলো। তারপর সকাল বেলা একজন বিপ্লবী বন্দীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করে শ্রীমান্ যে একটি বারও সেই বন্দীর নাম জেনে নেবার আগ্রহ প্রকাশ করেনি, এ কথা কি বিশ্বাসের যোগ্য ?

তথাপি আমার নাম আর একবার উচ্চারণ করলাম। শুনেই ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা বড় মণি-ব্যাগ বার করে ফেললেন এবং তার একটি প্রকোষ্ঠ থেকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ বার করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরে বললেন : এই দেখুন। দেখলাম তাতে পেন্সিলে স্পষ্ট ভাবে লেখা : দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

ব্যাপার কি ? ভ্রূ কুঁচকে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানা হাসি হেসে আবার সেই কাগজের টুকরোটি মণি-ব্যাগে ভরে রেখে দিয়ে বললেন : বলবো সব পরে। নৌকো আরও খানিকটে যাক্ আগে। দেখুন কি অদ্ভুত ব্যাপার, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, সাক্ষাৎ নেই, আমার নামও আপনি জানেন না, অথচ আপনার নাম লেখা একখানা কাগজ স্থান পেয়েছে আমার ব্যাগে। কি করে তা বলছি সব। দাঁড়ান, আরও একটু এগিয়ে যাই।

কৌতূহল দারুণ বেড়ে গেল। লোকটি তো বেশ সাসপেন্স সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এঁকে আমি খুব সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলাম। ভাবলাম, এ হয়তো একটি আস্ত ঘুঘু। নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে। তাই জিহ্বার ওপর অধরের কঠিন বাধা চেপে ধরলাম।

এবারও যথারীতি দু'জন সিপাই এসেছে এবং যথারীতি তারা স্থান নিয়েছে ছইয়ের সম্মুখে ও পশ্চাতে।

অগ্রহায়ণের সকাল। ভারী মিঠে সকালের রোদ। দু'পাশের উঁচু পাড়ের কোথাও সরষে ফুল অজস্র ফুটে রয়েছে, কোথাও বা কলাইয়ের বন। সরু খালে জলও তেমন গভীর নয়, তাই মাঝি লগি মেরেই দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

সীতানাথ কৌতূহল সৃষ্টি করেই থেমে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন আমিই হয়তো এবার তাগাদা জানাব রহস্যভেদের জন্য। কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্ত করা আমাদের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। তাই বেশ দিব্যি বসে-বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সীতানাথ বোধ হয় অনেকক্ষণ আমার দিক থেকে কোনো প্রশ্ন আসে কি না, তার জন্য অপেক্ষা করে-করে একেবারে হতাশ হয়ে উঠলেন। তারপর এক সময় বলে উঠলেন : গণেশ বোসকে চেনেন ? গণেশ বোস ? আপনাদের গাঁয়ের কালাচাঁদ দাসের বোনের জামাই ? ডেকেছিলেন নাকি তাকে কোন

দিন সেরাজদীঘা মেইল ডাকাতির জন্য ? অকস্মাৎ তিন দিনের বৃষ্টির ফলে শুক্‌নো মাঠ আবার জলে ভেসে যাওয়ায় সেই কাজটি স্থগিত রাখতে হলো।— আচ্ছা, আরো জিজ্ঞেস করি, তন্তর গ্রামের 'সীতা' নাটকাভিনয় আপনার দেখতে যাবার কারণ কি ? রাজদিয়া গাঙ্গুলী-বাড়ীর পাশেই কোন্ পণ্ডিতের বাড়ীতে আপনার কে বন্ধু আছেন ? মধুসূদন কি তাঁর নাম ?

একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। সেই মুহূর্ত্তে নৌকোর ওপর একটা বজ্র-পতনেও বোধ হয় এতটা বিস্মিত হতাম না।......লোকটি তো সত্যিই অনেক সংবাদ রাখে এবং এমন সব গূঢ় ও মারাত্মক সংবাদ রাখে, যা ঘুণাক্ষরেও এর কাণে আসবার কথা নয়। আমি অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম সীতানাথের মুখের পানে, শুধু উচ্চারণ করলাম : গণেশ বোস ?

হ্যাঁ।—সোৎসাহে সীতানাথ বলতে লাগলেন : মনে পড়ে মাস দুয়েক আগে একসঙ্গে এদিকে কয়েকখানা গ্রামের প্রায় পঁচিশখানা বাড়ীতে তল্লাসী হয়েছিল ? আপনার বাড়ী, হাঁসাড়ার শান্তি সোমের বাড়ী, শেখরনগরের সুবোধ গুহের বাড়ী, তন্তরের সুবোধ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী—এমনি আরও অনেক বাড়ী। তল্লাসী দলের সঙ্গে আমি আপনার বাড়ী তল্লাসী করতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আই-বি'র লোক ছিল। সংবাদ ছিল, আপনার বাড়ীতে অনেকগুলো রিভলভার আছে,—বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার। মাটি খুঁড়ে একেবারে লাঙ্গল চালাবার মতো করে এসেছিলাম। রিভলভার তো দূরের কথা, আপনার এক টুকরো হাতের লেখাই পাওয়া গেল না।

বললাম : তাহলে বাজে খবরের ওপর নির্ভর করে পরিশ্রমটা আপনাদের মাটি হলো বলুন ?

সীতানাথ তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : নিশ্চয়ই নয়। কাজ আমাদের হাঁসিল হয়ে গেল। কারণ গণেশ বোসের হাতে যে চিঠিখানা আপনি সুবোধ গুহকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, সেখানা সে দু'দিন নিজের বাড়ীতেই রেখে দিয়েছিল। তল্লাসী করে সেখানা হস্তগত করা গেল আর অন্যান্য তল্লাসীগুলো তো শুধু লোক-দেখানো।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইলো না : মানে ?

মানে অতি সহজ। গণেশ বোসকে বাঁচাতে হবে। চিঠির সংবাদ সে পূর্ব্বেই দিয়ে গেছে। কিন্তু চিঠিখানা যদি তল্লাসীর ছুতোয় হস্তগত করা যায়, তাহলে গণেশকে আপনাদের সন্দেহ করবার কারণ থাকবে না আর কাজে-কাজেই আরও অনেক কাল শ্রীমান্ আপনাদের অনেক গুপ্ত সংবাদ বয়ে নিয়ে এসে আমাদের বড় বাবুর কাণে ঢালতে পারবে। সুতরাং—

সীতানাথের কোনো কথাই আর আমার কাণে যাচ্ছিলো না। সত্যিই, কী সাংঘাতিক লোক এই গণেশ। মনে পড়লো কিছুদিন পূর্ব্বে সত্যিই তাকে আর হাঁসাড়ার প্রবোধ গুহকে আহ্বান করা হয়েছিল মারাত্মক একটি কাজে, যাতে হত্যার প্রয়োজন ছিল আর তা দিনে-দুপুরে ও রামদা' দিয়ে। সবই ঠিক

ছিল, সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল সম্পূর্ণ, শুধু শেষ মুহূর্তে সংবাদ এল যে, নির্ব্বাচিত স্থানটিতে বর্ষার জল এসে পড়েছে। মনে পড়লো, কাজটি হলো না বলাতে প্রবোধের অপেক্ষা গণেশই যেন ভারী মুষড়ে পড়লো, এই একটি ডাকাতি দ্বারাই যেন সে গোটা দেশটাকেই স্বাধীন করে ফেলতো—এমনি ভাব। তার পর সে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো একখানা চিঠির জন্য। যতই আমি তা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সে চেপে ধরতে লাগলো একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে। সুবোধ গুহের প্রেরিত অতি বিশ্বাসী কর্ম্মী, বার বারই সে অনুরোধ জানাতে লাগলো সুবোধ বাবুকে লিখে দিতে যে, যে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা হলো না, পরে হবে।

নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি যে চার লাইন লিখে দিয়েছিলাম, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে :

'সে কাজ হলো না। জল এসে পড়েছে। হলে আবার জানাবো। পরশু আপনার বাড়ীতে যাবো দুপুরে। না খেয়ে কিন্তু ফিরবো না। খাবার ঠিক রাখবেন।'

বেশ বুঝতে পারলাম এই চিঠিখানাই পুলিশের হাতে পৌঁছেছে। আর গণেশ বোসই হচ্ছে সরকারী গোয়েন্দা। কিন্তু এই সব সংবাদ যথাস্থানে পাঠাই কি করে? তারপর শুধু এই সংবাদই নয়। আমার যে দু'টো বালিশ বাড়ীতে রেখে এসেছি, সে দু'টোরও তো একটা সদ্গতি করা একান্ত প্রয়োজন। যাচ্ছি তো জেলে। চক্রব্যূহের মতো এর আছে অতি সহজ অসংখ্য প্রবেশ-পথ, কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ কোথায়?

অকস্মাৎ সীতানাথের কণ্ঠ কানে এল : দ্বিজেনবাবু, আমার বাড়ী বরিশালে। আমার কাকার নাম করলেই আপনি চিনতে পারবেন। প্রেসিডেন্সী জেলে তিনিও একজন রাজবন্দী। এটা একটা বিচিত্র এ্যাকসিডেণ্ট বলা যায় যে, কাকার মতো প্রেসিডেন্সী জেলে না গিয়ে ভাইপো আজ শ্রীনগর থানার সহকারী দারোগা। তাই রাজবন্দীদের আমি চিনি। দেশের জন্য তাঁরা কতখানি আত্মত্যাগ করেছেন, অন্তরে আমি তা উপলব্ধি করি। তাই প্রথমেই যেদিন গণেশ বোস এসে বড় বাবুর ঘরে বসে ফিস-ফিস করে আপনার সম্বন্ধে একটা কাহিনী বিবৃত করছিল, পাশের ঘরে বসে কান পেতে আমি শুনছিলাম তা। সেদিন এই কাগজখানায় আপনার নাম লিখে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম আপনাদের বাড়ীর দিকে গেলে আপনাকে সব বলে আসবো। গেলাম বটে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে, কিন্তু কোথায় আপনি?

কথা বলতে পারলাম না। লোকটা শুধু আমার নয়, আরও অনেকের, একটা গোটা বিপ্লবী দলের যে কতখানি উপকার করলো, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশসিংহের বিবরে যে এমনি ধারালো-দাঁত ইঁদুর বাস করে, সে সংবাদ নিশ্চয়ই এস-পি'র কানে আজও যায়নি! একবার মনে হলো, লৌহজং যাবার পথে এই পুলিশের নৌকোতে বসেই সীতানাথকে recruit করে ফেলি,

তাহলেই বোধ হয় দলের পরম কল্যাণ সাধন করা হবে। আবার ভাবলাম, অতটা না এগিয়ে এর হাত দিয়েই একটা সংবাদ পাঠাবার চেষ্টা করি ছোট ভাই রঙ্গলালের কাছে, কিংবা বিপদভঞ্জন অথবা খগেনের কাছে। কিন্তু একদিনের মধ্যে মাত্র দু'এক ঘণ্টা আলাপের পরই একজন সহকারী দারোগাকে কি অতখানি বিশ্বাস করা ঠিক হবে? তবে সংবাদগুলো পাঠাই কি ভাবে?...

চার

প্রায় সাড়ে দশটায় আমরা এসে পৌঁছোলাম লৌহজং ষ্টেশনে। যথাসময়ে ঢাকা মেল-ষ্টীমার এল এবং আমরা তাতে চেপে বসলাম।

ষ্টীমারে ভিড় যে খুব বেশী তা নয়। তবে সবাই সতরঞ্চি, চাদর বা মাদুর বিছিয়ে নিয়েছে বলে সমস্ত ডেকটাই যাত্রীতে ভরে আছে বলে মনে হয়। এই সব ষ্টীমারের নীচের তলাটা বেশ নোংরা। বাক্স বা চটের ব্যাগ-ভর্ত্তি মালপত্র থাকে, মাছের ঝুড়ি থাকে, দইয়ের ও ক্ষীরের হাঁড়ি থাকে, ষ্টীমারের দড়াদড়ি লোহা-লক্কড় থাকে। তার পর মাঝখানের সবটাই জুড়ে থাকে কলকব্জা—সেখানটা দারুণ গরম। দু'পাশে সারি সারি ঘর, কোনটা খালাসীদের রান্না-ঘর, কোনটা সুখানি ও কোনটা সারেংএর শয়নকক্ষ, কোনটা মলমূত্রাগার, কোনটাতে বাবুর্চ্চিদের ষ্টোর আর একখানা হচ্ছে কেরাণীর অফিস ও বিশ্রামকক্ষ দুই-ই।

দোতলা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেখানে শুধু যাত্রীদের আস্তানা। মালপত্রের বা রান্না-ঘরের ঝামেলা নেই। ইণ্টার ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ ও ফার্ষ্ট ক্লাশ সব দোতলাতেই। সীতানাথবাবু ও আমি ইণ্টার ক্লাশের একটি কামরায় এসে উঠলাম। সীতানাথবাবুর সাদা পোষাক, তাঁর অনুগামী সিপাই দু'জনেরও তাই; সুতরাং আমি যে একজন বন্দী, তা টের পাবারই উপায় ছিল না।

লৌহজংয়ের কাছে পদ্মা অত্যন্ত প্রশস্ত। বর্ষাকালের প্রচণ্ড তোড় এই শীতকালে সামান্য একটু কমেছে হয়তো, কিন্তু তবু অকস্মাৎ দৃষ্টিক্ষেপে বুকের ভিতরটায় একটা ধাক্কা লাগে। পাড়ের দিকে চাইলেই বেশ বোঝা যায়, এখনো দিবারাত্র পাড় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। একটি হিজল গাছের টিকিটুকু দেখা যাচ্ছে এখনো পাড়ের কাছেই জলের মধ্য থেকে। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ তার সংখ্যাতীত ঝুরি সহ বোধ হয় সবে উলটে পড়েছে, তাই পদ্মা এখনো তাকে কুক্ষিগত করতে পারেনি। খান-কয়েক খড়ের ঘরের আধখানা চালা হাঁটু ভেঙে এখনো দাঁড়িয়ে আছে একটি সম্পূর্ণ গৃহের শেষ চিহ্নস্বরূপ। দণ্ডাদেশ পেয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় তারা যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। অনেকগুলি ভিটে খালি পড়ে আছে। বাসিন্দারা পুর্ব্বাহ্নেই সব গুছিয়ে নিয়ে হয়তো কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে আবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে।

পদ্মার পাড় এমনি অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেঙে পড়ে যে, যারা দেখেনি, তারা তা ধারণাই করতে পারবে না। সন্ধ্যায় যে নদী পুরো দু'শো গজ দুরে ছিল, রাতারাতি তা শুধু যে এই দু'শো গজ মাটি গলাধঃকরণ করতে পারে, তাই নয়, পারে আরো চারশো গজ এগিয়ে যেতে। ফলে সন্ধ্যায় যে গৃহ শিশুদের কলহাস্যে ছিল মুখরিত, যে চায়ের দোকানে ছিল লোক-জনের জটলা, সকাল বেলায় তার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। শুধু

রাত্রে কেন, দিনের বেলাতেও তাই। নদীর ধারে সকালের মিঠে রোদে এক দল ছেলে ছুটোছুটি করে খেলছে, কখন যে সেখানকার মাটিতে চুলের মতো সরু একটি চিড় দেখা দিল, তার পর সেই প্রকাণ্ড মাটির চাপের তলা দিয়ে জলের তোড় বার বার আঘাত হেনে কখন যে তা ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেল, ছেলেরা তা টেরই পেল না। তার পর এক সময় অকস্মাৎ গাছপালা ঝোপজঙ্গল সহ ক্রীড়ারত ছেলের দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে তলিয়ে গেল নদীর মধ্যে।

পদ্মা নদীর ধারে এমনি মর্ম্মভেদী ঘটনা বিরল নয়। আর নদীর পানে চাইলে দেখা যায় তা যেন অনন্ত সমুদ্রের মতোই সীমাহীন, একেবারে দূরে—বহু দূরে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সকালের রোদ নদীর এলোপাথাড়ি ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিকচিক করছে সাপের মাথার মণির মতো। দুঃসাহসী দু'-একখানা জেলেডিঙ্গি সেই ঢেউয়ের ওপর টাল খেতে-খেতে ভেসে চলেছে। পাল-তোলা দু'-একখানা পাটের বা ধানের বিরাটকায় নৌকোও দেখতে পাওয়া যায় একখণ্ড তৃণের মতোই ঢেউয়ের ঘায়ে যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে এগিয়ে চলেছে।

লৌহজং ষ্টেশনে একটি ফ্লাট আছে। সেই ফ্লাটেই এসে ষ্টীমার লাগে। লোহার শিকলে আটকে রাখা সম্ভব নয় বলে ষ্টীমার থেকে নোঙর ফেলা হয়, তাও আবার একটা নয়, সমুখে ও পেছনে দু'টো। ইঞ্জিনহীন ষ্টীমারগুলিকে বলা হয় ফ্লাট, রেলের মালগাড়ীর মতো। এতে বুকিং অফিস আছে, মাল অফিস আছে, কেরাণীদের কোয়ার্টার আছে, তৃতীয় মধ্যম ও প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগার আছে, জেনানার জন্যও নির্দ্দিষ্ট আছে একটি কক্ষ। নদীর অবস্থা বুঝে ভাসমান ও চলমান এই ষ্টেশন ও প্লাটফরমটি খুশীমত সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সীতানাথবাবুর একটা নেশা আছে দেখা গেল ব্রিজ খেলা। ষ্টীমার ছেড়ে দেবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দেখলাম তিনি এক দল লোকের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়ে শুধু যে তাঁদের সতরঞ্চিই দখল করে বসেছেন, তাই নয়, দু'জোড়া তাস নিয়ে তাঁদের ব্রিজ খেলা সুরু হয়ে গেছে। আমি জানি সামান্যই, এর কলা-কৌশল তখনো ততটা রপ্ত করতে পারিনি ; তাই পাশে বসে এঁদের খেলার দর্শক হয়ে রইলাম। কিন্তু বুঝতে দেরী হলো না যে, সীতানাথ একজন পাকা খেলোয়াড়। তাঁর হিসাব একেবারে নিখুঁত, তাঁর আক্রমণ একেবারে শাণিত, কাজে কাজেই তাঁর জয় একেবারে অবধারিত। সীতানাথ পর-পর জিততে লাগলেন আর আমিও ঘন ঘন উচ্ছ্বাসে তাঁর উৎসাহ সহস্র গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তাঁর নেশা লক্ষ গুণ জমিয়ে দিতে লাগলাম।

ব্রিজের নেশায় সীতানাথ যখন একেবারে বুঁদ হয়ে গেছেন, সেই সময় আমি আবেদন জানালাম : সীতানাথবাবু, বসে-বসে আর ভালো লাগছে না। একটু ঘুরে আসি ?

সীতানাথ আকাশ থেকে পড়লেন : বিলক্ষণ। সে কথা আর বলতে !—রামভজন সিং, বাবুর সঙ্গে যাও।

খুশী হতে পারলাম না। সঙ্গে আবার কেউ কেন? সেই মাথার বালিশ ও গণেশ বোস তখনো আমার মাথায় ঘুরছে। ঢাকা জেলের ফটক পার হবার পুর্ব্বে যে ভাবে হোক্ এই সংবাদ দু'টি পাঠাতে হবে। ভাবছিলাম, ষ্টীমারে ঘুরে একবারটি দেখবো চেনা লোক মিলে যায় কি না। কিন্তু রামভদ্দর 'স্বদেশীর' সঙ্গে কাউকে কথা কইতে দেখলে যে আর আদৌ 'ভদ্দর' থাকবে না। যাই হোক, কপাল ঠুকে সেই হিন্দুস্থানী দেহরক্ষীকে নিয়েই নীচে নেমে এলাম ও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ফন্দী আঁটলাম, এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে রামভদ্দরকে একেবারে বিরক্ত করে তুলবো। তাই তৃতীয় শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার প্রথম শ্রেণীর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। ষ্টীমারের একেবারে সম্মুখভাগে ছড়ানো ইজি-চেয়ারগুলোর একখানায় বসেই আবার উঠে পড়লাম। একেবারে পশ্চাতের সেকেণ্ড ক্লাশ ভোজনালয়ে ঢুকে নদীর দিকে বৃথাই দৃষ্টি প্রসারিত করে মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপরই এসে দাঁড়ালাম দোকানের সম্মুখে। বৃথাই এটা-ওটার দাম জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। তারপরই পাশের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে কলকজার কর্ম্মব্যস্ততা নিরীক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হলাম। সারাক্ষণই আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেমন খুঁজে বেড়াচ্ছিল একটি পরিচিত মুখ, রামভদ্দরও তেমনি সারাক্ষণই আমার পশ্চাতে লেগেছিল একটি ফেউয়ের মতো।

কি যে করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হয়ে এসেছে। নারায়ণগঞ্জ পৌঁছোবার পুর্ব্বে এই সংবাদ দু'টি যে ভাবে হোক আমায় পাঠাতে হবেই। যদি প্রয়োজন হয়, রামভদ্দরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেলিংএর পাশে এনে উলটিয়ে জলে ফেলে দিতে হবে এবং তার পর আমাকেই নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে পদ্মায় নামতে হবে। দলের নিরাপত্তার চাইতে আমার জীবনের মূল্য বেশী নয়।

সংকল্প প্রায় এঁটে ফেলেছিলাম এবং তা সাধনের জন্যই রামভদ্দরকে নিয়ে ষ্টীমারের পশ্চাৎ দিকে এগিয়ে চললাম একেবারে প্রস্তুত হয়ে। প্রথমে রামভদ্দর, তার পর আমি। মোটা শিকলের সঙ্গে যেখানে হালখানা ঝোলানো রয়েছে, সেখানেই দোব ওকে ঠেলে ফেলে, তারপর একটা বয়ার নিয়ে নিজে নীরবে নেমে যাবো। স্থির-পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় অকস্মাৎ এক 'দেশওয়ালী ভাই'এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রামভদ্দরের। লোকটা বোধ হয় ঢাকা যাচ্ছে। আর্ম্ পুলিশে কাজ করে। কাঁধের ওপর বি-এ-পি পেতলের ব্যজ আঁটা।—ব্যস্, দু'জনে জমে গেল। বালিয়া জেলার কথা, নকরির কথা আর তার সঙ্গে খৈনি। সীতানাথ আর কত বড় নেশাখোর?

বললাম: সিপাইজি, আমি একটু ঘুরে আসি ততক্ষণ?

আমার সভক্তি আবেদনে বালিয়া জেলার নরপুঙ্গবের পৌরুষ জেগে উঠলো। তাচ্ছিল্য ভরে নিজেই যুক্তি দেখালো: যান, বাবু যান। আরে, ইষ্টিমার ছাড়িয়ে তো আপনি আর বাহিরে যাইতে পারবেন না। কী

হোবে একলা একটুখন ঘুরে বেড়াইলে। —যান, যান। তবে তুরন্ত ঘুমে আসবেন, হ্যাঁ?—বলে রামভদ্দর তার গোঁফে একটি চাড়া লাগালো।

কিন্তু কি করা যেতে পারে? সুযোগ তো পেলাম, কিন্তু চেনা লোক কোথায় পাই? ঘুরতে লাগলাম আবার যদি পাওয়া যায়। অকস্মাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠলো। ষ্টীমারের কেরাণীর ঘরের মধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখি সুধীরবাবু খুব নিবিষ্ট মনে মোটা বাঁধানো খাতায় কি লিখছেন। একটু ভাবলাম কি করা যায়। তার পর সম্মুখে ও পশ্চাতে একবার তাকিয়ে নিয়ে সটান তাঁর ঘরে ঢুকে ধপ্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

সুধীরবাবু রীতিমত চমকে উঠলেন: আরে, দ্বিজেনবাবু যে। কোথায় চললেন? নারায়ণগঞ্জে?

ঢাকাতে।—বলেই ফিসফিস করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দু'খানা চিঠি লেখার কাগজ ও দু'টো খাম চাইলাম। সুধীর বাবু আই, জি, এন ও আর, এস, এন কোম্পানীর নাম ছাপানো ব্রাউন রংয়ের দু'টুকরো কাগজ আর তাদেরই ব্যবহার্য্য ব্রাউন রংয়ের দু'খানা খাম দিলেন। কলম তাঁর মোটা, লিখতে দেরী হবে বলে পেন্সিল তুলে নিলাম। বন্ধু শ্রীপদর কাছে যে চিঠিখানা ঐ অত বড় ঝুঁকি নিয়ে খস-খস করে লিখে দিয়েছিলাম, সেখানা সে আজো সযত্নে রেখে দিয়েছে:

ভাই, তোমায় অসুস্থ রেখে এসে আমার মন যে কত খারাপ হয়ে আছে, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারি না। তার পর চলে আসবার সময় তোমার সাথে দেখাটা করেও আসতে পারলাম না। কত দিনের জন্যে চললাম, একমাত্র ভগবানই জানেন। আমার কথা যাতে না ভুলে যাও, সেজন্য আমার মাথার বালিশ দু'টি (যা আমি কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম) তুমি নিয়ো। মাকে এই পত্র দেখালেই তিনি তোমায় বালিশ দু'টি দিয়ে দেবেন। প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময়ও একবারটি আমার বালিশে মাথা রেখে আমার কথা তোমার মনে পড়বে। আজ এইখানে বিদায়।

বন্ধু শ্রীপদর কল্যাণে বহুবার গোয়ালন্দ গেছি; তাই ষ্টীমারের প্রায় সব কেরাণীদের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল এত বেশী যে, চেনা কেউ গেলে আমার আর টিকিট কেনাই লাগতো না। সুধীরবাবু সেই চেনার দলের একজন।

চিঠি দু'খানা সাবধানে সুধীরবাবুর হেপাজতে দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে দু'-চার পা যেতেই দেখি দেহরক্ষী রামভদ্দর দোতলা থেকে নামছে। আমায় দেখেই বলে উঠলো: আরে বাবু, আপনাকে ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে পা বেথা হইয়ে গেল। কুথা গেছিলেন?

একেবারে চোখ দু'টো কপালে তুলে ফেললাম: কোথায় আবার? এইখানে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন দেখছিলাম। তার পর সেখানে গিয়ে দেখি আপনি নেই। তাই আমিও খুঁজছি আপনাকে। চলুন, ওপরে যাই।

'আপনি' সম্বোধনের ফল একেবারে হাতে-হাতে পাওয়া গেল। বত্রিশটি ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে রামভদ্দর হেসে উঠলেন এবং সুড়সুড় করে আবার ওপরে উঠতে লাগলেন!

নারায়ণগঞ্জে নেমেই ট্রেন আর সেই ট্রেণে সোজা ঢাকায় এসে পৌঁছুলাম বেলা আড়াইটেতে। ষ্টেশন থেকে সোজা গিয়ে উঠতে হলো আই-বি অফিসে। আই-বি অফিস তখন ছিল আদালতের কাছেই কোথাও।

রাজেন সরকার অবশ্য তাঁর এস-পি'র হুকুম তামিল করেছেন মাত্র, আমায় সোজাসুজি রাজবন্দী করা হবে, না অন্য কোনো মামলায় জড়িয়ে দিয়ে একবার ফাঁসাবার চেষ্টা করা হবে, তা তিনি জানতেন না বটে, কিন্তু আমি আশঙ্কা করছিলাম গোয়েন্দা বিভাগ আপ্রাণ চেষ্টা করবে আমার কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্য। নেহাৎ না পারলে হয়তো রাজবন্দীই করে দেবে।

কারণ অনেক কথাই পুলিশ জানতো না আর তাদের অজানা কথার স্তুপ বেড়ে চলেছিল দিনের পর দিন। ২১শে আগষ্ট ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে ঢাকা বিভাগীয় পুলিশ কমিশনার মিঃ এ. ক্যাসেল্‌স্‌ রিভলভারের গুলীতে আহত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার তত্ত্বাবধায়ক পুলিশ ইন্সপেক্টার আসানুল্লা চট্টগ্রাম শহরে ৩০শে আগষ্ট নিহত হন। সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী বন্দিশিবিরে গুলী চালানোর ফলে রাজবন্দী সন্তোষ ও তারকেশ্বর নিহত হন। ২৮শে অক্টোবর ঢাকা শহরের বুকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোকে গুলী করা হয়। পরদিনই কলকাতায় ইয়োরোপীয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ ভিলিয়ার্স কে গুলা করার চেষ্টা করা হয়। এ ছাড়া অনেকগুলো রাজনৈতিক ডাকাতিও সংঘটিত হয়।

এতগুলো হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা ও ডাকাতির পশ্চাতে কারা তৎপর, কি ভাবে তারা কাজ করছে, কি তাদের সর্ব্বনাশা কর্ম্মপন্থা, তাদের দলের নেতাদের নাম কি, এসব অমূল্য কথার একটিও তো জানা নেই গোয়েন্দা বিভাগের। তাই প্রস্তুত হয়ে ইন্সপেক্টার সাহেবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সীতানাথ কোথায় চলে গেলেন জানিনা।

এলেন ইন্সপেক্টার যোগিনী বসু। কথা কি ভাবে আদায় করা যায়, সে বিষয়ে তাঁর ভালো করেই জানা আছে, আর এ ব্যাপারে তাঁর নাম-ডাকও খুব। আমার সঙ্গে এই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ।

কিন্তু ব্যবহার তাঁর একেবারে অদ্ভুত ঠেকলো: এই যে দ্বিজেনবাবু, এসে গেছেন। বেশীক্ষণ আর আপনাকে আটকে রাখবো না। যদি ইচ্ছে করেন, একটা বিবৃতি দিতে পারেন। সই আপনাকে করতে হবে না, আমিই লিখে নোব। আর যদি না দেন, না দিলেন। দেখবেন, আপনার বন্ধুরা সবাই আছে ওখানে। শান্তি সোম, ভোলা বসাক, বিভুতি চৌধুরী সবাই—বলে যোগিনী বাবু এক গাল হাসলেন।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম : কলকাতার এস-বি অফিসেও আমি কখনো কোনো বিবৃতি দিইনি।

যোগিনী বাবু আর অযথা বিলম্ব করলেন না। একখানা ঘোড়ার গাড়ীতে নিয়ে এলেন আমায় ঢাকা জেলের অফিসে এবং যখন কর্তৃপক্ষের হাতে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তখন অগ্রহায়ণের অপরাহ্ন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

প্রকাণ্ড ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেল। প্রায় দু'হাজার কয়েদী এখানে বাস করে। একেবারে শহরের মাঝখানে বলা যায়। জেলের মধ্য থেকে বাইরের দোতলা ও তেতলা বাড়ীগুলি দেখা যায়।

একজন ডেপুটি জেলার আমার নাম, ধাম, বয়স লিখে নিয়ে একজন সিপাইকে সঙ্গে দিয়ে পাঁচ নম্বর খাতায় নিয়ে যেতে হুকুম করলেন। জেলের সদর দরজা থেকে বেশ খানিকটে দূরে পাঁচ নম্বর খাতা। পাঁচ নম্বর খাতা মানে খাতা নয়, ইয়ার্ড। কিন্তু পাঁচ নম্বর খাতায় ঐ ইয়ার্ডের ইতিবৃত্ত লেখা থাকে বলে জেলের প্রচলিত অদ্ভুত ভাষায় ওকে বলা হয় খাতা।

ইয়ার্ডে ঢুকতেই অন্যান্য বন্দীরা একেবারে কলরব করে উঠলো : এই যে, তুমিও এসে গেছ দেখছি। ক'দিন ধরেই আমরা বলাবলি করছি তুমিই শুধু বাকি থেকে গেলে কি করে।

কে একজন বলে উঠলো : কেন, দুর্গোর পরেই কি দ্বিজেনের পালা নাকি ?

সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো।

একটি প্রকাণ্ড তিন-তলা লাল রংয়ের বাড়ী। নীচের তলায় থাকে আমাদের চাকর, ঠাকুর, ধোপা, নাপিত ও জমাদারের দল। দোতলা আর তেতলায় আমরা। তেতলার 'এ' ব্যারাকে আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জেলের সাধারণ কয়েদীদের দিনের বেলাতেই রাত্রের আহার শেষ করে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই নিজেদের প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়তে হয়। শুধু আমাদের বেলাতেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম। রাত্রি সাড়ে দশটায় বারো জনের একটি সিপাই দল এসে আমাদের গুণতি করে তালা এঁটে দিয়ে যায়। সন্ধ্যে হতেই কিচেন-ম্যানেজার নীরেনবাবু এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন, রাত্রে আমি কি খাব, ঢাকাই পরোটা, না পোলাউ।

একজনের শোবার মত লোহার একখানা খাটিয়া, তার ওপর পাতা মোটা গদী, তোষক ও সুদৃশ্য সুজনী। সাদা ধবধবে খোলে ঢাকা দু'টি নরম শিয়রের বালিশ আর মাথার ওপর ম্যাঞ্চেষ্টার নেটের সাদা মশারি। পাশের টেবিলে কাচের ডোম-আঁটা মোমবাতি।

বিছানায় গা এলিয়ে দেবার আগে কোটটা খুলে ফেললাম। সার্টও। তার পর চশমাটা খুলে কোটের পকেটে রাখতে যেতেই সহসা হাতে ঠেকলো এক টুকরো কাগজ। ওঃ, আমি তো একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। পরশু দিন বাড়ী থেকে রওনা হবার প্রাক্কালে মধুসূদন পশ্চিম-বাড়ীর কোণে এসে আমার

হাতে গুঁজে দিয়েছিল এই টুকরোটি। আশ্চর্য্য, তার পর আর আদৌ মনে পড়েনি এটার কথা। পকেটের কোন্ কোণে উপেক্ষিত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। শ্রীনগরে, আই-বি অফিসে বা জেল-গেটে, কোথাও আবার আমার দেহতল্লাসী হয়নি। রেহাই পেয়েছি হয়তো রাজবন্দী বলে। পকেট থেকে টুকরোটি বার করে আলোর সামনে উঁচু করে ধরলাম। এ কি, এ যে রেণুর লেখা চিঠি। রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেললাম :

দাদা,

আমি তোমায় বলে-কয়ে রাখলাম বলেই আজ তোমায় ধরা পড়তে হলো। দোষ তাই আমারই। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি নে, আজকের উৎসবে আনন্দ আর এতটুকু অবশিষ্ট নেই। নেহাৎ আদেশ পালন করবার জন্যই হয়তো আমায় সাজতে হবে ও পিঁড়িতে বসতে হবে।

যাঁরা আমায় উৎসর্গ করবেন, তাঁরা কি আদৌ জানতে পারবেন যে, তুমি না থাকাতে আমার দুঃখের আর শেষ নেই ?

ইতি

অভাগিনী রেণু।

দুঃখের আর শেষ নেই। তা আমাদের অজানা নয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যখন এই পথে যাত্রা সুরু করেছি, তখনই জানি দুঃখ দিতে হবে অনেককে। মাকে, বাবাকে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীকে। শুধু সর্ব্ব দুঃখের উর্দ্ধে থাকবো আমরা নিজেরা। তাই ফাঁসীর দড়িকে মনে করবো মাত্র এক খণ্ড রজ্জু।...

হঠাৎ চমক ভাঙলো। ভোলাবাবু এসে বললেন : চলুন খেতে যাই। ঘণ্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ।

নিঃশব্দে ভোলাবাবুর পশ্চাতে নীচে নেমে এসে খাবার-ঘরে প্রবেশ করলাম।

পাঁচ

একুশ বছর বয়সে রাজবন্দী হয়ে জেলে আসার মধ্যে কেমন একটা রোমাঞ্চময় অনুভূতি আছে, বাইরের সাধারণ লোক তা সহজে উপলব্ধি করতে পারবে না। মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে পারিবারিক আনন্দ-কলমুখর শান্তিপূর্ণ গৃহ ছেড়ে চলে এলাম। পশ্চাতে রেখে এলাম বাবা ও মা'র স্নেহের বন্ধন, কাকা ও কাকীমাদের মমতার বন্ধন, প্রতিবেশীদের সহানুভূতির বন্ধন, সমবয়সীদের প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন, গ্রামবাসীর সহযোগিতার বন্ধন—সর্ব্বপ্রকার বন্ধন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে স্বচ্ছন্দ মনে চলে এলাম একেবারে জেলে। যাদের বাইরে রেখে এলাম, নিশ্চিত জানি আমার কথা তাদের মনে পড়বে, দৈনন্দিন হাজারো কাজের ফাঁকে অকস্মাৎ আমার স্মৃতি তাদেরকে নিমেষের জন্য হলেও চঞ্চল করে তুলবে, কবে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে, সেই অনাগত সুদিনের অপেক্ষায় জানি দিনের পর দিন চলবে তাদের নিরবকুণ্ঠ প্রতীক্ষা, দক্ষিণের কোঠায় প্রবেশ করলেই জানি মায়ের চোখে পড়বে আমার প্রতীক সেই গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটি আর অমনি এক বিন্দু অবাধ্য অশ্রু তাঁর চোখের কোণে উদ্বেল হয়ে উঠবে। এ-ও জানি, গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্নদের শিক্ষা দান করতে গিয়ে বাবা বার বার আমার অভাব অনুভব করবেন, বার বার তাঁর নিমের লাঠিখানা দু'হাতে ঘোরাবেন।

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বন্ধন, সর্ব্বপ্রকার পশ্চাতের টান অস্বীকার করে চলে এসে বাড়ী ও বাহির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে থাকার জন্য যে প্রচণ্ড মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, সেকালে বিপ্লবীদের তার অনুশীলন করতে হতো। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ছিল আমাদের ইষ্টমন্ত্র: পাঁকে মাছের মতো কাদায় বাস করবি। কিন্তু গায়ে যেন এক ছিটে কাদা না লাগে। বাবা-মা আত্মীয়-পরিজন পড়শী-গ্রামবাসী সবাইকে নিয়ে গোটা দেশকেই আমরা জীবনের চাইতে অধিক ভালবাসি সত্য, কিন্তু সে ভালোবাসায় মায়া নেই, দাসখৎ নেই। সেই ভালোবাসাই আমাদের বেহিসাবী করে তোলে, বিঘ্নসঙ্কুল পথে পা বাড়াবার সাহস জোগায়, মৃত্যুকে শ্যামের মত বরণ করে নেবার শক্তি জাগিয়ে তোলে, একেবারে একাগ্র মনে তদ্গতচিত্তে সুনিবিড় ভালোবাসা, শ্রীরাধিকা যেমন করে ভালোবেসেছিল কৃষ্ণকে, কিন্তু তথাপি ভালোবাসার বন্ধন আমরা স্বীকার করি না। যাদের নিয়ে এইমাত্র আমি হাস্য-পরিহাসে, গল্পে-গুজবে একেবারে মশগুল হয়েছিলাম, অপ্রত্যাশিত ভাবে এল বিদায় নেবার নোটিশ, তৎক্ষণাৎ সেই অম্লান হাসি নিয়ে, সেই হাল্কা মন নিয়েই বাইরে বেরিয়ে এলাম। যারা ভেতরে রইলো, তাদের পানে ফিরে চাইবারও অবসর নেই আমার, কারণ গ্রেপ্তার করে নিয়ে অত্যাচারী শাসক জানিয়েছে যে আর একটি চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ আমায় গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে অপর অধ্যায়ের অ-মিল ও অসামঞ্জস্য এত বেশী যে, সাধারণ লোক তার হদিস করতে পারবে কি না সন্দেহ। কলকাতায় গা-ঢাকা জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে এলাম বাড়ীতে, সেখানে পাড়ার আনন্দে নিজেকে ঢেলে দিয়ে সুরু করলাম আর-এক অধ্যায়। তারপর পুলিশ-সুপারের শমন যেতেই পশ্চাৎপট একেবারে মুছে ফেলে দিয়ে সুরু হলো সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়। এক-একটি অধ্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ধরে নিতে হবে। ভাড়াটেদের বাসগৃহ পরিবর্ত্তনের মতো। জাঁকিয়ে যেখানে বাস করছিলেন বছরের পর বছর, অকস্মাৎ এক দিন সকালবেলা দেখা গেল, তাঁরা চলে যাচ্ছেন পাড়া ছেড়ে চিরদিনের মতো। রান্নাঘরের উনুন ভেঙে দিয়ে গেছেন।

একুশ বছরের স্বাস্থ্যবান্ কিশোরের মনে বন্ধন-জয়ের আনন্দ রোমাঞ্চ সৃষ্টি করবেই তো!

আমাদের ইয়ার্ড বেশ বড়। সম্মুখে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, খোয়া ভর্ত্তি। মাঝে মাঝে পুরোনো ছাতিম বা কদম গাছ, তার নীচটা গোল করে শাণ দিয়ে বাঁধানো। তারই এক কোণে সারি-সারি বোধ হয় চল্লিশটা মলত্যাগের কুঠরী। এই কুঠরীগুলো মুখোমুখি দু'টি সারিতে বিভক্ত, কুড়ি আর কুড়ি। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এই কুঠরীর সম্মুখ দিকে একেবারে খোলা আর বাকি তিন দিকে আড়াই ফুট উঁচু লোহার শিটের পার্টিশন। ভেতরে দু'পাশে সিমেণ্ট দিয়ে বসানো দু'খানা ইট আর তার মাঝখানে পিচ-লাগানো ছোট বেতের একটি ঝুড়ি। মাথা নীচু করে দু'-চার দিন যাতায়াতের পরই আমরা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সাকরেদী করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই। তখন মুখোমুখি বসতে যে আমাদের আদৌ অসুবিধে হয় না, শুধু তাই নয়, আমরা অনেক সময় অমনি ভাবে বসে নানা রকম গল্প-গুজব করি, নানা রকম আলাপ-আলোচনা করি, হয়তো একটা গুরুত্বপূর্ণ সভাই করে ফেললাম। তাতে মারাত্মক একটি প্রস্তাবই হয়তো সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো যে, আশুবাবুর নামে সুপারিনটেনডেণ্টের কাছে নালিশ করতে হবে।

ইয়ার্ডের পুব দিকে ফুলের ছোট্ট একটা বাগান। তাতে বাংলা দেশীয় নানা রকম অজস্র ফুল ফোটে। তার পাশেই রান্না-ঘর। বিরাট দু'টি চুল্লীতে বিরাটকায় হাঁড়ী-কড়া চাপিয়ে প্রত্যেক বেলায় প্রায় দেড়শো জন রাজবন্দীর আহার্য্য প্রস্তুত করেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কিচেন-ম্যানেজার নীরেন মুখার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে হয়তো শেখ রহিমদ্দী, অথবা বাঞ্ছারাম মণ্ডল।

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীরাই রাজবন্দীদের চাকর, ঠাকুর, ধোপা, নাপিত ও জমাদারের কাজ করে থাকে। জেলের ব্যাপার সবই অদ্ভুত। বাইরে যে ছিল চাষী, দেখা গেল সে জেলের মধ্যে নাপিতের কাজ করছে, আর যে ছিল নাপিত, জমাদারের ঝাড়ু তার হাতে। এমনি ভাবে রান্নার বামুনগিরি করে হয়তো ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট, ধোপার কাজ

করে হয়তো পথের ভিক্ষুক, চাকরের কাজ করে কোনো ভদ্রলোকের ছেলে আর জমাদারের কাজ করে সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই। কারণ, জমাদারেরা প্রত্যেক দিন বারোটা বিড়ি পায়, তাদের খাদ্য "উন্নত" শ্রেণীর এবং দণ্ড তাদের একটু ঘন-ঘন আর একটু বেশী পরিমাণে মকুব হয়ে থাকে। সুতরাং জেলের দুর্ভোগটা যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়ে হাতের ঝাড়ু জেলের মধ্যেই ফেলে রেখে বাইরে গিয়ে তারাই আবার হয়ে বসবে হয়তো কোনো সওদাগরী অফিসের বেয়ারা। জেলের মধ্যেকার সংবাদ ওখানেই সমাধিপ্রাপ্ত হয়, বিশ ফুট দেয়াল টপকে বা সান্ত্রী-পাহারাওলার লোহার দরজার মধ্য দিয়ে তা ঘুণাক্ষরেও বাইরে আসে না।

রান্না-ঘরের পেছনে গোটা দুই ব্যাডমিণ্টন খেলার মাঠ। সামান্য কিছু সব্জীরও চাষ সেখানে হয় দেখা যাচ্ছে।

আইন অনুযায়ী যেখানেই আমরা থাকি না, গভর্ণমেণ্ট আমাদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করতে বাধ্য। কিন্তু এখানে ঘাস কোথায়? মাঠ কোথায়? কিন্তু আমরা সে অসুবিধায় দমবার পাত্র নই। তাই সম্মুখের খোয়া-ঢাকা মাঠে আমাদের রাগবি খেলা হয়। তারই এক পাশে হয় ভলিবল। রাগবির বল মাঝে মাঝে ফুটবলেও রূপান্তরিত হয়। আছড়ে পড়ে শরীরের নানা স্থানে ছড়ে যায়, কেটে যায়, পাইখানার নীচু লোহার চালে লেগে হরিদাসের একটা আঙ্গুল একদিন প্রায় ভেঙেই গেল, তবুও থামবার পাত্র আমরা নই।

সংবাদপত্রের মধ্যে আমাদের জন্য বরাদ্দ ষ্টেটস্‌ম্যান আর বাংলা সঞ্জীবনী ও হিতবাদী। ষ্টেটস্‌ম্যানে থাকে আগা খাঁয়ের ঘোড়ার সংবাদ আর যত ফিল্ম-ষ্টারদের পারিবারিক খোশ-খবর, তাই সঞ্জীবনীই ছিল আমাদের কাছে প্রিয় ও উপভোগ্য। প্রিয় এজন্য যে, ওতে রাজবন্দী সংবাদ নামে একটা ফিচার-কলাম ছিল, যাতে নয়া-নয়া রাজবন্দীর নাম, রাজবন্দী স্থানান্তর ও রাজবন্দীর অসুস্থতার সংবাদ থাকতো। উপভোগ্য এজন্য যে, সঞ্জীবনী একেবারে ফোঁটা-তিলক-কাটা গোঁড়া হিন্দুর পত্রিকা। শান্তিনিকেতনের মেয়েরা 'জনসাধারণের কুদৃষ্টির সম্মুখে লাস্য নৃত্য করে' বলে সম্পাদক স্বয়ং বিশ্বকবিকেই অজস্র গালমন্দ করেছেন, এক দিনের কাগজে পড়লাম। তথাপি, বাইরের চলিষ্ণু দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো এই সঞ্জীবনীই।

খাবার জন্য প্রত্যেকের বরাদ্দ ছিল এক টাকা দশ আনা দৈনিক আর মাসিক পকেট-খরচা বাবদ কুড়ি টাকা। টাকা-পয়সা এরা আমাদের হাতে দিত না। নীরেন বাবু দৈনন্দিন খাওয়ার জন্য ঐ বরাদ্দ অঙ্কের মধ্যে যা-খুশী-তাই রিকুইজিশন করতেন এবং আমরা পকেট-খরচার টাকা দিয়ে যা-খুশী-তাই কিনতে পারতাম।

ঢাকা শহরে নীরেন বাবুর নাকি হোটেল ছিল শোনা গেল। তাই ভদ্রলোক যেমন শহরের প্রতিটি তরী-তরকারির দর জানেন, তেমনি পরিপাটি করে খাওয়াতেও জানেন। শহরে ঠিকাদারের পক্ষে খুব বেশী ঠকানো যেমন

সম্ভব ছিল না, তেমনি চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজনে আমাদের স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর উন্নত হতে লাগলো। আমাদের কিচেনকে আমরা নীরেন বাবুরই হোটেল বলে আখ্যা দিতাম। সত্যি, লোকটা অত্যন্ত পরিশ্রমী। রাবণের চিতার মতো জ্বলন্ত চুল্লীর ওপর বিরাটকায় কড়াইতে আমাদের রাঁধুনী বামুন ইয়াসিন হয়তো মিষ্টান্নের দুধটা ঠিক মত নাড়তেই পারছে না দেখে নীরেন বাবু নিজেই এলেন এগিয়ে। খুন্তী নয়, খন্তা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আধ মণ দুধ নাড়তে সুরু করলেন। সেই ভোর থেকে ভদ্রলোক ঠায় থাকেন রান্না-ঘরের দরজায়। চতুর্দ্দিকে শ্যেন-দৃষ্টি, এক চিমটি নুণ এদিক-ওদিক করবার উপায় নেই, আর সেই রাত দশটায় আমাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে নীরেন বাবুর খাবার আসে তাঁর ঘরে। সম্ভব হলে আর সম্মত হলে আমরা নীরেন বাবুকে কিছু পারিশ্রমিকও দিতে প্রস্তুত ছিলাম। এত তাঁর কৃতিত্ব!

সকালে কোনো দিন লুচি ও মুর্গীর মাংস, কোন দিন ফেনাভাত ও ঘি, আবার কোন দিন নারকেল-কোরা দিয়ে চিঁড়ে ভাজা, সঙ্গে হাঁসের বা মুরগীর ডিম—কাঁচা থেকে সুরু করে কোয়ার্টার, হাফ, থ্রি-কোয়ার্টার ও ফুল্ বয়েল্ড, যার যতটা খুশী। এক-এক রকমের ডিমের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বালতী।

দুপুরের আহারটা অনেকটা অমানুষিক বলা যেতে পারে। ঢাকা শহরের সর্ব্ববৃহৎ চিতল মাছের পেটিগুলোই শুধু এক দিন আনা হলো। এক দিন আনা হলো এক ঝুড়ি-ভর্ত্তি বেলে হাঁস। এক দিন এলো প্রত্যেকের জন্য একটি করে রুই মাছের মাথা। কোন দিন হলো জন-প্রতি দু'টো করে মুর্গীর রোষ্ট। কোন দিন আস্ত ইলিস মাছ ভাজা।

বিকেলে নানা জাতীয় ফল ও পোয়াটেক ছানা ও আধ সের ঘন দুধ। মাঝে-মাঝে সে দুধে বাদাম পেস্তা ও কিসমিসও পাওয়া যেত। আঙুর, বেদানা, আপেল ও কমলা রোজই মিলতো।

রাত্রের খাবার শেষ হলে লেমনেড, সোডা, কমলা ও অন্যান্য ফলের ব্যবস্থা ছিল। সকালে ঢাকার বিখ্যাত খাদ্য 'বাখরখানি' ও বিকেলে 'অমৃতি'ও থাকতো মাঝে-মাঝে।

খাওয়া ব্যাপারে নাম-করাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। তাই দু'-চার দিন যেতে না-যেতেই আমিও 'ভক্ষণ সমিতির' একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়ে গেলাম।

তেতলায় আমাদের ঘরে, ঘর মানে দীর্ঘ হল-ঘরে, ভক্ষণ সমিতির আড্ডা। সভাপতি সুরেন্দ্র মজুমদার, সর্ব্ববয়োজ্যেষ্ঠ। সহসভাপতির পদ এখনো খালি আছে। অবশ্য সে পদের জন্য প্রার্থী আছেন নাম-করা ক'জন খাদক; যথা, তরণী সোম, বীরেন ঘোষ ও সতীশ দাশ। সভ্য-সংখ্যা বর্ত্তমানে পনেরো জন।

সভ্য হবার নিয়ম কিন্তু সহজ নয়। কোনো বিশেষ ফরম্-এ আবেদন-পত্র পেশ করতে হয় না বটে, তবু নিয়ম হচ্ছে, প্রার্থীকে সভায় বসে হয় একটি গান করতে হবে, নয় তো স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করতে হবে। গানের

গলা না থাকলেও ক্ষতি নেই, কবির কলম ভেঙে গেলেও আপত্তি নেই। গম্ভীর ভাবে যে-কোনো গান যে-কোনো সুরে ও তালে গলা ছেড়ে গাইতে হবে অন্ততঃ দু'মিনিট কিংবা ছন্দ ও মিল অর্থহীন হলেও যে কোনো স্বরচিত কবিতা সুর করে পাঠ করতে হবে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট। তার পর সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতি তার আবেদন সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

সভ্য হবার আর-একটি যোগ্যতা চাই এবং সেটাই প্রাথমিক ও সর্ব্বপ্রধান। খেতে পারা চাই। সাধারণে যা খায়, অন্ততঃ তার দ্বিগুণ। ব্যঞ্জনের কোন বাছাই থাকতে পারবে না, স্বাদের কোন বালাই থাকবে না, সময়ের কোনো বিচার নেই, যখন-তখন যা-তা জিনিষ বাটি-বাটি বা থালা থালা সাবাড় করে দিতে হবে। এবং সর্ব্বোপরি এর ফলে অসুখ হলে তৎক্ষণাৎ তার সভ্য-পদ বাতিল হয়ে যাবে। যে যত বেশী টানতে পারবে, সে তত বেশী সিনিয়রিটি দাবী করতে পারবে এবং তার সভ্য-পদের শিকড় ততটা পাকা হয়ে উঠবে এবং তার কর্ত্তৃত্বও বেড়ে যাবে ততখানি।

ভোলাবাবু একদিন সভাপতি সুরেনদা'র সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরদিনই সন্ধ্যার পর ভক্ষণ সমিতির সভায় আমার ডাক পড়লো। গান আমি যে গাইতে না জানতাম না নয়। বিয়ে-বাড়ীর মজলিসে বহু গান গেয়েছি। তথাপি কবিতা রচনারও ক্ষমতা যে আমার আয়ত্তে, সেটা প্রমাণ করবার জন্তই সভার সমক্ষে সুর করে স্বরচিত যে কবিতাটি পাঠ করেছিলাম, তার অনেকখানিই আমার মনে আছে আজো :

ওরে বীরেন, ওরে আমার ভোলা,
ওরে যতীন, ওরে বিপিন,
খাবার-ঘরের দুয়ার বুঝি খোলা।

পেট-রোগারা ভাঙ্গা গলার জোরে
যা খুশী তাই বলে বেড়াক তোরে,
সকল যুক্তি হেলায় তুচ্ছ করে
দিন-রাত্তির চালা, খাওয়া চালা।
আয় দিবাকর, আয় রে আমার ভোলা॥

এদিক্-ওদিক্ তাকাস্ নে আর কেউ,
ত্মাখ্ না চেয়ে বান ডেকেছে
কড়াই ছেপে উঠছে ডালের ঢেউ।

ঢালতে ওরা চায় না বাটি-বাটি,
দেবার বেলা এমনি আঁটিসাটি,
মনে মনে জানে কিন্তু খাঁটি
একটু পরেই ঠক্‌ঠকাবে তলা।
তরণী রে, ওরে আমার ভোলা॥

নীরেন বাবু করবে তোরে মানা,
খালি কড়াই দেখবে যখন,
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
খাওয়া দেখে উঠুন তিনি ঘেমে,
আসন ছেড়ে আসুন তিনি নেমে,
সেই সুযোগে দমের পরে দমে
কর রে সাবাড় বাটি এবং থালা।
ওরে রমেশ, ওরে আমার ভোলা॥
ম্যানেজারের খাবার আলমারী
চিরকাল কি রইবে বন্ধ?
হরিদাস, তুই আয় রে নীচে নেমে।
ভীমের মতন, কিন্তু গদা ছেড়ে
হাসি নয় রে, নিছক চুপিসাড়ে
খাবার-ঘরের আলমারীটা ঝেড়ে
অমৃতি আর আন্ রে রসের গোলা।
ওরে নির্ম্মল, ওরে আমার ভোলা॥
আপেলগুলি আন রে দেখে দেখে।
টক্ না লাগে আঙ্গুরগুলি,
মুখে ফেলে দেখিস্ নিজে চেখে।
কলা আছে, জানি শশা আছে,
তাই জেনে তো সিক্ত জিহ্বা নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পেট-রোগাদের কাছে
আহার নিয়েও হিসাব করে চলা।
ওরে ননী ওরে আমার ভোলা॥
সভাপতি তুই যে চিরজীবী।
গলা সমান আহার করে
ষ্ট্রেচার করে শয্যা এসে নিবি।
খাবার নেশায় ভোর করেছিস্ কারা,
খাবার তরেই জেলে আসার তাড়া,
খেয়ে খেয়ে হোস যদি বা সারা,
গলায় দেবে কমলালেবুর মালা।
ওরে সুরেন, ওরে আমার ভোলা।

কবিতা শুনে সভাপতি গদগদ ভাষায় আমার অজস্র প্রশংসা করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন এবং যেমন সভ্যদের মনের কথা এমনি সরস ভাবে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করেছি, তেমনি নীরেন বাবুর ভাড়ের হাঁড়ীও যেন উজাড় করে দিতে পারি, তেমনি একটা আন্তরিক আশা প্রকাশ করে তাঁর ভাষণ শেষ

করলেন। করতালির শব্দে হল-ঘর কম্পিত হয়ে উঠলো। তরণী বাবু আতঙ্কিত হলেন সহ-সভাপতির শূন্য আসন বুঝি দ্বিজেন বাবুই পূরণ করে বসেন।

আলোচ্য বিষয়ের তালিকার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে সুরেনদা ঘোষণা করলেন: এবার নির্ম্মল বসুর সঙ্গীত। জীবনে নির্ম্মল কোনো দিন গান করেনি, সুর, তাল, লয়, মান এ সব তার কাছে গ্রীক, কোনো গানের কোনো লাইনও সে জানে না। কিন্তু ভক্ষণ সমিতি নিয়মানুবর্ত্তিতায় অগ্রগামী, সভাপতির আদেশ তাকে পালন করতে হবেই।

দু'বার কেশে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে খুব গম্ভীর ভাবে মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে সে সুরু করলো:

জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে
ভারত ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।

এর পরের লাইন নির্ম্মলের কিছুতেই আর মনে পড়ছে না। ওদিকে কয়েদীদের এ্যালুমিনিয়মের থালা বাজিয়ে তবলচী বীরেন ঘোষ যে তাল রাখছে, যদি সে তাল কেটে যায়? তাই দেরী আর না করে নির্ম্মল অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকারে পাঁচ নম্বর ইয়ার্ড প্রকম্পিত করে ধরে বসলো:

জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে,
ভারত ভাগ্যবিধাতা।

অধিবেশন চলতে থাকা কালে হাসি নিষিদ্ধ। অথচ হাসির চোটে প্রত্যেকেরই দম ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। সুরেনদা'র দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এলেও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি সভাভঙ্গের আদেশ-বাণী ঘোষণা করলেন। আর যায় কোথা। হাসির চোটে সবাই একেবারে পাগল হয়ে উঠলো। ভোলা বাবু তো ছুটেই পালিয়ে গেলেন একেবারে ঘরের বাইরে। সে এক অদ্ভুত, অফুরন্ত একটানা হাসি। কিছুতেই আর থামতে চায় না। হয়তো একজন খানিকটে সামলে নিয়েছে, অমনি পাশের একজন আবার খুক-খুক সুরু করলো। ব্যস, আবার হো-হো সুরু হয়ে গেল।

কতক্ষণ হেসেছিলাম জানি না। অকস্মাৎ আমাদের হাসিতে বাধা দিয়ে যুদ্ধের দামামার মতো খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। অমনি হাসি একেবারে থেমে গেল। বিরাট কর্ত্তব্য আমাদের সম্মুখে, এসেছে তারই উদাত্ত আহ্বান, কারণ নীরেন বাবুর ডালের কড়াই আজ আমরা আক্রমণ করবো। অতএব, চল সখে, যাই সমরে।

আমাদের সংগ্রাম-নীতি অতীব উদার। প্রতিপক্ষকে আমাদের আক্রমণের

লক্ষ্যবস্তুর কথা জানিয়ে দিই পূর্ব্বাহ্নেই। হোক না সে প্রস্তুত, কী বায়-আসে? 'সমুদ্রমপি শোষয়ামি' মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ভক্ষণ সমিতির সম্মিলিত আক্রমণ-ধারা নীরেন বাবু কতক্ষণ সইতে পারবেন? অতএব এক সময় বিরাট ডালের কড়াইয়েরও তলদেশ দেখা যেতে লাগলো এবং সাত বাটি চুমুক দিয়ে খাবার পর তখনো হরিদাস ডাল-ডাল বলে হাঁক ছাড়ছে। সভাপতি সুরেনদা ডালের বাটির মধ্যে এক মুঠো ভাত ছড়িয়ে নিয়েছেন আর নির্ম্মল নিয়ে বসেছে ছোটখাটো একটি গামলা।

নীরেন বাবু এগিয়ে এলেন। সবিনয়ে নিবেদন করলেন: ডাল আর নেই। ভক্ষণ সমিতির সভ্যবৃন্দ শোভাযাত্রা করে বিজয়োল্লাসে ঘরে ফিরে এল। রাত তখন প্রায় দশটা। একটু পরই আমাদের লোহার শিকের দরজা রাতের মত বন্ধ হয়ে গেল।

দরজা বন্ধ হলেও আমাদের আলাপ-আলোচনা তখনো বন্ধ হয় না। আমাদের দিন তখনো শেষ হয় না। বীরেন র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে আমার সীটে এসে বসলো। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তার পর অকস্মাৎ এক সময় গলা খাটো করে বললো: কুমিল্লার বিস্তৃত সংবাদ জানা গেছে দ্বিজেন বাবু। ষ্টীভেন্স সাহেবকে যারা হত্যা করেছে, তাদের নাম শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরী। হত্যা করে স্বেচ্ছায় তারা ধরা দিয়েছে। পালাবার এতটুকু চেষ্টা করেনি তারা। কিন্তু এদের নির্ঘাৎ ফাঁসী হয়ে যাবে।

চুপ করে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় ঘটনাটি যা পড়েছি: মিঃ ষ্টীভেন্স কুমিল্লার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। এক দিন তাঁর বাংলোতে যেমন অনেকে অনেক রকম আবেদন ও নিবেদন নিয়ে আসে, তেমনি ভাবেই এল দু'টি স্থানীয় স্কুলের ছাত্রী। বয়েস কতোই-বা আর হবে! ষোলো কি সতেরো। শহরেরই বাসিন্দা, অপরিচিত নয় কেউ। ষ্টীভেন্স সাহেবের হাতে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর একখানি আবেদন-পত্র তারা পেশ করলো—একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা তারা করতে চায়; এ ব্যাপারে স্বয়ং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যদি অনুগ্রহ করে একটু অগ্রণী হয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন···সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন: দেখা যাবে।

আবেদন-পত্রখানা এক জনের হাতে ফিরিয়ে দিতে যেতেই অপর মেয়েটি ফস্ করে শাড়ীর আড়াল থেকে বার করলো একটি রিভলভার। একটি মাত্র গর্জ্জন শোনা গেল আর শোনা গেল জেলা-নায়ক ষ্টীভেন্স সাহেবের পতন-শব্দ। বাধা দিতে ছুটে এল ক'জন এ-ঘর ও-ঘর থেকে। কিন্তু অপর মেয়েটি সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। আবেদন-পত্র ফেলে দিয়ে সেও রিভলভার উঁচিয়ে ধরলো ও এলোপাথাড়ি গুলী চালাতে লাগলো। তার পর শান্ত হয়ে তারা ধরা দিল।

মনের কোণে একটা কাঁটা যেন খচ্ খচ্ করতে লাগলো। এ পর্য্যন্ত মারণাস্ত্র দেখা গেছে ছেলেদেরই হাতে। তাদেরই অস্ত্র-গর্জ্জনে একে একে ধরাধাম থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেছেন পেডি, লোম্যান, সিম্পসন, গার্লিক। কিন্তু মেয়েদের হাতে রিভলভার?

সহসা কিছু বলতে পারলাম না। বীরেন বোধ হয় সেটা উপলব্ধি করেই আর কিছু বললো না। ধীরে ধীরে নিজের সীটে গিয়ে মশারির মধ্যে প্রবেশ করলো। কি ভাবছিলাম জানিনে। সে ভাবনার যেমন নেই অর্থ, তেমন নেই সামঞ্জস্য। কিন্তু কোথা থেকে যেন কী সব অজস্র চিন্তার পোকা মাথার মধ্যে ঢুকে কিলবিল করতে লাগলো।

চেয়ে দেখলাম প্রায় সবাই শুয়ে পড়েছে। ভোলাবাবু মা'র কাছে নিবিষ্ট মনে একখানা চিঠি লিখছেন আর মশারির মধ্যে বসে-বসে নির্ম্মল পড়ছে স্বামী বিবেকানন্দের "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।" সবার টেবিলের মোমবাতিগুলো আমাদের ভৃত্যেরা নিবিয়ে দিয়ে গেছে। সারা রাত ঘর অন্ধকার রাখা নিয়মবিরুদ্ধ বলে মেঝের ওপর গোটা চারেক হারিকেন কমিয়ে রাখা হয়েছে।

বাইরের শহরেও চাঞ্চল্য কমে এসেছে নিশ্চয়। শীতের রাত এগারটায় সবাই এসে নিজের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। পাটবিহীন দরজার সমান জানালা-পথে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশে কাস্তের মত এক ফালি চাঁদ আর তাকে ঘিরে অসংখ্য মিটমিটে তারা। কেমন যেন কুয়াসায় ঢাকা মনে হয়। হাঁক দিলাম: হালিম, আলোটা নিয়ে যাও।

হালিম আলো নিয়ে গেল। আমি লেপখানা মাথার ওপর টেনে দিয়ে চোখ বুজলাম। কিন্তু চোখ বুজলেই কি ঘুম আসে? কিংবা ঘুম এসেছিল। ঘুমের মধ্যে দেখলাম বিচিত্র এক স্বপ্ন।...মিশমিশে কালো আকাশ। নেই চাঁদ, নেই একটিও তারা। জমাট অন্ধকারের পুরু একটা সামিয়ানা দিগ্ দিগন্ত ছেয়ে যেন টাঙ্গানো রয়েছে। হঠাৎ দেখলে অন্তরাত্মা বুঝি কেঁপে ওঠে ভয়ে। মনে হয়, অক্টোপাশের মতো হিংস্র চোখ মেলে অন্ধকার যেন ওৎ পেতে বসে আছে কিংবা পাইথনের মতো মুখব্যাদান করে রয়েছে।... অকস্মাৎ সেই কালো যবনিকায় দেখা গেল কেমন নীলাভ আলোকের বিচ্ছুরণ। দুটি সরু লিকলিকে শিখা কেঁপে-কেঁপে একেবারে লেলিহান হয়ে উঠলো। স্পষ্ট দেখা গেল, দু'টি নারীমূর্ত্তি ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলছে! আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিতবসনা ষোড়শী। আকাশের কালো মেঘের অন্তরাল থেকে নেমেছে দু'টি রজ্জু, সেই রজ্জুতে লম্বমান দু'টি কিশোরী। কোথা-থেকে-আসা দমকা হাওয়ায় তাদেরই বন্ধনহীন কেশরাশি আকাশে উড়ছে। তারাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে, আড়াল করে রেখেছে পুণিমার চাঁদকে। চুলের ফাঁকে ফাঁকে এলোপাথাড়ি হাওয়া শন্-শন্ করে বয়ে চলেছে। শব্দ শোনা যাচ্ছে গোখরো সাপের ফোঁসফোসানির মত। নারী দু'টির শুষ্ক অধর-কোণে

তখনো অপরিম্লান হাসির ঝিলিক। দু'কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গরম রক্তের ধারা, ইথারের গা বেয়ে এক-একটি বিন্দু হয়ে। বাতাসের সংস্পর্শে এসেই ফসফরাসের মতো তা জ্বলে-জ্বলে উঠছে, উল্কার মতো তির্য্যক্‌গতিতে ছিটকে পড়ছে পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে।...

অপরিসীম সাহসে ভর করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম নারী দু'টির মুখের পানে। —এ কি, চেনা-চেনা মনে হয় কেন? কোথায় যেন দেখেছি এদের? কোথায়? আমাদের দেশে? আমাদের গ্রামে? আমাদের পাড়ায়? তোমার বাড়ীতে? আমাদের বাড়ীতে? এ কি, তোমাদের-আমাদের বোনের মত কেন এদের দেখতে? তবে কি—তবে কি—

অকস্মাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। হালিম এসে ডাকছে: বাবু চা। পাঁচটা বেজে গেছে।

ইঃ, লেপখানা একেবারে ভিজে গেছে দেখছি।...হাত বাড়িয়ে ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালেখানা টেনে নিলাম।

ছয়

দিবাকর সেনগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক আমাদেরই ঘরের বাসিন্দা। সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান্ এবং বেশ আলাপী। কিন্তু মুশকিল দেখা দেয় সেখানটাতেই। ভদ্রলোকের আলাপটা কেমন যেন গায়ে-পড়া গোছের। যা তিনি জানেন না, তা জানবার জন্য তাঁর কৌতুহল বেশ তীব্র মনে হয়, অথচ ভাবখানা এমনি দেখাতে চেষ্টা করেন যেন ও-সব কেন, ওর চাইতে অনেক বেশী কথা তাঁর জানা আছে; এটা শুধু গল্পচ্ছলেই এসে গেছে বলেই এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন। ইচ্ছে হয় জবাব দিন্, না-হয় না দেবেন। তাতে হায়-আফ্সোস নেই।

অথচ হায়-আফ্শোস যে তাঁর যথেষ্ট থাকে, তার প্রমাণ আমি নিজেও পেলাম। পেডি, লোম্যান, সিম্পসন আর গার্লিককে যাঁরা হত্যা করেছেন, তাঁরা কি সবাই বি-ভি-র লোক? একদিন দুপুরে খোলামাঠে বসে শরীরে তেল মর্দ্দন করতে-করতে তিনি এই প্রশ্নটি আমায় করলেন।

আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম: তা কি করে বলবো বলুন। রিভলভার নিয়ে যারা গেল, তারা তো আর আমায় জিজ্ঞেস করে যায়নি।

দিবাকর এই হত্যাকাণ্ডগুলোর ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন: কিন্তু শোনা যায়, ঢাকার এই বি-ভিই সেই মেদিনীপুরে গিয়ে প্রথম বিপ্লবী দল গড়ে তোলে। সত্যি নয়?

তা তো জানি নে।

মৃদু হেসে দিবাকর বললেন: বুঝেছি, আপনি কিছুই বলবেন না। কিন্তু [illegible] লোকেরা এই সব life for life কাজগুলো নিজেদের বলে দাবী করছে, সে সংবাদ রাখেন? এই তো সেদিন এসেছে রমেশ ভট্টাচার্য্য। ও কি প্রচার করছে জানেন? বিনয় বসু না কি কায়েৎটুলীর ওদের কুস্তীর আখড়ায় নিয়মিত কুস্তি করতে যেতো। আর দীনেশ গুপ্ত তো না কি ওর নিজের হাতের recruit করা ছেলে, রিভলভার ছোড়া সে-ই না কি তাকে শিখিয়েছিল। ওদের এ সব কথার প্রতিবাদ করাও কি আপনি উচিত মনে করেন না?

নির্ব্বিকার কণ্ঠে জবাব দিলাম: না।

কেন?

কারণ রমেশ বাবু নিজেই জানেন যে, তিনি চাল মারছেন, কারণ ঢাকা শহরের এমন একটি লোক নেই যে, বিনয় বোস আর দীনেশ গুপ্তকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পুরোভাগে মার্চ্চ করতে দেখেনি। শুধু শহর কেন, বিক্রমপুরের গ্রামে-গ্রামেও এই অফিসার দু'জনকে হামেশা দেখা যেত ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠনের কাজে।

দিবাকর বাবু অকস্মাৎ ক্ষেপে ওঠেন: চলুন, এখনই যাই রমেশ বাবুর কাছে। মিথ্যেবাদীর—

বাধা দিলাম : থাক্‌, প্রয়োজন নেই। Falsehood shall meet a natural death—অপেক্ষা করুন।

কিন্তু দিবাকর বাবুর ধৈর্য্য যেন আর বাঁধ মানছে না। সেদিনই রাত্রে ঘর বন্ধ হয়ে যাবার পর ভদ্রলোক আবার এসে হাজির।

দ্বিজেন বাবু, কি করছেন ?—ও, ডষ্টয়ভস্কির "মাদার"। পড়ুন। চমৎকার বই। কিন্তু আগে পড়েননি ?

সময় কোথায় ?—বলে বইখানা টেবিলে রাখলাম। দিবাকরও বসে পড়লো এবং আমার কথার রেশ ধরে বেশ বলে যেতে লাগলো : তা তো নিশ্চয়ই। বাইরে থাকলেই খালি কাজ আর কাজ। নাওয়া খাওয়ারই সময় মেলে না, তার আবার বই পড়া! বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগটা পুরোই তো আপনার চার্জ্জে ছিল, তাই না ? তা থাকবেই তো। এই প্রায় এক মাসের পরিচয়ে যতটুকু আপনাকে বুঝতে পেরেছি দ্বিজেন বাবু, তাতে করে মনে হয়, আপনি বি-ভির একটা স্তম্ভস্বরূপ।

খুশী হলাম না শুধু নয়, বেশ বিরক্ত বোধ করতে লাগলাম। কারণ আমি বি-ভি'র স্তম্ভ নই। যে সব মারাত্মক কথা ও আমার মুখে ভরে দিতে চায়, তা যে কতখানি সাংঘাতিক, তা তো আর আমার অজানা নয়।

পরদিনই বীরেনকে গোপনে জিজ্ঞেস করলাম। বীরেন তো তখনি তাকে দু'ঘা বসিয়ে দিতে চাইলো। বললো : আপনি তো জানেন না, আমিও বলতে ভুলে গেছি, শালা আই-বির চর। ডেটিনিউ সেজে এসেছে। দিই লাগিয়ে দু'টো ঘুষি।

বীরেনের ঘুষির ওজন যে কতখানি, তা আমার অজানা নয়। ঢাকা শহরে তখন গুপ্ত সমিতির দলীয় চেতনা একটু মাত্রাধিক ছিল। শুধু অনুশীলন আর যুগান্তর দল নয়, একই দলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেও নানা গুরুতর ও তুচ্ছ বিষয়ে মন-কষাকষি চলতো এবং তার অনিবার্য্য পরিণতি ছিল আর্ম্মাণীটোলার খেলার মাঠে বা রেসকোর্সে অথবা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে খোলা ময়দানে দুই দলের মারামারি। অতর্কিতে নয়, সংবাদ আদান-প্রদান করে, এনগেজ-মেণ্ট করে। কখনো লোহার শিক দিয়ে, কখনো হকি ষ্টীক দিয়ে, কখনো পেতলের তৈরী পাঞ্চ দিয়ে আবার কখনো-বা হাণ্টার দিয়ে। রক্তদর্শন ছিল অবধারিত।

১৯২৬ সালের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে আমি পড়ি, কলেজ-হোষ্টেলে থাকি। ১৯৩০ সালের বেঙ্গল ভলাণ্টি-য়ার্সের মেজর বিনয় বসুও তখন থাকতো হোষ্টেলে আমারই পাশের ঘরে। সেও ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে। একদিন বিকেল বেলা শিশির সেনগুপ্ত এসে আমাদের বলে গেল সন্ধ্যার পর আর্ম্মানীটোলার মাঠে যেতে। তাঁতিবাজারের রবীন রায় না কি আমাদের একটি ছেলেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। তাই এই চ্যালেঞ্জ। সন্ধ্যার মধ্যে যদি এই মামলার ফয়সালা না হয়, তা'হলে ঐ মাঠেই হবে শক্তি-পরীক্ষা।

প্রস্তুত হয়েই গেলাম। অর্থাৎ রাত ৯টায় হোস্টেলে ফিরে আসবার সম্ভাবনা কম বলেই রোল-কলের সময় যাতে আমাদের দু'জনকার প্রক্সি দেওয়া হয়, তার ব্যবস্থা করে গেলাম।

মাঠে গিয়ে দেখি, পরিস্থিতি বেশ সঙ্গীন! অনেকগুলো হকি ষ্টীক এসে গেছে, সঙ্গে আবার গোটা দুই ছোরাও। বীরেন কোমর থেকে বার করে বললো: আজ একটাকে আমি নোবই।

বিনয় কুস্তিগীর। বড়লোকের ছেলে। কেমন নাদুস-নুদুস সুডৌল শরীর। বুকে জড়িয়ে ধরতে ভালো লাগে। থাকেও খুব পরিচ্ছন্ন ভাবে। মুখে একটা স্বাভাবিক মৃদু হাসি যেন লেগেই আছে। সে বললো: ও-সব ষ্টীক লাগবে না আমার। বেঁচে থাক্ আমার কুস্তি! এমনি করে ধরবো আর 'ঢাক্'—ব্যস্ একেবারে চিৎ!—বলে সে আমাকেই চিৎ করে ফেলে দেয় আর কি!

বিপক্ষ দলও প্রস্তুত হয়েই এসেছে বোধ হয়। মাঠের অপর প্রান্তে তারা অপেক্ষা করছে দেখা গেল। সন্ধ্যের পর মাঠের সাধারণ জটলা ও জনতা কমে গেলে দলীয় সবাই এসে জড়ো হলো। প্রতিপক্ষও এগিয়ে এল। দেখা গেল, তাদের প্রত্যেকের হাতে হকি ষ্টীক।

দুই পক্ষের বড়দের মধ্যে এই ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনা চলছে পাটুয়াটুলীতে রাঙ্গাদা'র বাসায়, সেখানে আমাদের একজন বার্ত্তাবহ অপেক্ষা করছে। যাহোক একটা কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেই সে সাইকেল নিয়ে ছুটে আসবে আমাদের সংবাদ দিতে। তারই ওপর নির্ভর করছে যুদ্ধ, অথবা শান্তি।

কিন্তু কোথায় সে? জিতেন বললো: আর দেরী করা যায় না। সুরু হোক্।

প্রতাপ তৎক্ষণাৎ তাকে সমর্থন করলো: যা বলেছিস। যদি ভালো খবর আসেই, তখন থেমে গেলেই চলবে।

তাই ঠিক হলো। প্রতিপক্ষ ও আমাদের মধ্যেকার ব্যবধান শনৈঃ শনৈঃ কমে এল এবং ক্রমে তা মাত্র দশ-বারো হাতে এসে ঠেকলো। সূচনা করে দেবার জন্য, আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে, অকস্মাৎ বীরেন ছুটে গিয়ে সম্মুখে যে লোকটিকে পেলো, তাকেই এমনি প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল যে, সে ছিটকে গিয়ে পড়লো কয়েক হাত দূরে, আর উঠলো না। তার পরই প্রচণ্ড বিক্রমে দুই দলের বাছা-বাছা পালোয়ানেরা এগিয়ে এসে যেই একে অপরের ওপর লাফিয়ে পড়বে, এমন সময় তীরবেগে এসে হাজির আমাদের বার্ত্তাবহ। মিটমাট হয়ে গেছে—অতএব সন্ধি। কিন্তু বীরেনের ঘুষির জের ছেলেটিকে কয়েক মাস টানতে হয়েছিল।

সেই জাতীয় একখানা ঘুষি যদি দিবাকর বাবুর নাকে পড়ে, তা'হলে কোন কালে তাঁর নাক ছিল কি না, তাও বোধ হয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ওকে নিরস্ত করলাম: মারার চাইতে চিনে রাখা ও সাবধানে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

বীরেন বললো : জানেন, ও লোকটা প্রায়ই যায় অফিসে। বলে যায় ওর ইণ্টারভিউ আছে। মাসে দু'বারের বেশী আমাদের আত্মীয়েরা মাথা কুটলেও দেখা করবার অনুমতি পায় না, ও কি গ্রাসবি সাহেবের পোষ্যপুত্র না কি ? আমার মনে হয়, যোগিনী বোস বা জিতেন ধর অফিসে আসে, আর ও এখানকার যাবতীয় সংবাদ তাদেরকে জানাতে যায়। বিশ্বাস করবেন না।

গুপ্ত সমিতিতে সে যুগে যেমন ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা, ঠিক তেমনিই ছিল কঠোরতম নিয়মানুবর্ত্তিতা ও গোপনতা রক্ষার প্রচেষ্টা। একই কাজে হয়তো পাঁচ জনকে প্রেরণ করা হলো, বলে দেয়া হলো, কাজ সুসম্পন্ন করে পলায়নের সুবর্ণ সুযোগ না পেলে পালিও না, পকেটে রইলো পটাসিয়াম সায়নাইড আর হাতের রিভলভারের শেষ গুলীটি তো রইলোই। পাঁচটি কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র-নেতার সুপারিশ অনুযায়ী হয়তো এই পাঁচ জনকে সংগ্রহ করা হলো। এরা কেউ কাউকে চেনে না, এর আগে কার্য্য-ব্যপদেশে একাধিক বার দেখা হলেও কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয়নি। আজ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার পূর্ব্বক্ষণে অর্থাৎ মৃত্যুকে নিয়ে হোরি-খেলায় মত্ত হবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সরকারা ভাবে এদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নিবিড় বন্ধুত্বে বদ্ধ হলো। তার পর যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে হয়তো দেখা গেল, একখানা মোটর গাড়ী এদের নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। কে পাঠিয়েছে গাড়ী, চালক বিশ্বাসী কি না সে সব প্রশ্ন করবার অধিকার এদের নেই। নীরবে গাড়ীতে উঠে বসে এরা যথাস্থানে গিয়ে অবতরণ করলো

অর্থাৎ তোমার যতটুকু না জানলে কাজ আটকে যাবার আশঙ্কা আছে, ঠিক ততটুকু তোমায় জানানো হবে। এই নিয়ম সবার ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। বিক্রমপুরকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা আছে। প্রত্যেক অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর সঙ্গে অপর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মীর যোগাযোগ থাকে সত্য, কিন্তু একে অপরের সমগ্র সদস্য-সংখ্যা কত বা কারা এর সদস্য, সে সব সংবাদ জানতে পারে না। নিয়ম নেই। ঢাকার কেন্দ্রীয় সমিতির সঙ্গে সারা বিক্রমপুরের যোগাযোগ রক্ষা করে চলে মাত্র একজন কর্ম্মী। কেন্দ্রীয় সমিতির ও মাত্র এক জনকেই সে চেনে। প্রত্যেক অঞ্চলের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি যার কাছে থাকে বা বেনামী ইস্তাহারে ব্যবহৃত ব্লকগুলি যার কাছে গচ্ছিত থাকে অথবা অন্যান্য বাজেয়াপ্ত পুস্তক, ছবি বা পুস্তিকা যার গুপ্ত গ্রন্থাগারে আছে, সে শুধু কেন্দ্রীয় সমিতির একটি মাত্র সদস্যকেই চেনে ও জানে। তাঁরই আদেশে মালখানা সে খোলে আর বন্ধ করে ও মনে মনে মালপত্রের জমা-খরচের হিসাব রাখে।

এই যে নিয়ম ও অনুশাসন, আশ্চর্য্য যে, এর একটিও লেখা নেই। গুপ্ত সমিতিতে কাগজ-কলমের ব্যাপার নেই। সবই মুখে-মুখে, মনে-মনে, অন্তরে-অন্তরে। সেখানকার অদৃশ্য স্লেটে তা লেখা হচ্ছে ও প্রয়োজন বোধে মুছে

ফেলা হচ্ছে। দলে যোগদানের প্রথম দিন থেকে একেবারে শেষ দিন পর্য্যন্ত কেউ তোমার নাম লিখে নেবে না এবং অনেক জায়গাতেই তোমার কি নাম, তাও কেউ জিজ্ঞেস করবে না। সাধারণ সদস্য থেকে নিজের কর্ম্মক্ষমতার দ্বারা ধীরে ধীরে বা একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবেই কবে, কখন্ যে তুমি দলীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্যতম হয়ে উঠলে, অপরে তো দূরের কথা, নিজেও যেন তা টের পেলে না। এর নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন বা বরখাস্ত কোনো ব্যাপারেই কোনো সার্কুলার নেই, বিজ্ঞপ্তিরও প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মদক্ষতার দ্বারা তোমার উন্নতিও যেমন এল একটি স্বতশ্চল যন্ত্রের মতো, তেমনি সামান্যতম দুর্ব্বলতার দোষে স্বতশ্চল পেষণ-যন্ত্রেই তুমি কবে যে একেবারে নিষ্পিষ্ট হয়ে পাউডার হয়ে বাতাসে উড়ে গেলে তার হদিসই পাওয়া যাবে না।

সমগ্র সমিতিটাই চলতো স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মতো। যেমন নিশ্চিত ও শাণিত তার গতি, তেমনি মজবুত ছিল তার কল-কব্জাগুলি। মাটির নীচের জমাট অন্ধকারে একটা অদৃশ্য জগৎ এমনি ভাবে চলতো, বাইরের দৃশ্যমান জগতে তার প্রাণস্পন্দনের বিন্দুমাত্র ধ্বকধ্বকানিও শোনা যেত না।

এমনি কড়া নিয়মের প্রয়োজনীয়তাও ছিল যথেষ্ট। সন্দেহবশে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারলেই আই-বি অফিসের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলতো তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার। প্রথমেই নয়। প্রথমে চলতো অনুরোধ, উপরোধ, আবেদন-নিবেদন : ভাই আমার, দাদা আমার, বল না ঐ রিভলভারটা কে তোমায় দিয়ে পাঠিয়েছিল ? আহা হা, এমনি কচি শরীর, হাজতের কষ্টে কেমন কালি হয়ে গেছে। ওরা বুঝি ভালো খাবার দেয় না ?—এই রামসিং, ইউ উল্লু, ইধার আও। এই বাবুকে খেতে দিস্ না না কি রে ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। শোন্, আজ থেকে রোজ রাত্রে মাংস আর পরোটা দিবি। আর যা, এক্ষুণি কিছু খাবার নিয়ে আয়।—বলে ঝনাৎ করে একটা টাকা মেঝের ওপর ফেলে দিলেন মনোরঞ্জন দারোগা। তার পরই : তুমি আমার ছেলের বয়সী। দেখতেও আমার বড় ছেলের মতো ; তাই তোমায় দেখে কেমন-একটা মায়া ধরে গেছে। তাই তো স্যারকে বলে আর কাউকে দিইনি তোমার কাছে ঘেঁষতে, আমি নিজেই এসেছি। বল তো বাবা, সব খুলে বল তো। বলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। মা-বাবা হয়তো কত কান্নাকাটি করছেন। —আরে, হাজতে কি ভদ্রলোকের ছেলেরা থাকতে পারে ?—বল।

আবেদন-নিবেদন অচল হলে চলতো প্ররোচনা বা পারসুয়েশন। একশো টাকার নোটের একশোখানার একটি বাণ্ডিল টেবিলের ওপর এগিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বসু বলে উঠলেন : পাছে তোমার অবিশ্বাস হয়, তাই চেক না এনে একেবারে ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি। নাও, ভালো করে গুণে ছাখ, দশ হাজার আছে কি না। এই টাকা নিয়ে বাড়ী চলে যাও। গরীবের সংসার, মার্চেণ্ট অফিসের ত্রিশ টাকার গোলামী আর খুঁজে বেড়াতে হবে না। বরাত ফিরে যাবে। আর তার বদলে তুমি দিচ্ছ কি ? কতটুকু তার মূল্য ? তাতে

তোমার কোন ক্ষতি আছে কি? এখানে এই ঘরে গোপনে বসে যে নামটি আমায় বলে যাবে, তোমার দলের কে জানতে পারছে তা? আমি তোমায় তো আর লিখে দিতে বলছি না। তোমার এই দুর্ভোগেরও যেমন শেষ হলো, তেমনি দলের মধ্যেও তোমার প্রতিপত্তি আগের মতই রইলো। মাঝখান থেকে নীট লাভ দশ হাজার টাকা। ইচ্ছে করলে বিলেতও ঘুরে আসতে পারো। জার্ম্মাণীতে গিয়ে হয়তো সাবান তৈরীই শিখে এলে। তখন তো টাকা দিয়ে তোমার দলকেই পারবে সাহায্য করতে। সেটাই ভালো, না একটা ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভালো?— নাও, আর দ্বিধা করতে হবে না। ও-সব সঙ্কোচ দূর করে ফেল।

আবেদন বা পারসুয়েশেন ব্যর্থ হলে প্রথমে চলে হুমকী ও অহঙ্কারজনক অশ্লীল ভাষায় বাপ-মা তুলে গালাগাল, তারপর মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়া বা চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে দেয়া। সে সব অস্ত্র ব্যর্থ হলে প্রয়োগ করা হয় একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র, শারীরিক নির্য্যাতন। যত রকম নির্য্যাতন কল্পনা করা যেতে পারে, সব। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান মেশানো। তাই কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে মেঝের ওপর শুইয়ে দিয়ে একটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে শরীরের ওপর রেখে দু'পাশে দু'জন বসে চাপ দেয়া হয়। ঘটির মধ্যে বালি ভর্ত্তি করে সেই ঘটি দিয়ে প্রহার করা হয়। এতে ওপরকার চামড়া ফেটে যাবার আশঙ্কা যেমন নেই, তেমনি মাংসের ভেতরটা একেবারে থেঁতলে পিষে কাদা করে দেবে। নখের ফাঁকে সূঁচ বিঁধিয়ে দেয়া হয়। তিনটি আঙ্গুলের ফাঁকে একটি সরু লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়ে ভীষণ ভাবে চাপ দেয়া হয়। চেয়ারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে বসিয়ে রুল টানবার কাঠের রোলার দিয়ে শরীরের প্রতিটি জয়েণ্টে আঘাত করা হয়। পরে হয়তো হাণ্টার দিয়েই বেদম প্রহার করা হয়।

আইন আছে বটে যে, গ্রেপ্তার করবার পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কোনো ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ধৃত ব্যক্তিকে হাজির করতে হবে, বিশেষ কারণ ব্যতীত পুলিশের হেফাজতে রাখা যাবে না, তাও পনেরো দিনের বেশী নয়। কিন্তু বৃটিশের আমলের বিচারক। তাই প্রহৃত আসামী হয়তো কয়েদীর গাড়ীতে ধুঁকছে, এমন সময় এস. বি বা আই. বির দারোগা স্যারের সম্মুখে কাগজ-পত্র স্থাপন করলেন আর অমনি স্যার বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে অবলীলাক্রমে স্বাক্ষর করে দিলেন: The accused is produced before the Court and on enquiry it is learnt that he is getting good behaviour in the hands of the police and he has got nothing to complain against...ইত্যাদি।

পনেরো দিন এস. বি অথবা আই. বি'র খপ্পরে আতিথ্য গ্রহণের পর [illegible] প্রায় হেঁটে চলবার শক্তি থাকে না।

শান্তি সোম এক দিন আড়ালে ডেকে নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলেন : আই. বি অফিসে তোমায় টরচার করেনি গাঙ্গুলী ? বললাম : না, একেবারেই না। একটা কটু ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করেনি।

এর কারণ পরে জানতে পারা গিয়েছিল। আমি না কি ছিলাম সেন্ট্রাল আই. বির আসামী, তাই জেলার কর্ত্তারা আমায় নিয়ে বেশী ঘাঁটাতেন না। তবে জেলার এলাকায় আমার কখনো আগমন বা আনাগোনাও তাঁরা আদৌ পছন্দ করতেন না। তাই ১৯২৮ সালের পর থেকেই দেশের বাড়ীতে যাওয়া আমার প্রায় ঘটতোই না।

শান্তি সোম বললেন : এবার ওরা পাইকারী ভাবে গ্রেপ্তার সুরু করে দিয়েছে। বোধ হয় সবাইকেই দেবে কনফার্ম করে।

নিয়ম ছিল, গ্রেপ্তার করে গভর্ণমেণ্ট তদন্ত করে দেখবেন যে, সত্যিই এ নিশ্চিত ভাবে বৈপ্লবিক কার্য্যাবলীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত কি না। তারপর তাঁরা সিদ্ধান্ত করবেন, একে রাজবন্দীর পদে পাকা ভাবে নিযুক্ত করবেন, না মুক্তি দেবেন। শান্তি সোম অন্যান্য আরও প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছেন আমি গ্রেপ্তার হবার দিন পনেরো পুর্ব্বে। সুতরাং ওদের ভাগ্য সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার সময় আগতপ্রায়।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, তাই হলো। একদিন সকাল বেলা আমাদের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি জেলার আশুবাবু এসে তাঁর ড্যাবডেবে চোখ দু'টোতে খুশীর ঝলমলানি ফুটিয়ে তুলে সংবাদ জানিয়ে গেলেন যে, এক মদন ভৌমিক ব্যতীত সবাইকে গভর্ণমেণ্ট কনফার্ম করছেন।

আশু বাবুর পক্ষে পরম সুসংবাদ। কারণ, এবার আমরা প্রত্যেকে প্রারম্ভিক ভাতা বাবদ পাবো ষাট টাকা আর তার ওপর জন-প্রতি মাসিক হাত-খরচার জন্য আরো কুড়ি টাকা। এই আশী টাকার একটি পয়সাও তো আমাদের হাতে দেওয়া হবে না। আমরা জিনিষপত্রের অর্ডার দোব আশু বাবুর মারফৎ আর বাইরের ঠিকাদার সেগুলো সাপ্লাই দিয়ে যাবে আশুবাবুরই কাছে। তার পর ভাউচারে স্বাক্ষর করে দেবার পর আমাদের চাওয়া জিনিষ আমাদের হাতে আসবে। মাঝখানের লোক হিসেবে আশুবাবুর কিছু কমিশন লাভ হবে আর রাজবন্দীর সংখ্যা যত বেশী হবে, তত বেশী টাকার অর্ডার হবে, আর কাজে-কাজেই কমিশনের অঙ্কটাও বেশ মোটা হয়ে উঠবে। তাই আমাদের সর্ব্বনাশ হলেও আশুবাবুর পৌষ মাস দেখা দিল।

সিভিল ইয়ার্ডে একখানা ঘরে আশুবাবুর দোকান। দোকান মানে, আমাদের প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যের নমুনা সেখানে সাজানো আছে। রোজ বিকেলে আমাদের প্রতিবারে পাঁচ জন করে সিপাই-পাহারায় সেখানে যাবার অধিকার আছে। সেখানে আমরা ব্যক্তিগত পছন্দ অনুযায়ী নমুনা দেখে জিনিষপত্রের অর্ডার দিয়ে আসি। অনেকে অনেক নতুন জিনিষের অর্ডার

দিয়ে থাকেন আশুবাবুর দোকানে যার নমুনা নেই। ঠিকাদারকে দিয়ে আশুবাবু তা-ও আনিয়ে দেন।

এই আশুবাবুটি একটি অদ্ভুত জীব। ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁর অত্যন্ত প্রখর বলে যা-তা জিনিষ দিয়ে দ্বিগুণ মূল্য আদায়ের ফিকিরে সর্ব্বদা তিনি ঘোরাফেরা করেন। এজন্য রাজবন্দীরা চোর বা দালাল আখ্যা দিয়ে অকথ্য ভাবে গালাগাল দিলেও, আশ্চর্য্য, তাঁর ড্যাবডেবে চোখ দু'টোতে হাসির ঝিলিক থাকবেই। কানে তুলো ও পিঠে কুলো নিয়েই দিব্যি তিনি প্রায়ই সকাল বেলা এসে আমাদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে প্রাতরাশটা শেষ করে যান এবং নির্লজ্জের মতো আবার মন্তব্য করে যান : আপনাদের এখানে খেতেও তো ভয় করে। পটাসিয়াম সায়নাইড যারা অবলীলাক্রমে খেয়ে ফেলতে পারে, তারা অপরকেও তা পরিবেশনও তো করতে পারে? তার পর রাজবন্দীদের সাথে বেশী মেলামেশার সংবাদ সাহেবের কানে গেলে আর রক্ষে নেই। আই. বি নির্ঘাত জেনে ফেলবে, তা'হলেই চাকরিটি খোয়া গেল আর কি!

আমরা প্রায় সকলেই ওঁকে করুণার চক্ষে দেখি। কিন্তু বীরেন কাছে থাকলে আর উপায় নেই। জিজ্ঞেস করে : তা'হলে না এলেই তো পারেন এখানে?

ড্যাবডেবে চোখে হাসি ফুটিয়ে জবাব আসে : কিন্তু কাজ যে আমার আপনাদের দিয়ে। কত বলি সাহেবকে এই কাজের ভার অপরকে দিতে। কিছুতেই দেবে না।

অর্থাৎ যেন কত অনিচ্ছাতে এই অস্বস্তিকর কাজটি আপনি করে থাকেন। জিনিষপত্র সরবরাহ ভারী হাঙ্গামের কাজ তাই না? কিন্তু মাসের শেষে মুনাফাটি যখন আসে আশুবাবু, তখন?

ড্যাবডেবে চোখ কপালে ওঠে : বলেন কি বীরেন বাবু, মুনাফা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আপনাদের টাকা থেকে আবার কমিশন খাবো আমি? অমন দুর্ম্মতি ভগবান যেন কোনদিন না দেন।

লোকটা কিছুতেই রাগ করে না। খুব ভালো আই. বি অফিসার হতে পারতো। খাবার লোভ ভীষণ, খেতেও পারে বেশ। রাজবন্দী হয়ে এলে সসম্মানে ভক্ষণ সমিতির সহ-সভাপতির শূন্য পদে ওকে নেয়া যেত।

কিন্তু বীরেন ওকে একেবারেই সইতে পারে না। আমরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যতই রগড় করতে যাই, বীরেন সিরিয়াসলি ততই চটে যায় ওঁর ওপর।

একদিন সকালে তো সাংঘাতিক কাণ্ড। সুপার সাহেব এসেছেন সকাল বেলা যথারীতি আমাদের ইয়ার্ড পরিদর্শনে। সঙ্গে জেলার নরেন সরকার, জনকতক ডেপুটি জেলরের মধ্যে আশুবাবু, বড় জমাদার, সশস্ত্র জেল-সিপাই ও কয়েকজন কয়েদী মেট্।

সুপারিনটেনডেন্ট লিওনার্ড সাহেব নিরক্ষর হলেও পাকা লোক। কোথাও ছুঁচোকে বাধা দিয়ে কোথাও হাতীকে কি ভাবে ছাড়পত্র দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা

অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, সে কৌশল তাঁর ভাল করেই জানা আছে। তাই চার নম্বর ইয়ার্ডেই কয়েকজন সাধারণ কয়েদীকে লাথি মেরে ৫ নম্বর ইয়ার্ডে রাজ-বন্দীদের মধ্যে এসেই তিনি দিলখোলা গল্পবাগীশ হয়ে ওঠেন। এ-কথা ও-কথা নিয়ে অনর্থক বাজে বকেন ও হাসাহাসি করেন অকারণে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে একেবারে যেন ফেটে পড়েন।

সেদিন বীরেনের সহ্য হলো না। আশুবাবু যে বাজে সব জিনিষ দিয়ে দ্বিগুণ দাম আদায় করেন, সে কথাটা সে আশুবাবুর সম্মুখেই লিওনার্ডকে জানিয়ে দিল। লিওনার্ড তাঁর চশমার মধ্য দিয়ে আশুবাবুর পানে নীল চোখের ক্রুদ্ধ চাহনি হেনে ডাকলেন : আশু!

আশু বাবুর ড্যাবডেবে চোখে ভয়, দুঃখ ও ক্রোধ মিলিয়ে একটা অদ্ভুত দ্যুতি দেখা দিল। তিনি প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সাহেবের সম্মুখে কি একটা কথা বলে সমস্ত রাজবন্দীদের নামেই একটা পাল্টা অভিযোগ করে বসলেন।

আর যায় কোথা। বীরেন তৎক্ষণাৎ ঝেড়ে দিল আশুবাবুর ড্যাবডেবে চোখের কোণে সেই সাংঘাতিক একখানি ঘুষি। তৎক্ষণাৎ আশুবাবু একেবারে ধরাশায়ী হলেন।...এ অপমান অসহ্য। জমাদার পকেট থেকে বাঁশী বার করে বাজিয়ে দিল। গেটে ঢং-ঢং করে "পাগলা ঘন্টি" বেজে উঠলো। চারিদিকে বাঁশী শোনা যেতে লাগলো। ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। হাঁক-ডাক চীৎকারে জেলের মধ্যে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে গেল যেন।

পাঁচ নম্বর লেখা একখানা প্রকাণ্ড বোর্ড জেল-টাওয়ারে ঝুলছে দেখা গেল।

সাত

জেলের "পাগলা ঘন্টি" সহজ ব্যাপার নয়। মারাত্মক একটা কিছু না ঘটলে এই ঘণ্টা বাজানো হয় না।

বিপদের সঙ্কেতসূচক এই ঘণ্টাটি জেল-দরজার ছাদের গম্বুজ থেকে ঢং ঢং করে যখন বাজানো সুরু হয়, সিপাইদের ব্যারাকে তখন হুলস্থূল পড়ে যায়। তখন যে যে-কোনো অবস্থাতেই থাক্ না কেন, তৎক্ষণাৎ তাকে হাতের কাছে সহজলভ্য হাতিয়ার নিয়ে ছুটে এসে ফল্-ইন্ করতে হয় ব্যারাকের সম্মুখস্থ ছোট্ট প্রাঙ্গণে। মুহূর্ত্তে সবাই এসে দাঁড়ালেই তারা অধিনায়কের হুকুমে ডবল মার্চ্চ করে এসে প্রবেশ করে জেলের অভ্যন্তরে। সাধারণত: জেলের বিরাট লৌহদ্বারের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্রাকার দরজা খুলেই সব কাজ চালানো হয়। কিন্তু "পাগলা ঘন্টি" বেজে উঠলে দ্বাররক্ষী বিনা দ্বিধায় দ্বারের শুধু একটা পাট নয়, দু'টোই একেবারে সটান খুলে দিয়ে এই সশস্ত্র সিপাই দলেরই প্রতীক্ষা করতে থাকে।

জেলের অভ্যন্তরে প্রত্যেক খাতার প্রত্যেক কয়েদীকে ঘরে তালাবদ্ধ করে ঘরের অভ্যন্তরে সমান্তরাল দু'টি ফাইলে বসিয়ে রাখা হয়। জেলের কারখানা, গুদাম, রান্নাঘর, হাসপাতাল বা অন্যত্র যারা কার্য্যে রত ছিল, তাদেরকেও হাতের সমস্ত কাজ ফেলে ফাইল করে বসে থাকতে হয়। তার :পর চলে গুণতি। কোথাও গণনা করে স্বয়ং সিপাই, কোথাও মেট্। গোণবার পরে প্রত্যেক খাতা বা অন্যান্য স্থানের সংখ্যা জেলের অফিসে পৌঁছানো হয়। তৎক্ষণাৎ তা মোট সংখ্যার সঙ্গে মেলে কি না দেখা হয়। মিলে গেলেই সংবাদ প্রেরিত হয় সেই জেল-দরজার ছাদের গম্বুজে। সেখানকার সিপাই এবার ঘণ্টায় ঢং করে একটি মাত্র আওয়াজ করে, যার অর্থ হলো যে, কয়েদী যারা জেলে ছিল, জেলের মধ্যেই তারা আছে এবং গোলমাল যা হয়েছিল, তা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অতএব আবার জেলের স্বাভাবিক কর্ম্মতৎপরতা সুরু হয়ে যায়।

সশস্ত্র জেল-সিপাইরা অকুস্থলের নিশানা পায় গম্বুজের সিপাইর হাতে লটকানো বোর্ডখানা দেখেই। সুতরাং ত্বরিতে তারা সেখানে হাজির হয়ে লাঠি চালিয়ে এবং প্রয়োজন বোধ করলে গুলী চালিয়েও পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে ফেলে। শুধু তাই নয়। জেল থেকে জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারকেও ফোন করে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ শহরের রিজার্ভ বাহিনীর একটি দল লরী ভর্ত্তি হয়ে এসে জেলের দেয়ালের বাইরে বন্দুক নিয়ে পাহারায় দাঁড়িয়ে যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি, ঢাকা জেলটি একেবারে শহরের মাঝখানে। আমাদের তেতলার 'সি' ব্যারাকের স্কুল-বারান্দায় দাঁড়ালে রাজপথের একাংশ স্পষ্ট দেখা যায় এবং রাজপথের যে অংশটিতে দাঁড়ালে আমাদের স্কুল-বারান্দা দেখা যায়,

স্বভাবতঃই সেখানে কৌতূহলী দু'চারজনকে দেখা যেত। আর পাঁচ নম্বর খাতায় যে রাজবন্দীরা বাস করেন, এ সংবাদও তাদের জানতে বাকি ছিল না নিশ্চয়ই।

আজ সকালে অকস্মাৎ পাগলা ঘণ্টার শব্দে শহরের লোকরাও নিশ্চয়ই গম্বুজে দৃষ্টিক্ষেপ করে বিপদের নিশানা সেই বোর্ডখানা দেখতে পেয়েছে; তাই রাজপথের সেই বিশেষ অংশটিতে রীতিমত একটা জনতার সমাবেশ হয়ে পড়েছে দেখা গেল। তাদের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমাদেরই ঝুল-বারান্দার পানে নিবদ্ধ।

চারু বাবু তেতলা থেকে ঝটাপট নেমে এসে এই সংবাদটাই ছেড়ে দিলেন আমাদের মাঝে।

কি করবো'স্থির করতে পারছিলাম না আমরা। ধুলা ঝেড়ে উঠে আশু বাবু জেল-সুপার লিওনার্ড সাহেবের সম্মুখে এসে ক্রন্দন ভাঙা সুরে কি বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক এমন সময় জমাদার বাঁশী বাজিয়ে দিয়ে এমনি অনর্থ ঘটিয়ে বসেছে যে, আশু বাবুর ড্যাবডেবে চোখের মণি দু'টি যেন আরও বড় হয়ে শূন্য প্রেক্ষণে চেয়ে রইলো। জেলার নরেন সরকার ভুঁড়ির ওপর হাফ প্যাণ্টটা আরও একটু টেনে দিয়ে গোঁফ জোড়াটায় সাহেবের অলক্ষ্যে আর একটা মোচড় দিয়ে হাণ্টারটা বগলদাবা করে সশস্ত্র বাহিনীর অপেক্ষা করছেন। ভাবখানা—এইবার বাছাধনদের দেখাচ্ছি।

সাহেবের সঙ্গে সিপাইদের যে ক্ষুদ্র দল ছিল, তারা আমাদের বার বারই ঘরে ঢুকে পড়বার অনুরোধ জানাচ্ছে, জমাদার কর্কশ স্বরে "চলিয়ে, নম্বরমে চলিয়ে" বলে হুকুম জারী করছে ও সঙ্গে সঙ্গে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, "নেই তো মুসকিল হো যায় গা।" বাইরে তখনো অবিশ্রাম বাঁশীর আওয়াজ চলছে এবং ডবল মার্চ্চ করে যে সিপাইর দল আসছে, স্পষ্ট তাদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। আমাদের ইয়ার্ডের দরজা সটান খোলা। এই তারা এসে পড়লো বলে।

অকস্মাৎ ডেপুটি জেলার মহম্মদ হানিফ চীৎকার করে উঠলেন: I say, all of you get inside the Barrack, otherwise you will be fired upon .....

হানিফ সাহেব হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু বীরেনের ভীম গর্জ্জনে তিনি থেমে গেলেন: Shut up, you rascal, shut up—

এমন সময় হুড়মুড় করে এসে সশস্ত্র বাহিনী আমাদের ইয়ার্ডে ঢুকে পড়লো এবং কালবিলম্ব না করে বন্দুকধারীরা বন্দুকে কার্তুজ ভরে ফেললো। নিয়ম হচ্ছে, তারা এসেই কয়েদীদের একচোট "ধোলাই" করবে, তার পর বলপ্রয়োগে তাদেরকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবেই, প্রয়োজন বোধ করলে গুলী চালিয়েও। এখানেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতো না, যদি না স্বয়ং লিওনার্ড থাকতেন। তাই বন্দুকধারীদের প্রস্তুত করে রেখে

জমাদার খটাস্ করে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গুলী চালাবার হুকুম চাইলো : হুজৌর্-র্।

বেশ বুঝতে পারলাম রক্তারক্তি কাণ্ড একটা ঘটবেই। আশু বাবুর গালের ঘুষি আর ফিরিয়ে নেয়া যাবে না, তেমনি ভয় দেখিয়ে রাজবন্দীদেরও ঘরে ঢোকানো সম্ভব নয়। বন্দুক দেখে শৃগালের মতো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা রাজ-বন্দীদের নীতির বাইরে ছিল। সুতরাং একেবারে প্রস্তুত হয়ে এসেই দাঁড়ালাম বীরেনের পাশে, তার গা ঘেঁষে। পার্শ্বে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম একে একে এসে দাঁড়ালো ভোলা বাবু, নির্ম্মল ও ননী। তাদের পাশে এসেছে রমেশ, কামাখ্যাদা, তরণী বাবু, হরিদাস ও চারু বাবু। খাবার-ঘরে ক'জন বুঝি চা খাচ্ছিল, তারাও এসে দাঁড়িয়ে গেল আমাদেরই আশে-পাশে। রান্না-ঘর থেকে নীরেন বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল নিরঞ্জন, দীনবন্ধু ও অবিনাশ এবং আরও কয়েক জন। দোতলায় তেতলায় প্রাঙ্গণের এখানে-ওখানে যেখানে যারা ছিল, সবাই একে-একে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। গুলী চলতে পারে নয়, গুলীবর্ষণ অবধারিত। লালমুখ সাহেব নিজেকে মনে করে বৃটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি, মনে করে জেলের অভ্যন্তরে সে হিটলার বা মুসোলিনী ; সুতরাং হুকুম সে করবেই, প্রয়োজন হলে একটি-একটি করে এই দেড়শো রাজবন্দীর শবদেহ শোভাযাত্রা করে সে মর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেও কসুর করবে না। অপর দিকে পাথরের মতো সারি সারি দণ্ডায়মান কানাইলাল-ক্ষুদিরামের উত্তর-পুরুষ, বৃটিশ ক্রাউনের সম্মুখে মাথা নত করবার কৌশল আজো যারা শিখতে পারেনি। রক্তের জবাব এরা চিরকাল রক্ত দিয়েই দিয়ে এসেছে। তাই জানি, শেষ নিশ্বাসটুকু বেরিয়ে যাবার পুর্ব্বে এখান থেকে এক ইঞ্চিও এদের কাউকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।...স্পষ্ট অনুভব করলাম, একটা অবাঙ্ময় সর্ব্বনাশা সিদ্ধান্ত যেন সবারই শব্দহীন সমর্থন লাভ করলো : বাধা দিতে হবে।

শোনা গেল নরেন সরকারের গর্জ্জন : বী রেডি। পয়েন্ট ইওর আর্মস্।

সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকধারীরা ডান হাঁটু মুড়ে দিয়ে বসে বাঁ হাঁটুর ওপর বাঁ কনুই স্থাপন করে টোটাভরা বন্দুকগুলি আমাদের পানে লক্ষ্য করে ধরলো। এবার এগিয়ে এলেন স্বয়ং জেল-সুপার লিওনার্ড। যা বললেন, তা এই : এক মিনিট সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমরা যার-যার ঘরে ঢুকে পড়, নইলে রাইফেলের বুলেট তোমাদের বুকে ঢুকবে।

স্তব্ধতা। নিশ্বাসও বোধ হয় পড়ছে না কারুর। নড়বারও লক্ষণ দেখা গেল না এক জনেরও। আর একটি মুহূর্ত্ত। এর পরই নিশ্চয়ই সাহেবের কণ্ঠ শোনা যাবে : ফায়ার!...হ্যাঁ, আমরাও প্রস্তুত! ক্রাউনের হুকুম তামিল করার চাইতে বুলেটকে কী করে আলিঙ্গন করতে পারি, হাসিমুখে দোব তারই পরীক্ষা।

কিন্তু অকস্মাৎ সুরেনদা'র কণ্ঠ শোনা গেল। চেয়ে দেখলাম, তেতালার সিঁড়ি বেয়ে দু'জন বন্দীর স্কন্ধে ভর করে দ্রুত নেমে আসছেন ক্ষীণদৃষ্টি, অসুস্থ, বৃদ্ধ সুরেনদা, ওখান থেকেই চীৎকার করে বলছেন: Wait, wait Leonard, for a second. Let the first bullet pierce through my lungs.

সবার সম্মুখে এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সুরেনদা দুজন বন্দীর কাঁধে ভর করে, বুক এগিয়ে দিয়ে। চোখে তাঁর দৃষ্টি নেই, মিটমিট করছে। কিন্তু মনে হলো, সে বুকখানা যেন দুর্ভেদ্য ট্যাঙ্ক, বন্দুকের গুলী প্রতিহত হয়ে ফিরে যাবে।...

বাঙালী অফিসার হলে কি করতো জানি না, কিন্তু এমনি সাংঘাতিক জটিল ও উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে লিওনার্ড সাহেবের স্থৈর্য্য অপরিসীম। একটি বার মাত্র সুরেনদা'র পানে দৃষ্টিক্ষেপ করেই তিনি মারাত্মক অবস্থাটা চট্ করে উপলব্ধি করে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করে বসলেন। বন্দুকধারীদের পানে ফিরে তিনি তাদের চলে যাবার হুকুম উচ্চারণ করলেন এবং তারা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সদলবলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। আর আমাদের পানে ফিরেও চাইলেন না।

আশুবাবুকে অবশ্য বদলী করা হলোনা আমাদের বিভাগ থেকে, কিন্তু দুপুরের পরই যে বিজ্ঞপ্তি এলো, তাতে জানা গেল, আশু বাবুকে ঘুষি মারার শাস্তিস্বরূপ আগামী দু'মাসের জন্য বীরেন্দ্রনাথ ঘোষের পত্রলেখা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধা বাতিল করা হলো।

গুরু পাপে লঘু দণ্ড। সময়বিশেষে তারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিল চুরির কাহিনী একেবারে উদ্ভট কল্পনা নয়। ভবিষ্যতে আরও জানা যাবে যে, সম্মুখ রণে চিরকাল ভঙ্গ দিয়ে লিওনার্ড কী ভাবে পশ্চাৎ থেকে ছুরি চালাতেন।

সীমাহীন ধূর্ত্ত ও মূর্ত্তিমান শয়তান!

আট

কোনও 'বি' ক্লাশ কয়েদীকে আমাদের ইয়ার্ডে কাজ করতে পাঠানো হতো না। 'বি' ক্লাশ মানে একাধিকবার জেলখাটা কয়েদী। সবাই 'এ' ক্লাশ। অর্থাৎ এই প্রথম হাতে-খড়ি।

কিন্তু হাতে-খড়ি দিয়ে সারা জীবনের মতো ফিরে যাবার ইতিহাস খুবই কম। হাতে-খড়ির পরই এরা পড়তে শেখে, বুঝতে শেখে, হাত পাকাবার কৌশলটা আয়ত্ত করতে শেখে। এদেরও রীতিমত রিক্রুট করা হয় প্রসিদ্ধ ডাকাত, চোর বা বদমায়েসের দলের মধ্যে থেকে। বাইরে রিপুর তাড়নায় অকস্মাৎ এক দিন ভুল করে বসে জেলে এসে এরা রীতিমত পাঠগ্রহণ করে ওস্তাদদের কাছ থেকে। বিদ্যাশ্রমের অধ্যয়ন সমাপ্তির পর এরা একেবারে ঝুনো হয়ে বেরিয়ে যায় বাইরে!

কারাদণ্ডের ফলে কোনও চোর বা বদমায়েস সাধু হয়ে গেছে, এমনি দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। কী করে হবে?…জেলে ধূমপান নিষিদ্ধ। বাইরে যা আদৌ আইন বিগর্হিত নয়, চাষী-মজুরদের মধ্যে যা পরিবারের সবাই এক-সঙ্গে বসে উপভোগ করে থাকে, দৈহিক পরিশ্রমকারীদের পক্ষে শ্রান্তি অপনোদনের জন্য যা একেবারে অপরিহার্য্য, মধ্যবিত্তদের যা সস্তা বিলাসের অঙ্গ, সেই ধূমপানে জেলের মধ্যে হয় শাস্তি—দাঁড়ানো হাত-কড়া, মাড়ভাত, পায়ে বেড়ি, চটের পোষাক এবং হয়তো বেত্রাঘাতও।

তাই জেলে এসেই নিম্নশ্রেণীর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েদীরা ধূমপানের জন্য অধীর হয়ে ওঠে এবং যে করে হোক্, যে পথেই হোক্ যাকে দিয়েই হোক্, যতটুকুই হোক্ তামাক-পাতা বা বিড়ি বেআইনী ভাবে সংগ্রহে তৎপর হয়ে ওঠে। কয়েদীদের তামাক-পাতা বা বিড়ি সরবরাহের ব্যবসা বেশ লাভজনক—সিপাইরা তা ভাল ভাবেই জানে। সুতরাং জেলে তামাক-পাতা ও বিড়ির চোরা-কারবার বেশ চলতে থাকে। মনে পড়ে, একবার শুনেছিলাম চার নম্বর ইয়ার্ডের পাশের আলুর ক্ষেতের নীচে নাকি তামাক-পাতার একটা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। খনি!…চমকে উঠেছিলাম সেদিন। কিন্তু পরে বেশ বুঝতে পেরেছিলাম এমনি অনাবিষ্কৃত খনি জেলের অভ্যন্তরে আরও বহু আছে।

অথচ ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ নয়। মেথরেরা পারিশ্রমিক বাবদ প্রত্যহ বারোটি বিড়ি পেয়ে থাকে। যে সব কয়েদী দক্ষতা দেখিয়ে কয়েদীদের মাতব্বর হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে, convict overseer খেতাব পেয়েছে, নলচে আড়াল দিয়ে তারা সিপাইদের কাছ থেকেই তামাক-পাতা বা বিড়ি চেয়ে খায়। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন আসামী বা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী, তাঁদের পক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ নয়। আর, রাজবন্দীদের বেলায় তো ওর কোনো পরিমাণেরই

বালাই নেই। কিন্তু কতক লোককে সুবিধা দিয়ে অবশিষ্টদের ঠেকিয়ে রাখতে যাওয়া যে কতখানি ভ্রান্তিপূর্ণ নীতি, জেলে গেলে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

তার পর সমাজের দুষ্কৃতকারীরাই এসে জেলে জমায়েৎ হয়। বাইরে থেকে জানতে না পারলেও জেলের অভ্যন্তরে সর্ব্বশ্রেণীর কয়েদীদের সঙ্গে মিশে ও তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা জানতে পেরেছি যে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়েছে অথবা একের দোষে অপরের প্রতি দণ্ডাদেশ হয়েছে কিংবা একেবারে নিরপরাধ ব্যক্তি আইনের নির্দ্দয় প্যাঁচে পড়ে ফেঁসে গেছে, এমনি দৃষ্টান্ত ওখানে মোটেই অপ্রতুল নয়। জেলে এসে দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে মেলামেশা করে এরাও ভবিষ্যতে বাইরে গিয়ে সমাজের আবর্জ্জনা হয়ে দাঁড়ায়। সংশোধন না হয়ে এখানে এসে হয় এদের কুশিক্ষা ও পাপানুষ্ঠানের দীক্ষাগ্রহণ। নির্দ্দয় আইন মানুষের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করে রক্ষা করে চলে শুধু নিজের দাঁড়ি, কমা ও সেমিকোলন। তাই কারাগার আমাদের দেশে অপরাধী সৃষ্টির কারখানা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমাদের ঘরের অন্যতম ভৃত্য (জেলের ভাষায় যাদের বলা হয় ফালতু) হালিমের ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হালিম বরিশাল জেলার লোক। চাষ-আবাদই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। দু'টি ছেলে ও তিনটি মেয়ে নিয়ে সংসার তার এক রকম চলে যাচ্ছিল। উপচে-পড়ার মতো স্বচ্ছলতা না থাকলেও নুইয়ে-পড়ার মত অভাব-অনটন ছিল না। কিন্তু কাল হলো তার দ্বিতীয় বার বিবাহে ও এক সুন্দরী ষোড়শী বধূ ঘরে এনে। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য তমিজদ্দীন হালিমের ঘরে ঈদ করতে এসে ফাতেমাকে দেখতে পায় ও আলাপ করে তাকে তার ভালো লাগে।

কিন্তু আলাপেই সে ক্ষান্ত হলো না, অন্তরঙ্গ হবার ফিকিরে বার বার ঘুরে-ফিরে আসতে লাগলো। দরিদ্র চাষী হালিম এটা ভালে চোখে না দেখলেও প্রতিবাদ জানাবার সাহস পেল না প্রথম প্রথম।

ক্রমে দেখা গেল, ফাতেমার আসনও টলটলায়মান। একদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এসে হালিম দেখলো দু'জনে বড্ড বেশী ঘেঁষা-ঘেঁষি বসে মালসার কাঠের আগুন পোহাচ্ছে ও খোসগল্পে মজে গিয়ে বেশ হাসি-তামাসা করছে। গোয়াল-ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনুচ্চ স্বরে ভৎর্সনা করতে গিয়ে হালিম বিস্মিত হলো স্ত্রীর জবাব দেবার ভাষা ও ভঙ্গী শুনে। অনুচ্চ তিরস্কারের জবাবে স্ত্রী উচ্চস্বরেই বলে বসলো : উনি আমার ধর্ম্মের ভাই। ওঁর সঙ্গে গল্প করলে আবার দোষ কোথায় ?

ধর্ম্মের ভাইয়ের সঙ্গে অধর্ম্ম কিছু হবে না এবং হতে পারে না বলেই বিশ্বাস করতো সরল মানুষ হালিম। তাই সে লজ্জা পেল সন্দেহ পোষণ করে ও তা প্রকাশ করে।

তার পর কিছু দিন যায়। ভাই-বোনের সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে উঠলেও

স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া তেমন দেখা যায়নি বলেই হালিম ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামাতো না। বরং তার মনে হতে লাগলো, প্রথম স্ত্রী গহরজানের চাইতেও ফাতেমা প্রেমময়ী ও সুগৃহিণী। পরলোকগতা গহরজানের অভাব সে ভুলে যেতে লাগলো।

কিন্তু হায়, কে জানতো সুচতুরা ফাতেমা পাকা অভিনেত্রীর মতই এক দিকে প্রেম ও সোহাগ দিয়ে স্বামীকে অভিভূত করে রেখে অপর দিকে মনোরঞ্জন করতো তার ধর্ম্মের ভাইয়ের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে। স্বামীকে তুষ্ট করে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে দরজা খুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বেরিয়ে আসতো গভীর রাত্রে। উঠোনের ওপারে গোয়ালঘরের অন্ধকারে তখন তমিজদ্দীনের বিড়ির আগুন দেখা যায়।

হালিমের আজও মনে পড়ে, সেদিন ছিল অমাবস্থার রাত্রি। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের পুরু কালো আস্তরণের সঙ্গে চারি দিকের গাছপালা যেন এক হয়ে মিশে গেছে। গভীর নিশীথে অকস্মাৎ হালিমের নিদ্রা ভেঙে গেল ছোট মেয়েটার একটানা ক্রন্দনে। নিদ্রা তার অত্যন্ত গভীর। সারা দিন ক্ষেত খামারে পুড়ে এসে রাত্রে বিছানায় গা দিতে-না-দিতে ঘুমে দু'চোখ তার আচ্ছন্ন হয়ে আসতো। কিন্তু—হালিম বলতে লাগলো: বোধ হয় খোদারই মর্জ্জি ছিল বাবু, তাই ঐটুকু মেয়ের কান্নার শব্দেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। পাশে হাত বাড়িয়ে ফাতেমাকে ডেকে দিতে গিয়ে দেখি সে নেই। চট্ করে মাথায় একটা ঘা খেলাম যেন। দেখলাম দরজা ভেজানো। নিঃশব্দে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম। কোথায় যেতে পারে?...অকস্মাৎ মনে হলো, তমিজদ্দীনের বাড়ী! তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম সাবধানে। কিন্তু গোয়াল-ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় স্পষ্ট ফিসফিস কথার শব্দ শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে খড়ের খস্‌খস্। থমকে দাঁড়ালাম। বেড়ায় কান পাতলাম। হ্যাঁ, দু'জনের কথা চলছে, মাঝে মাঝে চাপা হাসিও। মাথায় খুন চেপে গেল। ...রাতের আঁধারে গোয়াল ঘরে চুরি করে এসে ভাই-বোনের ধর্ম্মচর্চ্চা হচ্ছে? ধর্ম্মভাই!!—সামনেই দেখি বেড়ায় গোঁজা রয়েছে হাত-দা'খানা।

হালিম একটু থামলো। বোধ হয় উত্তেজনার মাত্রাটা একটু সামলে নিল। তার পর ধীরে ধীরে বললো: আদালতেও সবই আমি স্বীকার করেছি। বলেছি, হ্যাঁ, ঐ দা দিয়েই অন্ধকারে এক ঘা মেরেছি। কার কোথায় লেগেছে জানি নে। পরে দেখেছিলাম, তমিজদ্দীনের একখানা হাত একেবারে উড়ে গেছে, আর ফাতেমার বুকে গিয়ে বিঁধেছে দায়ের ধারালো ফলা।

হালিম আবার থামলো। গলার স্বরটাও তার যেন একটু কেঁপে উঠলো। মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরই সে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলতে লাগলো: দায়রা জজ দিলেন ফাঁসীর হুকুম। হাইকোর্টে দু'জন জজের দু'মত হওয়াতে বড় জজ রায় দিলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

হালিম কেন শুধু, হালিমের মত আরও অনেক কয়েদী এখানে আছে, যাদের

দীর্ঘমেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে আইনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু ন্যায়বিচার হয়েছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আমাদের ইয়ার্ডে যারা কাজ করে, তাদের নিয়ম-মাফিক খাবার আসে কিন্তু ওদের পৃথক্ চৌকা থেকে। সকাল হতেই আসে বড় বড় বালতী-ভর্ত্তি খুদের লপ্‌সি, কোনো-কোনো দিন ওরই মধ্যে গোটা কয়েক ছোলার ডালের দানা ছড়িয়ে দিয়ে নাম দেয়া হয় খিচুড়ী। মাঝে মাঝে এক-আধটা শুকনো লঙ্কাও মেলে। নুণ একটু দেয়া হয়েছিল কি না, তা বুঝতে হলে বেগ পেতে হয়।

দুপুর বেলায় আসে ট্রাঙ্ক-ভর্ত্তি ভাত। সত্যিই ট্রাঙ্ক। শুধু এর ডালাটা কব্জি দিয়ে আঁটা নয়, আলগা। ঢাক্‌নির মতো। ট্রাম ইন্‌স্‌পেক্টারদের বারান্দাটুকু বাদ দিয়ে টুপীটা উলটে দিলে যা হয়, ঠিক তেমনি ধরণের একটি লোহার পাত্র আছে ট্রাঙ্কের মধ্যে, তাকে বলা হয় কাঠা। উপচে-পড়া এক কাঠা ভাত জনপ্রতি বরাদ্দ। সিগারেটের টিনের আকার ও বোধ হয় সাইজেরও একটি এ্যালুমিনিয়মের বাটি একটি লম্বা ডাণ্ডার সঙ্গে লাগানো আছে। সেই বাটির এক বাটি করে ডাল। পরিমাণ মন্দ নয়। ঐ ধরণের একটু ছোট সাইজের বাটির এক বাটি তরকারি।

কী কী জিনিষ দিয়ে যে সেই তরকারি রান্না করা হয়, তা বোঝবার উপায় যে একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু কিছু শাক-পাতা তাতে থাকবেই। তা সে পালং থেকে সুরু করে সরষে শাক, মূলো শাক, নটে শাক, পটল-পাতা, শালগম ও ওলকপির পাতা, ফুলকপির পাতা, এমন কি পেঁপে গাছের কচি পাতাও থাকতে পারে। দুষ্ট লোক অবশ্য বলে যে, ঘাসও না কি মাঝে মাঝে তাতে ছেড়ে দিতে কার্পণ্য বা সংকোচ করে না বড় চৌকার বাটলারগণ। একটু বেশী ঝোল ও তাতে এই ঘাস-জাতীয় দ্রব্যগুলি গলিত অবস্থায় থাকে। আর যাই থাক না তাতে, সবই অতিরিক্ত সেদ্ধ করা হয়। ফলে বেশ হড়্‌হড়ে জাতীয় তরকারি প্রস্তুত হয়।

জেলের অভ্যন্তরে বিরাট সবজী-বাগান আছে। তাতে চমৎকার সব তরকারি জন্মে। আলু, বেগুন, সিম, শালগম, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, কুমড়ো, মূলো, টমেটো, বরবটি প্রভৃতি বারো মাসের তরকারি এখানে হয়। সেই ক্ষেতে সারা দিন খেটে মরে এই সাধারণ কয়েদীর দল, অথচ খাবার বেলায় এরা পায় শুধু পাতা আর ঘাস এবং খুব বেশী হলে সময়োত্তীর্ণ দু'-একটা জিনিষ। অর্থাৎ, চৈত্র মাসে হয়তো এদের দেয়া হলো ফুলকপির শুকনো ফুলগুলো কিংবা বুড়ো মূলোর ঝাড় কিংবা শালগজানো শালগম। তেল ও মসলাহীন সেই অপুর্ব্ব ব্যঞ্জন থেকে এমনি বোঁটকা গন্ধ বেরুতে থাকে যে, একেবারে সওয়া যায় না। বাগানের তরকারি যায় অফিসারদের বাড়ীতে আর বাকিটা বাইরে বিক্রী করে ফেলা হয়।

ভাত, ডাল ও তরকারি প্রত্যহই পাওয়া যায়। এ ছাড়া সপ্তাহে দু'দিন পাওয়া যায় মাছ ও দু'দিন মাংস। অবশ্য এক বেলা। ইংরেজের রাজত্বে

অবিচার হতে পারে না। তাই মাছ-মাংস যেদিন আসে, সেদিন বণ্টনকারীদের সঙ্গে এক জন আসে দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে। যদি কেউ মাছের বা মাংসের টুকরো দেখে চ্যালেঞ্জ করে বসে, তৎক্ষণাৎ ওজন করে তাকে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, ঠিক এক ছটাক এক টুকরো মাছ বা আধ ছটাক এক টুকরো মাংসই তাকে দিয়ে সরকারী হুকুমের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়েছে।

কিন্তু মজা হচ্ছে, মাছগুলো আসে ভাজা হয়ে আর মাছের ঝোল আসে পৃথক্ একটি বালতীতে। সেই ঝোল একেবারে পৃথক্ রান্না করা হয়, মাছের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে না। এমনি অভিনব মাছের ঝোলের কারণ দু'টি। প্রথম, কয়েদীদের মধ্যে অনেকে ঐ হলুদ মেশানো জল অথবা ঝোল পছন্দ করে না আর দ্বিতীয়, ঝোলে-ডোবানো মাছের ওজন বৃদ্ধি হবেই, তাতে তারা ঠকছে বলে দাবী করতে পারে।

মাংসের ঝোলকে অবশ্য মাংসেরই ঝোল বলা যায়, কারণ একই সঙ্গে রান্না করে মাংসের টুকরোগুলো সাবধানে তুলে নেয়া হয়। আর মাংস ভাজা ওরা কেউ খায় না।

এ ছাড়া পাওয়া যায় একটুখানি তেঁতুল, যাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব সুমধুর চাটনি বা টক আখ্যা দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। এক টুকরো তেঁতুল।

বিকেলে যারা ভাত খায় না, তাদের জন্য রুটিরও ব্যবস্থা আছে। প্রায় তেরো ইঞ্চি ডায়মেটারের এক-একখানা পাতলা রুটি, দু'খানা করে বরাদ্দ। চাইলে আর একখানাও পাওয়া যেতে পারে। চালনিতে ছেঁকে আটা বার করে নেবার পর যে ভুসি থাকে, দেখলে মনে হয় সেই ভুসি দিয়েই ঐ রুটি প্রস্তুত করা হয়। আটা খৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করে জেলের প্রধান জমাদারের বিরাটকায় গরুগুলির খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের ইয়ার্ডে যে সব কয়েদী কাজ করতো, আমাদেরই খাবার খেত, তারা অবশ্য এ সব খাদ্য যেমন নিয়ম-মাফিক আসতো, তেমনি নিয়ম-মাফিক গ্রহণ করতো শুধু, কিন্তু মুখে তুলতো না। আমরাই দিতাম না ওদের তা খেতে। বরং সখ করে মাঝে মাঝে আমরাই তা একটু চেখে দেখে বেশ মজা অনুভব করতাম।

নয়

পাগলা ঘন্টি বাজবার পর প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। সুতরাং উত্তাপ ও উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন-যাপন সুরু হয়েছে। সপ্তাহে দু'বার সুপারিনটেনডেন্টের আমাদের ইয়ার্ড পরিদর্শনে আসবার কথা। কিন্তু গত দু'সপ্তাহ তিনি আর আসেননি, এসেছেন শুধু জেলর নরেন সরকার। সঙ্গে সিপাইদের সংখ্যাও কম দেখা গেছে। ঘরোয়া সফরের মতো। সেদিনের ঘটনার কথা বেমালুম না ভুলে, অকস্মাৎ তিনি আমাদের শুভানুধ্যায়ী হয়ে ওঠেন: আরে মশাই, চোর চোর, সব শালা চোর। সেদিন আমি নিজে বাজারে গিয়ে ইয়া বড় বড় কৈ মাছ নিয়ে এলাম পঞ্চাশটি এক টাকায়, আর সেদিন সেই রকম কৈ মাছেরই দাম শালা কনট্রাকটর চার্জ্জ করেছে পুরো দু'টাকা করে? আপনাদের আর কি, নীরেন বাবুর সামনে বিল ধরলেই তিনি খস্‌-খস্‌ করে সই মেরে দেন। এমনি অন্যায় আমাদের কিন্তু গায়ে লাগে। হোক্ না সরকারী টাকা, তবুও একশো টাকায় একশো টাকা লাভ? আপনাদেরও বলি, যে টাকাটা শালা বেশী নিয়ে গেল, তা দিয়ে আর-একটা ভালো জিনিষও তো পারতেন কিনতে। কত কাল থাকতে হবে কে জানে। বলি, স্বাস্থ্যটা তো রক্ষা করে চলবেন।

একদিন যিনি বন্দুকধারীদের প্রতি 'পয়েন্ট ইয়োর গান্‌' হুকুম দিয়ে আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, আজ আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁর এই উৎকণ্ঠা এত বিসদৃশ ঠেকে যে, নীরেন বাবু বেশ একটু শ্লেষই করেন: ওজন নেবার খাতাটায় একবার চোখ দিয়েছেন? দেখেছেন আমাদের গড়পড়তা ওজন-বৃদ্ধির হিসাব? সপ্তাহে এক পাউণ্ড করে প্রায় প্রত্যেকেরই বেড়ে চলেছে। এর চাইতেও বেশী আশা করলে অবশেষে আপনার দশা হবে যে।

নরেন বাবু দুই হাতে ভুঁড়িটা চেপে ধরলেন, বোধ হয় হাসির ধাক্কায় সেটা খসে পড়ে না যায়, সেজন্য। তারপর বললেন: না, তেমন আর বেশী কি। এর চাইতে কত বড় বড় ভুঁড়ি দেখেছি। এই তো সেদিন নবাব-বাড়ীর একটা বিয়েতে গিয়েছিলাম—

বাধা দিয়ে ভোলা বাবু বললেন: তা হতে পারে। গৌরীশঙ্কর যে কাঞ্চনজঙ্ঘার চাইতেও উঁচু তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তাতে করে কাঞ্চনজঙ্ঘা উপেক্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় না।

চারু বাবু বলে ফেললেন: সারা ঢাকা জেলটাই তো আপনার উদরে। তাই সাইজটা তেমনি হওয়া চাই তো। ওতে দোষ নেই।

তীক্ষ্ণ শ্লেষটা সহজ করে দেবার জন্য নরেন বাবু উচ্চ হাস্য করে উঠলেন এবং বললেন: তবুও তো একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন না?

রাত্রে দিবাকর বাবু আমার টেবিলে এসে বসলেন। মা'র কাছ থেকে একখানা দীর্ঘ পত্র পেয়েছি, তারই জবাব লিখছিলাম নিবিষ্ট মনে। কখন যে সিপাই রাতের মতো দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে, টেরই পাইনি।

বাধা পেলাম। লোকটা অকস্মাৎ এসে হাজির হয় এমনি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এতটুকুও আভাস না দিয়ে যে, গা জ্বালা করে। তথাপি শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম : কি ব্যাপার দিবাকর বাবু ?

না, তেমন কিছুই নয়। শুধু ভাবছি বীণা দাসের গুলীটা যদি জ্যাকসনের বুকে লাগতো, তাহলে বাংলা দেশ একটা রেকর্ড করে ফেলতে পারতো। কিন্তু ব্যাটার কি ভাগ্য দেখছেন ? এত কাছ থেকে মারা হলো, অথচ একটি গুলীও শালার বুকে বা গায়ে লাগলো না।

এ সম্বন্ধে মন্তব্য করবার কি আছে এবং থাকলেও সরকারী গোয়েন্দা রাজবন্দী দিবাকর সেনগুপ্তের সঙ্গে তা নিয়ে কেন যাবো আলোচনা করতে ? তাই শুধু একটু মুচকি হাসলাম মাত্র।

কিন্তু ঐ হাসিতেই দিবাকর বাবু যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করলেন : আমার কি মনে হয় জানেন দ্বিজেন বাবু, বি-ভির ঐ life for life নীতিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং একেবারে নিশ্চিত। মরতে হবে নির্দেশ থাকলে মারবার যন্ত্রটা বোধ হয় আরো বেড়ে যায়। আর পলায়নের পরামর্শ থাকলে আগেই একটা চোখ থাকে দরজার দিকে। এ জন্যই বি-ভির প্রত্যেকটা প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মরতে হবে জানলে বীণা দাস একেবারে ডায়েসের ওপরে উঠে গুলী চালাতো তাহলেই গভর্ণর বাছাধনকে আর রক্ষা পেতে হতো না।

বললাম নেহাৎ কিছু বলতে হবে বলেই : তা কনভোকেশনটা খুব জমেছিল বলুন ?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—বলে দিবাকর বাবু হাসতে লাগলেন। তার পরই অকস্মাৎ স্বর অত্যন্ত খাটো করে বললেন : গত সপ্তাহে সকাল বেলা যে সিপাইটার ডিউটি ছিল, মনে আছে সেই মাধব সিংকে ? ওকে হাত করে ফেলেছি। রাজী হয়েছে। যদি কোথাও চিঠি পাঠাতে হয়, পাঠাতে পারেন। জবাবও ও এনে দেবে। টাকা অবশ্য ও চায়নি। তবুও বোঝেন তো—

বললাম, কোথায় আর খবর পাঠাবো। আর কি-ই বা খবর আছে। তবুও দেবেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আবার এখানে ডিউটি পড়লে।

না, না, খুব বিশ্বাসী।—এই দেখুন না, কাল রাত্রে এই 'আনন্দবাজার'খানা লুকিয়ে দিয়ে গেছে।—বলে তিনি র‍্যাপারের নীচে থেকে একখানা আনন্দবাজার সত্যিই বার করলেন। সত্যিই দেখলাম তার তারিখ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ সাল।

বিনাবাক্যে একটু চোখ বুলিয়ে নিলাম। বাইরের সংবাদ কিছু সংগ্রহ করা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্যও। পুরস্কার স্বরূপ দিবাকর বাবুকে খুশী করে দিলাম : আচ্ছা, ঠিক আছে। প্রয়োজন হলেই জানাবো আপনাকে।

আর জানাবোই বা কি? চিঠিই দিয়ে দোব আপনার হাতে, আপনি মাধব সিংকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন, কেমন? আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে, আপনাকেই শুধু চিনে রাখুক। পরিচিতের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি, কি বলেন?

খুব খুশীভরা মন নিয়ে উঠে গেলেন গোয়েন্দা-রাজবন্দী দিবাকর সেনগুপ্ত। ভাবলেন, এইবার কাজ দেখাবার একটা মওকা পাওয়া গেল। যোগিনী বোস বা জিতেন ধর এবার খুশী না হয়েই পারেন না।

খুশী আমিও হলাম ওঁর মূর্খতা অনুভব করে। গোয়েন্দা পুলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে বুদ্ধি বা কূটনৈতিক চালের লড়াইতে কোন দিনই জয়লাভ করতে পারে না, যদি না বিপ্লবীদেরই অন্তরঙ্গ কেউ ওদেরকে সাহায্য করে সংবাদ সরবরাহ করে। ঢাকায় মেডিক্যাল স্কুলে লোম্যান ও হাডসন গুলীবিদ্ধ হবার পরই বিনয় স্কুলের রেলিং টপকে নীচে খালে নেমে পড়ে। খালে হাঁটু-সমান জল পার হয়ে সে দৌড়ে গিয়ে ওঠে এক মুসলমানের কুঁড়ে ঘরে। সেখান থেকে তার বন্ধুরা সেই দিনই গভীর রাত্রে নৌকাযোগে তাকে পাঠিয়ে দেয় নদী-পথে চাঁদপুরে। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর বিনয় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। আর্মানীটোলার মেসে বিনয়ের রুম-মেট ছিল গোপাল সেন। গোপালকে গ্রেপ্তার করে তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় ঢাকার আই-বি পুলিশ। কিন্তু একটি কথাও প্রকাশ করেনি সে। তাই লোম্যান-হাডসন-সিম্পসন-গার্লিক প্রভৃতির ওপর যে গুলীচালনা হয়, তা নিয়ে পুলিশ কোনও ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করতে পারেনি, যদিও এ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করেছে অনেককে এবং নিশ্চয়ই আই-বি অফিসে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে জামাই-আদর দেখায়নি। তবুও পারেনি। কারণ বি-ভি বিপ্লবী দলে দিবাকর সেনগুপ্ত নেই।......

ফেব্রুয়ারী মাস পড়লে কি হবে, শীতের যেন আর কমতি নেই। হালিম এসে জানালার চিকখানা ভালো করে ফেলে দিয়ে গেল বটে, তবুও আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়েও যেন ঠাণ্ডা মনে হতে লাগলো। তরুণী সোমের নাসিকা-ধ্বনি সুরু হয়ে গেছে। অন্যান্য সবাইও নিদ্রামগ্ন। দিবাকর বাবু যথারীতি তার কোন আত্মীয়কে চিঠি লেখা সুরু করলেন। আত্মীয় যে কে, তা বোঝবার ক্ষমতা একুশ বছর বয়েস হলেও আমার হয়েছে। আজকের সারাদিনের ডায়েরী লেখা হচ্ছে এবং কালই হয়তো আবার একটা কাজের ছুতো করে যাবেন অফিসে আর ওখানা পাঠিয়ে দিয়ে আসবেন যথাস্থানে। উল্লসিত হয়ে নিশ্চয়ই আজকে আমার কথাও লিখেছেন। লিখুন। ওতে ঘাবড়াবার ছেলে নই আমি।

কারণ, গত বছর আলিপুরের সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর গুণেশ সেনের রিভলভার তাঁর ড্রয়ার থেকে উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারে যখন আমায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তখনই কলকাতার এস-বি অর্থাৎ গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল

ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার সম্যক্ পরিচয় ঘটে গেছে। বয়লার-ঘর তখনই ঘুরে এসেছি।...

গ্রেপ্তারের দিনের কথা মনে পড়ে। সন্ধ্যার পর যথারীতি ব্যায়াম সেরে ভবানন্দ রোডের আমাদের বাড়ীর সামনে সাইকেলে এসে নামলাম এবং অভ্যাস মতই রাস্তাটার একবার এদিক্ আর একবার ওদিক দৃষ্টি প্রসারিত করে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। গা-ঢাকা দেবার মতো পরিস্থিতি তখনো দেখা দেয়নি।

জানুয়ারী মাস। এদিকে তখন দু' চারখানা মাত্র বাড়ী উঠেছে। প্রায়ই ফাঁকা মাঠ। তাই বেশ শীত।

বেড়ার গায়ে সাইকেলখানা হেলান দিয়ে রেখে সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম, ভাগ্য সুপ্রসন্ন, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। সেজ বৌদি চা তৈরী করছেন। মেজ বৌদি আর সোনা বৌদিও বেশ জমিয়ে বসেছেন। শুধু চা যে খেতে নেই, এ জ্ঞানটা মেজ বৌদির ভারী টনটনে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার-ঘর থেকে এক মুঠো মুড়ি এনে দিলেন।

চায়ের আসর বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় বাইরে কার কণ্ঠ শোনা গেল : দ্বিজেন বাবু বাড়ী আছেন ? দ্বিজেন বাবু—

বন্ধু যে নয়, তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম। বন্ধুরা বাবু বলে না, আর কণ্ঠও অপরিচিত। সাড়া দিলাম : যাচ্ছি, দাঁড়ান।

চা-মুড়ি শেষ করে বাইরে এসে দেখি সত্যিই অপরিচিত এক ভদ্রলোক। বললেন অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে : একটু আসুন; এক মিনিট।

রাস্তায় পড়তেই দেখলাম, তিনি আড়ামোড়া তোলার ছলে কৌশলে রাস্তার একবার এদিকে আর একবার ওদিকে হাতছানি দিয়ে কাদের ইসারায় ডাকলেন এবং পর-মুহূর্তেই প্রায় বারো-চৌদ্দ জন পুলিশ এসে আমায় ঘিরে ফেললো। তৎক্ষণাৎ বন্ধুর এক মিনিটের তাৎপর্য্য জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

দারোগা প্রফুল্ল মণ্ডল এস-বির চাকুরে। তাই ভারী মিষ্টি তাঁর কথা : অত্যন্ত দুঃখিত দ্বিজেন বাবু। আপনার বাড়ীটা এক বার সার্চ্চ করতে হবে।

সার্চ্চ হলো তন্ন তন্ন করে। ওদের নজর দেখা গেল বিশেষ করে ভাঁড়ার ঘরে এবং ভাড়ার-ঘরের হাঁড়ি কুঁড়ির প্রতি। যথারীতি কিছুই পাওয়া গেল না। এবার মণ্ডল মশাইয়ের কণ্ঠস্বর আরো মোলায়েম : দ্বিজেন বাবু, আপনাকে একটি বার পাঁচ মিনিটের জন্য থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।

কেন ?

এই একটা বিবৃতির জন্য। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন মাত্র। পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। বলে মণ্ডল ব্যাপারটার গুরুত্ব একেবারে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন।

শীতের রাত। সন্ধ্যে হতেই রাতের রান্না শেষ হয়ে যায়। বৌদিরা তাঁদের দেবরকে খুব ভালো রকম চেনেন। তাই মেজ বৌদি বললেন :

এই মাছের ঝোলটা নামছে, একেবারে খেয়েই যাও। পাঁচ মিনিট মানে পাঁচ ঘণ্টাও তো হতে পারে।

পাঁচ মিনিট যে সত্যিই মাত্র তিনশো সেকেণ্ড, মণ্ডল আর একবার সেই সত্যটা উচ্চারণ করে বৌদি'র শ্লেষটা সহজ করে দেবার চেষ্টা করলেও দেখা গেল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খেতে দেবার আপত্তি তাঁর খুব প্রবল নয়।

দাদারা কেউ তখনো বাড়ীতে ফেরেননি। তাই সেজ বৌদিই অগ্রণী হয়ে মণ্ডলকে ঘরে গিয়ে বসতে বললেন। কিন্তু মণ্ডল বোধ হয় মারাত্মক আসামীকে রান্না ঘরে রেখে স্বস্তি পাবেন না, তাই এই প্রচণ্ড শীতেও বাইরে উঠানেই অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করলেন। বারো জন পুলিশ চব্বিশটি চক্ষু চতুর্দ্দিকে মেলে রেখে সতর্ক পাহারায় দাঁড়িয়ে রইলো।

কাছেই টালিগঞ্জ থানা। পাঁচ মিনিটের জন্য সেখানে এনে একটি কক্ষে বসিয়ে রেখে অপর কক্ষ থেকে প্রফুল্ল মণ্ডল টেলিফোনে যে কথা ক'টি বললেন, তাতেই পরিষ্কার আমার অবস্থাটা জানা গেল।

—হ্যালো, শুনুন, দ্বিজেন বাবুকে এখানে এনেছি।...না, কিছুই পাওয়া যায়নি।.. সঙ্গে আর কেউ ছিল না—একা।...অ্যাঁ, কোথায়? ভবানীপুরে? কাল সকালে ওখানে? ...রায় বাহাদুর কথা কইবেন? আচ্ছা।

তার পর ভবানীপুর থানায় রাত্রিবাস এবং তারপর দিন পনেরো থাকতে হলো পার্ক স্ট্রীট থানায়। সেখান থেকে লর্ড সিংহ রোডে প্রত্যহই যেতে হতো পুলিশ ভ্যানে এবং সারা দিন অঙ্গ সংবাহনের পর ফিরে আসতাম সন্ধ্যার পর। সেখানকার আদর-আপ্যায়ন সীমাহীন হয়ে উঠলো তখন, যখন অকস্মাৎ একদিন দেখলাম রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কক্ষে আমার তলব পড়লো।

বনবিহারীর এক চক্ষু একটি প্লেট ঝুলিয়ে ঢাকা। অসুখ নয় কিছু। পরে জেনেছিলাম, ওটা না কি স্কটল্যাণ্ডীয় কৌশল, এক চোখ ঢেকে রাখলে সে লোককে দু' চোখ খোলা অবস্থায় দেখলে চেনা কঠিন। বিপ্লবীরা যাতে তাঁকে চিনে না রাখতে পারে, তাই অসুখের ভান।

কিন্তু আশ্চর্য্য তাতে কিছু হইনি। চমকে উঠলাম তখন, যখন দেখলাম, তাঁর সুমুখের একখানা চেয়ারে কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছে গুণেশ সেনের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিমল সেন।

চেন একে?—বনবিহারীর ক্রুদ্ধ প্রশ্ন শোনা গেল।

মেঝের দিকে চেয়ে বিমল মৃদুস্বরে জবাব দিল: চিনি।

তুমি এর হাতে রিভলভারটা এনে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

চমকে উঠলাম: বলিস্ কি রে?

জবাব দিলেন বনবিহারী: হ্যাঁ, এমনিই সব বলছে। ভেবেছ কিছুই জানি নে আমরা? শোন তবে।—বল তো, কি করে দিলে?

মাথা নীচু করে শ্রীমান্ বিমল কুটি-কুটি করে বেশ বলে যেতে লাগলো : সন্ধ্যার পর সাইকেলে এসে উনি রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি বাবার ড্রয়ার খুলে রিভলভারটা ও কার্তুজগুলো একটা সাবানের বাক্সে ভরে নীচে এনে ওঁর হাতে দিয়ে যাই। উনি চলে যান।

এবার ?—গর্জ্জে উঠলেন রায়বাহাদুর : কি বলবার আছে তোমার ? চালাকী পেয়েছ ? We have got report of all your activities from Dacca—ভেবেছ আমরা সংবাদ রাখি নে।—বল, চুপ করে থেকে লাভ নেই।

বললাম : কি আর বলবার থাকতে পারে।

হ্যাঁ, সত্যিই তাই, বলবার আর কিছু নেই।—এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ওটা বার করে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আর তা নইলে, there will be a big conspiracy case against you and you shall get transportation for life। যান, নিয়ে যান। শুনুন প্রফুল্ল বাবু, ওকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। সব বলে দেয় ভালই। নইলে ঐ ডালহৌসী ষড়যন্ত্র মামলাটায় একেও জুড়ে দিন, বুঝলেন ?

যে আজ্ঞে।—বলে মণ্ডল মশাই আমায় নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রবেশ করলেন সোজা মণি বোসের কক্ষে। বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার, বিপ্লবীদের সঙ্গে মণি বসুর সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটেছে একবার অথবা একাধিক বার। কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা সেই বিরাট্ ডেলার মত দু'টি চোখ আর গরুড়ের মতো নিম্নমুখা-অগ্রভাগ নাসিকা আর মা-বাবা থেকে সুরু করে উর্দ্ধতন সব ক'টি পুরুষেরই উদ্দেশ্যে বাছা-বাছা গালিবর্ষণ, বাংলার, বিশেষ করে কলকাতার, প্রত্যেক বিপ্লবী বন্দীরই স্মৃতিপটে চিরকাল জেগে থাকবে।

তাঁর বিখ্যাত কোটরে শুধু হাণ্টারই থাকতো না, মণি বসু এক গ্লাস জলও রাখতেন রেডি করে। কারণ জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য জলের প্রয়োজন হতে পারে। দূরদর্শী ও সাবধানী। আমরা এই বিশেষ ঘরটিকে বলতাম বয়লার আর এই অগ্নি-পরীক্ষায় যে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসতো, তাকে বলা হতো বয়লার-প্রুফ।

বিমল মুখের ওপর স্বীকারোক্তি করলে কী হবে, দ্বিজেনে সে উক্তির প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল না। তাই প্রায় চার মাস বিচারাধীন আসামীরূপে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করে রাখবার পর আমায় মুক্তি দেয়া হলো কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ না করে। পুলিশের আশা ছিল, ছেড়ে দিয়ে কিছু দিন পেছনে কেউ লাগিয়ে রাখলেই রিভলভারের গুদামের সন্ধান পাওয়া যাবে।...

এর পর ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে কর্ণেল পেডিকে গুণেশ সেনের বাড়ী থেকে চুরি-করা সেই রিভলভারটি দিয়েই যে হত্যা করা হয়েছে, পুলিশ কোনও সূত্রে সেসংবাদ জানতে পেরে ১৯৩২ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাসেই ঢাকা জেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে।

দেখা হতো জেলের অফিসের একটি নিভৃত কক্ষে। কে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। তবে আই-বি দারোগা প্রমোদ দাশগুপ্ত হতে পারেন।

ভারী সহানুভূতি দেখালেন: এই তো গেল তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার সমগ্র জীবন। গভর্ণমেণ্ট confirmed করে দিয়েছে মানেই অন্ততঃ দশটি বৎসর। মানে, জেল থেকে বেরুবে একত্রিশ বৎসর বয়সে। কি করবে তখন? বাবা খেতে দেবে, না দিতে পারবে তোমার ঐ সত্য গুপ্ত আর হেম ঘোষ?...ভারী দুঃখ পাই তোমার মত ব্রাইট ইয়ংম্যানকে আটকে রাখতে। কিন্তু কি করবো, তুমি নিজেই যে বাধ্য কর।

চট করে প্রশ্ন করলাম: কি রকম?

প্রমোদ বাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন: কি রকম। সেবার গুণেশ সেনের রিভলভার তুমি বলেছিলে নাওনি। তা'হলে মেদিনীপুরে তা কি করে গেল, সেই রিভলভারেরই গুলীতে কর্ণেল পেডি কী করে নিহত হলেন?

নির্ব্বিবাদে বলে ফেললাম: বোধ হয় মেদিনীপুরের কেউ টাকা দিয়ে বিমলের কাছ থেকে ওটা সংগ্রহ করেছিল।

দু' চোখ কপালে তুললেন প্রমোদ বাবু: মেদিনীপুরের কেউ! বল কি? জানি আমরা যে, মেদিনীপুরের এই সন্ত্রাসবাদী দলের গোড়া পত্তন করেছে বি-ভি ঢাকা থেকে গিয়ে। বি-ভির একজন পাকা সংগঠক সেখানে ছিল। তার নাম বলবো না। কথা হচ্ছে, ওটি নিয়ে তুমি তাকে দিয়েছ, আর সে চালান করেছে মেদিনীপুরে। তাই নয় কি?

বিরক্ত বোধ করলাম। এটা আর লর্ড সিংহ রোড নয় আর মণি বোসের বয়লারের সমুখে আসিনি এখন যে, সমঝে চলতে হবে। বললাম: দেখুন, আমার সময় নেই আপনার সঙ্গে বক্-বক্ করবার। কাজ করবোই, কিন্তু সে কাজের হদিস্ পাওয়া আপনাদের সাধ্যি নেই। তাই তো পরাজিত হয়ে অবশেষে করলেন রাজবন্দী। পাঠান না দেখি দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে একবার জেলে কয়েদী করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। বুঝবো আপনার হিম্মৎ কতখানি!

গট গট করে বেরিয়ে এলাম। ফল এই দাঁড়ালো যে, তার দিন চারেক পরই স্থানান্তরের হুকুম এলো বহরমপুর বন্দীশিবিরে। একদিন সকালবেলা আরও তিন জন রাজবন্দীর সঙ্গে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ছেড়ে ফুলবাড়ী ষ্টেশনে (ঢাকা ষ্টেশনের নাম) ট্রেণে চেপে বসলাম।

দশ

ঠিক কোন্ ট্রেণে আমাদের তোলা হয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। সঙ্গে ছ'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সিপাই আর সাদা পোষাকে এক জন আই-বি'র দারোগা। তিনিও নিশ্চয়ই সশস্ত্র, তবে সিপাইদের মতো প্রকাশ্যে নয়, বস্ত্রাভ্যন্তরে, সংগোপনে। বন্দী হলেও আমরা রাজবন্দী, তাই আমাদের সঙ্গে সরকারী আচরণ কথঞ্চিৎ ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে অন্তত: দৃশ্যত:। তাই হাতকড়া ও দড়ির মামুলী নিয়মের ব্যতিক্রম আমাদের বেলায়। কিন্তু তাই বলে যে আমরাও ভদ্রতা করে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে অথবা ভাসমান ষ্টীমার থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলায়নের চেষ্টা করবো না, জোর গলায় যতই কেন না সে সম্বন্ধে আমরা বরাভয় দিই, অবিশ্বাসী সরকার তাতে বিচলিত হন না। তাই, ঢাকা থেকে সহজ ও দ্রুত পথে বহরমপুর না গিয়ে গ্রহণ করা হয় ঘোরা ও দীর্ঘ পথ এবং মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মারাত্মক শত্রুর দল যে এই পথে চলেছে, বিজ্ঞপ্তি প্রচারে জানিয়ে দেওয়া হয় আই-বি'র চেলা-চামুণ্ডাদের। ফলে, প্রায় ষ্টেশনেই সাদা পোষাকধারী এক জন জানালায় এসে আমরা বহাল তবিয়তে ও শরীফ মেজাজে চলেছি কি না, মূল্যবান সে তত্ত্বটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যান!

মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী আমরা। তাই, এক দিকে যেমন সাধারণত: পরিচ্ছন্ন আরোহীদের সঙ্গে চলবার সৌভাগ্য লাভ করা যায়, তেমনি আবার কথা কইবার সুযোগ হারাতে হয়। সমাজের যে স্তরের মানুষ এঁরা, তাকে ঠিক জনতা আখ্যা দেওয়া যায় না। বুদ্ধি না থাকলেও এঁদের যোদ্ধার-মুখোস পরবার সখ আছে। সবাই যে একেবারে সরকারী চাকুরে এবং রাজবন্দীর সঙ্গে আলাপের কাহিনী উপরওয়ালার কর্ণগোচর হলেই যে এঁদের চাকরি খতম হয়ে যাবে, তা নয়। রাজবন্দীকে এঁরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন, বোধ হয় এটাই নীতি এঁদের। ফলে, শুধু বসবার কেন, পা দু'টি সটান মেলে দিয়ে দিব্যি শোবার জায়গাও সহজেই মিলে যায়।

দারোগাটির নাম সতীশ জানা। আদি বাস মেদিনীপুরে। প্রায় বারো বছর এই বিভাগের চাকরি, একেবারে ডাইরেক্ট সাব-ইন্স্পেক্টার। ঢাকা শহরে এসেছেন মাত্র বছর দেড়েক। ঢাকা নাকি তাঁর খুব ভালো লেগেছে। মাছ দুধ যেমন সস্তা, তেমনি শাক-সব্জী। পরিবারের সবার স্বাস্থ্যই ফিরে গেছে।—গায়ে পড়ে এমনি আত্মপরিচয় অনেকখানি দিলেন সতীশ জানা। অবশেষে স্বহস্তে আমাদের সুজনী বিছিয়ে বালিশ পেতে দিয়ে দরদী আহ্বান জানালেন: শুয়েই পড়ুন আপনারা। পড়ন্ত বেলা হলেও মালপত্র গোছগাছের জন্যে দুপুরে হয়তো ঘুমোতেই পারেননি আজ, তাই না?—নিন্ একটু গড়িয়ে। নামতে হবে তো সেই রাত্রে।

জিজ্ঞেস করলাম : আচ্ছা, এমনি মাথা ঘুরিয়ে গ্রাস মুখে তোলা কেন বলতে পারেন ? গোয়ালন্দ হয়ে সোজা রাণাঘাট গিয়ে বহরমপুরের ট্রেণে না চেপে এমনি ঘুরপাক দিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি ? এর পশ্চাতেও কি যোগিনীবাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক না কি ?

সতীশবাবু মৃদু হাস্য করলেন, বললেন : সেনট্রাল আই-বি'র বন্দী আপনি, যোগিনীবাবুর নাগালের বাইরে। তাই স্বয়ং গ্র্যাসবি সাহেবের নির্দ্দেশ যে গোয়ালন্দ দিয়ে তাকে যেতেই দেবে না।

আর এঁরা ? এদের কী অপরাধ ? এঁরাও কি সেনট্রাল আই বি-র অতিথি ?

সতীশবাবু আবার হাস্য করলেন, বললেন : এক যাত্রায় পৃথক পথ কি হতে পারে ?

গোয়ালন্দ সম্বন্ধে পুলিশের এত আতঙ্ক কেন, বুঝতে পারলাম। বাড়ী থেকে মা'র চিঠি অবশ্য দু'দিন পূর্ব্বেও এসেছে, কিন্তু তাতে শ্রীপদর কোন কথা নেই। ষ্টীমার থেকে যে জরুরী চিঠি শ্রীপদর কাছে লিখেছিলাম, সেখানা তার হাত পর্য্যন্ত পৌঁছোল কি না কে জানে। গোয়ালন্দ থেকে যে সে আমারই সাথে গ্রামে এসেছিল, পুলিশ তা জেনেছে ; সুতরাং তার নামীয় চিঠিপত্র হস্তগত করা আই-বি'র পক্ষে স্বাভাবিক। ষ্টীমারের চিঠি শেষ পর্য্যন্ত গ্র্যাসবির হাতেই গিয়ে উঠলো না কি ? তাহলে তো আমার বালিশ এবার ওরা নিয়ে আসবে এবং টাটকা একটি ছ'ঘরা রিভলভার হস্তগত করবে। তাই করেছে কি ?...

নানা চিন্তায় মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সতীশবাবু বললেন : হ্যাঁ একটু কষ্ট হবে বৈ কি এ পথে। তা—নতুন দেশ দেখা তো হবে, কি বলেন ? কত কালের জন্যে যাচ্ছেন কে জানে। তাই যত বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যায়, ততই লাভ।—বাড়ীর চিঠি পেয়েছেন ?

আবার বাড়ীর চিঠি।—চমকে উঠলাম মনে মনে। মুখে বললাম : হ্যাঁ, তা পেয়েছি। মা খুব দুঃখ করে লিখেছেন যে, বুড়ো বয়সে আমিই তাঁকে দুঃখ দিলাম।

আপনারা ক' ভাই-বোন ?

সাত ভাই, একটি বোন। সবার ছোট, সাত ভাই চম্পার বোন পারুলের মত।

মর্ম্মাহত হলেন যেন সতীশ জানা : ওঃ, দেখুন তো একেবারে সাজানো সংসার। মা তো ঠিকই লিখেছেন। আর—কেনই-বা গেলেন এই হাঙ্গামায়, আমিও তাই ভাবি। দু'টো বোমা-রিভলভার দিয়ে কি দেশ স্বাধীন হয় কখনো ?

যা বলেছেন।—বলে বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এমনি অনাহূত আদর-আপ্যায়ন ও এমনি অযাচিত উপদেশের নিগূঢ় উদ্দেশ্য যে কী,

তা বোঝবার মতো কূটবুদ্ধি আমার হয়েছে। বোধ হয় একটু পর সতীশবাবু নিজেও সেটা উপলব্ধি করলেন, তাই অন্য কথা পাড়লেন: আপনার দাদারা বোধ হয় ভালো চাকরি করেন? সরকারি চাকরি আছে কারুর?—ওঃ, আলীপুরে জজের ওখানে ট্র্যানস্লেটর? চাকরিটি ভালো।

এমনি অনেক বাজে প্রশ্ন করলেন সতীশ জানা। আমি কোনোটা নিয়েই আলোচনা না তুলে সংক্ষেপে 'হুঁ' 'হাঁ' করে কাটিয়ে দিতে লাগলাম। একটু পর যেন তাও আর ভালো লাগলো না। জানালার সার্সি তুলে দিয়ে বাইরে যত দূর পারি দৃষ্টি প্রসারিত করে রইলাম।...হ্যাঁ, গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম ছুটে চলেছে। গাছপালা-সমাকীর্ণ ছায়া-শীতল গ্রাম। ঢেউ-খেলানো হরিৎ ক্ষেত-ঘেরা গ্রাম। নাম-না-জানা অসংখ্য পাখীর কল-কাকলিতে মুখরিত গ্রাম। সরল, অনভিজ্ঞ জেলে, চাষী ও দিনমজুরের গ্রাম। এমনি অসংখ্য গ্রামের তুলনাহীন বিচিত্র চিত্র চোখের সামনে ঝলসে উঠে উঠে সরে যাচ্ছে। এমনি গ্রামের বুক চিরে চিরে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাষ্পীয় যান।

...এমনিই একটি অখ্যাত গ্রামেরই ছেলে আমি। ভালোবেসেছিলাম আমার দেশকে, দেশের মাটিকে, দেশের অগণিত শোষিত বুভুক্ষুদের। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্ণ-সোপান ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলাম বাইরে, কঙ্করময় বন্ধুর পথে, পরদেশীকে বিতাড়িত করবার সুকঠিন ব্রত গ্রহণ করেছিলাম। দৃশ্যমান দুনিয়ায় প্রকাশ্য ভাবে চলছিল যে আপত্তি, যে অভিমান, তার ঢিমে তালের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেই পদক্ষেপ করেছিলাম ভূগর্ভস্থ অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে, সেখান থেকেই সুরু করেছিলাম প্রতিবাদের মৃদু গুঞ্জন, লোম্যান, হডসন, সিম্পসন, পেডি ও ষ্টীভেন্সের ওপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়ে জানিয়েছিলাম বিক্ষোভের অভিব্যক্তি।...কিন্তু তাই কি আমার অপরাধ? দেশকে ভালোবাসা কি অন্যায়? শাঠ্য ও জোচ্চুরি সম্বল করে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে যারা এই দেশটা দখল করে বসলো, এখানকার টাকা নিয়ে গিয়ে যারা লণ্ডনে নির্ম্মাণ করলো স্কাই-স্ক্রেপার, তারাই হল আমার দেশের সম্রাট, কোটি কোটি নর-নারীর ভাগ্যবিধাতা? গ্রামের শুষ্ক পুষ্করিণী, শূন্য গোলা আর ভগ্ন গোয়ালের সমাধির ওপর বসে যারা নীরোর মত বাজাবে বাঁশী, তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার থাকবে আমার দেশের সম্পদে, দেশের ঐশ্বর্য্যে, আর সর্ব্বহারা আমি সেই একটানা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অঙ্গুলি হেলনের পুরস্কার লাভ করবো কারাদণ্ড, দ্বীপান্তর, ফাঁসী?......

মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা নীরবে মেনে নিতে পারিনি বলেই আমার এই পুরস্কার।...এই তো চলেছে কামরা-ভর্ত্তি আরোহী, পথের এই ক্লেশ, এই ক্লান্তি গন্তব্য স্থলে পৌঁছোলে অপনোদিত হয়ে যাবে প্রিয়জনের সান্নিধ্যে, এই আশা বুকে নিয়ে। কিন্তু এদের মনের কোণে এক প্রবঞ্চিতের দীর্ঘশ্বাস কি এতটুকুও আলোড়ন সৃষ্টি করছে না? এক সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কুসুমাস্তীর্ণ পথে না এগিয়ে কেন এলাম এই কণ্টকাকীর্ণ পথহীন পথে, কারুর মনে কি

জাগছে না এই প্রশ্ন? ষ্টেশনে ষ্টেশনে চলছে নামা-ওঠা, যাত্রী, ফেরিওয়ালা, কুলি ও দর্শকদের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠছে প্লাটফর্ম, কিন্তু এদেরই চোখের ওপর দিয়ে চলেছে এক জন যুবক, স্বাধীনতা যার জীবনের ব্রত—এ সংবাদ কি তারা রাখে?

কী জানি কেন, বার বার মনে হতে লাগলো আমি রিক্ত, আমি অনাথ, আমি একক, এই দুনিয়ায় আপনার বলতে আমার কেউ নেই, দক্ষিণে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে যত দূর দৃষ্টি যায়, একটা ভয়াবহ শূন্যতা বুঝি খাঁ-খাঁ করছে।...

অকস্মাৎ সতীশবাবুর কথায় চমক ভাঙলো: দ্বিজেনবাবু, এই প্রথম অ্যারেষ্ট হলেন না কি?

রিভলবার চুরি সম্পর্কে গ্রেপ্তার ও মুক্তির কথা উল্লেখ করলাম। শুনে সতীশবাবু বললেন: দাগ যখন একবার লেগেছিল, তখন আর রেহাই পাবেন কি করে? যারা একেবারে নতুন, সবে আপনাদের খাতায় নাম লিখিয়েছে, তারাও এবার একটিও বাদ যায়নি।

চুপ করে থাকলাম। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে খুব সংযত হয়ে কথা কইতে হয়। বিশেষ করে আমার সম্বন্ধেই সতীশ জানার উৎসাহ ও আগ্রহ একটু বেশী মনে হলো। নরেনবাবু তাকিয়ে রয়েছেন জানালার বাইরে, হরিপদ পড়ছে পেঙ্গুইন সিরিজের কী একখানা বই, আর অমলবাবু কাৎ হয়ে শোবার মতো পোজ করে কী ভাবছেন আকাশ-পাতাল কে জানে।...

একটা ষ্টেশন এসে পড়লো। পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, পাঁউরুটিওয়ালা হেঁকে চলে যাবার পর এলো সোডা-লেমনেড আর এলো কলা ও কমলালেবু। জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়লাম।

সোডা কোথাকার? কত করে?

ফেরিওয়ালা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: আজ্ঞে নারায়ণগঞ্জের আসল মাল। দাম চোদ্দ পয়সা।

দু' বোতল নিলাম আর নিলাম এক ডজন কমলালেবু ও এক ডজন কলা। দামের জন্য ডাক দিলাম: সতীশবাবু।

বলুন।

মোট দাম হয়েছে পুরো এক টাকা। আর বোতল দু'টোর দাম কত দিতে হবে? আমি তো আর এখন দু' বোতলই খেয়ে ফেলছি না, নিয়ে যাবো।

সতীশ বাবু অসীম কুণ্ঠার সঙ্গে এক টাকা চার আনা বার করে দিলেন।

এ ব্যাপারে প্রচলিত বিধি ও তার ওপর চলনদার দারোগার ক্ষমতা যে কতখানি, তা আমার ভালো ভাবেই জানা ছিল। নিয়ম ছিল, আমাদের খাবার জন্য দৈনিক যে টাকা বরাদ্দ আছে, ট্রেনে বা ষ্টীমারে যাতায়াতের সময় পাওয়া যাবে তার দ্বিগুণ। তার পর বিন্দুমাত্রও অসুবিধার সৃষ্টি না করে এবং পথে কোন ক্রমেই কোনো বিতর্ক না করে রাজবন্দীকে গন্তব্য স্থানে ঠাণ্ডা মেজাজে নিয়ে যেতে হলে আরও কিছু প্রয়োজন হতে পারে বলে ভাউচার লিখে

দারোগার হাতে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। এরও পর [illegible] রাজবন্দীর পাল্লায় পড়লে পথে যাতে অর্থাভাবে কোনো অসুবিধায় না পড়তে হয়, তার জন্য কিছু টাকা দারোগার হাতে বিনা ভাউচারে তুলে দেওয়া হয়। তারও পর আছে : জরুরী কোনো অবস্থা দেখা দিলে দারোগার ক্ষমতা থাকে প্রয়োজন মত অর্থব্যয়ের। হেড কোয়ার্টারে ফিরে এসে বিল করলেই সে সমুদয় অর্থ ফিরে পাওয়া যায়।

আমরা এই ব্যবস্থার কথা জানি বলেই পথে বেরুলেই অকস্মাৎ আমরা এক দিকে একেবারে যেমন হয়ে উঠি পেটুক ও অমিতব্যয়ী, অপর দিকে হয়ে উঠি করুণার অবতার। যা খুশী তাই খাই, যা ভালো লাগে বা লাগে না, তাই কিনি, যাকে-তাকে যা-তা বিলিয়ে দিই আর ভিক্ষুক দেখলেই দু'-চার আনা তৎক্ষণাৎ দান করে বসি। কুলি চার আনা চাইলে আমরা আরো বখ্‌শিশ দিই আট আনা, যেখানে হেঁটে যাওয়া যায়, সেখানে যাই রিক্সায় আর যেখানে রিক্সা হলেই যথেষ্ট, সেখানে চেপে বসি ট্যাক্সিতে। একটি মাত্র আমাদের নীতি, সরকারী অর্থ যে ভাবে পারা যায় জনসাধারণের মাঝে বণ্টন।

পক্ষান্তরে, চলনদার দারোগা কৃপণের মত পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে রিপোর্ট দেয় এমনি দীর্ঘ এবং তাতে জরুরী অবস্থা দেখা দেবার ইতিবৃত্ত এমনি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করে কতকগুলি অনভিপ্রেত ব্যয়ের তালিকা জুড়ে দেয় যে, বিলগুলি তার অনায়াসে পাশ হয়ে যায় আর শ্রীমান বেশ একটা মোটা মুনাফা লাভ করে। ফলে, টানা-পোড়েন চলতে থাকে রাজবন্দী আর দারোগার মধ্যে।

ট্রেণের ঘণ্টা পড়ে গেল, এমন সময় প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক এক দল মহিলা ও শিশু এবং লটবহর সহ হুড়মুড় করে এসে উঠলেন। কতক মেঝের 'পরে, কতক বাঙ্কে ও কতক বেঞ্চির নীচে ফেলে রেখে তিনি "কেতনা দেগা" বলে বিতর্কে আহ্বান করলেন কুলীর দলকে। সুরু হলো দর-কষাকষি, তর্কাতর্কি, রাগারাগি, এবং অবশেষে ভদ্রলোক গায়ের ময়লা তেল-চিটচিটে র‍্যাপারখানা কোমরে কোটের ওপর জড়িয়ে নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে ঘোষণা করলেন : গভর্ণমেণ্ট আমলমে জুলুম? ছেলেখেলা মিলা হায়? আও, হাম ভি গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার (কনট্রাকটর) হায়। এক টাকাকে যাস্তি হাম এক আধলা নেহি দে গা। সাত হাত মাটি খুড়লে ভি একঠো পয়সা নেহি মিলতা। আট আনা সস্তা হায়? বলে তিনি কোটের আস্তিন গুটোতে গিয়ে বাহুর যে অংশটুকু অনাবৃত করলেন, সেটুকুতে চামড়া দিয়ে ঢাকা এক-একটা প্যাকাটি ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

ট্রেণের গতি দেখা গেল এবং এই জন্যই ভদ্রলোকের সাহস আরো বেড়ে গেল। তিনি আবার একাই কুলীর দলকে দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান জানালেন এবং আবারো উল্লেখ করতে ভুললেন না যে, তিনি গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার।

গভর্ণমেণ্ট নামেই তখন ভেলকি খেলতো, তার ওপর ট্রেণ প্রায় প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে এসে গেছে, তাই অগত্যা কুলীর দল রূপোর টাকাটাই ট্যাঁকে গুঁজে

লাফ দিয়ে পড়লো এবং ভদ্রলোক যুদ্ধজয়ী সেনাপতির মতো তাম্বুলরস-চর্চ্চিত বত্রিশখানা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললেন : দেখলি রেণু, বললাম না এক টাকার একটি পয়সা বেশী আমি দোব না।

চমকে উঠলাম। রেণু। কোন্ রেণু?

দেখলাম, সে রেণু নয়। এ শহরের রেণু। শহুরে আদব-কায়দায় ও আধুনিকতম পোষাক-পরিচ্ছদে এ রেণু একেবারে মূর্ত্তিমতী অজন্তার ছবি।

স্থানের অভাব ছিল পূর্ব্বেই। তার পর একেবারে এতগুলো লোক উঠে পড়াতে বেশ মুশকিল দেখা দিল। আমার সুজনী অনেকখানি গুটিয়ে ফেলতে হল, সঙ্গীরা শিয়রের বালিশ কোলে তুলে নিলেন, উল্টো দিকের বেঞ্চের শায়িত ভদ্রলোক উঠে বসলেন, কাউকে তাঁর অ্যাটাচি কেসটা বেঞ্চের নীচে নামিয়ে দিতে হল, এমনি ভাবে সমস্ত কামরায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে এখানে-ওখানে-সেখানে এক-এক করে জন বারো শিশু ও মহিলাদের বসিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক যখন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে পকেট থেকে পানের প্রকাণ্ড ডিবেটা বার করলেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম শহুরে রেণুর স্থান মিলেছে আমারই বিপরীত দিকের বেঞ্চে ঠিক আমার মুখোমুখি।

আধুনিকাকে এইবার ভালো ভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পাওয়া গেল। ফিনফিনে পাতলা ব্লাউজ, নীচের বাসন্তী রংয়ের বক্ষোবাসের প্রান্তরেখাগুলি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, রুখু চুলের দু'টো বেণীর একটি দোদুল্যমান পিঠের ওপর, অপরটি লম্বমান বুকের ওপর। রক্তরাঙা শাড়ীর আঁচলখানি আলগোছে গায়ের ওপর রাখা, কেয়ারফুলি কেয়ারলেসের মতো।

বসেই ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে তিনি গালের রুজ সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন।

এই রেণু সত্যিই সুন্দর, শরীরের গড়ন যেমন সুডৌল, তেমনি নিখুঁত। যৌবনের জোয়ারে ভরা নদীর মতো। যতই সময় কেটে যেতে লাগলো, ততই বুঝতে পারলাম ইনি কলকাতার কোনো কলেজের ছাত্রী এবং স্মার্ট। কথায়-বার্ত্তায়, হাসিতে হল্লাতে এই দলটি সমস্ত পথটাই বেশ প্রাণবন্ত ও হালকা করে রাখলো।

আমার কমলা ও কলাগুলো ছোটদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম যখন, তখন এদের সঙ্গে আমি বেশ জমিয়ে ফেলেছি। ছোটরা হাত পেতে নিলেও বড়রা একটু সংকোচ প্রকাশ করতে ভুললেন না, বিশেষ করে রেণু দেবী। বললেন : ও কি করলেন, ওদের সব দিয়ে দিলেন যে?

বললাম : তাতে কি আর হয়েছে। আমি আবার কিনে নোব।

বাঃ, বেশ তো। কিনে-রাখা জিনিষ এমনি করে বিলিয়ে দিয়ে আবার কিনবেন?—ও, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বড়লোক!

হাসলাম ও রহস্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না : তা বড়লোক তো নিশ্চয়ই, অন্ততঃ যতক্ষণ ট্রেণে থাকবো ততক্ষণ তো।

রেণু প্রশ্ন করলেন : মানে ?

জবাব দিলাম : মানে খুব কঠিন কিছু নয়। রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছি যে। তাই ব্যয়ের কোনো সীমা থাকতে পারে কি ?

বলে আড়চোখে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম, দারোগা সতীশবাবুর ঝিমোনো থেমে গেছে। তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাণাকড়ি ব্যয় সংক্ষেপ করবার জন্যে যে নীতি গ্রহণ করেছেন, আবার বুঝি আমি তাতে ঘা দিই, এই দুশ্চিন্তার কালো ছাপ স্পষ্ট তাঁর মুখমণ্ডলে দেখা গেল। কিন্তু রেণু আমার রহস্য ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন : রাজার আতিথ্য ?

হ্যাঁ।

বুঝতে পারলাম না।

জানি, বুঝতে পারবেন না তিনি। এই হচ্ছে শহুরে রেণুর সত্যিকার রূপ। সাতরঙা প্রজাপতির মত হাল্‌কা পাখনার ঘায়ে বাতাসে গ্লামোরাস তরঙ্গ সৃষ্টি করে আলগোছে ঘুরে বেড়ান এঁরা। সকাল-সন্ধ্যা কেটে যায় নিউ মার্কেটে আর প্রেক্ষাগৃহের ব্যালকনিতে পুরুষ-বন্ধুর পাশে-পাশে। বাইরের চলিষ্ণু দুনিয়া কোনও দিন অচল হয়ে ভেঙে পড়লেও এঁদের চেতনা আসবে না। সাড়ী, বাড়ী ও গাড়ীর মধ্যেই যারা পেয়েছে জীবনের প্রেয়কে, রাজবন্দীর অর্থ তারা জানবে কোত্থেকে ?...

এই যে আমার সম্মুখে এক মোহময় ভঙ্গীতে শরীর এগিয়ে দিয়ে বসে আছেন, ইঙ্গিতে, ইসারায় ও হস্ত-সঞ্চালনে সমস্ত কামরাখানির মধ্যে সৃষ্টি করে তুলেছেন বিভ্রান্তিকর আবহাওয়া, অন্তরঙ্গতায় যিনি একেবারে উচ্ছল ও উদ্বেল হয়ে উঠেছেন—নিশ্চিত জানি রাণাঘাটে আমাদের ছেড়ে ইনি যখন কলকাতাগামী ট্রেণে উঠে বসবেন, তখন থেকেই আর আমার কথা মনে পড়বে না এঁর।

তথাপি, রাজবন্দীরাও যে তাঁর আপাতমধুর সখ্যতার মোহবন্ধনে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজী নয়, সে পরিচয়টা ভালো করে দেবার জন্যেই আমার সত্যকার পরিচয় দিলাম। শুনে প্রথমটা তিনি জানালেন অসীম সহানুভূতি, সমগ্র রাজবন্দীর জন্যই যেন তাঁর কোমল হৃদয়ে দরদ একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, তার পর অকস্মাৎ যেন তাঁর উৎসাহে, স্মার্টনেসে ও অকুণ্ঠ আচরণে বিবর্ণতা দেখা গেল। অবশ্য একেবারেই যে নীরব হয়ে গেলেন, তা নয়, তবুও তৈলহীন প্রদীপের মতো টিম্‌-টিম্‌ করতে লাগলেন। বক্রদৃষ্টিতে দেখলেন গাড়োয়ালী সেনাদলকে, তাদের বন্দুকগুলো ও বেয়নেটগুলোকে এবং বার বারই অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাঁর সাদা পোষাক-পরা দারোগাটিকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

বেশ বোঝা গেল এবার রঙিন ফানুষ ফেটে গেছে, চুপষে একখণ্ড নগণ্য কাগজ হয়ে নীচে নেমে এসে তা ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়েছে। পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেলেও আর তা আকাশে ওড়বার স্বপ্ন দেখবে না।......

সন্ধ্যার পর ফুলছুরি ঘাটে ষ্টীমারে চড়তে হল। লটবহর গোটা তিনেক

কুলীর মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সতীশ জানা ও গাড়োয়ালী সেনাসহ আমরা চার জন একেবারে শোভাযাত্রা করে এসে দোতলায় উঠলাম। ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে ওপারে তিস্তামুখ ঘাটে পৌঁছে আবার ট্রেণে চাপতে হবে।

পদ্মানদীর ষ্টীমারের সঙ্গে এই ষ্টীমারের তুলনাই হয় না। এর আয়তন শুধু ক্ষুদ্র নয়, এর আকারও অত্যন্ত গেঁয়ো। একেবারেই আভিজাত্য নেই। এর প্রপেলর দু'টি যেমন বেমানান ভাবে বৃহৎ, তেমনি এ দু'টি আঁটা রয়েছে একেবারে পশ্চাৎ ভাগে। সেখানে যে সব কলকব্জা এ দু'টিকে চালিত করে, যেমন নেই তাদের জাঁকজমক, তেমনি নেই তাদের ফুসফুসের জোর। যক্ষ্মা-রোগীর খুক্-খুক্ করে কাসির মতো ঝুক্-ঝুক্ শব্দ হচ্ছে সেখানে আর বিস্তর ষ্টীমের প্রশ্বাস বেরিয়ে এসে প্রমাণিত করছে যে আয়ু বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নেই। ষ্টীমারের দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিন গুণ হবে। একখানা ভারী ও অচল ফ্লাটের সঙ্গে দু'খানা চাকা জুড়ে দিলে যা দাঁড়ায়, তাই।

দোতলায় সম্মুখ ভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন এবং তার পশ্চাতেই ইণ্টার ক্লাশের যাত্রীদের জন্যে খানকতক বেঞ্চ বিছানো।

এবার আর সুজনী পাতা হল না, কারণ ওপারে পৌঁছতে অল্প সময় লাগবে। তার পরই আবার ট্রেণ। রেণু দেবী যতই ভড়কে গিয়ে থাকুন, এবার তিনি হয় ভুল করে কিংবা কেয়ারফুলি কেয়ারলেসের মতো একেবারে আমার পাশেই বসে পড়লেন। স্তিমিত বৈদ্যুতিক আলোকে তাঁর মুখের চেহারা স্পষ্ট ঠাহর করতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গীরা সবাই একটু লাজুক ধরণের, স্বল্পভাষী। আমার কিন্তু এই পরিবারের সঙ্গে পথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সতীশবাবুর কালো মুখে আরও কয়েক পোঁচ কালি লেপন করে বার তিনেক আরও কমলা, আপেল ও আঙুর কিনে ছোটদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি এবং হাজারো আপত্তি সত্বেও এবার রেণুর হাতে জোর করে খান কয়েক ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট গুঁজে দিতে আর সংকোচ বোধ হল না।

তার পর বেলফুলের কুঁড়ির মতো দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে কুট্-কুট্ করে বিস্কুট ভাঙতে ভাঙতে রেণুর সঙ্গে যে কথা হল হুবহু তা লিখে দিচ্ছি :—

রাণাঘাটে পৌঁছে আপনি অপেক্ষা করবেন বহরমপুর ট্রেণের জন্যে আর আমরা তো সোজা চলে যাবো কলকাতায়। আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে, তাই না দ্বিজেনবাবু?

বললাম: হবে না বলতে পারি না। কিন্তু সে যে কবে, আজ থেকে কত বছর পরে, নিশ্চয় করে তা বলা যায় না;

ফস্ করে প্রশ্ন এল: ভুলে যাবেন তো একেবারে? কিংবা মনে থাকলেও থাকবে অভদ্র মেয়ে হিসাবে—চেয়ে-চেয়ে বিস্কুট খায়, লেমনেড খায়, খাওয়ায় না একটি পয়সারও—এই তো?

হেসে জবাব দিলাম: আমি খাওয়াইনি একটি পয়সারও। যা খেলে, প্রকৃত পক্ষে তা খাওয়ালেন মহামান্য সরকার বাহাদুর। কিন্তু আমি ভাবছি, এমনি যেচে

খাওয়াতে খাওয়াতে হঠাৎ আবার একদিন আতিথ্য গ্রহণেরই না আমন্ত্রণ এসে যায় আমারই মত। তখন চোখের জলে বান ডাকবে তো?

জেলে নিয়ে গিয়ে না কি খুব অত্যাচার করে?—প্রশ্ন করলো রেণু। বললাম: আমার চেহারা কি অত্যাচারিতের চেহারা?

রেণু আমার পানে চেয়ে মুচকি হাসলো, বললো: না, তা মনে হচ্ছে না তো। বরং—

বরং মনে হচ্ছে বাদসাহী অট্টালিকা আর নবাবী খানা ছেড়ে চলেছেন রাজার অতিথি হয়তো কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানে আনন্দ-সফরে, তাই না?—বলে হেসে উঠলাম। রেণুও হেসে উঠলো হি-হি করে।

ষ্টীমারের রেষ্টুরেণ্ট থেকে বয় এসে দু'কাপ চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপে মুখ দিয়ে একবার সতীশবাবুর পানে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। পাছে চায়ের সঙ্গে কেক বা মামলেট চেয়ে বসে আবার খরচান্ত করি তাঁকে, তাই তিনি র‍্যাপারখানা খুব ভালো করে জড়িয়ে শম্বুকের মতো একপেশে হয়ে বসেছিলেন অন্ধকার নদীর পানে চেয়ে। একুশ-বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছোকরার সঙ্গে আঠারো বছরের পেখম-তোলা কলেজী মেয়ের ঘনিষ্ঠ আলাপ সেই মামুলী মন দেয়া-নেয়ার পথেই তো চলবে, তাও তো মাত্র রাণাঘাট পর্য্যন্ত।—সুতরাং ঠাণ্ডার প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ করাই সতীশবাবু যুক্তিযুক্ত মনে করছেন দেখা গেল।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমার সহবন্দীরা সবাই একটু লাজুক ধরণের। তারপর এমনি পেখম-তোলা ময়ূরের মোহনীয় স্মার্টনেসের সমুখে তাঁরা যে শিকড় দেখে সাপের মতো কুঁকড়ে গেছেন, তা বেশ বুঝতে পারলাম।

রেণুর বাবা আবার চা-ওয়ালার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়েছেন। জলের মতো চা, এর দাম কখনো চার পয়সা হতে পারে? সুতরাং "গভর্ণমেণ্ট কণ্টাগ্‌দার" পুনরায় চা-ওয়ালাকেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন। তবে এবার আর জামার আস্তিন গুটোতে পারলেন না, র‍্যাপারটাও গায়েই রাখলেন জড়িয়ে। শীত যে। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়া যে গায়ে বিঁধছে। দেখলাম, পানের ডিবে তাঁর হাতে এবং একটু পর-পরই দু'খিলি করে তুলে মুখে পুরছেন।

এই তো সুযোগ। বন্দীনিবাসে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্তে প্রবেশের পূর্ব্বে রেখে যাই না একটি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে বাইরে পথের ধারে। কে বলতে পারে উত্তরকালে এই স্ফুলিঙ্গই সৃষ্টি করবে না এক সর্ব্বনাশা হব্যবাহন?...

চা খেতে খেতে অনেক কথা হল। দু'জনের মাঝখানকার হাল্‌কা লঘু পরদা কখন্ যে উড়ে গিয়ে গাম্ভীর্য্যের মতো একটা থমথমে ভাব এসে গেছে, দু'জনেই যেন তা টেরও পাইনি। রেণু জিজ্ঞেস করলো: কি করতে পারি আমি আর কেমন করে পারি?

বলতে লাগলাম: শান্তি, সুনীতি আর বীণা তোমারই মত মেয়ে। তারা কি করতে পেরেছে? তারা যা পেরেছে, তুমিও তা পারবে না কেন?

রাজপুত মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ করতেন তলওয়ার চালিয়ে। আর তুমি পারবে না ভ্যানিটি ব্যাগ ছেড়ে রিভলভার তুলে নিতে ?

কোথায় পাবো ? কাকে আমি চিনি ? কে আমায় চিনিয়ে দেবে ? পর পর প্রশ্ন করলো রেণু।

হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করে নিয়ে এলাম রেলিংয়ের-ধারে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। তার পর বললাম : আমি তোমায় চিনিয়ে দোব। তোমায় একটা নাম ও ঠিকানা দিচ্ছি। রাত দশটার পর একে বাড়ীতে পাবে। আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলবে "হলদে ফুল" তোমায় পাঠিয়েছে। তাহলেই হবে।

হলদে ফুল ?

হ্যাঁ, ওটাই আমার সাংকেতিক নাম। পার্টির লোক ছাড়া কেউ জানে না— বলে নীচে নদীর দিকে রেণুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম : দেখছো কী অন্ধকার। এমনি অন্ধকার আমাদের ভবিষ্যৎ। কোনো উজ্জ্বল প্রভাতের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না তোমায়। কাজই আমাদের জীবন। এরই চাকার নীচে নিজেকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই আমাদের আদর্শ।

রেণু কি বলতে যাচ্ছিল, আমার কণ্ঠস্বরে তখন আবেগ এসে গেছে : কবে আমি বেরিয়ে আসবো জানি না। কিন্তু তবু বন্দীনিবাসে বসে বসে তোমার কথা ভাববো, ভাই জেলে গেলেও বোন রয়েছে বাইরে—এই হবে আমার সান্ত্বনা। পারবে না তুমি আমাদের ব্রত গ্রহণ করতে ? দেশকে স্বাধীন করবার কাজে পারবে না নিজেকে বিলিয়ে দিতে ? কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে, আত্মীয়জনের মধ্যে পারবে না এই অগ্নিমন্ত্র প্রচার করতে ?

অকস্মাৎ অনুভব করলাম হাতের ওপর স্পর্শ। আমার রেলিংয়ের ওপর রাখা হাতে রেণুর তপ্ত হাত এসে ঠেকেছে। বুঝতে পারা গেল শহুরে রেণুর বুকেও জ্বালিয়ে দিয়েছি বিপ্লবের আগুন। এবার অত্যাচারীকে পুড়িয়ে মারবে সেই আগুনের শিখা।...উদ্দীপনায় যেন একেবারে ফেটে পড়তে লাগলাম : ক্ষুদিরাম কানাইলাল থেকে সুরু করে বিনয়-বাদল-দীনেশ পর্য্যন্ত বাংলার অগণিত শহিদেরা যে পথের নিশানা দিয়ে গেছেন, সেই আমাদের পথ রেণু! সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতকে স্বাধীন করাই আমাদের লক্ষ্য। যে কোনো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটাই বার বার করে মনে ঘা দেয় যে, আবেদন-নিবেদনে করুণা পাওয়া যেতে পারে, স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। চেয়ে দেখ ফ্রান্সের দিকে, চেয়ে দেখ রাশিয়ার দিকে, আয়ারল্যাণ্ডের দিকে চেয়ে দেখ—

অকস্মাৎ বাধা পেলাম। আমার হাতখানা সস্নেহে হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে হঠাৎ রেণু বলে উঠলো : বা:, আপনার আংটিটি তো ভারী সুন্দর। কী বলে একে, নীলা ? ইস্, কি চকচক করছে। কতটুকু সোনা দিয়ে তৈরা ?ওজনবা ? আমিও এমনি তৈরী করাবো একটা। দিন্ না একটুখানি, বাবাকে দেখিয়ে আনি।

একবারে চুপ করে গেলাম। নিশ্বাসও বুঝি বন্ধ হয়ে এল।······মুক্তো ছড়াচ্ছিলাম কোথায়? কার গলায় পরাচ্ছিলাম মুক্তোর মালা? কাকে দিচ্ছিলাম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা? এ যে শহুরে রেণু......গ্রামের রেণু আমি চলে আসাতে খুশী মনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পারেনি, পত্রালাপ বন্ধ থাকলেও জানি আজও যেমন তার মনের গহনে আমার স্মৃতি ফুলের মত ফুটে রয়েছে, অপরিম্লান পারিজাতের মতই তা চিরদিন বিকীর্ণ করবে সৌন্দর্য ও সুগন্ধ।···

আর এ শহুরে রেণু। বাতাসে তুলে চলে এরা কড়া এসেন্সের হিল্লোল, এরা হিসেব করে কথা কয়, ওজন করে হাসে, এদের প্রতিটি নিমেষ সীমাহীন ভদ্রতায় নিখুঁত। এদের শালীনতা ও শোভনতার পালিশে দাগ ধরে না, পাশ কাটিয়ে এরা এসে দাঁড়ায় আদর্শবাদীর মুখোমুখি, গায়ে গা ঠেকিয়ে। আকাশের রামধনুর মতোই এদের ভালবাসা। দীপ্তিময়, কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর দূর থেকে দেখতে ভালো লাগে এদের, কাছে এলেই কাঠামোর নোংরা কাঠ আর নীরস খড় বিশ্রী ভাবে চোখে ঠেকে।···

বিপ্লবীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তৈরী করে যেতে চেয়েছিলাম ভেরা ফিগনার, কিন্তু দেখলাম রেণু বেলোয়ারী কাচের পুতুল ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ওপরে চেয়ে দেখলাম মিশমিশে কালো আকাশ, তাতে অসংখ্য তারার মিটমিটে প্রদীপ। আর নীচে, ষ্টীমারের স্বল্পালোকে নদীর যেটুকু দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে, তা মৃত্যুর স্তিমিত হাসির মতই ভয়াবহ মনে হচ্ছে। তার বাইরে ঠাণ্ডা, মৃত অন্ধকার, অনেক কালের বাসি মড়ার মতোই ভারী ও স্যাঁৎসেতে।...

হলদে ফুলের সাংকেতিক শব্দ ওকে বলে দিয়ে আমিই চোখে হলদে ফুল দেখতে লাগলাম।···

এগারো

বহরমপুর বন্দীনিবাসের লৌহদ্বারে আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা দশটা হবে।

লোহার শিকওয়ালা প্রকাণ্ড গেটখানা এক পাশে সরে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। গেটের পর অফিস। মালপত্র এসে জমা হল অফিসে। তল্লাসী হবে। তার পর আসল বন্দীশিবিরের দ্বার খুলবে।

গোটা কয়েক সিপাই এসে সুরু করলো তল্লাসী। নামমাত্র। না করে উপায় নেই। কারণ ঐ নীরেট মগজে কী করে ঢুকবে যে, টুথ পেষ্টের টিউবের মধ্যে, সাবানের দেহাভ্যন্তরে অথবা কোটের লাইনিং-এর মধ্যে আমরা গোপনীয় পত্র বহন করে থাকি?

তাই তল্লাসী শেষ হয়ে গেল। এবার গুরুতর বিষয়, বাসস্থান নির্ব্বাচন। বাংলার বিপ্লবীরা তখন প্রথমত: মোটামুটি দু'টি দলে বিভক্ত ছিল—অনুশীলন ও যুগান্তর। তারপর ছিল ঐ এক-একটি দলের মধ্যেই বৃহৎ উপদল, হয়তো গোটা জেলা বা মহকুমা জুড়ে। আবার একটি ক্ষুদ্র শহরেই হয়তো এমনি গোটা কয়েক উপদল ছিল, পরস্পরবিরোধী। তার পর ছিল এমনি উপদলে গোটা কয়েক গ্রুপ—অমুক রায়ের গ্রুপ, তমুক দাসের গ্রুপ ইত্যাদি। এই গ্রুপ-লীডাররা অনেকটা সেনাবাহিনীর সেকশন কমাণ্ডারের মতো। হয়তো মাত্র দশ-বারো জনই তাঁর দলের সভ্য। তাহলেও তাঁর হাঁক-ডাক কম নয়। বাংলার বিপ্লব আন্দোলন যেন তাঁর দ্বারস্থ না হলে একেবারে মিইয়ে পড়ে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে, এমনি তাঁর ভাবখানা। এই গ্রুপ-বিভাগের পরও আছে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব, পছন্দ ও নির্ব্বাচন।

কর্ত্তৃপক্ষ বন্দীদের খুশী মত সীট নির্ব্বাচনের যে অধিকার দান করেছিলেন বন্দীরা পূর্ণ ভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করে সমগ্র শিবিরটাই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে সংখ্যাভিত্ত অঞ্চলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। তাই অফিসের কেরাণীরাও জানেন যে, এঁদের দল, উপদল, গ্রুপ-লীডার, আঞ্চলিক সখ্যতা ব্যক্তিগত পছন্দ প্রভৃতি বহু বিষয় আছে, যা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তবে এঁরা সীট মনোনয়ন করেন। কোন্ বন্দী কোন্ দলভুক্ত কিংবা ইস্টার্ণ ব্যারাকের তেরো নম্বর কক্ষের বাসিন্দারা কোন্ উপদলের সভ্য, এঁরা তা বেশ জানেন ও তাই নিয়ে পরিহাস করবার সুযোগ পেলে ছাড়েন না।

প্রধান কেরাণী প্রশ্ন করলেন: আপনি কোন্ ব্যারাকে ও কোন্ ঘরে থাকতে চান?

মানে?—বিস্মিত হলাম: খুশী মত সীট নেয়া যেতে পারে তাহলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে কেরাণী বলে যেতে লাগলেন: ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাক, ইস্টার্ণ ব্যারাক আর সাদার্ণ ব্যারাকে থাকেন যুগান্তর দলের বন্দীরা আর টালি

শেডগুলোতে থাকেন অনুশীলনের সভ্যরা। আপনারা কি টালি শেডে যাবেন, না—

বললাম : ব্যারাকে যাবো। তবে কোন্ ব্যারাকের কোন্ ঘরে সেটা ভেতরে গিয়ে দেখে আপনাদের খবর পাঠিয়ে দোব, কেমন ?

সে সময় রাজবন্দীদের মধ্যে দলীয় বা উপদলীয় চেতনা অত্যন্ত তীব্র ছিল। নতুন কেউ এলেই সাগ্রহে লক্ষ্য করা হতো তিনি কোন্ দলের, কার পরিচিত এবং কোথায় সীট নিলেন। তার পর মুহূর্তের মধ্যেই সেই সংবাদ সমগ্র শিবিরে প্রচারিত হয়ে যেত মুখে মুখে যে, আজ অমুক দলের অমুক গ্রুপের এক জন এসেছে। প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিত বন্দীরা ঝটিতি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান এবং যেই তাঁদের মধ্যে এক জন এসে কাঁধে হাত দিয়ে অন্যান্য সবাইকে পশ্চাতে ফেলে নবাগত কাউকে নিয়ে শিবিরের অভ্যন্তরে চলে যান, তখনই তার পরিচয় জানা যায়। পরিচিত কাউকে না পেলে তখন ভারী হাঙ্গামে পড়তে হতো, কারণ সবাই সন্দেহ সুরু করতো তাকে। সে আখ্যা পেত দিবাকর সেনগুপ্ত অর্থাৎ স্পাই রাজবন্দী নামে।

বন্দীশিবিরের ভেতরের দরজা খুলে যেতেই আমরা চার জন প্রবেশ করলাম এবং পরিচিতেরা এসে ছোঁ মেরে এক-এক জনকে নিয়ে অদৃশ্য হতে লাগলেন। আশ্চর্য্য, আমায় এসে পাকড়াও করলেন নারায়ণগঞ্জের অনুশীলনের রিভল্ট (বিদ্রোহী) গ্রুপের লীডার সুধীর চট্টোপাধ্যায়। আমার সঠিক পরিচয় তাঁর যথেষ্ট জানা ছিল আর ঢাকা জেলে একসঙ্গেই তো ছিলাম গত দু'মাস। এগিয়ে এলেন তিনি তাঁর দলীয় ঢাকা জেলের দু'টি একটি ছেলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। কাঁধেও একখানা হাত রাখলেন এবং সন্তর্পণে বেশ একটু এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে আলাপ সুরু করলেন। ফল দাঁড়ালো এই যে, নেহাৎ ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ব্যতীত সারা শিবিরের প্রায় তিনশো বন্দী সেদিন সেই সকালে স্থির ভাবে জেনে নিলেন যে, আমি অনুশীলনের লোক, নারায়ণগঞ্জের রিভল্ট গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

যুগান্তর দলের নানা দল, উপদল ও গ্রুপের সদস্যেরা মুখ অন্ধকার করে যার যার কক্ষে ফিরে এলেন।

এদের ভুল অবশ্য ভাঙলো সেদিনই দুপুরে ভোজন-কক্ষে।

বারো

বন্দীশিবিরে চেনা ও জানা লোকের যে খুব অভাব ছিল, তা নয়। তবুও, সেকালে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির কর্মীরা সর্বাগ্রে শিক্ষা গ্রহণ করতো গোপনতার এবং প্রতি ক্ষেত্রে সে শিক্ষা সাধ্যমত কার্যে প্রয়োগ করতে ভুলতো না। তাই, প্রথম দিনেই একেবারে কোন্ নির্দিষ্ট ব্যারাকের কোন্ বিশেষ সীটটি পেলে আমি বাধিত হই, অফিসে সে কথা প্রকাশ না করে শুধু বলেছিলাম টালির ব্যারাকগুলি বাদ দিতে। দেখা গেল, আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে ইসটার্ণ ব্যারাকের চার নম্বর ঘরে।

সুধীরবাবুকে ছেড়ে দিয়ে আমার ঘরে এসে বসতেই অনুশীলনের যাঁরা দলবৃদ্ধির পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন, তাঁদের মুখাবয়বের ঔজ্জ্বল্য চকিতে মিলিয়ে গেল শরতের হালকা মেঘের মতো। তার পরই 'লবি' আলোচনা ও গবেষণা সুরু হয়ে গেল যুগান্তর দলের সংখ্যাতীত উপদল ও গ্রুপের মধ্যে : লোকটি কোন্ গ্রুপের হে ?

বারান্দায় এঁদের অনেককেই আনাগোনা করতে দেখলাম। আমার দিকে একটা অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁরা সরে যেতে লাগলেন এবং ঘুরে এলেন আবার। কী যে এঁদের নীরব প্রশ্ন, স্পষ্ট তা বুঝতে পারলেও চুপ থেকে একটা সাসপেন্স সৃষ্টি করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

এঁদের মধ্যে দু'-এক জন হয়তো সাহসে ভর করে ঘরে ঢুকে পড়লেন এবং এগিয়ে এলেন পাশের সীটের বাসিন্দার কাছে, একটু ইতস্তত: করে, টেবিলের ওপরকার এটা-ওটা-সেটা বৃথাই নাড়াচাড়া করে নিরর্থক কয়েকটা মিনিট নষ্ট করে আবার আমার প্রতি একটা জ্বালাময়ী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি হেনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন গুটি-গুটি করে। এরই মধ্যে দু:সাহসী এক জন হয়তো একেবারে প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে এলেন আমার কাছেই। কিন্তু সোজা-সুজি প্রশ্ন করতে পারলেন না : আপনি ঢাকা জেল থেকে আসছেন ?

জবাব দিলাম।

নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকে চিনতেন না ?

পাল্টা প্রশ্নে উত্তর দিলাম : বরিশাল শঙ্কর মঠের তো ? নিশ্চয়ই চিনতাম। আর কাকেই বা না চিনতাম। মাত্র তো শ' দেড়েক বন্দী। কারুর কাছে কি কেউ অচেনা বা অপরিচিত থাকতে পারেন ?

তা তো বটে, তা তো বটেই।—বলে প্রশ্নকারী সন্দেহ নিরসনের জন্যে আবার প্রশ্ন করলেন : ধীরেন সোমকে ?

হেসে বললাম : সবাইকেই চিনি। অনুশীলনের চারু রায়কেও চিনি, আবার মাদারীপুরের পুষ্প চাটার্জ্জীকেও চিনি। বিশেষ করে, ঢাকা জেলের তখ্কণ সমিতি দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে।

তক্ষণ সমিতির প্রসঙ্গ আসতেই স্বভাবতঃই তার বিবরণ খানিকটে দিতে হলো এবং কিচেন ম্যানেজারের সঙ্গে জীবনব্যাপী মহাসংগ্রামে সর্ব্বত্র জয়লাভ করে কোন্ ওয়াটারলু রণক্ষেত্রে আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটে, তাও বিবৃত করলাম। অবশেষে করলাম পাল্টা প্রশ্ন : কমেট মানে শশাঙ্ক দাশগুপ্ত কোন্ ঘরে আছেন বলতে পারেন ?

ও—শশাঙ্কবাবু! হ্যাঁ, হ্যা, খুব পারি। চলুন না, নিয়ে যাই আপনাকে ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের চৌদ্দ নম্বরে।—আসুন।

আহ্লাদে ভদ্রলোক অকস্মাৎ ডগমগ হয়ে উঠলেন এবং উৎসাহের আতিশয্যে আমায় সাহায্য করবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর অত্যুগ্র আগ্রহের আগুনে জল ঢেলে দিয়ে আমি বলে ফেললাম : থাক্, পরে ত দেখা হবেই।

কিন্তু তিনি শেষ চেষ্টা করলেন : তাঁকে ডেকে আনবো ?

না, থাক।—বলে আমি এই প্রসঙ্গের ওপর যবনিকা টেনে দিলাম। মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোক চোখে-মুখে খুশীর মশাল জেলে নিয়ে হন-হন করে বেরিয়ে চলে গেলেন। মনে হলো যেন বাহিরে গিয়ে সমগ্র বিশ্বকে আহ্বান করে উদাত্ত কণ্ঠে এই মহাবাণীই ছড়িয়ে দেবেন যে, অনুশীলন অথবা যুগান্তরের রিভোল্ট দল নয়, রংপুর বা দিনাজপুরের ভ্যাবাগঙ্গারাম গ্রুপের নয়, সতীশ রায়ের সাড়ে তিন জনের পাকানো দল, এমন কি, মুখচোরা কমিউনিষ্টও নয়, একেবারে খোদ বি-ভি...

ঘণ্টা খানেক পর খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং যতীশ গুহ, কমেট, মনোরঞ্জন, নীতিশ প্রভৃতির পাশেই বসলাম আসনে। ব্যস্, এবার ললাটে টীকা লাগানো হয়ে গেল এবং সর্ব্বপ্রকার গবেষণা ও আলোচনার ঘটলো পরিসমাপ্তি।

রাত দশটা পনেরো মিনিটে ঘর বন্ধ হয়ে গেলে আমার পাশের ছেলেটির পানে দৃষ্টিক্ষেপের অবসর পেলাম। ওর দাদার বয়সী তো আমি নিশ্চয়ই, কারণ অমরের বয়েস পনেরো- বোলোর বেশী হবে কি না সন্দেহ। চেহারায় বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নেই, তথাপি হঠাৎ একবার চাইলে আবার চাইতে ইচ্ছে করে। মুখাবয়বের কোথায় যেন কী-একটা আছে লেপটে, চোখের মণিতে তার প্রতিবিম্ব হঠাৎ ঝক্-ঝক্ করে ওঠে।

গ্যাটাপারচারের ফ্রেমে-আঁটা পুরু কাচের চশমা, তার পশ্চাতে এক জোড়া রহস্যময় চক্ষু। অন্যমনস্কতার ছাপ তাতে লেগে রয়েছে মনে করলে ভুল করা হবে। সে চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়, অথচ তাতে বুদ্ধির চোখ-ঝলসানো প্রখরতা নেই, অনেকটা উদাসীন দার্শনিকের মতো। এ্যাটম বা মলিকিউলের প্রতি দৃষ্টি যার সীমাহীন সজাগ অন্ধকার রাতে পাহারাওয়ালার লণ্ঠনের মতো, অথচ ব্যবহারিক জীবনের এলোপাথাড়ি পাগলা হাওয়ায় যার শিখা অনুক্ষণ

কেঁপে-কেঁপে ওঠে আত্মরক্ষার দাপাদাপিতে। সব্যসাচীর মতো সে পাখীর চক্ষুটিকেই শুধু দেখতে পায়, পারিপার্শ্বিক তার কাছে বিবর্ণ ও মূল্যহীন।

আলাপে জানা গেল, উড়িষ্যায় কেন্দ্রাপাড়ায় তার আদি বাড়ী। মেদিনীপুরে আই-এ ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েছিল। কর্ণেল পেডি নিহত হবার পর আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও গ্রেপ্তার করে কয়েক মাস হাজতে রাখা হয় ও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। মিছামিছি আবার রাজবন্দী করে পাঠিয়ে দিয়েছে বহরমপুরে।...এমনি আকুতিভরা কণ্ঠে নিরীহ বেচারা মন্তব্য করলো যে, আশঙ্কা হলো অমরের চোখের পাতা বুঝি সিক্ত হয়ে উঠেছে।

সমরেন্দ্র পাল আমার অন্যতম রুম-মেট। সদালাপী, মিষ্টভাষী ও অত্যন্ত স্মার্ট। বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক শিক্ষা বাহিনীর তিনি ছিলেন অন্যতম সেকসন কমাণ্ডার। রাইফেলের নিশানায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। কলকাতার মার্জ্জিত ভাষায় কথা বলবার শত চেষ্টা করলেও জিহ্বার প্রহরা ব্যর্থ করে দিয়ে বেরিয়ে আসে মাঝে মাঝে খাস কুমিল্লার সুর। শ্রোতা হেসে উঠলে তিনিও হাসেন। ভারী সরল।

কুমিল্লার হিমাংশু ভট্টাচার্য্যও আছেন। সেখানকার জনৈক গ্রুপ-লীডার। কার্ত্তিকের মতো অত্যন্ত ঘন ও কুঞ্চিত চুল, চওড়া অথচ অত্যন্ত বেঁটে প্রায় হিটলারের মত এক জোড়া গোঁফ। পাতলা শুষ্ক তেজপাতার মতো দেহ আর তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি। যুক্তি প্রদর্শনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার বলে একাধিক বার প্রমাণিত হয়েছে সংবাদ পাওয়া গেল।

প্রথম রাত্রির কথা আজো মনে পড়ে। হরিমোহন এসে মশারি গুঁজে দিয়ে গেলে আমি লেপখানা মাথার ওপর টেনে দিলাম। কিন্তু ঘুম কোথায়? দূরে কোথায় ঘণ্টা বেজে চললো: বারোটা, একটা, দু'টো।...পরিচিতদের সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপে এবং অপরিচিতদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ে অনেকখানি সময়ক্ষেপ হলেও সে তো দিনের বেলা। রাত্রে এসে তো বন্ধুরা তেমন ভিড় কিছু করেনি। এমনি স্তিমিত অন্ধকারে। চোখ মেলে চেয়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা না-কাটিয়ে বাড়ীতে মার কাছে চিঠি লিখলেও তো চলতো?

কিন্তু লিখবার সরঞ্জাম থাকলেই তো লেখা হয় না, লিখবার জন্য চাই মন। আমার একেবারেই মন ছিল না। বহরমপুরে এসেই যেন সে-মন হারিয়ে ফেলেছি। ঢাকা জেলে থাকতে অত্যন্ত যুক্তিহীন হলেও তবুও একটা ক্ষীণ আশার আলো-রেখা মাঝে মাঝে মনের কোণে ঝিলিক মেরে যেত: হয়তো অকস্মাৎ এক প্রভাতে আসবে আমার মুক্তির সংবাদ। প্রতিদিনের প্রভাত ব্যর্থ প্রত্যাশায় পাণ্ডুর হয়ে উঠলেও আগামী দিনের অনিশ্চয়তা আবার খানিকটে কৌতুহল করে তুললো। কন্‌ফারমড্ হয়ে যাবার পরও মনে হয়েছে, তবু তো রয়েছি ঢাকা জেলে; আমার গ্রামের আট মাইলের মধ্যেই। দেয়ালের ওপর দিয়ে ঐ লাইট-পোষ্টগুলো, দেখা যাচ্ছে, ওরই নীচেকার রাস্তা দিয়ে কত বার

যাতায়াত করেছি নিঝুম রাতে শহরের খোয়া-ঢালা রাস্তায় পাড়া কাঁপিয়ে যে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী ছুটে চলে, তার বিশ্রী শব্দ এসে কানে কত পরিচিতের গুনগুনানি শুনিয়ে গেছে, শহরের সোরগোলে যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে আমারই কণ্ঠ। ঢাকা শহরকে মনে হয়েছে যেন আমাদের গ্রামেরই বৈঠকখানা। অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার হারালেও বৈঠকখানার ফরাসে তো গা এলিয়ে পড়ে থাকবার অধিকার ছিল।...

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে প্রবেশের পর অকস্মাৎ মনে হলো যেন কত দুরে আমায় টেনে আনা হয়েছে। কত পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, কত সাগর পাড়ি দিয়ে, কত মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে কোন্ পাতালপুরীর লৌহ-কুঠরীতে আমায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। এ থেকে যেন আর নিষ্কৃতি নেই আমার! চক্রব্যুহে প্রবেশের পথ আছে খোলা, কিন্তু বেরিয়ে যাবার? ভাবতে গেলে সারা গায়ে কাঁটা দেয়, শরীরটা ছমছম করে ওঠে—মনে হয় জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই ইসটার্ণ ব্যারাকের চার নম্বর ঘরেই আমায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে।...

তথাপি নিরাশায় ভেঙে পড়বার মতো ঠুনকো মন সে-যুগের বিপ্লবীদের মধ্যে একজনেরও ছিল কি না সন্দেহ। কী করে বিপ্লব আসবে, কোথা থেকে আসবে আমাদের অস্ত্র, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে কে করবেন আমাদের পরিচালনা, কোথায় সেই জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, এই সব তীক্ষ্ম প্রশ্নের খুব পরিষ্কার জবাব আমরা দিতে পারতাম না সত্য। সংগঠনের পরবর্ত্তী অধ্যায় কি, কি আমাদের কর্ম্মসূচী, কোন্ ইন্দ্রজাল-স্পর্শে অকস্মাৎ একদিন বৃটিশসিংহ ল্যাজ গুটিয়ে তার বিলিতি বিবরে অদৃশ্য হয়ে যাবে, কোন্ কর্ণধারের হাতে স্বাধীন দেশের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালিত হবে, ঠিক কোন্ পথে দুর হবে দেশের নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, দুঃখ ও দারিদ্র্য, এ সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা ধারণা থাকলেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল আমাদের একেবারে সীমাহীন। সে-যুগের বিপ্লবীদের মন ষ্টীমারের বয়লারের সঙ্গে তুলনীয়। বাইরেটা অন্ধকার, শান্ত ও স্বাভাবিক, কিন্তু ভেতরে অনির্ব্বাণ বৈশ্বানর, লকলকে তার সর্ব্বগ্রাসী শিখা। আস্তরণের কোমলতা দেখে অন্দরের ভয়াবহতার পরিমাপ করা কঠিন। ত্বকের মসৃণতায় অস্থির কঠোরতার প্রতিবিম্ব পড়ে না।..

চলার পথে পদে-পদে পেয়েছে তারা বাধা, কানে শুনেছে আসন্ন বিপদের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন, বিশ্বাসঘাতকতার কুশাঙ্কুরে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তাদের দেহ, একে-একে বিদায় নিয়েছে শুভানুধ্যায়ী ও সহযোগীর দল, তথাপি মুষড়ে পড়েনি, দুমড়ে যায়নি তারা, সুচিভেদ্য অন্ধকারে মাথা খুঁড়ে-খুঁড়ে প্রতীক্ষা করেছে তারা এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতের।..

আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে ফাঁসীর আসামী দীনেশ গুপ্ত তাঁর দিদিকে লিখেছিলেন, "...মৃত্যুকে আমরা ভয় করি বলিয়াই সে আমাদের জুজুর ভয় দেখাইবার সাহস পায়।..." সত্যিই বিপ্লবীরা মৃত্যুকে ভয় করে না। তাকে

তারা আমায় আহ্বান পরিচিতের মতো, অন্তরঙ্গের মতো কাছে ডেকে নেয়, বন্ধুর মতো করে আলিঙ্গন।

তাই জানি, এ অমানিশা কেটে যাবে, এ রাত্রি প্রভাত হবে, বহরমপুর বন্দীশিবিরের লৌহ-দ্বার দু'পাশে সরে গিয়ে সসম্মানে আবার একদিন আমার বেরিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত করে দেবে।...

তের

ক্রমে ক্রমে যা হয় তাই হলো, বন্দীশিবিরের সঙ্গে আমার মিতালী ঘটে গেল। এখানকার জীবনযাপনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম নিজকে।

বিরাট বন্দীশিবির। আয়তন এক বর্গ-মাইলের কাছাকাছি। অতি দীর্ঘ ব্যারাক দু'টি, ইস্‌টার্ণ ও ওয়েষ্টার্ণ। এ ছাড়া ক্ষুদ্রাকার ব্যারাক দু'টি, সাদার্ণ এ এবং সাদার্ণ বি। বড় ব্যারাক দু'টির প্রত্যেক কক্ষের আয়তন অনুযায়ী হয় চার জন বা ছয় জন বন্দী থাকেন। সাদার্ণ ব্যারাক দু'টির প্রত্যেক কক্ষে থাকেন চার জন করে। যুগান্তর দলের বিভিন্ন উপদল, গ্রুপ ও স্বতন্ত্র সদস্য মিলে এই ব্যারাক চারটি দখল করে রেখেছেন।

এ ছাড়া গোটা চারেক টালীর ছাউনি-দেয়া মাঝারি সাইজের ব্যারাক আছে। তাতে থাকেন অনুশীলন, রিভোল্ট দলের সদস্যেরা এবং জন কতক কম্যুনিষ্ট ও গুটি কয় কংগ্রেসী।

বাসিন্দার সংখ্যা তিনশো'র ওপর। কাজে-কাজেই তাদের স্নানের জায়গা, খাবার ঘর, রান্নাঘর, জ্বালানী রাখবার ঘর, অসংখ্য কয়েদী চাকর, রাঁধুনী, ধোপা, নাপিত, জমাদার, বাগানের মালী—সব মিলিয়ে একটা আস্ত দুনিয়া বলা চলে। একটি ডিসপেনসারী আছে ও আছে ত্রিশটি বেডের একটি হাসপাতাল।

তার পর এরই মাঝে মাঝে খেলার মাঠ। সেখানে ফুটবল, টেনিস, ভলিবল ব্যাডমিণ্টন, হকি, ক্রিকেট ও বাসকেট বল খেলা হয়। যাঁরা ব্যায়ামের অভিলাষী, তাঁদের জন্য গোটা দুই নানাবিধ সরঞ্জামপূর্ণ ব্যায়ামাগার আছে, কুস্তির আখড়াও আছে।

খোলা জায়গায় স্নানের জন্য বিরাট চৌবাচ্চা আছে, আবার আবরু রক্ষা করে যাঁরা স্নান করতে চান, তাদের জন্য আছে প্রায় পঞ্চাশটা বাথরুম। এক ধরনের জলের আধার থাকে জেলের মধ্যে, যাকে জেলীয় ভাষায় বলা হয় মুড়ী। আঠারো ইঞ্চি চওড়া এবং হয়তো ত্রিশ ফুট দীর্ঘ ড্রেনের মতো। ট্যাপ দিয়ে জল এসে ভর্তি হয়ে যায়, আবার ছিপি খুলে দিলে সব জল বেরিয়ে যেতে পারে। এই দীর্ঘ গোটা চারেক মুড়ীর ওপর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা ঝাঁপের দরজাওয়ালা সারি সারি স্নানের ঘর।

[illegible]দের মধ্যে অনেকের ফুলের বাগানের সখ। তাঁরা হয় নিজেদের ঘরের বাইরেই অথবা অন্যত্রও সুদৃশ্য ফুলের বাগান তৈরী করে নিয়েছেন। তাতে দেশী ও বিলিতি নানাজাতীয় ফুলের দঙ্গল। কেউ সখ করে পোষেন মুরগী, কেউ হাঁস, কেউ কবুতর। কারুর আবার পোষা কাঠবিড়ালীও আছে। পকেটে করে বা কাঁধে নিয়ে বেড়াতে যান, রাত্রে বালিশের পাশেই সে চুপটি করে ঘুমিয়ে থাকে। খাবার-ঘরে কাঁধ থেকে নেমে এসে কুট-কুট করে হয়তো একটা আলু ভক্ষণ করে আবার কাঁধের ওপর উঠে বসে থাকে। অনেক সময়

সারাটা দিন বাইরের গাছে-গাছে জ্ঞাত-ভাইবোনদের সঙ্গে খেলা করে সন্ধ্যে হতেই ফিরে আসে আমাদের ব্যারাকে, যার পোষা ঠিক তার কাছে। আশ্চর্য্য পোষ মানে এই কাঠবিড়ালী। সবার চাইতে উদ্ভট সখ দেখলাম নোয়াখালার বীরেন কুণ্ডুর। তার পোষা ছিল বেজী, সাদা বক, একটা হনুমান এবং একটা পাতি শেয়াল। কোন্ ড্রেন দিয়ে কী করে এই শেয়ালটা বন্দীশিবিরে ঢুকে পড়ে। বীরেন তাড়া করে তাকে এনে আটকে ফেলে ব্যায়ামাগারে। তার পর তার গলায় দড়ি বেঁধে একেবারে ছাগলের মতো নিয়ে এল নিজের ঘরে। াক করে যে হনুমান বা বক সে বন্দী করেছে, সেই জানে। তার ঘরটি একেবারে চিড়িয়াখানা, দুর্গন্ধে ভরপুর।

সত্যি, একটা পৃথক জগৎ। এখানকার হাসি-কান্না, এখানকার মান-অভিমান, এখানকার প্রত্যেকটি তরঙ্গ চারখানা দেয়ালের মধ্যেই উত্তাল ও দুর্নিবার হয়ে উঠে, আবার এক সময় এই চারখানা দেওয়ালের মধ্যেই সমাধি লাভ করে আর তার ওপর জমতে থাকে বিস্মৃতির মাটির চাপ। বাইরের জগতের কোনো উচ্ছ্বাসেরই প্রতিধ্বনি এখানে মেলে না। পরিবর্ত্তনশীল সমাজের যেন একটি টুকরো নির্মম হাতে এনে এই বন্দীশালায় রাখা হয়েছে বন্দী করে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে। স্নেহ, মায়া ও মমতায় এবং দরদী পরিবেশে বাইরে যে সুখ-নীড়টি গড়ে উঠতে পারতো, এখানে উষর ক্ষেত্রে পড়ে গিয়ে হয়তো তার আর্দ্রতা যাচ্ছে উবে।.........

সমগ্র বাংলা দেশের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গের লোক সাধারণতঃ কম, উত্তর-বঙ্গের কিছু আছে, অবশিষ্ট অর্থাৎ অর্দ্ধেকের অনেক বেশী এসেছে পুর্ব্ব-বঙ্গ থেকে—ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ থেকে। কুমিল্লারও কিছু আছে। বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এসে দাঁড়িয়েছে তিনশো পঁচিশে। আর স্থান নেই।

আহারের বাবদ বরাদ্দ জন-প্রতি দৈনিক এক টাকা দশ আনা। অর্থাৎ বিরাট রসুই ঘরের গোটা দশেক চুল্লীতে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করা হয়। এত টাকা ব্যয়ের পরও মাসের শেষ দিকে দৈনন্দিন উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বেশ মোটা হয়ে জমে ওঠে। কিন্তু এক মাসের উদ্বৃত্ত পরবর্ত্তী মাসে টেনে নিয়ে যাওয়া সরকারী নিয়মে নিষিদ্ধ বলে প্রত্যেক মাসেরই শেষ দিকে ঘন-ঘন কয়েকটা Feast বা বিশেষ ভোজনের ব্যবস্থা থাকে।

বিশেষ ভোজনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে কিচেন ম্যানেজারের মৌলিকত্ব, রুচি-পছন্দ ও কর্ম্মদক্ষতার ওপর। একজন ম্যানেজার যেভাবে করলেন, অপর ম্যানেজার চেষ্টা করেন সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে করতে। এবং বলাই বাহুল্য যে, বৈচিত্র্য সৃষ্টির উন্মাদনায় অনেক সময় তা খানিকটে উদ্ভট হয়ে ওঠে। ফলে হয়তো কিছু অপব্যয় হয়; কিন্তু সে জন্যে দুঃখ করবার কারণ নেই। এটা সরকারী পয়সা, বরাদ্দ অর্থে যে আমাদের অতি কষ্টে

সংকুলান হচ্ছে, সেটাই প্রমাণ করতে হবে সর্ব্বদা, নইলে ভাতা কমিয়ে দেবার আশঙ্কা আছে।

মার্চ্চ মাসের শেষাশেষি এমন একটা বিশেষ ভোজনের দিন পড়লো। কিচেন-ম্যানেজার সত্য বাবু অফিসে গিয়ে ব্যবস্থা করে এলেন যে, দু'-রকম পোলাউ হবে—ঝাল ও মিঠে। আর হবে দু'-রকম মাংস—ঝোল ও কোর্ম্মা। রান্না করবে স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলার বাবুর্চ্চি। ঠিক সিরাজের নয়, তবে মুর্শিদাবাদ নবাব-বাড়ীর খাস বাবুর্চ্চিই আসবে জানা গেল। কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আই-বি বিভাগের অনুমতি ও উপস্থিতি ব্যতীত বে-আইনী। সুতরাং বাবুর্চ্চিরা এসে অফিসের ওখানে রান্না করে রেখে যাবে। তারা চলে যাবার পর আমাদের সত্য বাবু সেগুলো নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবেন। খাসী গোটা চারেক কিনে আনা হলো বটে, কিন্তু তা বলি দিয়ে কাটবার অধিকার আমাদের নেই। কারণ ঐ বিরাট খড়্গ নিয়ে খাসীর মুণ্ডচ্ছেদের নাম দিয়ে শিবিরের কমাণ্ডাণ্ট টবিন সাহেব বা তাঁর সহকারী গিরিজা দত্তকেই যদি আমরা তাড়া করে বসি। তাদের দিয়ে তো আর খাসীর কাজ চলতে পারে না।...

সুতরাং বাবুর্চ্চিরাই খাসী জবাই করে নিয়ে অফিসে রান্না সুরু করলো। আর এদিকে খাবার হল্‌-এ সত্য বাবু ও জনকতক স্বেচ্ছাসেবক অন্যান্য ব্যবস্থায় মেতে উঠলেন।

হল্‌-এর মাঝখানে গোটা কয়েক তক্তপোষ জড়ো করে শুভ্র চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। সেই মঞ্চের ওপর অর্কেষ্ট্রা দল নানা যন্ত্র বাজাচ্ছেন। দেয়ালে মাঝে-মাঝে ফুলের রিং, প্রত্যেকটি খুঁটি সাদা কাপড়ে মুড়ে তার ওপর দিয়ে জড়ানো ফুলের মালা। ফরাসের ওপর অনেকগুলো ফুলদানী, তাতে বেশ বড়-বড় গোলাপ ও রজনীগন্ধা। সারা হল্‌ময় সুশৃঙ্খল ভাবে নয়, ইতস্ততঃ ছড়ানো অনেকগুলো ছোট টেবিল, তার চারি দিকে চারখানা চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে একটি ফুলদানীর মধ্যে থেকে রজনীগন্ধার ঝাড় গলা উঁচু করে আছে।

নিমন্ত্রিতেরা যেই একে-একে এসে হল্‌ ঘরে প্রবেশ করছেন, অমনি দরজায় তাঁদের বুকে গুঁজে দেয়া হচ্ছে একটি ছোট্ট ফুলের তোড়া আর ঝারি থেকে ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছে গোলাপ-জল।

রাত ঠিক আটটার সময় খাবার দেবার ঘণ্টা পড়লো। এসে অবধি ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের চোদ্দ নম্বর ঘরে আমার আড্ডা জমে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিনই খাবার ঘণ্টা পড়লে আমরা যাই স্নান করতে এবং খাবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘণ্টা বেজে যাবার পর যাই দল বেঁধে খেতে। তখন বিরাট হোটেলের খাদ্যাবশেষ নিয়ে আমরা বসি কেউ বারকোষ নিয়ে, কেউ বা গামলা নিয়ে, আবার কেউ কড়াইতেই। মেনু'র অনেকগুলোই হয়তো তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে দমে যাবার পাত্র আমরা নই। শুধু নুণ ভাত হলেও

আধপেটা আমরা কোন দিন খাইনে। খাওয়া সম্বন্ধে চোদ্দ নম্বরের ঔদাসীন্য সর্ব্বজনবিদিত।

হল্-ঘরে প্রবেশ করতেই যথারীতি পেলাম ফুলের তোড়া ও গোলাপ-জল। খান তিনেক টেবিল জুড়ে আমরা বসলাম। যতীশ বাবু, নীতিশ, কমেট, মনোরঞ্জন, ভোলা বসাক, ননী চৌধুরী, চারু জোয়ারদার, অমর চাটার্জ্জী, নরেন দাস, পরিমল রায়, জ্যোতিজীবন ঘোষ ও আমি। নবাবী খানা মিলবে বলে আজই প্রথম এলাম যথাসময়ে। ওদিকে আবার দশটা বেজে পোনেরো মিনিটে লক্-আপ। এর মধ্যেই সব সেরে যার-যার ঘরে পৌঁছুতে হবে।

কমেট ও ননী খাবার ব্যাপারে একেবারে সদাশিব। যা যখন পাওয়া যায়, তাতেই তারা খুশী, শুধু 'যতটুকুটা' একটু বিবেচনা করে দেখে।

কমেট বললো : এ কি, নবাবী খানার উপক্রমণিকা নাকি ?

গোটা কয়েক আঙুরের দানা মুখে ফেলে জবাব দিল ননী : আঙুর ফল যখন টক নয়, তখন নবাবী খানাতেও বোধ হয় সিরাজউদ্দৌলার খোসবাই পাওয়া যাবে। সবুরে মেওয়া ফলে, এ কথা ভুলছো কেন ?

ভোলা বলে উঠলো : তার পর শাস্ত্রবাক্য রয়েছে প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ষয়েৎ। অতএব—

খাওয়া সুরু হলো। এক প্লেট করে ফল—আপেল, আঙুর, বেদানার দানা, ন্যাসপাতি, আখরোট, কিসমিস, মনাক্কা, কিছু বাদাম-পেস্তা, কমলা, শশা, ও এক ফালি পেঁপে আর কয়েকটা বড় সাইজের কুল। সঙ্গে জল নয়, এক গ্লাস করে ঘোলের সরবৎ।

অর্কেষ্ট্রা দল বাজাচ্ছে ইংরেজী কোনো গৎ আর আমরা টেবিলে বসে খাচ্ছি সাত্ত্বিক আহার। অর্থাৎ পরবর্ত্তী রাজসিক ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য পাকযন্ত্রগুলিকে তালিম দিয়ে নিচ্ছি। পিটপিটে চারু বাবু বলে উঠলেন : কিসমিসগুলো ভালো করে ধোয়া হয়নি, দেখছেন বোঁটাগুলো রয়ে গেছে আর পেঁপেটা যেন বড্ড বেশী পাকা, গলে যাচ্ছে।

পেটরোগা চারু বাবু চিরকালই অতি সাবধানী। কিন্তু তাই বলে নীতিশ তো নয়, মনোরঞ্জনও নয়। তারা তৎক্ষণাৎ চারু বাবুর প্লেট ভারমুক্ত করে দিল। নীতিশ বললো : চারুদা, নবাবী খানা এলে আপনি এসে আমার টেবিলে বসবেন কিন্তু।

ননী বাধা দিল : যা, যা। আমার রুম-মেট ভাগাতে আসিস নে। পাশাপাশি রাত্রে শুতে হবে। তোকে দান করলে চারু বাবুকে আর ঘরে ফিরে যেতে হবে না।

কুস্তিগীর ভোলা জবাব দিল : তাহলে বদলী যাবো আমি। কায়েৎটুলীতে তোকে আমিও চিৎ করেছি বহু বার, তা ভুলিসনি তো ননী ?

পরিমল বললো : তা এখানেই হয়ে যাক না একবার। নবাবী খানার জন্য পাকস্থলীর জায়গা বেড়ে যাবে'খন।

সত্য বাবু ঘুরে-ঘুরে সবার টেবিলে তদারক করে বেড়াচ্ছিলেন। বোধ হয় পরিমলের কথাটা কানে গেছে। প্রায় বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে আশ্বাস-বাণী উচ্চারণ করলেন : সত্যিই নবাবী খানা ! যে বাবুর্চ্চি রাঁধছে, তার ঠাকুরদাদার বাবা কিংবা তার বাবা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার খাস বাবুর্চ্চি। অফিসের কাছাকাছি আমি ঘুরে এসেছি। একেবারে মুর্শিদাবাদী খোসবাই। এই এসে পড়লো বলে। আপনারা আর-একটু ধৈর্য্য ধরুন।—ওহে, একখানা নতুন গৎ ধরো না, দীনেশ।—বলে অর্কেষ্ট্রা দলের নেতা দীনেশ দাসকে উস্‌কে দেবার চেষ্টা করলেন।

একখানা কেন, নতুন ও পুরাতন অনেকগুলো গৎ বাজানো হলো এবং ঘড়ির কাঁটাও এসে ঠেকলো পুরোপুরি নটায়। কোথায় নবাবী খানা। সবাই অধীর ছিলেন, এবার অতিষ্ঠ হয়ে ওঠবার উপক্রম দেখা গেল। মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল এ-টেবিলে ও-টেবিলে। দু'-একটা টেবিল খালি করে নিমন্ত্রিতেরা উঠে গেলেন। বাদক দলের ফরাসও খানিকটে খালি বোধ হলো। বেগতিক দেখে একটা কোণের টেবিল থেকে পুরো ছ'ফিট দীর্ঘ করালী বিশ্বাস দণ্ডায়মান হয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন : বন্ধুগণ, ম্যানেজার আমায় কিছু বলবার অনুরোধ না জানালেও কর্ত্তব্য পালনের তাগিদে আমি দাঁড়িয়েছি। আপনারা যে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন, তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এবং তার যে যথেষ্ট যুক্তিও আছে, তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর ঘণ্টাখানেক পরই টবিনের বিউগল বেজে উঠবে আমাদের বুকে হাতুড়ী মেরে। নবাব সিরাজ কেন, তার ঠাকুর্দ্দা আলীবর্দি কবর থেকে উঠে এসে অনুরোধ জানালেও বৃটিশসিংহের পালিত পুত্র টবিন সাহেবের হুকুম টলবে না, তাও আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে জানি। কিন্তু বন্ধুগণ, এই ব্যাপারের জন্য ম্যানেজার কি করতে পারেন, তাই বলুন আপনারা ? আফিসের গেটের কাছাকাছি তিনি চীৎকার করতে পারেন মাত্র, কিন্তু বাবুর্চ্চির দাড়ী ধরে টেনে দেবার সুযোগ তাঁর কোথায় ? সেই পাকশালায় তাঁর প্রবেশাধিকার আছে কি ? অতএব, বন্ধুগণ—

অকস্মাৎ একটি কণ্ঠ শোনা গেল : কিন্তু ম্যানেজারের ক্যানভাস করে কি মাংসের মাত্রা কিছু বেশী পাওয়া যাবে, করালী বাবু ?

করালী বাবু জবাব দিলেন : নিস্বার্থ ভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেয়াই আমার কাজ। তা থেকে আপনারা নিজেদের খুশীমত উপসংহার টেনে নিতে পারেন। নবাবী খানা এসে পৌঁছোবার এই যে অযৌক্তিক বিলম্ব, এই যে আমাদের সীমাহীন প্রতীক্ষা—

কিন্তু অকস্মাৎ মিছিল করে চাকর ও রাঁধুনীর দল এসে প্রবেশ করলো। সবার হাতেই হয় পোলাউয়ের ডেকচি কিংবা মাংসের বালতি। নবাবী খানা এসে গেছে। নিমন্ত্রিতেরা কলস্বরে এমনি ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যে, করালী বিশ্বাস বক্তৃতার মধ্যপথেই আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। মিছিলের

শেষে প্রবেশ করলেন স্বয়ং কিচেন-ম্যানেজার সত্য বাবু, চোখে-মুখে বিজয়ীর আত্মপ্রসাদ ঝক্-ঝক্ করছে।

দশখানা হাত বার করে তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে দু'-রকম পোলাউ প্লেটে সাজিয়ে দিলেন টেবিলে-টেবিলে। সুবাসে পাগল হয়ে অর্কেষ্ট্রা দল একযোগে ফরাস ত্যাগ করে টেবিল দখল করে বসে গেছেন। সবে নামানো হয়েছে, অত্যন্ত গরম। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে ন'টায় এসে ঠেকেছে।

বোধ হয় মনোরঞ্জনই সবার আগে জিভে ঠেকিয়েই চীৎকার করে উঠলো: ও ব্বাবা, এ কি নবাবী খানা রে! এ যে দেখছি মিষ্টি একেবারে সীতাভোগের মতো। আর এই-বা কি রকম ঝাল পোলাউ? নুণ নেই, মসলা নেই, ঝাল নেই, একেবারে হাইড্রোজেনের মতো tasteless, odourless—

রবি লাহিড়ীর কণ্ঠ শোনা গেল: আর খাসীর মাংস? এ কি রে ভাই, এ যে গলে একেবারে জুস্ হয়ে গেছে। আর এ কি ঝোল, না ঘি আর তেলের সুরুয়া?

অপর টেবিল থেকে, মতি সিং একখানা ঠ্যাং হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল: আর এখানা? এই হাত খানেক লম্বা হাড়খানা খাসীর, না কোন কচি বাছুরের, যে বাছুর এখনো ঘাস খেতে শেখেনি, একেবারে ফুলের মতো পবিত্র—

শিবদাস লাহিড়ী বাধা দিল: থাম্ মতি, থাম্, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

বিমল চক্রবর্ত্তী বললো: কেন, এতে তো দোষ নেই? শাস্ত্রে আছে হরিণ, কাছিম আর একুশ দিন যার বয়স হয়নি, এমনি কচি বাছুর বিধবারাও খেতে পারেন।

একেবারে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

ভোলা বসাক প্লেট ঠেলে রেখে বলে উঠলো: না দ্বিজেন বাবু, এ নবাবী খানা আমার পোষাবে না। ও সত্য বাবু, সত্য বাবু কোথায়? আরে মশাই, ও-বেলার খরসোলা মাছের ঝোল আর হাঁড়ীর তলায় এক মুঠো ভাত হবে কি?

কিন্তু কোথায় সত্য বাবু? প্রায় পাঁচশো টাকা ব্যয় করে যে নবাবী খানার ব্যবস্থা করা হলো, তা যে এমনি হবে, কি করে জানবেন তিনি? তাই বুদ্ধিমানের মতো চাকরদের ওপর ভার দিয়ে তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন।

সত্যিই, পোলাউ আর মাংসের অদ্ভুত স্বাদ। পূর্ব্বেই বলেছি, বন্দীদের মধ্যে প্রায় সবাই পূর্ব্ব অথবা উত্তর-বঙ্গের। উত্তর-বঙ্গের কোথাও কোথাও মিষ্টি দিয়ে রাঁধবার রীতি প্রচলিত থাকলেও পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান মসলা হলো ঝাল—শুকনো লঙ্কা হোক্, কাঁচা লঙ্কা লঙ্কা হোক্, গোলমরিচ হোক্, আদা হোক্, নইলে নিদেন পক্ষে সরষে হোক—ঝাল তাদের চাই-ই এবং প্রচুর পরিমাণে চাই। কিন্তু এ কি খাদ্য? মিষ্টি পোলাউ আর মাংসের কোর্শ্মার কথা ছেড়ে দিলেও ঝাল পোলাউ আর মাংসের ঝোলে আর যা-ই থাক, এতটুকুও ঝাল নেই।

সুতরাং একে একে সবাই উঠে পড়লেন। ননী মন্তব্য করলো: শালা

বাবুর্চ্চি এখনো বোধ হয় অফিসে আছে। যাবেন চারু বাবু ব্যাটার দাড়িটা ছিঁড়ে দিয়ে আসতে ?

চারু বাবু এই সব তুষ্পাচ্য খাদ্য একেবারে স্পর্শ করেননি। ঘ্রাণেই নাকি তাঁর বমি-বমি করছে। বললেন : ফল যা খেয়েছি, তাতেই আমার হয়ে গেছে। ও-সব অখাদ্য আমি খাইওনি, তাই বাবুর্চ্চির দাড়ী ছেঁড়বার উৎসাহও আমার নেই।

দেখতে-দেখতে সবগুলো টেবিল খালি হয়ে গেল। টেবিল ভর্ত্তি পড়ে রইলো সিরাজী খানা,—মিষ্টি পোলাউ, ঝাল পোলাউ, মিষ্টি-মাংস আর ঝাল-মাংস। বাবুর্চ্চিদের উদ্দেশ্যে চোখা-চোখা গালি বর্ষণ করে সবাই গায়ের ঝাল মেটাতে লাগলেন।

সবার শেষে হল্ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় দেখলাম, বাগ্মী করালী বিশ্বাস খালি টেবিল-চেয়ারের উদ্দেশ্যে অথবা স্তূপীকৃত খাদ্যের উদ্দেশ্যে তখনো ওজস্বিনী ভাষায় এক্সটেম্পোর চালাচ্ছেন : নবাবী খানা আপনাদের মনোরঞ্জন করতে পারলো না। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হলো যে, নবাবী আমল শেষ হয়ে গেছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সূর্য্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নবাবী সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারও বাংলা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আপনাদের আত্মত্যাগ, আপনাদের সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম ও আপনাদের রক্তদানের ফলে সেই স্বাধীনতা-সূর্য্য ভারতের গগনে আবার উদিত হলেও সেই নবাবী আমল আর ফিরে আসবে না। কারণ আপনাদের সে প্রস্তুতি কোথায় ? এই যে মিঠে-পোলাউ, এই যে খাসীর লম্বা ঠ্যাং দাদু আলীবর্দ্দি যা নাতি সিরাজকে হাতে করে খাইয়ে দিতেন—

এমন সময় শিবির প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠলো বিউগল। দশটা বেজে গেছে। পনেরো মিনিট সময় আছে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবার। কাজেই করালী বিশ্বাসের বক্তৃতা মধ্যপথে থেমে গেল। খালি টেবিল-চেয়ারগুলোকেই বোধ হয় অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে করালী বাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে বললেন : চারু জোয়ারদারের বোধ হয় দিনাজপুরের কাটারীভোগের চিড়ে আছে। যাই এক মুঠ নিয়ে যাই। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, দ্বিজেন বাবু।

চোদ্দ

রাজবন্দীদের খাদ্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের গৌরী সেনী ব্যবস্থার পশ্চাতে আছে তাঁদের সুস্পষ্ট একটি কূটনীতি, বাইরের লোক তার সংবাদ রাখেন কি না জানি নে। সরকারী বরাদ্দ অর্থে আমাদের কায়ক্লেশে সংকুলান হয়, এটা প্রমাণিত করবার জন্য কিচেন-ম্যানেজার সর্ব্বদাই চেষ্টা করতেন দৈনন্দিন বরাদ্দ অর্থের সবটাই ব্যয়ের। কিন্তু তা হতো না। তাই মাসের শেষ দিকে feast হতো। ফলে অপব্যয় হতো প্রচুর আর সেই অপব্যয়ের সংবাদ যে যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছোত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঢাকা জেলেই যে শুধু দিবাকর সেনগুপ্ত আছে, তা কি করে বলা যায়? এই বিরাট বন্দীশিবিরের বিশ্বে অমনি ক'জন দিবাকর যে আত্মগোপন করে রয়েছে এবং ইঁদুরের মতো কি ভাবে যে তারা মাটির নীচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে মেঝের ওপর চোরাবালির সৃষ্টি করছে, কে তার সঠিক সংবাদ রাখে? গভর্ণমেণ্ট এখানকার মেঝেতে সূচ পড়বার শব্দও শুনতে পান।...

কিন্তু এর পরও আমাদের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা হয় না কেন? প্রয়োজনাতীত অর্থ ব্যয় করে গভর্ণমেণ্ট তাঁদের মারাত্মক শত্রুদের পোষেন কেন? কারণ, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের আরামপ্রিয় ও ভোজনপ্রিয় করে তোলা। থালাপূর্ণ দামী খাদ্য না হলে যদি আমাদের মন খারাপ হয়, তাহলে কাজে আমাদের উৎসাহ ও আগ্রহ কমে আসবে, গভর্ণমেণ্টের তাই বিশ্বাস। এই সহজ লজিকের ওপর নির্ভর করেই আমাদের রাজসিক খাদ্য ও নবাবী খানার সুযোগ দেয়া হয়। সরকারী অভীষ্ট খানিকটে সিদ্ধ হয় বৈ কি?...

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্টের এই নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অর্থ ব্যয় না করলে বরাদ্দ হ্রাস পাবে, আবার ব্যয় করলেও অলস হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে, এই উভয় সংকটকে অপরে ভয় করে চললেও আমরা করিনি। ডায়লেমার দু'টি তাক্ষ ও উন্মুখ হর্ণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করে আমরা সাহসী বুলফাইটারের মতো দু'হাতে ধরে ফেলেছি তার দু'টি শিং এবং মোচড় দিয়ে দিয়েছি ভেঙে বৃষপুঙ্গবের স্কন্ধ।...যেমন পেটুকের মতো খেতাম আমরা, তেমনি ব্যায়ামও করতাম কয়েক ঘণ্টা নিয়মিত ভাবে। ঢাকার ছেলেরা ছিল কুস্তিতে ওস্তাদ, বরিশালের ছেলেরা ছিল প্যারালাল বারে আর কুমিল্লার ছেলেরা ছিল ভারোত্তোলনে। কোনোটাতেই প্রথম স্থান অধিকার না করলেও সবটাতেই ছিলাম আমি।

ঢাকা জেলের পুরানো বন্ধুরা এসে পড়বার পর কুস্তির আখড়া বেশ ভালো ভাবে সরগরম হয়ে উঠলো। ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের পশ্চাৎভাগে তৈরী হলো মাটি, তাতে ঢালা হলো আধ মণ সরষের তেল। সবার দেখাদেখি ল্যাঙট এঁটে

আমিও নেমে গেলাম। কামাখ্যাদা'র সঙ্গে প্রথম দিনের লড়াইতেই এতখানি শ্রান্ত হয়ে পড়লাম যে, সাত রাউণ্ড কুস্তির পর আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলাম।

প্রথম দিনের টেনিস খেলার কথাও মনে পড়ে। প্রথমতঃ র‍্যাকেটখানা বেশী বড় ও ভারী মনে হচ্ছিল ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেটের তুলনায়। রবারের বলটাও বড্ড জোরে ছুটে আসে জালের ওপর দিয়ে। শাটল ককের মতো হাওয়ায় আদৌ আটকায় না। ফিরিয়ে দিতে হলেও প্রয়োজন প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত, ব্যাডমিণ্টনের মতো ঠুকুস-ঠাকুস অচল।

অতএব, প্রথম বলটাই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে এত জোরে হাঁকিয়ে দিলাম যে, ক্রিকেট খেলার নিয়ম অনুযায়ী সেটা ওভার বাউণ্ডারী আউট হয়ে গেল আর র‍্যাকেটখানা খটাস্ করে এসে ঘা মারলো আমারই কপালে। চশমার ব্রিজ গেল দু'টুকরো হয়ে ভেঙে আর কপাল খে তলে রক্ত দেখা দিল। তারপর ডাক্তার...বেনজিন সীল!

প্যারালাল বার ব্যায়ামের ওস্তাদ অজিত দাস, মধুসূদন দত্ত, সুধীর দাস প্রভৃতি। সবাই বরিশালের। সেখানে আমি যোগদান করলাম। রাইজিং থেকে সুরু করে অনেকখানিই ফেললাম শিখে, শুধু পিকক্ কিছুতেই হতে পারলাম না শত চেষ্টা করেও।

কিন্তু ফুটবল, ভলিবল, ব্যাটমিণ্টন আর ক্যারম খেলায় আমি প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠলাম। ফুটবলে আমার কৃতিত্ব আমি যে কোনো পজিশনে চমৎকার খেলতে পারি। দু'টো পা যেমন চলে, তেমনি চলে আমার মাথাও। চশমাতে আমার পাওয়ার বেশ। তাই খুলে নিয়ে খেলি। তথাপি গোলকিপার কোন্ দিকে ঝুকে দাঁড়িয়েছে চকিতে দেখে নিয়ে ঠুক্ করে মাথা দিয়ে বল্‌টি আস্তে অপর দিক দিয়ে গোলে ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারে আমার দোসর নেই। আর সাংঘাতিক বেগমান আমার শট্। পেনাল্টি হলে কোনো কৌশলের আশ্রয় না নিয়েই সোজা শট্ মারি আমি, গোলকিপার তা প্রতিহত করবার জন্য আদৌ চেষ্টাই করে না। ভেটারেন গোলকিপার কুশা বাবু তো একবার স্পষ্টই বললেন: দ্বিজেন বাবুর কিক্ থামাতে গিয়ে কি হাতখানা খোয়াবো?

ভলিবলে আমার যোগ্যতম স্থান নেটে নয়, দ্বিতীয় সারির মধ্যস্থানটি। ফুটবলের সেণ্টার-হাফের মতো। একেবারে কেন্দ্রস্থল। দায়িত্ব সীমাহীন। বল শুধু ফিরিয়ে দিলেই হবে না, নিয়ন্ত্রিত আঘাতে ওটি জালের ঠিক ওপরে এমনি ভাবে তুলে দিতে হবে যাতে সেণ্টার খেলোয়াড় অনায়াসে তা হয় রসগোল্লাটির মতো টুক করে প্রতিপক্ষের দিকের ফাঁকা জায়গাটি দেখে ছেড়ে দেবে কিংবা চাপ মেরে একেবারে রাইফেলের বুলেটের মতো উড়িয়ে দেবে। আরো মজার ব্যাপার এই যে, আমি বল মারি দু'হাত জড়ো করে নয়, প্রায়ই এক হাতে। ফলে, আমার ক্ষিপ্রতা সবার চাইতে বেশী।

ব্যাডমিণ্টনে আমার স্ক্রু মারা বা প্লেসিং ছিল অননুকরণীয়। গায়ের

জোরে চাপ মারার চাইতে জু ও প্লেসিং-এর দ্বারা যে কত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে খেলা যায় হৈ-হৈ ও ছুটোছুটি না করে, আমি তা দেখিয়ে দিলাম।

ক্যারম এতই ভালো খেলতাম যে, সারা শিবিরে আমরা ছিলাম চার জন, যাদের খেলা দেখবার জন্য ভিড় পড়ে যেত। শিবদাস লাহিড়ী, নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, দেবেশপ্রসাদ চৌধুরী ও আমি। বিজ্ঞানের চরম প্রমাণিত হতো আমাদের প্রত্যেকটি মারে। শুধু ঝড়ের মতো আঘাত দেয়া নয় এবং তার ফলে কোথাও একটি খুঁটি অপ্রত্যাশিত ভাবে পকেট হয়ে যাওয়া নিয়ে আত্মপ্রশংসা নয়, প্রত্যেকটি মারের পুর্ব্বে তার ফলাফল কি নিশ্চয়ই হবে আর কি-কি হবার প্রচুর সম্ভাবনা আর কি হয়তো হতে পারে, দর্শকদের সমক্ষে তা বিবৃত করে আমরা ষ্ট্রাইকার ছেড়ে দিই।

শুধু ব্যায়াম আর খেলাধুলা নয়। শিবিরে আসবার পরেই জানি নে কি করে জানাজানি হয়ে গেছে যে, ১৯২৮ সালের ভারতীয় জাতীয় মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে যে বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে, তারই 'বি' কোম্পানীর অন্যতম সার্জেণ্ট ছিলাম আমি। অবশ্য 'বি' কোম্পানীর দু'-চার জন সেনা যে রাজবন্দী হয়ে আসেনি, তা নয়। কিন্তু গল্প করে বেড়াবার মতো ছেলে তারা নয়।

আসল কথা, শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, সামরিক শিক্ষার কথা তাঁরা কিছু দিন ধরেই বিশেষ ভাবে চিন্তা করছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স বাইরে জেলায় জেলায় যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, শিবিরে আসবার পর সে শিক্ষাদান স্থগিত থাকবে কেন? সমগ্র বাংলা দেশের বিপ্লবী কর্ম্মীরা এখানে এসে জমায়েৎ হয়েছেন। থিওরী যতখানিই জানা থাক না কেন, প্যারেড ও ব্যায়ামের মাধ্যমে হাতে-কলমে সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কুচকাওয়াজ আদ্যোপান্ত শিক্ষালাভ করে স্ব স্ব কর্ম্ম-এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁরা এমনি স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলবার সুযোগ পাবেন। এতে সামরিক মনোবৃত্তি গঠন করা সহজ হবে। হিংসায় বিশ্বাসী বিপ্লবীদের সৈনিকের হিম্মৎ থাকা আবশ্যক।

অনুশীলনের সদস্যেরা সংখ্যায় আমাদের এক-তৃতীয়াংশ হলেও এবং তাঁদের পৃথক্ কিচেন ও পৃথক্ ব্যারাক হলেও স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন ব্যাপারে তাঁরা যুগান্তরের সঙ্গে পুর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে দ্বিধা করলেন না।

অতএব, ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসের এক শান্ত সকালবেলায় অকস্মাৎ শিবির কম্পিত করে বেজে উঠলো স্নানের ঘণ্টা নয়, খাবার ঘণ্টা নয়, ঢাকা জেলের সেই পাগলা ঘন্টিও নয়, বহরমপুর ডিটেনশন ক্যাম্প ইনফ্যান্ট্রির কুচকাওয়াজের ঘণ্টা, আর হুড়-হুড় করে বেরিয়ে এসে সবাই ফল্ ইন্ করলো ইস্ টার্ণ ব্যারাকের পুর্ব-দক্ষিণ কোণের মাঠটিতে। সংখ্যায় তারা প্রায় আড়াইশো। অনুশীলন আছে, যুগান্তর আছে, দল আছে, উপদল আছে, গ্রুপ

আছে, স্বতন্ত্রেরা আছে, পরিচয়হীনরা আছে, রিভোল্ট আছে, এমন কি কমিউনিষ্টেরাও আছে ; আর, সবার সম্মুখে উন্নত বক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে ইনফ্যান্ট্রির জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, সর্ব্বাধিনায়ক দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়।

আমার প্রধান অডারলি সেই রহস্যময় চক্ষু উদাসীন দার্শনিক অমর চাটার্জ্জী।

কিন্তু বিভ্রাট বেধে গেল প্রথম দিনেই।

ঠিক সাতটাতে ঘণ্টা বাজাবার কথা ছিল। কিচেন-ম্যানেজারের ঘণ্টা। যখন পাঁচ মিনিট বাকি, তখন অমরকে আসতে না দেখে কামাখ্যাদা' পাছে দেরী হয়ে যায়, এ জন্য নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে দেন। কিন্তু তখনো তিন মিনিট বাকি ছিল। যথাসময়ে অমর সেখানে এসে তাঁকে ঘড়ি দেখিয়ে দেয়।

সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত কঠোর। সেখানে তিন মিনিট হেলায়-ফেলায় উড়িয়ে দেবার মতো নয়, প্রতিটি সেকেণ্ড মূল্যবান।

সুতরাং—

সুতরাং জিওসি-র হুকুম এলো : কমরেড্‌স, এ্যাটেন—শন্।

পাথরের মতো সবাই দাঁড়িয়ে গেল। একেবারে নিশ্চল, নিশ্বাস পড়ছে কি না সন্দেহ।

জিওসি খট্ করে বুটের আওয়াজ করে প্রত্যেকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার পোষাক-পরিচ্ছদ, বেল্ট প্রভৃতির সামান্য ত্রুটিগুলি শুধরে দিতে লাগলেন। কিছু সৈন্য প্রথম দিনেই সামরিক খাঁকি পোষাক সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি, জনকতক বয়স্ক লোক সংকোচবশে সংগ্রহ করেও পরিধান করেননি।

Number : জিওসির আদেশ এল। ওয়ান, টু, থ্রি করে সংখ্যা উচ্চারিত হতে-হতে এসে ঠেকলো দুশো আঠারো।

তার পর মুহূর্ত্ত মাত্র নীরবে থেকে হুকুম এলো : Orderly fall out!

লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এসে অমর বুটের আওয়াজ তুলল : খট্।

—Who rang the bell earlier ?

অমর ঘটনা যথাযথ ভাবে বিবৃত করলো এবং অদেশ পেয়ে আবার লাইনে ফিরে গেল।

এবার কামাখ্যাদা'র পালা। দলীয় নিয়মানুবর্ত্তিতায় কামাখ্যাচরণ রায় আমার দাদা—শ্রদ্ধেয় ও সম্মানার্হ। সেখানে সর্ব্বদাই তাঁকে সমীহ করে চলাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু প্যারেড গ্রাউণ্ডে আমি জিওসি,-বি-ডি-সি-আইয়ের সর্ব্বাধিনায়ক আর কামাখ্যাচরণ রায় সেই ইনফ্যান্ট্রির সামান্য প্রাইভেট। কামাখ্যাদা' আর দ্বিজেন নয়, এখানে মেজর জেনারেল গ্যাংগুলী আর প্রাইভেট রয়। সামরিক সংবিধানে দাদা-ভাই নেই। অতএব—

Private Roy, fall out.

কামাখ্যাদা' সামরিক কায়দায় লাইন থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম উন্নতবক্ষে প্রস্তর-কঠিন মুখ নিয়ে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর চোখের পানে।

—Why did you ring the bell ?

কামাখ্যাদা' বললেন যে, পাছে দেরী হয়ে যায়, সে জন্যে তিনি নিজেই ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে ঘড়ি ছিল না, তাই সময় দেখতে পারেননি।

—The bell was rung three minutes earlier. Did you not commit an offence ?

—Yes, Sir, it was an offence.

—Was it not a breach of military discipline ?

—Yes, Sir.

—Are you not liable to punishment ?

Certainly, Sir.

চরম মুহূর্ত্ত এসে গেছে। বেশ বুঝতে পারলাম সেই দু'শো সতেরো জন বন্দী রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে আমার পরবর্ত্তী আদেশের। জলদগম্ভীর স্বরে কোন্ কঠিন শাস্তির অদেশ-বাণী আমি উচ্চারণ করি আমারই দলীয় দাদার প্রতি, সমবেত বন্দীরা যে তারই প্রতীক্ষা করছে, তা স্পষ্ট অনুভব করলাম।

কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বললাম : This is the birthday of the Infantry and this is your first offence. Hence, you are let off with a very grave warning. Don't you follow ?

Yes, Sir.

To you lines !

দাবানলের মতো এই সংবাদ সমগ্র বন্দীশিবিরে রাষ্ট্র হয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে।

দুপুরে খাবার হল্-এ এসে প্রবেশ করতেই কামাখ্যাদা' সবার সমক্ষেই একবারে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। সবলে আলিঙ্গন করে বলে উঠলেন : That's like a real G. O. C. ভারী খুশী হয়েছি তোমার দৃঢ়তায়। এই তো চাই। আমায় শাস্তি দিলেও অবনত-মস্তকে মেনে নিতাম তা।

লজ্জিত মুখে নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই কামাখ্যাদা' আবার আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বরিশাল শঙ্কর মঠের ধীরেনদা'ও পেছনে আসছিলেন কিচেন-ম্যানেজারের কাছে। তিনি বলে উঠলেন : হবে না কেন। কার হাতের তৈরী দেখতে হবে তো।

সঙ্গী রমেশ দাস প্রশ্ন করলো : কার ?

মেজর সত্য গুপ্ত। সেই "চ্যালেঞ্জ কিপ্ টি।" একাই হকি-ষ্টীক নিয়ে যিনি পঞ্চাশ জনের মহড়া নেবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জানিস্ নে বুঝি সে কাহিনী ? শোন্ তবে—

পনেরো

বরিশাল শঙ্কর মঠের ধীরেন সেন সবারই দাদা—ধীরেনদা। কনফার্মড্ ব্যাচেলরই শুধু নন, স্বপাক আহার করেন এবং তাও বিশুদ্ধ নিরামিষ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিশিপালন ও একাদশীর উপবাস নিয়মমত ভাবে করেন তিনি। ষ্টোভে দু'বেলা নিজের ঘরেই রান্না হয়। নিরামিষাশী বলেই তাঁর ঘি ও মাখন একটু বেশী প্রয়োজন হয়, আর সেরখানেক দুধের পায়েস তৈরী করতে হয় গোটা কতক কিসমিস ও পেস্তা দিয়ে আর বেশ খানিকটে এলাচ-গুঁড়ো ছড়িয়ে। নিরামিষাশী বলেই তাঁর জন্য আধ সের চিনি-পাতা দৈ-এর ব্যবস্থা আছে আর গোটা কয়েক মিষ্টি। ক্ষয়শীল শরীর এই সামান্যতেই কি টেঁকে? তাই রাত্রে খাবার পর তার জন্য কিছু ফলমূল আসে—দু'টো কমলা, একটা আপেল, একটা ন্যাসপাতি, একপো' আঙুর, কিছু মনাক্কা ও একটি নারায়ণগঞ্জের লেমনেড নয়, সোডা।

জীবনধারণের জন্য নেহাৎ যা না-হলে চলে না, মাত্র তাই তিনি নিয়ে থাকেন, উদাস ভাবে এমনি মন্তব্য করে আকাশের পানে চেয়ে থাকেন তিনি। প্রতি মাসে কিচেন-ম্যানেজার বদলি হয় বটে, কিন্তু ধীরেনদা'র এই সামান্য খাদ্য-তালিকার পরিবর্ত্তন নেই!

সমগ্র ভাবে দল-উপদল-নির্ব্বিশেষে রাজবন্দীরা একটা মস্ত উপকার পেয়ে থাকেন তাঁর কাছ থেকে, আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সে কথা স্মরণ করি। বন্দীদের পরীক্ষা দেবার হুজুগ তিনিই তোলেন। বাইরে রাজনৈতিক কাজের চাপে যাঁরা পরীক্ষার জন্য মাথা ঘামাতে পারেননি, এখানে তাঁদের ধীরেনদা মাথা ধার দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখালেখি করে, বার বার কমাণ্ডাণ্ট টবিনের অফিসে হানা দিয়ে তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন যে, শিবিরের মধ্যেই রাজবন্দীদের প্রতিদিন ক্লাস হবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর বাইরের কলেজের বিভিন্ন অধ্যাপক এসে বিভিন্ন বিষয়ে পড়িয়ে যাবেন। ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী থেকে বই আসবার ব্যবস্থাও তাঁরই ব্যবস্থাপনায় সম্ভব হলো।

পড়া ও পরীক্ষার জটিল বিষয়টির পরিচালনার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ধীরেনদা। তিনি সেকালের গ্রাজুয়েট এবং কাজেকাজেই প্রত্যেক চিঠিতেই নীচে নামের পর ছোট করে রেজিষ্টার্ড নম্বরটি উল্লেখ করতে কিন্তু ভুলতেন না।

রাজনীতির কথা উল্লেখ করলেই ক্ষেপে যেতেন তিনি। শুদ্ধ বরিশালের ভাষায় যা বলতেন, তা তাঁর দেশের সৌজন্য ও নম্রতার নমুনা হলেও আমাদের মনে হতো ধীরেনদা বুঝি গাল দিচ্ছেন।

বন্দিজীবনটা যাতে আহার ও নিদ্রায় অপব্যয়িত না হয়, সে জন্য কম-বেশী

সবারই চেষ্টা ছিল জ্ঞান অর্জ্জনের, শরীর গঠনের এবং নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য পালনের।

পরিষ্কার বুঝতে পারি, সে-যুগের দেশপ্রেমের সঙ্গে আজকের দেশপ্রেমের তফাৎ কোথায় ও কতখানি। সে-যুগে দেশপ্রেমকে বলা হতো স্বদেশী আর এ-যুগে একে বলা হয় পলিটিক্স্। পলিটিক্স্-এর বাংলা পরিভাষা নেই, অন্ততঃ ব্যবহৃত হয় না। স্বদেশী আর পলিটিক্স্ শুধু বিভিন্ন নয়, প্রায় পরস্পরবিরোধী। স্বদেশীর পাঠ গ্রহণ করতে হতো শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে, বিবেকানন্দ-বাণীতে, ঋষি বঙ্কিমের আনন্দমঠে এবং অশ্বিনী দত্তের ভক্তিযোগে কিংবা শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম্ম ও জাতীয়তায়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করে উঠে করতে হতো প্রার্থনা, ধ্যান, প্রাণায়াম ও ব্যায়াম। ব্রহ্মচারীর মতো শয়ন করতে হতো ভূমিশয্যায়, গ্রহণ করতে হতো নিছক সাত্ত্বিক আহার, সর্ব্বদা কোপীন এঁটে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে হতো। নারীজাতি স্বদেশীদের কাছে ছিল ভগিনী নয়, মাতা। দেশমাতারই প্রতীক দেশমাতারই প্রতীক বলে মনে করতো তারা নারীকে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নির্ম্মল ব্যক্তিগত চরিত্র ব্যতীত দেশসেবার অধিকারই নেই বলে মনে করতো সে-যুগের স্বশীদেরা। গীতা স্পর্শ করে তারা বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতো।

আর এ-যুগের পলিটিক্সের প্রশ্ন: চরিত্র কি, নির্ম্মলতার সংজ্ঞা কি, চরিত্রের সঙ্গে দেশসেবার সম্পর্ক কোথায়, দেশপ্রেমের মধ্যে নিছক জড়বাদ ব্যতীত আধ্যাত্মবাদের স্থান আছে কি? পলিটিক্স্ স্বদেশীদের ভাবাবেগের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে বস্তুতন্ত্রবাদের ঊষর ময়দানে। গীতা ও কৌপীনকে এরা পেছনে ফেলে এসেছে। সমবেত প্রয়াসে পলিটিক্স্-এ ষ্ট্রাটেজিকেই বড় করে দেখা হয়, স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়াসীদেরকে নয়। তাই ব্যক্তির দুর্ব্বলতাকে পলিটিক্স্ থোড়াই কেয়ার করে চলে। আর মেহনতি জনতার দুর্ব্বলতাই-বা বলবো কাকে? সারা দিন জীবন্ত যন্ত্রের মতো হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যেমন সত্য, সন্ধ্যায় তাড়ির দোকান আর একখানি নথ-নাড়ানো গজলও তেমনি অনিবার্য্য সত্য।

পলিটিক্স্-এর মধ্যে খানিকটে গন্ধ পাই কূটনীতি ও চালাকীর আর স্বদেশী একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট। কোষবদ্ধ অসির মতো পলিটিক্স্ সুযোগের অপেক্ষা রাখে আর নাঙ্গা খড়্গের মতো স্বদেশী সর্ব্বদাই উদ্যত, উন্মুখ। স্বদেশীর তাসগুলো সবই বিছানো টেবিলের 'পরে আর পলিটিক্স্ তাস চালানের কসরৎ করে। পলিটিক্স্ যাঁরা করেন, সবার ওপরে স্থান দেন তাঁরা আদর্শকে আর স্বদেশীরা সেই সঙ্গে যাচাই করে নিতে চায় আদর্শবাদীকেও। প্রশংসাপত্র দেখে নয়, বক্তৃতা শুনে নয়, বাজিয়ে, ওজন করে, অনুভব করে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যানালাইস্ করে। ছলে, বলে কৌশলে অভীষ্ট অর্জ্জনই পলিটিক্সের কাম্য, স্বদেশী কিন্তু উদ্দেশ্যের সাধুতা প্রচেষ্টার ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একটু বেশী রকম সতর্ক।

স্বদেশীতে স্থান নেই কোনো রেণুরই, না শহরের, না গ্রামের, আর পলিটিক্সে এরা শুধু সাথিনী নন, সখীও।

উৎকর্ষ বিচার নয়, আজকের পলিটিক্স্ হয়তো গতকালের স্বদেশীরই সার্থক পরিণতি। অঙ্কুরের সঙ্গে কাণ্ডের আর মিল নেই। না থাকতে পারে। কিন্তু মাটির নীচেকার সৌকুমার্য্যহীন শিকড়কে অস্বীকার করে পারে কি নব নব কিশলয় দিকে দিকে তার শ্যামলিমা বিকীরণ করতে?......

পরীক্ষা পাশের পড়া ছাড়াও ক্লাশ হতো নানা রকমের—কোনোটা ইতিহাসের, কোনোটা অর্থনীতির, আবার কোনোটা আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির। পণ্ডিত রাজবন্দীরা এই সব ক্লাস নিতেন এবং কখনো দল-নির্ব্বিশেষে, কখনো-বা দলবিশেষে শিক্ষানবিশ বন্দীরা তাতে যোগদান করতেন। যাঁরা আর্ট স্কুলে পড়তেন, তাঁরা প্রচুর ছবি আঁকতেন এবং আঁকা শেখাতেন।

সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক নানা নামীয় ও নানা জাতীয় হাতে-লেখা পত্রিকা বেরুতো। প্রত্যেকখানাই ছিল কোনো বিশেষ দলের মুখপত্র। পাঠক রাজবন্দীরাই। প্রত্যেক দলই তার অন্তরের কথা যুক্তিসহ করে প্রচার করতো বন্দীদের মধ্যে হয়তো সংখ্যাবৃদ্ধির আশায়। কিংবা নয়। পত্রিকা-গুলিতে যেমন অনেক ছবি প্রকাশিত হতো, তেমনি হতো অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ। কোনো কোনো পত্রিকা আবার যে-দলের মুখপত্র, সেই দলের বিশেষ সভায় আদ্যপান্ত পাঠ করা হতো।

কিন্তু দলনির্ব্বিশেষে একখানাও পত্রিকা নেই। রাজবন্দীরা এর অভাব অনুভব করতে লাগলেন। কোনো দলের নিন্দা নয়, কুৎসা নয়, কারুর প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির লড়াই নয়, অন্ধের মতো কোনো বিশেষ একটা মতকে অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দেবার অভিসন্ধি নয়, নিরপেক্ষ, বলিষ্ঠ ও নির্ভীক একখানি পত্রিকা বন্দীশিবিরে থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সভা হলো এবং পত্রিকার নামকরণ হলো 'শৃঙ্খল।' পত্রিকাখানি একটি সর্ব্বদলীয় সাহিত্য-সভার পরিচালনাধীনে জনৈক সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর এই সম্পাদক পরিবর্ত্তন করা হবে।

মনে আছে প্রথম সম্পাদক হলেন বরিশালের বিনয় সেন, আর পত্রিকাখানি লেখার ভার পড়লো আমার ওপর। আমার অপরাধ আমার লেখা নাকি মেয়েলি ছাঁদের মত স্পষ্ট ও একই ছাঁচের। সাহিত্য-সভার সদস্যদের সবার নাম আজ আর মনে পড়ে না, তবে এঁদের মধ্যে ছিলেন দেবজ্যোতি বর্ম্মণ, নিবারণ দত্ত, বিনয় সেন, সুধীন সরকার, রাখাল ঘোষ, করালীকান্ত বিশ্বাস, অনন্ত দে ও আমি।

সমস্ত রাজবন্দীর এক মহতী সভায় সমগ্র পত্রিকাখানি নয়, এ থেকে নির্ব্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা পাঠ করা হতো এবং সর্ব্বশেষে

সম্পাদক সম্পাদকীয় পাঠ করতেন। সভান্তে কিচেন-ম্যানেজারগণ অবশ্যই জলযোগের ব্যবস্থা রাখতেন।

একদা ঢাকা জেলে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতার প্যারোডি শুনিয়েই তরুণ-সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ প্রায় অধিকার করে ফেলেছিলাম তরণী বাবুকে বঞ্চিত করে। তারপর অবশ্য সভাপতি সুরেনদা'র বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ফলে নির্ব্বাচিত আমায় বঞ্চিত করে মনোনীত তরণী সোমই গদী আঁকড়ে রইলেন।

এখানেও 'শৃঙ্খলে'র প্রথম সংখ্যাতেই বেরুলো আর একটি প্যারোডি—"দাদার দাদা।" প্রথম সভাতে সুর করে সেই কবিতাটিই আবৃত্তি করলাম যেই মুহূর্ত্তে, সেই মুহূর্ত্তে সারা শিবিরে রটে গেল যে, জি-ও-সি শুধু কাটখোট্টা মিলিটারী ম্যান নয়, কাব্যও জাগে তার মনে। কবিতাটি পাঠকদের উপহার দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

একটু উপক্রমণিকা প্রয়োজন। সে-যুগে দল গড়ার হুজুগ খুব বেশী ছিল। একটি দল তাই অসংখ্য উপদল ও গ্রুপে বিভক্ত ছিল। বৃহত্তর প্রয়োজনে সবাই হাত ও কাঁধ মেলাতে পরাঙ্মুখ না-হলেও, ইংরেজ আমলের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মতো এদের স্বাতন্ত্র্যও যে খানিকটে ছিল, এবং না থাকলেও তারা যে নিয়মোত্তর অধিকার হিসেবে তা ভোগ করতো, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে, বন্দীশিবিরে গ্রুপ-লাডার অর্থাৎ দাদা ছিল সংখ্যাতীত। এই সংখ্যাতীত দাদাদের ব্যঙ্গ করেই লেখা হয়েছিল আমার কবিতা কবি রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি" ভিত্তি করে। এখন আর পারি না বটে, কিন্তু সে-যুগে এমন প্যারোডি বা গান লিখতে পারতাম খুব সহজে এবং বন্ধুরা তার প্রশংসাও করতেন।

সভাপতি হিমাংশু আইন ময়মনসিংহের উকিল। আইনজ্ঞই শুধু নন, পার্লামেন্টি নিয়ম-কানুন একেবারে কণ্ঠস্থ তাঁর। রুলিংগুলো যেমন নিয়মানুগ, তেমনি ব্যক্তিত্বের সঙ্গেই তা প্রয়োগ করেন তিনি। দেবজ্যোতি বর্ম্মণের একটি সারগর্ভ অর্থনৈতিক প্রবন্ধ পাঠের পর হিমাংশু আইন ঘোষণা করলেন: অর্থনীতির জটিল প্যাঁচে নিশ্চয়ই আপনারা গম্ভীর হয়ে উঠেছেন, এবারে এক কাপ গরম কফির মতো একটি কবিতা আপনাদের উপহার দিচ্ছি—"দাদার দাদা।" পাঠ করবেন রচয়িতা স্বয়ং এবং দেখে বিস্মিত হবেন না যে, তিনি আমাদের জি-ও-সি। প্রবল হাততালির মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি সুরু করলাম:

দাদার দাদা তারেই আমি বলি,
ছ্যাবলা তারে বলে দুষ্ট লোক,
রাত্রিবেলা দেখেছিলাম মাঠে
কালো ফ্রেমে চশমা-আঁটা চোখ।
জামা গায়ে ছিল না তার মোটে,

শুধু চাদর পিঠের 'পরে লোটে,
ক্যাবলা ? তা সে যতই ক্যাবলা হোক',
দেখেছি তার চশমা-আঁটা চোখ।

রাত্রি বেড়ে দশটা হলো যেই
উঠলো বেজে টবিন চাচার বাঁশী,
দাদার দাদা ভাইকে ছেড়ে দিয়ে
ব্যারাক ঘরে ত্রস্তে উঠে আসি।
ঘড়ির পানে বারেক হানি ভুরু,
শয্যা নিয়ে পঠন করে সুরু।
মূর্খ ? তা সে যতই মূর্খ হোক্,
দেখেছি তার দাদা হবার ঝোঁক।

পুবের আলো এলো জানলা-পথে,
সিপাই এসে দিল খুলে তালা,
ভাইকে এসে তুললো দাদা ডেকে
এবার সুরু বক্‌বকানির পালা।
কারুর পানে দেখলে নাকো চেয়ে,
ভাবের ঘোরে নামলো মাঠে যেয়ে।
গবুচন্দর ? যতই গবু হোক্,
তবুও সে আস্ত ছিনে জোঁক।

এমনি করে আসছে কত দাদা,
ভর্ত্তি হয়ে উঠলো বন্দীশালা
ভাই বলে আর থাকবে না যে কেউ
দাদার গলায় পরিয়ে দিতে মালা।
এ সব ভেবে হঠাৎ রজনীতে
দুখের কালো ঘনিয়ে আসে চিত্তে।
ফাল্‌তু ? তা সে যতই ফাল্‌তু হোক্
দাদার দাদা তাকেই বলে লোক।

মনে পড়ে, সভান্তে আড়ালে ডেকে নিয়ে সভ্য বাবু আমায় কয়েকটা অতিরিক্ত কাঁচাগোল্লা খাইয়েছিলেন প্রশংসাপত্রের পরিবর্ত্তে।

ফুটবল খুব তাড়াতাড়িই নামিয়ে দিলাম আমরা। সম্পাদক নির্ব্বাচিত হলেন কমরেড কুশা রায়। কমরেড তাঁকে কেন বলা হতো জানি নে।

কম্যুনিজম্-এর যে ক্ষীণ ধারা তখন সবে এসেছে, কুশা বাবুর মনে তো তার রং লাগেনি। তবে?

একটা কথা মনে পড়ে, কম্যুনিজমকে অত্যন্ত ধারালো ব্যঙ্গোক্তির সম্মুখীন হতে হতো তখন। একজনের তেল, সাবান, টুথপেষ্ট প্রভৃতি অপরে নিয়ে গেলেই তাকে ব্যঙ্গ করে বলা হতো: এই রে, কম্যুনিজম চালাচ্ছে। মন্তব্য করা হতো একেবারে প্রকাশ্যেই: কমিউনিষ্টদের কী সুবিধে দেখেছিস্? পরের ওপর দিয়ে বেশ দিব্যি তেলটা সাবানটা চলছে আর এদিকে নিজের এ্যালাউন্সের টাকা দিয়ে কেনা হচ্ছে, Capital, Memories of Lenin আর Ten Days That Shook The World.—বেশ মজা নয়?

খুব সমঝে চলতেন কমিউনিষ্টরা সে-যুগে। আকাশচুম্বী সমুদ্রে বারিবিন্দুসম তিন শতাধিক রাজবন্দীর মধ্যে মাত্র দশ-বারো জন। যেমন মাথা নীচু করে এসে তাঁরা খাবার-ঘরে প্রবেশ করতেন ব্রীড়াবনতা গ্রাম্যবধূর মতো, তেমনি নিঃশব্দে আহারান্তে বেরিয়ে যেতেন শেয়ার মার্কেটে সর্ব্বস্বান্ত ঝুনঝুনওয়ালার মতো।

বিতর্কমূলক সর্ব্বপ্রকার আলোচনাকেই সযত্নে চলতেন পাশ কাটিয়ে। কিন্তু এই দশ-বারো জনের জন্যেই ছিল পৃথক্ একটি চৌকা। এঁরাই স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির উন্মাদনায় এমনি পৃথক্ হাঁড়ীর আশ্রয় নিয়েছেন, না সাধারণ বন্দীরাই এঁদের অপাংক্তেয় করে দিয়েছিল, তা জানা যায়নি। বক্রদৃষ্টিক্ষেপে আমিও যে তাঁদের বিঁধতাম না তা নয়, কিন্তু আজ স্বীকার করতে সংকোচ নেই যে, উত্তরকালে তাঁদের মধ্যে থেকেই অনন্যসাধারণ একাধিক কর্ম্মীর সৃষ্টি হতে দেখেছি।......

খেলার মাঠটি দৈর্ঘ্যে ছোট। একদিকের গোটা কয়েক আম গাছ কেটে ফেলার প্রস্তাব নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা একদিন প্রভাত নাগের নেতৃত্বে কমাণ্ডাণ্ট টবিনের অফিসে গিয়ে হাজির হলেন।

মিলিটারী ম্যান টবিন। একেবারে সম্ভ ইয়োরোপ থেকে আমদানী। তাকে বোঝানো হয়েছে যে, আমরা সব War prisoners—যুদ্ধবন্দী। কোথায় ও কবে এই যুদ্ধ হলো, এই প্রশ্ন টবিনের মনে জাগতে পারে বলে তাকে এ-ও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আমরা গোপনে যুদ্ধের আয়োজন করছিলাম জার্ম্মানীর সহযোগিতায়। ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে ইংরেজ গুপ্তচরদের কর্ম্মতৎপরতায়।

সুতরাং প্রতিনিধি দলকে অপেক্ষা করতে হলো কেবিনের বাইরে। সাহেব কার সঙ্গে কথা কইছেন।

গোপাল গুপ্ত একটু উগ্র রকমের লোক। বললেন: চলুন না, প্রভাত বাবু, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ি। ব্যাটা আমার লাট সাহেবের বাচ্চা আর কি!

অনন্ত দে ধীর প্রকৃতির মানুষ। বাধা দিলেন: একটুখানি দেখাই যাক না, গোপাল বাবু। বেশী দেরী করলে তখন সে পথ আমাদের আটকায় কে?

প্রভাত নাগ সমর্থন করলেন : আর এসেছি যখন স্বার্থোদ্ধারে। সুতরাং কৌশলে—

সুধীন সরকার বললেন : ও-সব কৌশল-টৌশল টবিন চাচার কাছে অচল, প্রভাত বাবু! দেখবেন ওর গোঁ!

মিনিট দশেক পর টবিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সহকারী কম্যাণ্ডাণ্ট গিরিজা দত্ত এক বোঝা ফাইল নিয়ে। অপেক্ষমান প্রতিনিধিদের দেখে একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন : আরে, আপনারা! অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি? সাহেবের কাছে যাবেন? একটু অপেক্ষা করুন প্লিজ, এক সেকেণ্ড! এই ফাইলগুলো রেখে আসছি।

পঁয়তাল্লিশ বছরের গিরিজা পঁচিশ বছরের যুবকের মতো যেমন তড়াক করে নিজের দপ্তরে প্রবেশ করলেন ফাইলের বোঝা নিয়ে, তেমনি আবার সড়াক করে বেরিয়ে এলেন হাত খালি করে। চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন : ছি, ছি, ছি!……আপনারা এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে? কতক্ষণ এসেছেন, প্রভাত বাবু?

জবাব দিলেন গোপাল গুপ্ত : তা পনেরো মিনিট তো হবেই। সাহেব হয়তো কাজে ব্যস্ত, একটু অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু বসবার জায়গা—

বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে!—গিরিজা সীমাহীন বিস্ময়ে চশমা-ঢাকা চোখদু'টি একেবারে কপালে তুললেন : পনেরো মিনিট এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? কেন, বেয়ারাগুলো কি সব মরেছে নাকি?—এই দল বাহাদুর, ইধার আও!

দল বাহাদুর এসে বুটের আওয়াজ তুললো। গিরিজা কণ্ঠস্বরে প্রভুর গাম্ভীর্য্য এনে জিজ্ঞেস করলেন : ইন্ বাবুলোগ কব্ আয়া থা?

সায়েদ, আধা ঘণ্টা হোগা!—দল বাহাদুর নিবেদন করলো।

এত্‌না টাইম তক্ বৈঠনে কেঁও নেই দিয়া তুম?

দল বাহাদুর মিনমিন করতে লাগলো। ভাবখানা এই, বলেছিলাম বসতে, কিন্তু এঁরা—

ঝুটা হায়!—গর্জ্জে উঠলেন গিরিজা : তুম বেয়াকুপ হায়, উল্লু হায়। ফের এইসা হোনেসে তুমারা নকরি হাম খতম কর দে গা।—যাও।

চলে গেল দল বাহাদুর আবার বুটের আওয়াজ তুলে। মহা দুঃখে গিরিজা একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন : আর বলেন কেন, প্রভাত বাবু! এই সব জংলী নিয়ে কাজ করা যে কী হ্যাঙ্গাম, তা আর বলে শেষ করা যায় না। কোন্ জঙ্গল থেকে যে—

বাধা দিয়ে সুধীন সরকার বললেন : যাক্ সে কথা। এখন সাহেবের কাছে যাওয়া যাবে কি না তাই বলুন।

বিলক্ষণ, সে কথা আর বলতে!—গিরিজা প্রতিনিধি দলকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে টবিনের কেবিনে প্রবেশ করলেন।

এই গিরিজা দত্ত। ঝানু লোক। যেমন প্রখর বুদ্ধি, তেমনি কৌশলে কাজ হাঁসিল করে নেবার ফন্দী এঁর কণ্ঠস্থ। আশ্চর্য্য, অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও এঁর মাথা একেবারে ঠাণ্ডা থাকে। টবিনের সামরিক গোঁয়ারতুমিকে যুক্তি ও কৌশলের প্রলেপ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখাই এঁর প্রধান কাজ। কূটবুদ্ধিতে ইংরেজের দোসর নেই। তাই সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে সাহেবদের নিয়োগ করে তাদের সহকারী বা মন্ত্রণাদাতা হিসেবে বসিয়ে রাখতো বাঙালীদের। বাঙালী রাজবন্দীদের ভাবগতিক এঁরাই তো নির্ভুল ভাবে বিচার করতে পারবেন। পান থেকে চুণ খসলেই রাইফেল চালাবার বিদ্যায় টবিন পটু, কিন্তু পড়ে-যাওয়া চুণকে তুলে নিয়ে আবার এক খিলি মিঠে পান তৈরীর কূট চালে গিরিজা দত্তের তুলনা নেই।

টবিন মনে করতো রাজবন্দীদের তরফ থেকে কোনো আবেদন এলেই তা অগ্রাহ্য করতে হবে, নইলে সরকারী প্রেষ্টিজ ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। তাই, আমাদের আম গাছ কাটবার প্রস্তাব প্রথমটা সে কানেই তুললো না, তার পর sweet mango fruit বলে নানা ওজর-আপত্তি তুললো, তার পর অকস্মাৎ গিরিজার চোখে চোখ পড়তেই সুর নরম করে বললো : আচ্ছা, দেখা যাবে।

পরদিন সত্যিই দেখা গেল। গাছগুলো কেটে ফেলার ফলে আমাদের মাঠ প্রায় বিশ হাত বেড়ে গেল দৈর্ঘ্যে।

টিম তৈরী হলো অনেকগুলো। ব্যারাক ও দল-নির্ব্বিশেষে যে যাকে পারে টেনে নিয়ে টিম গঠন করে ফেললো। কয়েকটি টিমের নাম মনে আছে, যথা, Y. L. R. (Young Light Runners), N. Y. R. (Nine Young Runners), Red-white, Retired Nine, Winners Nine এবং Biswagutani (বিশ্বগুঁতানি)। এর মধ্যে বিশ্বগুঁতানি টিমটির একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। এর খেলোয়াড় হবার যোগ্যতা সকলের ভাগ্যে জুটতো না। খেলা জানা-না-জানা ছিল গৌণ ব্যাপার, এ টিমে যোগদানের প্রধানতম যোগ্যতা অর্জ্জন করতো তারাই, যাদের বুকের ছাতি অন্ততঃ চল্লিশ ইঞ্চি। বলকে লাথি মারলেই দূরে সরে যায় এবং প্রতিপক্ষকে নেহাৎ কুস্তি বা জুজুৎসুর প্যাঁচ না মেরে পা ছুঁড়ে রুখতে হবে—এই দু'টি সত্য অন্তরে গেঁথে রাখলেই বিশ্বগুঁতানির সভ্য হওয়া চলতো। এঁদের দলপতি ছিলেন বরিশালের অজিত দাস, আর সভ্য ছিলেন টিটু নাহা, অনিল চক্রবর্ত্তী, দিলীপ দাস, সুধীর গুহ, রমেশ চক্রবর্ত্তী, অনিল চক্রবর্ত্তী ও আরও কয়েক জন।

দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এপ্রিল মাসেই ফুটবল লীগ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্রিকা 'শৃঙ্খলে'র বিশেষ দৈনিক সংখ্যা প্রকাশিত হতে লাগলো এই খেলাকে উপলক্ষ্য করে। সম্পাদক ছিলেন বরিশালের বিনয় সেন এবং প্রকাশক আমি। মুদ্রাকরও আমায় বলা যায় এবং কম্পোজিটরও। কারণ সারা পত্রিকাখানা আমারই হাতে লেখা। প্রতিদিন অপরাহ্ণে খেলার মাঠের পাশের দেয়ালে সেঁটে দেয়া হতো দৈনিক 'শৃঙ্খল'।

ভিড় পড়ে যেত পড়বার জন্যে। খেলার ও খেলোয়াড়ের তীক্ষ্ণ সমালোচনা ছাড়াও থাকতো চমৎকার কার্টুন-ছবি খেলোয়াড়, রেফারী বা দর্শকদের নিয়ে। বীরেন ঘোষ একদিন হেড করতে লাফিয়ে উঠে বল্ নাগাল না পেয়ে নির্ব্বিবাদে দু'হাত তুলে ভলি মেরে বসলো।—ব্যস্, আর যায় কোথা। পরদিনের 'শৃঙ্খলে' দেখা গেল তার ছবি। নীচে লেখা ষ্টাফ ক্যামেরাম্যান কর্ত্তৃক গৃহীত আর ক্যাপশন: Oh! my old days of Volley!

মাঠের এক দিকে ছিল ছাঁটাই-করা মেহেদীর বেড়া; লাইন থেকে প্রায় দশ হাত দূরে। তাহলে কি হবে, হরিদাস সেন একদিন অমিয় মজুমদারকে চার্জ্জ করে একেবারে সেই বেড়ার ওপরে নিয়ে গিয়ে পড়লো। অমনি পরদিন বেরুলো ষ্টাফ ক্যামেরাম্যানের ছবি আর ক্যাপশন: বেড়া সরাইয়া দিবার জন্য টবিনের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। এই জাতীয় কার্টুন অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন টিটু নাহা, অতুল গুপ্ত, নরেন সরকার প্রভৃতি।

বাইরে লীগ খেলায় যা হয়, আমাদের এখানেও তাই হতে লাগলো। পার্কার বা লেদার ট্রাঙ্কের লোভ দেখিয়ে খেলোয়াড় ভাগানো, রেফারীর ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, প্রতিবাদ, প্রতিবাদের প্রতিবাদ, লীগ কমিটির অবিশ্রান্ত অধিবেশন, জরুরী বৈঠক, বিরোধী দলের সভা-কক্ষ ত্যাগ প্রভৃতি সবই চলতে লাগলো।

আমাদের টিমের নাম ছিল Y. L. R. এবং শশাঙ্ক (ওরফে কমেট) দাশগুপ্ত ছিল এর অধিনায়ক। খেলতো অশোক রায়, দীনেন ভট্টাচার্য্য, অমিয় মজুমদার, জ্যোৎস্না সরকার, বিভূতি চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ভোলা বসাক, কমরেড কুশা রায় ও আমি। দীনেন ভট্টাচার্য্য, অমিয় মজুমদার, কমরেড কুশা রায় ও অশোক রায় ময়মনসিংহ পণ্ডিতপাড়া টিমে খেলতেন। এই টিম সে-যুগে দুর্দ্ধর্ষ মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও পাল্লা দিত। কমেট ঢাকার এক জন নামজাদা খেলোয়াড় ছিল। আর সারা বিক্রমপুরেই তখন আমার খ্যাতি ছিল। সুতরাং লীগ চ্যাম্পিয়নশীপ আমাদের ভাগ্যেই যে জুটবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

চ্যাম্পিয়নশীপ নির্দ্ধারণের শেষ খেলাটি ছিল ৩০ শে এপ্রিল, ১৯৩২ সাল। ভোরেই দেয়ালে-দেয়ালে কতকগুলো বেনামী প্রাচীরপত্র দেখা গেল: প্রবল জনরব যে, ওয়াই-এল-আরের অধিনায়ক কমেট দাশগুপ্ত প্রতিপক্ষ রেড হোয়াইট দলের অধিনায়ক অনন্ত দে'র হোল্ডঅল দানের প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়া অসুস্থতার ওজর দেখাইয়া অদ্যকার খেলায় অংশ গ্রহণ করিবেন না। এমনি রোমাঞ্চকর আরো কতকগুলি।

শিবিরের একমাত্র নির্দলীয় নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্র 'শৃঙ্খলে'র দপ্তর বসে গেল। বিনয় সেনের বুলি আর আমার কলম। কলম হাতে নেয়া আর আগুনে হাত দেয়াকে বিনয় সেন একই রকম শক্ত কাজ মনে করতেন। অথচ ভদ্রলোক মুখে মুখে বলতেন চমৎকার কবিতা, সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও

মুখরোচক সমালোচনা। এক তা' ফুল্স্ কাপ কাগজ নিয়ে পার্কার পেনটি খুলে সবে লেখা সুরু করেছি, এমনি সময় অকস্মাৎ কুমিল্লার সুকুমার ভৌমিক একখানা 'ষ্টেটসম্যান' এনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন: হো গিয়া, দ্বিজেন বাবু, কেল্লা ফতে হো গিয়া। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস শট ডেড্।

অ্যাঁ, কই দেখি।—বলে 'ষ্টেটসম্যানখানা' হাতে তুলে নিতেই সুকুমার বাবু বললেন: ওতে কোথায় পাবেন? সাবধানে ওটুকুতে কাঁচি চালিয়েছে শালা পবিত্র।—এই দেখুন।

প্রশ্ন করলেন বিনয় সেন: তবে সংবাদ পেলেন কি করে?

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে সুকুমার বাবু জবাব দিলেন অনুচ্চ কণ্ঠে: কম্পাউণ্ডার একখানা আনন্দবাজার এনেছে লুকিয়ে।

সুতরাং বিপদে পড়া গেল। লীগ ফাইন্যালের গুরুত্ব যতই থাক, 'শৃঙ্খলের' তাগিদ যতই থাক, এমনি উত্তেজনাকর সংবাদ পাবার পর বিনয় সেনের ভাষাও যেমন গেল ফুরিয়ে, তেমনি আমার কলমেরও যে কালি গেল শুকিয়ে।

অবিশ্বাসী সম্পাদক তথাপি প্রশ্ন করলেন: আজকের লীগ খেলাটা পণ্ড করে দেবার জন্যে অনিষ্টকারীদের এ-ও একটা গুলবাজী নয় তো? আজকের প্রতিযোগী দল দু'টির একটিতে যে আপনি আছেন, সুকুমার বাবু!

কিন্তু গুলবাজী মোটেই নয়। দাবানলের মতো এই সংবাদ রটে গেল যে, মেদিনীপুরের নিহত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ণেল পেডির শূন্য আসনে এসেছিলেন মিঃ আর. ডগলাস। ৩০শে এপ্রিল জেলা বোর্ডের একটি সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি। জেলার নানা জাতীয় জটিল বিষয় নিয়ে যখন তাঁরা আলোচনায় নিমগ্ন, তখন অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করে দু'টি কিশোর, বালকও বলা যায়। ডগলাসের পশ্চাতে দেহরক্ষী ও জনকতক আর্দ্দালী ছিল দাঁড়িয়ে। এদেরই দলে এসে দাঁড়ায় এরা নীরব দর্শক বা শ্রোতার মতো। ডগলাস সাহেব একবার যেই সোজা হয়ে বসে কোনও ব্যাপারে সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দিচ্ছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ পর-পর রিভলভার গর্জ্জে উঠলো দু'জনের হাতে। একটি গুলী এসে বিদ্ধ হলো চেয়ারে হেলান দেবার কাঠে, আর একাধিক গুলী পিঠের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ডগলাস সাহেবের ফুসফুস ফুটো করে দিল। সাহেব ঢলে পড়লেন প্রথমে চেয়ারে, তার পর মেঝেতে।

দেহরক্ষী ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাত দিল রিভলভারে। কিন্তু ততক্ষণে আততায়ীদ্বয় পগার পার! সুতরাং সে দাঁড়িয়ে গেল প্রভুর মৃতদেহ রক্ষার জন্য। আর্দ্দালী ও অন্যান্য লোক দু'জনকে তাড়া করে অবশেষে এক জনকে ধরে ফেলে, তার নাম প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য বলে জানা গেছে।

—পড়ে রইলো দৈনিক 'শৃঙ্খলে'র বিশেষ সংখ্যা। বিনয় সেন গেলেন ইষ্টার্ণ ব্যারাকের দিকে, সুকুমার বাবু তো পূর্ব্বেই উধাও, আর আমি ধীরে ধীরে গিয়ে হাজির হলাম ডবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরে।

লীগ ফাইন্যাল পরদিন হবে বলে কমরেড কুশা এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন, সত্য বাবু বিশেষ ঘোষণা জানিয়ে দিলেন ব্যারাকে ব্যারাকে : আজ রাত্রিকালে প্রত্যেকের জন্যে একটি করে বেলে হাঁসের রোষ্ট তৈরী হবে। রোষ্ট যাঁরা খান না, তাঁরা পূর্ব্বাহ্নে কিচেন-ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন।

রাত দশটা পনেরো মিনিটে দরজা বন্ধ হয়ে গেলে অমরকে ডাকলাম। সে নিঃশব্দে এসে আমার টেবিলের পাশে চেয়ারে বসলো। আড়-চোখে চেয়ে দেখলাম সমরেন্দ্র পাল ঘুমোবার উদ্যোগ করছেন। সুধাংশু বাবুও তাই। নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলাম : প্রদ্যোৎ কেমন?

অমর রহস্যপূর্ণ চোখ তুলে চেয়ে রইলো আমার পানে, জবাব দিল না কিছু।

বললাম : কিন্তু আজকের সভা ও বৈঠকগুলোর সংবাদ পেয়েছ তো? প্রত্যেকটা গ্রুপই দাবী করছে এ কাজ তাদের ছেলেরাই করেছে। এমন কি, অনুশীলনের হুগলী গ্রুপ তো একটা প্রস্তাবই গ্রহণ করেছে যে, বাইরে যারা এখনো আছে, তাদের কাছে নির্দ্দেশ পাঠাবে প্রদ্যোতের মামলা চালাবার জন্যে একটা তহবিল গঠন করবার। শুনেছ তো সব কিছু?

এবার অমর মৃদু হাস্য করলো মাত্র। এমনিই সে। এ-সব বিষয়ে তার মুখ খোলানো দুরূহ কাজ। আবার মন্তব্য করলাম : কিন্তু আই-বি ওকে দারুণ ঠ্যাঙ্গাবে। পর-পর দু'টো ম্যাজিষ্ট্রেট গেল! সোজা কথা নয়! পেডি সাহেবও যায় গত এপ্রিলে। ঠিক এক বছর।

অমর এইবার কথা কইলো : ঠ্যাঙ্গালেও কিছু বেরুবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই সব চালিয়াৎদের সভা ও প্রস্তাবের অবসানের জন্যে আরও বিস্তৃত সংবাদ প্রয়োজন, তাই না? ক্রেডিট নেবার হুজুগ তাহলে একদিনেই যায় থেমে।

অমর নিঃশব্দে হাসলো এবং পুরু কাচের আড়াল থেকে রহস্যময় চোখদু'টি মেলে আবার চেয়ে রইলো আমার চোখের পানে।

এর কয়েক দিন পরই সকল সন্দেহ ও গবেষণার সমাপ্তি ঘোষণা করে, ফাঁকি দিয়ে যারা ক্রেডিট নিচ্ছিলো, তাদের সবার মুখে চুণকালি লেপন করে, আলোচনা-সভা ও প্রস্তাবের মূলে কুঠার হেনে কম্পাউণ্ডার মারফৎ আনীত আর একখানা আনন্দবাজারে সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রদ্যোৎ পুলিশের নিকট যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে জানা যায়, মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তার সহপাঠী অমর চট্টোপাধ্যায় বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা দেবার জন্যে তাকে নিয়ে যায় পরিমল রায়ের কাছে। তারই মুখে সে শুনেছিল যে, ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে কে একজন দাশগুপ্ত নাকি সর্ব্বপ্রথম মেদিনীপুরে এসে পরিমল রায়কেই সর্ব্বাগ্রে দলে ভর্ত্তি করে। এ-ও শোনা গিয়েছিল যে, দাশগুপ্ত ঢাকার বি-ভি দলের সভ্য।

ব্যস্, থেমে গেল দল ও উপদলের গুনগুনানি। সবাই বক্র দৃষ্টিক্ষেপে আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে সরে পড়তে লাগলো একে-একে। পরিমল রায় তখনো এই শিবিরেই আছে, আর অমর তো আমার ঘরে আমারই পাশের সীটে বাস করে।......

ষোল

শুধু কম্পাউণ্ডার কেন, গোটা কয়েক গাড়োয়ালী সিপাইকেই আমরা রিক্রুট করে ফেলেছিলাম, যারা বাইরের যাবতীয় সংবাদ ও খানকতক নিষিদ্ধ সংবাদপত্র সরবরাহ করতো নিয়মিত ভাবে। কিন্তু এই গুপ্ত সংবাদ জানতো রাজবন্দীদের মধ্যে মাত্র ক'জন। সংবাদপত্র পড়বার সৌভাগ্যও জুটতো বাছা-বাছা বন্দীদের। অপরে পেত খবর মুখে-মুখে। দিবাকর সেনগুপ্তের সাকরেদ যারা বন্দী হয়ে এসে আমাদের গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে "যথাস্থানে" প্রেরণ করতো, তারা দারুণ একটা সন্দেহ পোষণ করলেও ঠিক কোন্ পথে যে এই স্মাগলিং চলছে, তা হদিস করতে পারতো না।

পারবে কোত্থেকে ? কম্পাউণ্ডার বঙ্কিম বাবু এমনি গম্ভীর হয়ে থাকেন যে, দেখে বিরক্ত হতে হয়। ডাক্তার সরকার সাধারণ ডাক্তারদেরই মতো খুব আলাপী এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে তিনি মেসোপোটমিয়ার কোন্ রণাঙ্গণে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, প্রায়ই তার কাহিনী সালঙ্কারে আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। আর বঙ্কিম বাবু নীরবে এগিয়ে এসে টেবিলের পাশে থাকেন দাঁড়িয়ে। বন্দীরা কদাপি মিকশ্চার খান না, তাই কম্পাউণ্ডারের কাজ হচ্ছে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আলমারী খুলে পেটেণ্ট ওষুধের বোতল বা শিশি বার করে দেয়া মাত্র !

কিন্তু এরই মধ্যে অকস্মাৎ রোগী যতীশ গুহ বলে উঠলেন : যাই বলেন ডাক্তার বাবু, ঐ এ্যাগারল হোক বা এ্যাগারয়েলই হোক, আপনার কারমিনেটিভ মিকশ্চারই আমার পক্ষে বেশ ভালো। রাত্রে খাবার পরে এক দাগ খেয়ে ঘুমুলেই আর দেখতে হবে না—সকাল বেলা অল্ ক্লিয়ার।

ডাঃ সরকারের বাঁধানো দাঁতের প্রায় বত্রিশটাই দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে যতীশ গুহ কম্পাউণ্ডারের পশ্চাতে তাঁর কম্পাউণ্ডিং কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে বঙ্কিম বাবু শুধু কারমিনেটিভই দিলেন, না আরও কিছু হস্তান্তর করলেন, তা জানা গেল না। এদিকে আমরা ডাঃ সরকারের মধ্য-প্রাচ্যের লোমহর্ষণকারী অভিজ্ঞতার কথা আবার শোনবার জন্মে তাঁকে উসকিয়ে দিয়েছি ; সুতরাং চলছে মেশিন বক্-বক্ করে। ওদিকে কাজ হাঁসিল হয়ে গেল।

রাত বারোটায় সমগ্র শিবির যখন গভীর ঘুমে অচেতন, তখন বারান্দায় পাহারা-রত বন্দুকধারী একটি সিপাই ইষ্টার্ণ ব্যারাকের চার নম্বরের দরজার শিকের সমুখে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত রকমের গলার শব্দ করলো, অনেকটা খুসখুসে কাসির মতো। সুধাংশু ভটচায্যের মশারীতে সে শব্দ প্রতিধ্বনি তুললো। অন্ধকারেই বেরিয়ে এলেন ভটচায্য মশাই। প্যাকেট নিয়ে এসে আবার প্রবেশ করলেন মশারীর অভ্যন্তরে।

কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন সকালে সেন্সর করবার পর পাঠাতেন অনেকগুলো 'ষ্টেটস্ম্যান'। সেন্সর করবার জন্মে আই-বি অফিসার পবিত্র সরকার ওখানে

স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত ছিলেন। যে-কোনো সংবাদ তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হতো, সেটুকুই তিনি সাবধানে কাঁচি চালিয়ে কেটে নিতেন, অপর পৃষ্ঠার ক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না তিনি। এমনি অস্ত্রোপচার করা জানালা-দরজাওয়ালা পত্রিকা আমাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটতো।

জুন মাসের প্রায় মাঝামাঝি গোপনে আমদানী একটি পত্রিকায় মারাত্মক একটি সংবাদ পাওয়া গেল। চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামের একটি গৃহে এক দল গুর্খা সেনা হানা দেয় ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে। সেই গৃহে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার জনকতক পলাতক আসামী ছিলেন আর তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রীতিলতা ওয়াদেদার, নির্ম্মল সেন, অপুর্ব্ব সেন ও স্বয়ং মাষ্টারদা। কয়েক ঘণ্টা উভয় পক্ষ থেকে গুলি বর্ষণের পর দেখা যায় ক্যাপ্টেন ক্যামেরন বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত আর গুর্খা সেনার গুলীতে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন বিপ্লবী অপুর্ব্ব ও নির্ম্মল সেন। প্রীতি ও মাষ্টারদা সতর্ক ও সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টনীর মধ্য দিয়েই নির্ব্বিঘ্নে পলাতক।......

সেদিন রাত্রে ভালো করে ঘুমই এলো না আমার। বার বার মনে হতে লাগলো মাষ্টারদা'র কথা। চট্টগ্রামের অনেক বন্দী ছিলেন। তাঁদের মুখে এই লোকটির অসমসাহসিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বহু শুনেছি। পুলিশের সতর্ক তল্লাসীকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা দু'-একখানা ছবিও এনেছেন তাঁর। দেখেছিলাম সে ছবি। টাক-পড়া মাথা, চোয়াল উঁচু, গাল তোবড়ানো, ভগ্নস্বাস্থ্য আর শুনেছি খর্ব্বকায়। শুধু সাধারণ নয়, অতি শোচনীয় ভাবে নিম্নশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। ব্যক্তিত্ব তো দূরের কথা, দশ জনের সমুখে দাঁড়িয়ে কথা কইবার হিম্মৎ আছে বলে মনে হয় না। গলাবন্ধ কোটের নীচে পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা খানকয়েক সরু হাড়ের কোটরে ধুক্‌-ধুক্‌ করে যে যন্ত্রটি চলেছে, ছবি দেখে মনে হয় ক্যামেরনের একটা হুমকিতেই সেটা ঠক্‌ করে থেমে যাওয়া উচিত ছিল। শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, আকৃতি দেখে মনে খানিকটে অবজ্ঞা জাগলেও নালিশ করবার কিছু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এবং বিশ্বের আশ্চর্য্যতম সত্য যে, এই অতি সাধারণ ইস্কুল-মাষ্টারটি চমক লাগিয়ে দিয়েছেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে। একটি চুম্বকের মতো দুর্নিবার বেগে টেনে এনেছেন চট্টগ্রামের জাগ্রত যৌবনকে, অকস্মাৎ বৈদ্যুতিক অভ্যুত্থানে কুকুরের মতো বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন সেখানকার পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে। ড্যাবডেবে দু'টি চক্ষুর নীল সাগরের কোন্‌ অন্ধতলে আগ্নেয়গিরির অগ্নিকণা লুকিয়ে আছে, ছবি দেখলে আদৌ হদিস পাওয়া যায় না তার। যেন একটি অনির্ব্বাণ বয়লার; মোটা ইস্পাতের পাত দিয়ে ঢেকে অন্ধকার করে রাখা হয়েছে।

চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব-সুর্যের একটি উত্তপ্ত রশ্মি। চট্টল-গগনে তাঁর উদয়। অস্ত নেই তাঁর। যুগে-যুগে কালে-কালে বিপ্লবীর রক্তরাঙা পথে সেই অম্লান রশ্মি আলোক বিকীরণ করবে।......

বহরমপুর বন্দীশিবিরের বন্দীবাহিনী বিপ্লবী নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেনের উদ্দেশ্যে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করলো। ওয়েষ্টার্ণ এনেক্সি ও ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর ওপর অপূর্ব্ব ও নির্ম্মল সেনের প্রতিকৃতি। এঁকেছেন তাঁরই কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পাশে হিমাংশু সেন এবং আরো উনিশ জন শহীদের নাম-ফলক।

এ সব ব্যাপারে কোনো সভাপতি থাকেন না, বক্তৃতাও হয় না। সেনাদল বেদীর পানে মুখ করে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ায়। জি-ও-সি মুখপাত্ররূপে চার পা এগিয়ে যান বেদীর পানে, তার পর ঠকাস্ করে বুটের শব্দ করে হুকুম করেন: In profound respect to the deathless martyrs Sa—lute!

জি-ও-সির সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্যালুট করে।

তার পর জি-ও-সি বেদীর' পরে ওঠেন। বেদীর উপর রক্ষিত প্রতিকৃতি ও নাম-ফলকগুলির আবরণ উন্মোচন করে মাত্র এক মিনিট বক্তৃতা করেন: কমরেডস্, আজ দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করছি, কমরেড নির্ম্মল ও অপূর্ব্ব সেন ইংরেজের গুলীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, প্রীতিলতা ও মাষ্টারদা ক্যাপ্টেন ক্যামেরনকে হত্যা করে পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। আজ আমরা স্মরণ করি শহীদ নির্ম্মলকে, শহীদ অপূর্ব্বকে আর বাংলা ও ভারতের অগণিত শহীদদের। আমাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তাঁরা আশীর্ব্বাদ করুন, এই কামনা।

In memory of the innumerable martyrs, Comrades, Sa—lute!

সবাই স্যালুট করে।

সেদিনকার গার্ড অব অনার প্রদর্শনের শেষে চট্টগ্রামের জ্যোতিশ্বর চক্রবর্ত্তী আমায় একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন: The real G. O. C. of the Liberation Army of India। সত্যিই আপনার সৈন্যবাহিনী পরিচালনা ও সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার বলিষ্ঠ রীতি বিপ্লবীদের পক্ষে অনুকরণীয়। আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশেষণে সবিশেষ লজ্জিত হলাম।

সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ হতো প্রতিদিন ভোর ছ'টায়। সাড়ে পাঁচটায় সিপাই এসে দরজা খুলে দেবার পর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে মাঠে এসে হাজির হওয়া কঠিন বলে সবাইকেই শয্যাত্যাগ করতে হতো রাত চারটেতে। যখন আর দশ মিনিট বাকি, তখন অর্ডারলি অমর চাটার্জী প্রত্যেক ব্যারাকের নিকটে গিয়ে বাঁশী বাজিয়ে সতর্ক করে দিয়ে আসতো।

শুধু মিনিটের কাঁটাই নয়, সেকেণ্ডের কাঁটাটিও যখন ঘাটের কোঠায় এসে

ঠেকতো, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জলদগম্ভীর স্বর শোনা যেত জি-ও-সির : কম্‌রেড্‌স্‌, ফল ইন্‌।

তারপর এক ঘণ্টা চলতো কুচকাওয়াজ। এক সেকেণ্ড দেরী হলেও কেউ রেহাই পেত না।

একদিন হরিদাস সেন দেরী করে আসাতে দশ মিনিট তাঁকে ডবল মার্চ্চ করতে হয়। আর এক দিন করালী বিশ্বাসকে অভিনব শাস্তি নিতে হয়। বাহিনীকে মার্চ্চ করবার হুকুম দিয়ে করালীকে নির্দ্দেশ দেয়া হলো সর্ব্বদাই সমগ্র বাহিনীর বিশ গজ সম্মুখে থেকে তাকে মার্চ্চ করতে হবে। লীডারের মতো মাতব্বরি পদক্ষেপে বেশ চলছিলেন করালীকান্ত। কিন্তু যেই বাহিনী অ্যাবাউট টার্ণ করলো, অমনি চোঁ-দৌড়ে করালীকে এসে আবার বিশ গজ সামনে স্থান নিয়ে মার্চ্চ করতে হলো। বাহিনী এবার রাইট টার্ণ করলো, আবার করালী দৌড়ে এসে স্থান নিল। এর পর বাহিনী বার বার দিক্‌ পরিবর্ত্তন করতে সুরু করলো আর বার বারই করালীকে দৌড়ে এসে পুরোভাগে স্থান নিতে হলো। এমনি দৌড়াদৌড়ির শাস্তি পনেরো মিনিট ভোগের পর করালী রেহাই পেলেন সেদিনকার মত।

নিয়মিত কুচকাওয়াজে বন্দীদের মধ্যে এই বাহিনী যেমন হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয়, তেমনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হতো সামরিক নিয়মাবলী। প্যারেডের মাঠে দ্বিজেন গাঙ্গুলী যে সর্ব্বাধিনায়ক জি-ও-সি, এ কথা প্রতি পদক্ষেপে মেনে চলেন সবাই। দলীয় চেতনা যাঁর যতই উৎকট থাক, সমগ্র শিবিরে যতই নেতৃস্থানীয় হোন না কেন যিনি, সিনিয়রিটি যাঁর যত বেশীই থাক, তথাপি এ কথা তাঁরা অন্তর দিয়ে মেনে চলতেন যে, বহরমপুর বন্দী-শিবিরের সেনাবাহিনীর জি-ও-সি এক জন আর সে দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

মেহেদীর বেড়াকে প্রথমে মনে করা হতো অনতিক্রম্য বাধা। সেনাদল মার্চ্চ করে তার সম্মুখীন হয়ে মার্ক টাইম করতো পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু পরে শিক্ষা দেয়া হলো এই সামান্য বাধা লম্ফ দিয়ে উৎরে যেতে হবে। ফলে, অনেকেরই পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল মেহেদীর কাঁটায়।

সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যেই এল নিয়মানুবর্ত্তিতা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা। সামরিক কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে সৈনিকের মতো গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছিল এই বাহিনী। তাই জেলা হিসাবে বেছে বেছে জন কতককে সেক্‌সন-কমাণ্ডার নিয়োগ করা হলো—কমেট, বীরেন ঘোষ, বিভূতি চৌধুরী, রংপুরের বিমল মৈত্র, ময়মনসিংহের বিমল চক্রবর্ত্তী, কুমিল্লার সমরেন্দ্র পাল, চট্টগ্রামের ত্রৈলোক্য বিশ্বাস, নোয়াখালীর হরিভূষণ মজুমদার, দিনাজপুরের করালী বিশ্বাস প্রভৃতি। মুক্তির পর এরা নিজেদের জেলায় এমনি সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে, এই ছিল উদ্দেশ্য।

একদিন সকালে কুচকাওয়াজের শেষে ঘরে এসে চা খাচ্ছি, এমন সময়

একজন বেয়ারা এল অফিস থেকে। নিবেদন করলো, বড় সাহেব আমায় একবার 'সেলাম' দিয়েছেন। আমি সেই সামরিক পোষাকেই অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, 'সেলাম' দিয়েছেন বড় সাহেব নন, তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র—গিরিজা দত্ত।

মহা সমাদরে বসিয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে সুরু করলেন গিরিজা : সত্যি, ভারী চমৎকার প্যারেড করান আপনি। আমার সেপাইরা দেখেছে। ওরা বলে, একেবারে হাবিলদারের মতো। আপনি বুঝি ইউনিভারসিটি কোর্-এ ছিলেন?

বললাম : না তো। ইউনিভারসিটিতে এখনও প্রবেশের সুযোগই পাইনি আমি। আটাশ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী হয়, আমি তাতে 'বি' কম্পানীর সার্জ্জেণ্ট ছিলাম।

গিরিজা বলে যেতে লাগলেন : আমি আপনার প্যারেড না দেখলেও আপনার গলার আওয়াজ শুনি। আমার বাড়ী থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। আপনার ফুসফুসে বেশ জোর আছে তো। একদিন অফিস থেকে সাহেবই আপনার গলা শুনতে পেয়ে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। মিলিটারী ম্যান কিনা, তাই প্যারেড ওরা ভারী পছন্দ করে।

বলে গিরিজা দত্ত অহেতুক চারিদিকে একবার চেয়ে নিলেন, কেউ নিকটে আছে কি না। অহেতুক এ জন্যে যে, এক দিকে দেয়াল ও তিন দিকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘেরা তাঁর কক্ষ, কক্ষের মধ্যে তিনি ও আমি। পার্টিশনের বাইরে যারা অন্য কাজে রত, তাদের আর দেখা যাবে কি করে? বোধ হয় পরের কথাগুলিতে গুরুত্ব সংযোজনা করবার জন্যেই অকস্মাৎ গলা খাটো করে বললেন : কিন্তু জানেন তো, দ্বিজেন বাবু, এক জন টিকটিকি এখানে বসে আছেন শ্যেন-দৃষ্টি মেলে, অতি সহজ জিনিসকে বাঁকা করে দেখাই যাঁর একমাত্র কাজ। আর শুধু কি দেখা, সঙ্গে সঙ্গে নলিনী মজুমদারের কানে তুলে না দিলে তাঁর ঘুমই আসে না।

গিরিজা দত্তের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম : কি আর এমন কথা তিনি কানে তুলবেন?

বিস্ময় প্রকাশ করলেন গিরিজা : বিলক্ষণ। বলেন কি, দ্বিজেন বাবু? এখানকার সূচ পড়ার সংবাদটিও সযত্নে উনি ওপরওয়ালার কানে বজ্রপতন হয়েছে বলে তুলে দিলে শুধু যে কর্ত্তব্য সম্পাদনই হবে তাই নয়, ওঁর প্রমোশনের পথ বেশ খোলসা হয়ে আসবে। এই জন্যেই, মশায়, আই-বিতে কখনো গেলামই না আমার এই আটাশ বছর চাকরিতে। চান্স কি কম পেয়েছিলাম, মশাই? ওখানে গিয়ে যে-সব নেমকহারামি কাজ করতে হয়, তা মশাই, আমার ধাতে সয় না। ভদ্রলোকের ছেলে তো সবাই।

আসল কথায় আসার তাগিদ দিলাম : কি করেছেন পবিত্র সরকার?

বিরক্তিতে গিরিজার কণ্ঠ প্রায় ক্রুদ্ধের মতো শোনা গেল : কি আর

করবেন! আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ ভালোই আছেন দেখে তাঁর সইবে কেন? অতএব বাহাদুরী নিলেন এবার আপনাদের ঐ প্যারেডের খবরটি বেফাঁস করে দিয়ে।

চমকে উঠলাম: কি হয়েছে?

ওপর থেকে নির্দ্দেশ এসেছে আপনাদের প্যারেড নিষিদ্ধ করে দেবার। কেন, এতে দোষটা কি হচ্ছিলো বলুন তো? স্বাস্থ্যরক্ষা ছাড়া এর আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, আমার এই আটাশ বছরের চাকরি নিয়ে তো বুঝতে পারছি না। ক্যাম্পের মধ্যে এটাকে সংঘবদ্ধ ব্যায়াম ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?—আর আপত্তিজনক কিছু দেখলে আমরাই তো পারি আপনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপোষ-রফা করতে—

প্রশ্ন করলাম: কি, গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্যারেড বন্ধ করবার হুকুম জানিয়েছেন না কি?

আজ্ঞে, তাই তো দেখছি।—বলে গিরিজা মহা অপরাধীর মতো বলতে লাগলেন: মানে, এমনি ভাবে ইনি লাগিয়েছেন যে, আমাদের ডিসক্রিশনের কোন সুযোগই আর দেয়নি। আরে, এতে Administration ও discipline-এর সত্যিই ক্ষতি হচ্ছে কি না, সে তো বুঝবো আমরা, যারা প্রতিদিন আপনাদের সুখদুঃখের ভাগ নিচ্ছি।—ছিঃ ছিঃ, ছি, কী আর বলবো, দ্বিজেন বাবু, এই করেই তো গেল বাঙালী জাতটা। ইস্, এতগুলো টাকা ব্যয় করে আপনারা পোষাক তৈরী করালেন, এখন যদি প্যারেড না হয়—

বাধা দিলাম: প্যারেড বন্ধ হয়ে যাবে কে বললে?

গভর্ণমেণ্ট যে বন্ধ করে দিয়েছেন দ্বিজেন বাবু।

জবাব দিলাম: প্যারেড করি আমরা, গভর্ণমেণ্ট নয়। আমরা তো বন্ধ করিনি। এই তো এখনই করে এলাম।

গিরিজা দু'চোখ কপালে তুলে ফেললেন: বিলক্ষণ, বলেন কি! সরকারী হুকুম না মানলে আমাদের যে চাকরি যাবে, দ্বিজেন বাবু—

বললাম: তা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের আত্মমর্য্যাদার মূল্য আপনাদের চাকরির চাইতে অনেক বেশী।

গিরিজা এবার অফিসিয়েল মুখোস পরবার চেষ্টা করলেন: কিন্তু হুকুম তামিল করা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের।

হুকুম তামিল-করা ভৃত্যদের আরো কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় কি-কাজে স্বয়ং কমাণ্ডাণ্ট টবিন এসে গিরিজার কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে দেখেই বলে উঠলেন: হ্যাল্লো জি-ও-সি, Perhaps you have received the Government order?

It has been communicated to me just now—জবাব দিলাম।

টবিন ক্রুর হাসিতে ঠোঁট দু'খানি একটুখানি প্রসারিত করে এবং নীল

চোখে হাসির আভা ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করলেন : Would you stop the Drill just from today ?

উঠে দাঁড়ালাম, জবাব দিলাম : Certainly not. It shall go on as usual.

আহত টবিনের কণ্ঠে এবার বৃটিশ-সিংহের গর্জ্জন শোনা গেল : Do you realise I am the Commandant of this Camp and I know how to make you stop it ?

সিংহ-গর্জ্জনেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল জি-ও-সির কণ্ঠে : And do you realise I am the G. O. C. of the Berhampore Detention Camp Infantry and I have the courage to defy your orders ?

দেরী নয়। গট-গট করে বেরিয়ে চলে এলাম। গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল অর্ডার্‌লি অমর। সাংঘাতিক কিছু অনুমান করে নিয়েই প্রশ্ন করলো : গণ্ডগোল হলো নাকি কিছু ?

হলো এবং আরও হতে পারে।—সবটা বললাম অমরকে।—ঘরে ফিরে আসবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রেসিডেণ্ট পরেশ সান্যাল সমর-পরিষদের জরুরী বৈঠক আহ্বান করলেন। ঐ দিন বিকেলেই স্পেশাল প্যারেডের প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। ফল্‌ ইন্‌ চারটেতে। চললো বাহিনীর মার্চ্চ —লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট।

সংবাদ নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে বৃটিশ-সিংহের কানে। কানে পড়েছে গরম সিসে। প্রকাণ্ড গেটের মধ্যে দিয়ে এসে ঢুকলো এক দল রাইফেলধারী সিপাই। কুচকাওয়াজ মাঠের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। ওৎ পেতে রইলো নেকড়ে বাঘের মতো।

চেয়ে দেখলাম। এ তো জানা কথাই। রাইফেলে নিশ্চয়ই গুলী ভরা আছে। প্রয়োজন শুধু জমাদারের হুকুম। সে হুকুমও কঠিন কিছু নয়।

কিন্তু মার্চ্চ আমরা করেই চলেছি অবিচ্ছিন্ন ভাবে—লেফট রাইট লেফট, লেফট রাইট লেফট……

নির্ভীক, নিঃশঙ্ক, ভয়-ডরহীন।

সতেরো

পুর্ব্বেই বলেছি, হবুচন্দ্র রাজার গোঁ যখন ব্যারোমিটারের পারাকে লাথি মেরে-মেরে ওপরে তুলছে, গবুচন্দ্র মন্ত্রী তখন বিপর্য্যয়ের আশঙ্কায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন বৃহৎ একখণ্ড বরফ নিয়ে। যুক্তি-পরামর্শের ঠাণ্ডা লজিক তখন উঠতি পারাকে নামিয়ে আনে ধীরে ধীরে।

এ ক্ষেত্রেও হলো তাই। বন্দুকধারী সান্ত্রীগুলো শুধু দৃষ্টি দিয়েই লোলুপতা প্রকাশ করলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতে পারলো না। কারণ, বোধ হয় অবশেষে ঝানু কূটনীতিবিদ্ গিরিজার হুকুম এলো টবিনের হুকুমকে সংশোধন ক'রে—অ্যাবাউট টার্ণ, কুইক মার্চ্চ।

সিপাইরা চলে গেল : জয়লাভ করলো আমাদের সেনাবাহিনী।

এমনি করে সেনাবাহিনীর যেমন বৃদ্ধি পেলো জনপ্রিয়তা, তেমনি সর্ব্বাধিনায়ক হিসেবে আমিও সবার স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করলাম। বয়স আমার মাত্র একুশ। আমার বয়সী বন্দীর ভিড় ছিল। তথাপি সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তনের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিত্বকে বহরমপুর বন্দী-শিবিরের সবাই মেনে চলতেন।

কিন্তু কি জানি কেন, ১৯৩২ সালের জুন মাসের শেষদিকে অনুশীলনের বন্দীরা পৃথক বাহিনী গঠনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। কেন করলেন, তার যুক্তিপুর্ণ কোনো কারণ সেদিনও যেমন খুঁজে পাইনি, এতকাল পরে আজও তেমনি মনে করতে পারি না। সেকালের বন্দীরা আমার এই কাহিনী পাঠ করে হয়তো ক্ষুণ্ণ হবেন, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নিরপেক্ষ অভিমত দিতে হলেও আমি বলতে বাধ্য যে, উগ্র দলগত চেতনা ও হীনমন্যতাই ছিল এর একমাত্র কারণ।

ব্যারাক তাঁদের পৃথক ছিল সত্য, তেমনি চৌকাও। তাঁদের প্রতিনিধি পৃথক্ ভাবে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন দৈনন্দিন চাওয়া ও পাওয়া নিয়ে। একই শিবিরে বাস করলেও অন্তরঙ্গতা কঠিন ভাবে সীমাবদ্ধ থাকতো দলীয় পরিধির মাঝখানে। চাই বা না চাই, একটা অদৃশ্য দেয়াল শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সীমানায়!

কিন্তু এ কথা কোনো বন্দীই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, বহরমপুরে এই বন্দীবাহিনী ছিল দলীয় স্বার্থ বা চিন্তার অনেক উর্দ্ধে। একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়েই এর জন্মলাভ এবং এর সর্ব্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল যে সমর-পরিষদের ওপর তাতে অনুশীলনেরও যথেষ্ট সংখ্যক সদস্য ছিলেন এবং তাঁদেরও ছিল পুর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। সামরিক আওতার মধ্যে কোথাও দলীয় স্বার্থের গন্ধ ছিল না। তাঁরাও তা অনুভব করতেন।

তথাপি অনুশীলনের বন্দীরা আমাদের ত্যাগ করলেন। অবশ্য এর

ফলে সংখ্যা আমাদের তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে কমলো না, কারণ এই পৃথকীকরণের ছুরিকাঘাতে যতটুকু ক্ষত হলো, নতুন নতুন বন্দীরা এসে যোগদান করে তা অচিরে নিরাময় করে দিলেন।

অনুশীলনের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা যখন ত্রিশের কোঠায় এবং সপ্তাহে মাত্র দু'দিন প্যারেড-মাঠে তারা আত্মপ্রকাশ করে, যুগান্তরে তখন নিয়মিত প্রতিদিনকার কুচকাওয়াজে যোগদান করে শতাধিক নওজোয়ান।...অনুশীলনের বাহিনী পরে একেবারেই ভেঙে দেয়া হয় যখন, যুগান্তর-দলে তখন সৈন্য-সংখ্যা প্রায় দু'শো।

দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। ভালো ভাবে না একঘেয়ে ধরণে, আজ আর তা মনে করতে পারি না। বাইরে যাদের ফেলে এসেছি, মন থেকে তাদের একেবারে মুছে ফেলতে না পারলেও বার বারই মনে হয়েছে, তারা বাস করে এক পৃথক্ জগতে। আমাদের বন্দী-শিবিরের বন্দী-জগতের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলেও কোন দিন সে চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করা দূরে থাক, মনের স্ফটিক চত্বরে তার ছায়াও ফেলতে পারেনি। পুব দিকের ঐ প্রকাণ্ড শিমুল গাছটার কোণ ঘেঁসে সকালের সূর্য্য যখন দেখা দেয়, জানি, আমাদের গ্রামের মাখন মুদীর দোকানে তখন ক্রেতাদের ভিড় লেগে গেছে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুরের শুষ্ক উত্তপ্ত হাওয়া যখন শরীরের রক্তবিন্দুগুলিকে শুকিয়ে দেবার চেষ্টা করে, জানি, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণের কোঠায় তখন হু হু করা দখিন হাওয়ার মাতামাতি। রাত দশটা বাজতেই এখানে যখন ঘরে ফিরে যাবার বিউগল বেজে ওঠে, বেশ জানি আমাদের বাড়ীর ছাদে তখনো বৌদিদের ও পড়শীদের ভিড়।

কিন্তু সব জেনেও মনে হয় ও-সব জানতে নেই, মনে রাখতে নেই, রেখে-আসা দিনের কথা ভাবতে নেই। অজস্র ও অসংখ্য নিজের ও পরের কাজে ব্যাপৃত থেকে নিমেষের জন্যও কখনও মনকে বসে থাকতে দিই না, পাছে হৃদয়াবেগের ভূত তার স্কন্ধে চেপে বসে। বহরমপুর বন্দীশালার গেট বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মনের সবগুলো বাতায়নই শুধু বন্ধ করে দিইনি, তাতে তুলে দিয়েছি অর্গল, ঝুলিয়ে দিয়েছি পুরু পরদা। বাহিরকে আর ভেতরে আসতে না দেবার কঠোর ব্রত।

তবুও লোহার নিশ্ছিদ্র কুঠরীর মধ্যেও কি জানি কি করে সাপ এসে পড়ে, সাপ লক্ষীন্দরকে দংশন করে, সে দংশনে মৃত্যু হয়।...সজাগ সতর্ক প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে কী করে কখন্ কোন্ পথে অকস্মাৎ এসে পড়ে হয়তো একমুঠো ফুলেল হাওয়া, এক ঝলক দক্ষিণা মলয়। সাজানো-গোছানো সুকঠিন তপশ্চর্য্যার পারিপাট্যে অকস্মাৎ আঘাত লাগে, তাতে দাগ ধরে, বিপর্য্যয় কাণ্ড বেধে যাবার উপক্রম হয়। ফুলেল হাওয়া তুলে ধরে কালবৈশাখীর কালো ফণা।...

অকস্মাৎ একদিন নীল খামে একখানা চিঠি এল। নীল রংয়ের কাগজে চমৎকার হরফে লেখা দীর্ঘ পত্র, চারটি পৃষ্ঠা ভর্ত্তি। লিখেছে লতিকা। লতিকা দাশগুপ্তা। বেথুনের বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী। একেবারে স্পষ্ট নির্লজ্জ প্রেমপত্র। কোনো উপক্রণিকা নেই, প্রস্তাবনা নেই, যবনিকা ওঠবার প্রাক্কালে কোনো ঐক্যতান নেই। একেবারেই নির্জলা নাটক।...'আমি তোমায় চাই, একান্ত করে নিজস্ব করে চাই। শুধু ভালো লাগেনি, তোমায় ভালবেসেছি সারা অন্তর দিয়ে। তোমায় না পেলে ব্যর্থ হবে আমার জীবন, ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই।'

পরিশেষে এই ক'টি কথা লিখে শেষ করেছে: 'আমার কোনো খোঁজ তুমি আর না নিলেও আমি নিয়মিত তোমার সংবাদ সংগ্রহ করি বীণার কাছ থেকে প্রতি রবিবার নীলমণি মিত্র লেনে গিয়ে। অপেক্ষা করবো আমি তুমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। পথ চেয়ে থাকবো তোমারই প্রতীক্ষায়। ইতি—

—তোমারই লতিকা'

আমারই লতিকা!! আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত ক্ষোভে-দুঃখে একেবারে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।...একেবারে উপন্যাস সৃষ্টি করে ফেলেছে লতিকা। চার পৃষ্ঠাকে টেনে নিয়ে অনায়াসে এবার কলম চালিয়ে যাওয়া যায় চারশো পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, কিংবা উদাস নয়নে আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দেয়া যায় সারাটা দিন। কিন্তু কী মারাত্মক কাণ্ড করে বসলো লতিকা। সে কি জানে না, একেবারে বোকা বি. এ. ক্লাশের ছাত্রী, যে, আমাদের প্রত্যেকখানা চিঠি আমাদের হাতে এসে পেঁৗছোবার পুর্ব্বে খোলে পবিত্র সরকার? পড়ে-পড়ে একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলে সেন্সর করবার নামে?—ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ব্যাটা এমনি চিঠি পেয়ে হয়তো গিরিজাকে দেখিয়েছে, গিরিজা হয়তো বলেছে টবিনকে। তারপর তিন জনে মিলে কত হাসিই না হেসেছে, আর বলেছে, এই হচ্ছে জি-ও-সি। বাইরে কড়া মিলিটারী খোলস আর ভেতরে ভেতরে রসের সাগর।...বন্দীরাই বা কেউ জেনেছে কি না কে জানে। হয়তো এতক্ষণে সংবাদ এসে গেছে, ব্যারাকে ব্যারাকে চলছে কাণাঘুসা, হাসিঠাট্টা, জটলা, গুপ্ত বৈঠক। এইবার সব আসবে একে একে জি-ও-সিকে অভিনন্দন জানাতে শ্লেষের তীরে বিঁধতে, মুখের ওপর অপমান করে যেতে।...উঃ, আর ভাবতে পারি না। মাথার রগ দু'টো ঠক্-ঠক্ করে লাফাচ্ছে।...

এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নেই চাদরখানায় আপাদমস্তক ঢেকে চোখ বুঁজে সটান শুয়ে পড়লাম। কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। কিন্তু যখন জাগলাম, তখন দেখি সেটা ১৯২৯ সাল, কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. ক্লাশের ছাত্র আমি।...

মার্টিন কোম্পানীর চাকুরে সুন্দরদা অর্থাৎ সুখময় গাঙ্গুলী বিপদে পড়লেন

আমায় নিয়ে। পেছনে টিকটিকি লেগেছে। তাঁর রামাপুরার বাড়ীতে আমার অনুপস্থিতিতে হানা দিয়েছে ক'বার, অফিসেও গেছে।

কি সুখময় বাবু, চাকরিটি খোয়াবার ইচ্ছে আছে না কি?

সুন্দরদা প্রশ্ন করেন: কেন, বলুন তো?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন: আর কেন। বাড়ীতে পুষছেন কাল সাপ, সে সংবাদ রাখেন কি?

কাল সাপ?

হ্যাঁ, কাল সাপ। আপনার কলকাতা-থেকে-আসা ভ্রাতাটি একটি আস্ত টেরোরিষ্ট। গায়ে দিয়েছেন অবশ্যি কংগ্রেসী ছদ্মবেশ। বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সহ-সম্পাদক আর বিবেকানন্দ সেবাসমিতির সম্পাদক হয়ে যতই কেন না ফাঁকি দেবার চেষ্টা করুন, আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।

সুন্দরদা তাঁকে নিয়ে অফিসের বাইরে বারান্দায় এলেন। একটা সিগারেট অফার করে চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন: কেন, কিছু করেছে না কি?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন: করেনি, কিন্তু করবার ফিকিরে আছে। সারনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী যায়, সেখানে আসে ত্রিলোক সিং আর অমরনাথ মেহরোত্র। সারা রাত জটলা চলে। আর বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সম্পাদক কে জানেন তো? জিতেন লাহিড়ী। কাঁকোরী মামলার ফাঁসীর আসামী রাজেন লাহিড়ীর দাদা।

সুন্দরদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। এত খবর তো তিনি রাখেন না। ভোর হতেই চলে আসেন অফিসে। দুপুরে ফিরে গিয়ে স্নানাহারের পর ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করে আবার চলে আসতে হয় অফিসে। ফেরেন রাত্রে। প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হয় না। বৌদিই আমার তদারক করেন। কংগ্রেসে যোগদানে তেমন আপত্তি ছিল না সুন্দরদার, কারণ আপত্তিজনক তেমন কিছু তখনো কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীতে স্থান পায়নি। আর বাঙালীটোলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন কিরণচাঁদ দরবেশ। আমার আপন মামা, মায়ের ছোট ভাই। আপত্তিজনক কাজে প্রধান প্রতিবন্ধক তো সর্ব্বপ্রথমে হবেন তিনিই। কিন্তু তবুও—

সুন্দরদা এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করলেন: কি করা যায় তাহলে?

কি করা যেতে পারে ও কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে ভদ্রলোক এমনি সারগর্ভ এক বক্তৃতা দিলেন যে, সেদিনই রাত্রে সুন্দরদা, বৌদি ও আমার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, অতঃপর আমি বসবাস করবো পৃথক স্থানে, শুধু দু'বেলা এসে এখানে খেয়ে যাবো।

সুতরাং দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটি গলিতে একখানা পুরোনো বাড়ীর দোতলায় একখানা ঘর নিলাম।

জিতেন লাহিড়ী হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান ষ্টার কোম্পানীতেই ময়মনসিংহের হরেন রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং অতি দ্রুত সেই পরিচয়

রূপায়িত হয় প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতায়। হরেনদা আর দ্বিজেন বাবু, আপনি ও তুমিতে এসে ঠেকলো। হরেনদার বাসায় গিয়ে পেয়েছিলাম এক দিদি, হরেনদার বড় বোন। কিন্তু আমার কাছে তিনি ছিলেন শুধু দিদি নন, মা-ও। আমার জন্যে তাঁর স্বতঃ-উৎসারিত নিবিড় স্নেহের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আজও স্মরণ করি।

দিদির ওখানেই পরিচয় হয় বীণার সঙ্গে। আঠারো বছর, আমার সমবয়সী। বিবাহিতা, একটি মেয়ে হয়েছে। কলকাতা থেকে কাশীতে এসেছে স্বাস্থ্যোদ্ধারে মাকে নিয়ে। যেমনি সরলা, তেমনি আলাপী। কিন্তু কোনো একটি বিষয়ে নয়। মুখে খৈ ফুটবে বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে বিষয়বস্তু বদলে যাচ্ছে। যথা: দ্বিজেন-দা, আপনি বলে চা'য়ে চিনি কম খান? আমার তো পুরো ছ'চামচে চাই-ই আর তেমনি দুধ।—যাবেন আজ বিকেলে দশাশ্বমেধে, নৌকো করে বেড়াবো'খন? ঐ কালীকীর্ত্তন শুনতে এত ভালো লাগে আমার।—মা, বেশ তো লোক তুমি, দ্বিজেনদা এসেছেন আর এখনো চায়ের জলটা ষ্টোভে চড়িয়ে দিতে পারোনি?—আর পারি না, বাপু, একা সব দিক সামলাতে। যেদিকে না দেখবো, সেদিকেই—মিলি, ও মিলি, কোথায় গেলে, ছাদ থেকে কাপড়গুলো এখনো নামিয়ে আনিসনি?

—দ্বিজেনদা, একটা বিয়ে করুন না, দ্বিজেনদা!

এত শীগ্‌গির?—হেসে হয়তো প্রশ্ন করি।

বীণা জবাব দেয়: কেন, আঠারো বছরে মেয়েদের বিয়ে হয়, আর ছেলেদের হয় না বুঝি?—ঐ যাঃ, তুলটা তো বাথরুমে ফেলে এসেছি।—বলেই হয়ত ফস্ করে চলে যায়। ফিরে এসে বলে: বুধবার আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি, দ্বিজেনদা! কলকাতা গেলে যেন দেখা করতে ভুলে যাবেন না।

বীণাকে আমার ভালো লাগতো, খুব ভালো লাগতো। ওর প্রাণ-প্রাচুর্য্য, অনর্গল হাসি, অবিশ্রান্ত মুখে খৈ ফোটানো, এর পশ্চাতে আছে একটি অতি নির্ম্মম সত্য—মদ্যপ স্বামী তার রক্ষিতা নিয়ে মত্ত, বীণার দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই তার। মাসিমার কাছে যেদিন এই করুণ কাহিনী শুনি, সেদিনই স্থির করেছিলাম কলকাতা ফিরে গেলেই একবার হানা দোব হাওড়ায় উপেন সরকার মশায়ের বাসায়।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজের পর ফেরবার পথে পড়তো বীণাদের বাসা। প্রত্যেক দিন আমার সাইকেল সেখানে হল্ট্ করতো এবং অনেক দিনই ঘুরে আসতাম বীণাকে সঙ্গে করে বৈকালিক ভ্রমণে। সেখানে চা চলতো, খাবার চলতো এবং বীণার মুখে খৈ ফুটতে ফুটতে কখন্ যে বেলা পড়ে গিয়ে অন্ধকার করে আসতো, টেরই পেতাম না। তখন তো আর সুন্দরদার বাসায় থাকতাম না; তাই আর বৌদির জেরার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা ছিল না।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। বাঙালীটোলা কংগ্রেসকর্ম্মীদের উদ্যোগে

মহা আড়ম্বরের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর আয়োজন হলো। শুধু পুজো নয়, জলসা, নাটকাভিনয় ও তৃতীয় দিবসে সাহিত্য-সভা। মণিকর্ণিকা ঘাটের কাছাকাছি কোন্ একটা বাড়ীর তেতলার ছাদে এই সাহিত্য-সভার অধিবেশন হবে। নামে উদ্‌যোক্তা কংগ্রেস-কর্ম্মীরা, আসলে জিতেন বাবু ও আমি।

বিকেল চারটেতে সভা সুরু। সভানেত্রীত্ব করবেন জ্যোতির্ম্ময়ী রায়। সে সময় কলকাতা থেকে কাশীতে বেড়াতে এসেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি। আরও উপস্থিত আছেন সুরেশ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র রায়, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সভানেত্রীকে নিয়ে আসবার ভার পড়লো আমার ওপর।

গাড়ী নিয়ে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। পরিচয় হলো এবং নাম শুনেই অকস্মাৎ তিনি আগ্রহান্বিত হয়ে আমার বাবা-মা-ভাই-বোনদেরও সংবাদ নিতে লাগলেন। কফি এলো এবং সঙ্গে দু'টি ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ। নিয়ে এলো কোনো বয় বা চাকর নয়, একটি মেয়ে। অবিবাহিতা আর অপূর্ব্ব রূপসী। সরু জরিপাড় একেবারে দুধের মতো সাদা মলমল পরেছে। খাটো করে কাটা রুখু চুলের সম্ভার ক্লিপ এঁটে এঁটে সংহত ও সংযত করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী পরিচয় করিয়ে দিলেন: অশোকা, জিতেন বাবুর কাছে তুমি যাঁর এত সুখ্যাতি শুনেছ, life blood of the whole organisation, ইনি হচ্ছেন সেই দ্বিজেন গাঙ্গুলী, আর আমার মেয়ে অশোকা, আই. এ. পড়ছে।

পরিচয় হলো, আলাপ হলো, হাসি-পরিহাসও হলো এবং অবশেষে মোটরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যখন আমায় একেবারে অশোকার পাশে বসবার জন্যে জিদ করতে লাগলেন, তখনই অকস্মাৎ আমার মনে পড়ে গেল আমিও অবিবাহিত এবং রূপবান স্বাস্থ্যবান যুবক। আশ্চর্য্য সুন্দরী এই অশোকা, পরীর মতো অনৈসর্গিক, সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবার মতো অলৌকিক। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে ভয় হয়, পাছে সৌন্দর্য্যের রেণুগুলি ময়লা আঠায় লেগে উঠে আসে!...

সাহিত্য-সভায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ হলো। আবৃত্তিও হলো কয়েকটা। পরিশেষে আমার লেখা "নিরুপায়।" সর্ব্বশেষে গান গাইলো যে মেয়েটি, শুনলাম তার নাম লতিকা দাশগুপ্তা। কলকাতার মেয়ে, বেড়াতে এসেছে ক'দিনের জন্যে। জিতেন বাবুর কোন্ বন্ধুর আত্মীয়া।

কিন্তু কী অপূর্ব্ব সঙ্গীত! গানের কথা হুবহু আজ আর মনে না পড়লেও সেখানা যে বিরহিণী শ্রীরাধিকার কীর্ত্তন, তা ভুলিনি। কেঁদে কেঁদে বলছেন শ্রীরাধিকা: 'সখি, আর কত সইবো বল্। আসবে বলে চলে গিয়ে আজো সে এল না ফিরে। আকাশের নীলে দেখি তাকে, কোকিলের কাকলীতে শুনি তার কণ্ঠ, নিশিদিন শুনি তার বাঁশী। কিন্তু কৈ সখি, সে তো এলো না।... কী মূল্য তবে আমার জীবনের, কী সার্থকতা আমার এই ভরা যৌবনের, কী হবে

আমার এই বুকভরা প্রেমের ? সে সখি, আমায় বিষ এনে দে, নীল বিষ পান করে আমি নীলেতে লীন হয়ে যাই।...'

লতিকার গান শুনলাম না, শুনলাম মদনপীড়ায় জর্জ্জরিতা বিরহিণী শ্রীরাধিকার পাঁজরা-ভাঙ্গা আকুতি...নীল বিষ পান করে লীন হয়ে যাই! তাল, মান, লয় সম্বন্ধে ধারণা আমার খুব নির্ভুল ছিল না সত্য, কিন্তু সর্ব্বসত্তা বিলিয়ে, তনুমনপ্রাণ দিয়ে প্রিয়ের তরে যে অশ্রুসজল আবেদন, সে আবেদনের মরমী কণ্ঠ আমি চিনি। সেই মায়াবী কণ্ঠে গান গাইলো লতিকা। শুধু শুনলাম, আলাপ পরিচয়ের অবকাশ বা সুযোগ ছিল না আমার।

ফিরে যাবার সময় আবার জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সঙ্গে যেতে হলো আমায় অশোকার পাশে বসে। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মহেন্দ্র রায় প্রভৃতি সবার কাছ থেকে সস্মিত মুখে বিদায় নিয়ে আশোকার পাশে যখন উঠে বসলাম জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর জিদে, কে জানতো কোন্ আড়াল থেকে লতিকা তা লক্ষ্য করেছিল ?

আঠারো

মাত্র দিন কয়েক পর। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে কাশী শহরে এসে পৌঁছোবার পরই অকস্মাৎ একদিন গেল সাইকেলের টিউব ফুটো হয়ে। কাছে কোথাও সাইকেল সারাইয়ের দোকান পেলাম না। তাই প্রায় দু'মাইল রাস্তা সেই ফুটো সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাঁটু-সমান ধুলো নিয়ে এসে হাজির হলাম বীণাদের বাসায়।

দোতলায় উঠে দেখি কন্যা ও দিদিমা নিদ্রিতা, বীণা কোথাও নেই। বাথরুমে জলের শব্দ পেলাম। কিন্তু এমনি ভাবে সব খুলে ফেলে রেখে বাথরুমে? কোনো সাড়াশব্দ না দিয়ে বীণার কক্ষে ঢুকে হাঁটু-সমান ধুলোমাখা পা দু'খানা সটান মেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং ঘুমের ভাণ করে রইলাম পড়ে।

কিন্তু বীণা আমায় জানে। বাথরুম থেকে এসে একেবারে হাত ধরে টেনে তুললো আমায়: জানো, দ্বিজেনদা, তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে। বল, কি খাওয়াবে? নইলে বলবো না কিন্তু, আগেই বলে দিচ্ছি।—একটু দাঁড়াও, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।

সরলা অনভিজ্ঞা বীণা পরে এল সায়া, সাড়ী আর শুধু মাত্র হাতওয়ালা বডিস। বললো: বল, কি খাওয়াবে?

যা খেতে চাইবে।

যদি চাই আকাশের চাঁদ?

তা দোব। তুমি যদি খেতেই পার, তাহলে না হয় আঁকশি দিয়ে চাঁদটাকে পেড়ে আনবার কষ্ট স্বীকার করা যাবে।

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

একটু পরে প্রশ্ন করলাম: কিন্তু খবরটা সত্যিই যদি সুখবর না হয়? তুমি মনে করছো সুখবর, আর আমি হয়তো তাকেই বলবো কুখবর—ও, হয়েছে হয়েছে, উপেন বাবুর চিঠি এসেছে, তাই না?

বীণা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করলো: তাই হবে। তারপর?

বললাম: লিখেছেন এবার তোমায় নিয়ে যাবেন। মন তাঁর ভালো হয়ে গেছে, মত তাঁর গেছে বদলে, তাই না?

ছাই।—বলে বীণা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর অকস্মাৎ আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বলে উঠলো: দাঁড়াও, হাত দেখতে পারি আমি। দেখি—ভেনাসের একটা চক্র পড়েছে আর শুক্রের স্থানটিও বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—সত্যি কথা বলবে?

মজা দেখতে ইচ্ছে হলো: বলবো। কর জিজ্ঞেস।

সীমাহীন অভিনিবেশ সহকারে রেখাগুলো আর একবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষা

করে জ্র কুঞ্চন করে বীণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করে বসলো : নিশ্চয়ই কাউকে ভালোবেসেছ তুমি ? বল, সত্যি কি না ?

জিজ্ঞেস করলাম : কাকে ?

লতিকাকে—লতিকা দাশগুপ্তা।

চমকে উঠলাম। লতিকা দাশগুপ্তা ? সেই গায়িকা, বিরহিণী শ্রীরাধিকা ? বীণা তাকে চেনে কি করে ?

তারপর শুনলাম কি করে চেনে। শুধু চেনে নয়, দু'জনে বন্ধু। আর এখানে এসে নয়, সেই কলকাতা থেকে। সাহিত্য-সভার কথা লতিকা সব বলেছে বীণাকে, আর সেই সঙ্গে আমার কথাও উল্লেখ করতে ভোলেনি। আমার লেখা "নিরুপায়'' লতিকার নাকি খুব ভালো লেগেছে, আর চুপি-চুপি জানালো বীণা, সেই সঙ্গে লেখককেও। অতএব, বীণা হুকুম করলো আমার সেই খাতাখানা তার চাই এবং সেই সঙ্গে আমাকেও।

প্রশ্ন করলাম : আমাকেও ?

হ্যাঁ, তোমাকেও। আজই মিশিরপোখরায় একটা বিয়ে-বাড়ীতে রাত্রে আসবে লতিকা তোমার খাতা নেবার জন্যে আর তোমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে। তোমায় যেতে হবে, দ্বিজেনদা।

আশ্চর্য্যান্বিত হলাম : বাঃ, বেশ তো ! অজানা এক বিয়ে-বাড়ীতে যাবো অজানা একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে ? তোমার প্রস্তাবটি যেমন নতুন, তেমনি উদ্ভট।

কিন্তু অসম্ভব নয়, আর তা আমি হতেই দোব না। তুমি কাঠের পুতুল হলে কি হবে, লতিকা সত্যিই তোমায় ভালোবেসেছে।—বলে বীণা আলমারী থেকে বার করলো লতিকার লেখা একটা চিরকুট, চোখের সামনে মেলে ধরে বললো : এই দেখ, বীণা তো তোমায় শুধু মিছে কথাই বলে। এবার বিশ্বাস হলো তো যে, এটা আর উদ্ভট উপন্যাস নয় ? আমি বলে এসেছি তোমায়ও নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই।—বল, কথা দিলে, দ্বিজেনদা !—বলে বীণা একেবারে আমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু আমার কথার জন্যে বয়েই গেছে বীণার। রাত দশটায় টেনে নিয়ে গেল সেই বিয়ে-বাড়ীতে খাতাখানা বগলদাবা করে। পরিচয় হলো লতিকার সঙ্গে।

তার পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত হলেও গতিশীল ও রোমাঞ্চময়। কলেজ থেকে ফেরবার পথে বীণার বাসাতে বহু বিকেল রাত করে ফেললাম, ছুটির দিনে রেস্তোরাঁয় বসে বসে চা ও কেকের সঙ্গে অনেক সকাল একেবারে দুপুর হয়ে গেল, অনেকগুলো সন্ধ্যা নদীর বুকে ভাসমান নৌকোয় কাটলো। কখনো সাক্ষী রইলো বীণা, কখনো শুধু লতিকা ও আমি, আমি ও লতিকা। তখনকার সাক্ষী রইলেন হয়তো অশরীরী কোনো দেবতা।…

আমাদের সুবর্ণ সুযোগ দিয়ে অনেক সময়ই বীণা সরে যেত। কিন্তু

সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার মতো মন কোথায় আমার? কোথায় আমার সে সময়? ভালো তাকে লেগেছিল সত্যি, কিন্তু ভালোবাসতে পারলাম কই?

অশোকার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। অশোকাকে নিয়ে ফ্রেস্‌কো আঁকা চলে, কিন্তু লতিকার পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের ক্ষুদ্র এক টুকরো ছবি বুক-পকেটে ভরে রাখতে ইচ্ছে করে। অশোকার স্বর্ণপদক পেনডেণ্টের মতো গলায় দুলিয়ে বীরদর্পে যাওয়া যায় ক্লাবে, হোটেলে, সভা-সমিতিতে, আর লতিকার সঙ্গে চুরি করে কথা কইতে ভালো লাগে আধো-অন্ধকার কোণের বেঞ্চিতে। অশোকার সান্নিধ্য মনোরম আর লতিকা রক্তকণিকাগুলিকে নাচিয়ে তোলে। অশোকার সৌন্দর্য্য অনৈসর্গিক আর লতিকার রূপ রসালো রক্ত ও মাংস দিয়ে গড়া। অশোকাকে মনে থাকে, আর লতিকা সারা মন জুড়ে বসে থাকে।...

কিন্তু আমার সর্ব্ব অন্তর পূর্ব্বেই যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক সুকঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্বে! সেখানে আর তিলমাত্রও স্থান আছে কি?...

আর এ তো আশাই করিনি আমি। উনত্রিশ সালের স্বপ্ন বত্রিশ সালে কখন্ চূর্ণ হয়ে গেছে, চাকা ঘুরে-ঘুরে কোথাকার ঘটনা পুরোনো বাসি হয়ে কোথায়, কোন্ ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কে তার সংবাদ রাখে? হরেনদা'রা ঘটনাস্রোতে কোথায় চলে গেছেন, উপেন সরকারের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বীণার আপোষ-রফা হয়ে গেছে কিনা, আই-এ পাশ করে লতিকা বি, এ, পড়ছে কিনা, তা জানবার আমার যেমন নেই উৎসাহ, তেমনি সময়েরও অভাব।

এই দুনিয়া-ছাড়া দুনিয়ায় অকস্মাৎ চেনা দিনের সুগন্ধ কেন? লোহার ঘরে কোন্ পথে প্রবেশ করলো কাল সাপ?...

কোথায় একটা কাঁটা বিঁধতে লাগলো, কোথা থেকে যেন কার চাপা গোঁঙানির শব্দ কানে আসতে লাগলো, অনুভব করলাম একটা আলোড়ন অন্তর-সমুদ্রে।

তুলে রাখলাম নীল চিঠি সযত্নে বাক্সের তলায় কাপড়ের ভাঁজে। নীল বিষ পান করে লতিকা লীন হয়ে যেতে চেয়েছিল। আমার কাছে নীল খামখানা একটি নীল অপরাজিতা মনে হলো, সমস্ত বাগান থেকে চয়ন-করা অনাঘ্রাত ফুল।

উনিশ

সত্যিই, একটা ঘা খেলাম। দু'-এক দিনের মধ্যেই অবশ্য বুঝতে পারা গেল যে বন্ধুরা কেউ মাঝপথে আর খোলেনি এই চিঠি, তথাপি নিজকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগলো। রাগ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম কোথায়? চোখ রাঙালেই দেখতে পাই, বেল ফুলের কুঁড়ির মতো দাঁতগুলোর আভাস দেখিয়ে যেন লতিকা খিলখিল করে হাসছে ছোটফ্রক-পরা মেয়ের মতো।

একদিন বলেছিলাম রাগ করে: কাল থেকে আবার ফ্রক-পরা সুরু করো তুমি, বুঝলে?

প্রশ্ন এলো: কেন?

ব্যাখ্যা করলাম: কেন, এমনি হল-কাঁপানো হাসি সাড়ীপরা মেয়েকে কখ্‌খনো মানায় না। বয় দু'বার উঁকি মেরে গেছে, লক্ষ্য করেছ? অন্যান্য কেবিনেও তো লোক আছে, সেটা বুঝি ভুলে যাও?

গম্ভীর হয়ে গেল লতিকা: তাহলে কি করতে হবে? হাসি বন্ধ করতে হবে?

বললাম: তা হবে।

মাথা নেড়ে লতিকা বললো: না, তা হবেনা। ফ্রক-পরার হাসি ধুতি-পরার সঙ্গে চলতেই পারে না।

আশ্চর্য্য হলাম: মানে?

মানে খুব সহজ। তোমায় হাফপ্যাণ্ট পরতে হবে আর হাতে নিতে হবে একটা গুলতি, বুঝলে?

বিস্ময় বেড়ে গেল আমার: হাফপ্যাণ্ট। গুলতি।

কাঁটা বিঁধিয়ে এক টুকরো কাটলেট আমার প্লেটে ছেড়ে দিতে-দিতে বললো লতিকা: বাঃ, তা নইলে ফ্রক-পরার সঙ্গে প্রেম জমবে কি করে শুনি?

এবারে চোখ দু'টো একেবারে কপালে উঠে গেল: প্রেম।

হ্যাঁ, প্রেম।—বেশ সহজ ভাবেই বললো লতিকা: আমায় যে ভালবেসে ফেলেছ, সে কথা অস্বীকার করতে পার? গায়ের জোরে না-না করে চীৎকার করতে পার বটে, কিন্তু তাতে মনের প্রতিধ্বনি পাবে না। কিন্তু ফ্রককে দেখে ভুলে যেতে পারে কে, ধুতি নয়, হাফপ্যাণ্ট, বুঝলে? তাই বলছি তুমি হাফপ্যাণ্ট পরলে আমি পরবো ফ্রক।

কৌতুক অনুভব করলাম: কিন্তু ঐ গুলতি?

গম্ভীর হয়ে জবাব দিল সে: বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্গ রক্ষার দল-মাদল কামান। জানোই তো, দুনিয়ায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কোথাও নেই। হয় দু'টি মেয়ে একটি ছেলেকে কিংবা দুটি ছেলে একটি মেয়েকে

ভালবাসে। যেমনি ছড়াছড়ি ওসমান-জগৎসিংহের, তেমনি ভিড় সূর্য্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর। তাই তোমার হাতে থাকবে গুলতি। 'হয় কর্ণ, নয় পার্থ ধরা হতে লইবে বিদায়।'

বলেই সেই ফুলের হাসি। ছোট ছোট সাদা দাঁতে হল্‌-কাঁপানো শব্দ।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী কিন্তু আর বেশী আগ্রহ দেখাননি। অবশ্য সেই সাহিত্য-সভার পরে দিন কয়েক তাঁর ওখানে আমায় চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু কোথায় যেন বাধো-বাধো ঠেকলো, সম্মানজনক ব্যবধানটি বিশ্রীভাবে হাঁ করে রইলো। ভারী মিষ্টি মেয়ে অশোকা, অষ্ট্রেলিয়ান মধুর মতো। আর লতিকা একেবারে স্যাকারিন। স্রেফ স্যাকারিন। মিষ্টি বিষ।

সে সময় লাহোর কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে কাশীতে প্রতুল গাঙ্গুলী নেমেছিলেন। এক যুগান্তকারী সংবাদ দিলেন আমায় যে, ঢাকার বিপ্লবী দলের মধ্যে বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে দু'টো ভাগ হয়ে গেছে সম্প্রতি। এক দলের নেতা অনিল রায়, লীলা নাগ প্রভৃতি, আর অপর দলের নেতা হচ্ছেন সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত, রসময় সুর, মণি রায়, প্রফুল্ল দত্ত, প্রভাত নাগ (লীলা নাগের ভাই) প্রভৃতি।

সংবাদ পেয়ে সেদিনকার ট্রেণে সোজা চলে এলাম কলকাতায় সত্য গুপ্তের কাছে। স্বাভাবতঃই অশোকা তখন একেবারেই হারিয়ে যায়। লতিকাও যে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গিয়েছিল আমার মনে, তাও সত্য। কিন্তু আমি ভুলে গেলে কি হবে, সে তো ভোলেনি আমায়? নাছোড়বান্দা কাবুলীওয়ালার মত একেবারে ওৎ পেতে বসে আছে যেন অনন্ত কাল ধরে। বেরুলেই পড়তে হবে খপ্পরে। আমি মিনি নয় বলেই হয়তো বলবে: এ খোঁখা, হাফপ্যাণ্ট লিবে আউর গুলতি......

এই রঙীন তরঙ্গের তোড় কমে যেতে সময় লাগলো অবশ্য মাত্র ক'দিন। জীর্ণ বস্ত্রের মতো ক্ষণিকের এই চিন্তা-বিলাস ঝেড়ে ফেলে দিলাম মন থেকে। প্যারেড, খেলাধুলা, আর 'শৃঙ্খল' নিয়ে একেবারে মেতে উঠলাম। নীল অপরাজিতা বাক্সের তলায় কোন কাপড়ের ভাঁজে মুখ থুবড়ে পড়ে-পড়ে শুকিয়ে গেল, মনেই পড়লো না তা।

২৯শে জুন পাওয়া গেল আর একটি উত্তেজনাকর সংবাদ: ঢাকা শহরের একটি পোষ্ট অফিসে ২৮ তারিখে কালীপদ মুখার্জ্জী নামে একটি যুবক একখানা 'তার' করতে আসে—Operation successful—পোষ্টমাষ্টারের সন্দেহ হয়। তিনি তাকে একটু দেরী করতে বলেন কাজের ভিড়ের অজুহাত দেখিয়ে। আর গোপনে সংবাদ পাঠান আই-বি অফিসে। পুলিশ সন্তর্পণে এসে কালী-পদকে গ্রেপ্তার করে। কালীপদ তাতে বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য না দেখিয়ে

পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে তার মেসে এবং স্পষ্টভাবে পরে যে বিবৃতি দেয়, তাতে স্বীকার করে যে, আগের দিন অর্থাৎ ২৭ তারিখ রাত্রে স্পেশ্যাল অফিসার কামাখ্যা সেনকে নিদ্রিতাবস্থায় সে-ই হত্যা করেছে। রাত তখন গভীর। বাইরের রাস্তায় মাঝে মাঝে টহলদার সিপাইয়ের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাগানের নীচু দেয়াল টপকে কালীপদ নাকি নিঃশব্দে প্রবেশ করে। জানালাও খোলা ছিল; তাই সে এসে হাজির হয় একেবারে নিদ্রিত কামাখ্যা সেনের খাটের পাশে। তারপর মশারিটি তুলে একবার…দুবার…তিন বার…ব্যস, জানালা টপকে, দেয়াল টপকে আবার সে নির্ব্বিবাদে সরে পড়ে।

কামাখ্যা সেন !!…অকস্মাৎ রক্তবিন্দুগুলি যেন সাপের মত কিলবিল করে উঠলো। সেই নোটোরিয়াস কামাখ্যা? সেই স্কাউণ্ড্রেল?…১৯৩০ সালে এই নরপুঙ্গব স্পেশ্যাল অফিসাররূপে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণা চষে ফেলেছিল!…

অসহযোগ আন্দোলন তখন ভীষণ আকার ধারণ করেছে। আইন-সভার সদস্যগণ একে একে করছেন পদত্যাগ, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, 'ষ্টেটসম্যান' জাতীয় এক-আধখানা সংবাদপত্র ব্যতীত সমস্ত সংবাদপত্রের প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে, পথে-ঘাটে তৈরী হচ্ছে লবণ, প্রকাশ্য সভায় বাজেয়াপ্ত পুস্তক পাঠ চলছে, ১৪৪ ধারা সর্ব্বত্রই অমান্য করা হচ্ছে, উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গের মত জাগ্রত জনতা সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে তুচ্ছ করে পুলিশের লাঠী ও চাবুক, গুলী ও বেয়নেট!

ঠিক সেই সময় সাব ডেপুটি কামাখ্যার ওপর ভার পড়লো বিক্রমপুরকে, বিশেষ করে শ্রীনগর, সেরাজদীঘা, তালতলা প্রভৃতি কয়েকটি থানার অধিবাসীদের সায়েস্তা করবার। কামাখ্যা পেল হাতে স্বর্গ। কারণ সে জানতো কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রমোশন পাবার এই সুবর্ণ সুযোগ হারানো মূঢ়তা। সুতরাং সপাং সপাং গর্জ্জে উঠলো তার হাতের চাবুক, গুড়ুম গুড়ুম গর্জ্জে উঠলো তার কোমরবন্ধের রিভলভার। মহিলাদেরও কসুর করলো না কামাখ্যা সেন!…

সে সময় ঢাকা শহরে অকস্মাৎ দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হিন্দু-মুসলমানে গলা-কাটাকাটি। সরকার পক্ষের প্ররোচনায় সেই দাঙ্গা তীব্রতর হয়ে বিক্রমপুরের কোনো কোনো গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু এর পুর্ব্বেই ঢাকা শহরের বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সে'র অফিসারেরা, মেজর বিনয় বোস, ক্যাপ্টেন দীনেশ গুপ্ত, লেফটেন্যাণ্ট বাদল গুপ্ত, সার্জ্জেণ্ট ননী চৌধুরী প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে সফর করে গড়ে তুলেছিলেন ভলাণ্টিয়ার বাহিনী, যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এনেছিলেন নব জাগরণ। তার ফলে ঢাকা শহরের এই দাঙ্গার সময়ই বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে যুব সংগঠন সৃষ্টি হয় ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর নেতৃত্বে। কোথাও বিপদ আসন্ন হলেই কাঁসর বাজানো হতো আর দিকে দিকে প্রেরণ করা হতো বার্ত্তাবহ। দেখতে দেখতে যে-কোনো হাতিয়ার নিয়ে এসে জমায়েৎ হতো হাজারো অধিবাসী। এমনি সুশৃঙ্খল সংগঠনের ফলেই কিন্তু সরকারী শত প্ররোচনাতেও সে-বার শহরের দাঙ্গা গ্রামের দিকে

ততটা মারাত্মকভাবে সংক্রামিত হতে পারেনি। সে সময় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ঢাকা রেঞ্জের অধিনায়ক ছিলেন তেজোময় ঘোষ আর সহকারী ছিলেন জ্যোতিষ-চন্দ্র জোয়ারদার।

কলকাতা থেকে আমায় পাঠানো হলো বিক্রমপুরে আমাদের গ্রামে। অচিরেই সেখানে তৈরী হলো ভলান্টিয়ার বাহিনী। সর্ব্বশ্রেণীর যুবক তাতে যোগদান করলো। দৈনন্দিন কুচকাওয়াজ ও গ্রামের মেঠো পথে-পথে লাঠি নিয়ে বাহিনীর মার্চ্চ দেখে শান্তিকামীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও প্রমাদ গুণলেন বাবা, মা, কাকা ও জ্যেঠারা! দাঙ্গা ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও পুলিশকে ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে যদি কামাখ্যা সেন—

বললাম : কে কামাখ্যা সেন, তাকে চিনি না, দেখিওনি কোন দিন। কিন্তু আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করলে তাকেও রেহাই দোব না আমরা।

নিজের লাঠিখানা দু'মুঠোয় ধরে একেবারে স্তব্ধ হয়ে বাবা বসেছিলেন। পুত্রের জিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

কিন্তু পাড়ার মুখপাত্র বিলাস কাকা সহজে ছাড়বেন কেন? বললেন : দেখ দ্বিজেন, আজকালকার ছেলে তোমরা যদি আমাদের, বুড়োদের কথা না মান, তাহলে কিছুই বলবার নেই। তবে তোমাদের বিপদ এলে তা সবার চাইতে বড় হয়ে লাগে আমাদেরই বুকে। তাই সময়-সময় গায়ে পড়েও উপদেশ দিতে এগিয়ে আসতে হয়।

বলে তিনি একটু থামলেন। দেবেন কাকা হুঁকোটা তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি কুলীনদা'র অর্থাৎ আমার বাবার বয়স ও সম্পর্কের মর্য্যাদা রাখবার জন্য হুঁকো নিয়ে বাইরে গেলেন ও এক মিনিট পর ফিরে এসে বসলেন।

দেবেন কাকা বিলাস কাকার বক্তব্যটাই আরো একটু পরিষ্কার করলেন : দেখ, আমাদের গ্রামের শতকরা আশী জনই মুসলমান। আমাদের অনুগত প্রজা হিসেবে পুরুষের পর পুরুষ ধরে এরা আমাদের শ্রদ্ধা করে আসছে। দেখেছ তো সদাকে, বন্দরালীকে? আজও এদের মনে কোনো দ্বিধা দেখা দেয়নি। সুতরাং আমাদের গ্রামে যখন কোনো আশঙ্কা নেই, তখন এমনি ভলান্টিয়ার দল তৈরী করে কি পুলিশকেই ডেকে আনা হবে না?

অশ্বিনী কাকা বিদেশে পাটের অফিসে অনেক কাল চাকরি করেছিলেন। কার্য্য-কারণ সম্পর্কে তাঁর একটু ধারণা আছে বলে তিনি মনে করেন। বললেন : তোমরা বল পুলিশই নাকি এই দাঙ্গা বাধাচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে সেই পুলিশকেই কেন এদিকে টানছো? গ্রামের নিরাপত্তা কি ভাবে করে রক্ষা করা যাবে? তারপর অন্য গ্রামে যদি দাঙ্গা লাগে, তবে তা থামাবার দায়িত্ব তোমার নয় বা আমাদের গ্রামের নয়। সে গ্রামেও তো লোক আছে।

এঁদের লজিকের পরেও কী বলে একেবারে চুপ করিয়ে দিতে হয় এঁদের, তা আমার বেশ জানা ছিল। আমাদের বাহিনী যে সাম্প্রদায়িক নয়, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে যে-কোনো গ্রামকে সাহায্য করাই যে এর উদ্দেশ্য, তা এঁদের বেশ

করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম। আর পুলিশের খাতায় আমার নাম আছে বলেই যে সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য আমি কোন ঝুঁকি নোব না বা অপরাপর সাহসী যুবকেরাও আসবে না আমার পাশে, এমনি উপসংহারের পেছনে যে যুক্তি ও মানবতার নামগন্ধ নেই, তাও বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করবো ভেবেছিলাম।

কিন্তু কিছুই পারা গেল না। অকস্মাৎ মজুমদার-বাড়ীর ছাদ থেকে ভীষণ জোরে কাঁসর বেজে উঠলো। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম: বিলাস কাকা, আপনাদের সঙ্গে আমি আজ আর আলোচনা করতে পারলাম না। দেখি, কোথায় আবার লেগে গেল। একটি মুহূর্ত্ত আর এখানে অপেক্ষা করা চলবে না আমার।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হন্তদন্ত হয়ে একজন ভদ্রলোক সাইকেলে এসে নামলেন। ঘর্ম্মে তাঁর সারা শরীর সিক্ত, উত্তেজনায় সারা মুখমণ্ডল আরক্তিম। কম্পিত কণ্ঠে জানালেন, ঘোলঘর বাজার লুঠ সুরু হয়ে গেছে। আপনারা আমাদের বাঁচান।

বলে দিলাম: আমি এখখনি যাচ্ছি। আপনি হাঁসাড়ায় শান্তি সোমের কাছে চলে যান। গিয়ে বলুন আর আমার কথাও জানাবেন যে, দ্বিজেন বাবুও দলবল নিয়ে গেছেন সেখানে।

লোকটি চলে গেল। আমিও ফিরে এলাম বাড়ীতে। খাকি মিলিটারী হাফ সার্টটা গায়ে দিলাম, মাথায় দিলাম হাইল্যাণ্ডার্স ক্যাপ, তাতে পিত্তল-ফলকে লেখা বি ভি, বাঁশীটি নিলাম আর হাতে নিলাম একটি ষ্টিক-সোর্ড।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দক্ষিণের পুকুর-ঘাটের পাশে মা'র সঙ্গে দেখা।

আবার চলেছিস বুঝি?

থমকে দাঁড়ালাম: হ্যাঁ।

কোথায়?

ঘোলঘর বাজার লুঠ হচ্ছে, এতক্ষণে বোধ হয় গ্রামেও লেগে গেছে।—অদূরে সদর সড়কে লোকজন ছুটাছুটি ক'রে চলেছে ঘোলঘরের দিকে। দেখিয়ে বললাম: ঐ দেখ মা, সবাই যাচ্ছে। সবে বাজার বসেছে এমনি সময়—

বলে চলে যাচ্ছি, আবার মা ডাকলেন: শোন্। কখন্ ফিরবি?

কি করে বলি, না গিয়ে তো আর অবস্থাটা বুঝতে পারছি না।

ছুটলাম। পেছনে মার কণ্ঠ শোনা গেল: তোর ভাত নিয়ে কিন্তু বসে থাকবো রে। তাড়াতাড়ি আসিস্।

ঘোলঘরগামী সড়কে এসে দেখি প্রায় শ'খানেক লোক জমে গেছে নানা রকম হাতিয়ার নিয়ে, লাঠী, হাণ্টার, ছোরা, রামদা, ষ্টিক-সোর্ড, ভোজালি, পুব-পাড়ার রমেশের হাতে একখানা খাপখোলা তরবারি। উভয় পার্শ্বের মুসলমান বাড়ীগুলো থেকে ছেলেমেয়ে, বুড়ো-বুড়ী সবাই ভয়ে ভয়ে দেখছে। অকস্মাৎ কোথা থেকে ছুটে এল বছিরদ্দি।

কৰ্ত্তা।

জবাব দিল অপরে : যা, ভালোয় ভালোয় বাড়ী যা। এখন আর ঘাঁটাতে আসিসনি। নইলে মরবি।

তবু বছিরদ্দি গেল না। আমার সমুখে এল। বললাম : ঘোলঘরে মুসলমানরা নাকি বাজার লুঠ করছে।

আমিও যামু কৰ্ত্তা।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে প্রশ্ন করলো ভুপেন : তুই ?

জবাব দিল বছিরদ্দি : ক্যান ? কৰ্ত্তাই তো কইছেন, দাঙ্গা যে বোনাইর পো-রা করে, সেই হালারা হিন্দুই হোক আর মোছলমানই হোক, মাইনষের শত্রু। সেই শ্বশুরের পো'রে ঠাণ্ডা করণের কাম সক্কলেরই, কি হিন্দু, কি মোছলমানের। তাই না কৰ্ত্তা ?

অ্যাঁ, বলে কি বছিরদ্দি ! বছিরদ্দি শেখ !

নৃপেন প্রশ্ন করলো : জাত ভাইকে পারবি মারতে ?

বছিরদ্দি সহজ ভাবেই জবাব দিল : দাঙ্গা যে করে, মা-বইনের গায়ে যে হাত উঠায়, সেই হালারে জাত ভাই বইলা স্বীকার করিনা আমি।—যাই কৰ্ত্তা আপনার লগে ?

সম্মতি দিলাম। নিমেষে সে বাড়ী থেকে নিয়ে এল পুরো আঠারো ইঞ্চি দীর্ঘ নেপালী কুকরি। গেঞ্জির নীচে খাপখানা টেনে বাঁধলো গামছা দিয়ে। তারপর হাঁক দিল : এই ঘইনা, গরুগুলারে জাবনা দিস। আমার ফিরা আইতে দেরী হইবো কইলাম। কইস তর মায়েরে।—

তারপর আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো : আছি কৰ্ত্তা আমি আপনার লগে-লগে। কুকরি যা নিছি, এক্কেরে কচু কাটা করতে পারবেন।

ডবল মার্চ্চ করে বেরিয়ে পড়লো কেয়টখালি গ্রামের শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক।

গ্রামের সড়ক ক্ষেতের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে গেছে। সে পথে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে বলে হুকুম দিলাম সোজা আমায় অনুসরণ করবার জন্য। নেমে পড়লাম ক্ষেতে, জল-কাদা, কাঁটা-গাছ, দীর্ঘ পাট গাছের ঝোপ সব অগ্রাহ্য করে একেবারে সোজা ছুটতে লাগলাম ঘোলঘরের দিকে। পাশেই বছিরদ্দি, লুঙ্গিটা সে হাঁটুর ওপর তুলে নিয়েছে।

ঘোলঘর বাজারে এসে দেখি, টিনের ঝাঁপ ফেলে-ফেলে দোকানগুলো সব বন্ধ। বাজারে ক্রেতাও নেই, বিক্রেতাও নেই। কিন্তু [illegible] একেবারে ভর্ত্তী, নানা স্থান থেকে ছুটে এসেছে সবাই। ব্যাপার কি ? লুঠনকারীরা তবে কি লুঠ শেষ করে সরে পড়েছে ? কোথায় গেল ? কোন্ দিকে ?

কিন্তু ঘটনা যা শোনা গেল, তা চমকপ্রদ। ঘোলঘর গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুরারি ঘোষ কিছু দিন ধরেই অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা

হারাচ্ছিলেন শুধু দুর্নীতি ও স্বজনপ্রিয়তার দোষেই নয়, নারীঘটিত দুর্বলতার জন্যও। কাজী-বাড়ীর মুসলমান জমিদারেরা ছিল তাঁর উগ্র সমর্থক। কিন্তু তাহলে কি হবে? হিন্দু ও মুসলমান সবার কাছেই মুরারি প্রায় সমাজচ্যুত হয়ে উঠেছিলেন।

বাজারে আজ অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্য উঠেছে শুনে মুরারি স্বয়ং পদার্পণ করেছিলেন ভুঁড়ি দুলিয়ে। সঙ্গে ছিল জনকতক মুসলমান মোসাহেব। দরে বনলো না, কারণ তিনি মনে করেছিলেন স্বয়ং মুরারিকে দেখে জেলে হয়তো মূল্য হাঁকবার দুঃসাহসই দেখাতে চেষ্টা করবে না। কিন্তু না-বেচার মতলব এঁটেই জেলে দাবী করলো অযৌক্তিক মূল্য। আর যায় কোথা! মুরারির মোসাহেব দল এগিয়ে এল। তর্ক-বিতর্ক, বচসা, গালাগাল, তারপর হাতাহাতি, হুড়োহুড়ি, মারামারি।......বাজারে দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল। মুসলমান মোসাহেব আর হিন্দু জেলে—ব্যস্, তৎক্ষণাৎ বাতাসের মুখে রটে গেল এটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা!!

বেগতিক দেখে মোসাহেব-পরিবৃত মুরারি ঘোষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন কাজী-বাড়ীতে। কিন্তু মুরারি পলায়ন করলেও আছে তাঁর বাড়ী, বৃহৎ অট্টালিকা, তাঁর পরিবার, তাঁর পরিজন। শয়তান গৃহস্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তারা করতে বাধ্য!

নিশ্চয়ই!—অকস্মাৎ সেই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতা চীৎকার করে উঠলো: নিশ্চয়ই। মুরারিকে না পেলেও তার বাড়ীটা তো পাওয়া যাবে। এত বড় বদমায়েসের সাজা দিতে—

প্রতিধ্বনি শোনা গেল: নিশ্চয়ই। চল সব, মুরারির বাড়ী লুঠ করি গে।

বন্যার মতো সেই বিশাল জনতা এগিয়ে চললো। এই সাগরতরঙ্গ রুখবে কে? কার আছে সে ব্যক্তিত্ব, সে সাহস, সে বাগ্মিতা, সে যুক্তি?

বিচলিত হলাম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম মুহূর্তের জন্য। শান্তি সোম দল বল নিয়ে এসে গেছেন ততক্ষণে। বললাম সব। কিন্তু আমরা দু'জনেই বা কি করতে পারি? কতটুকু শক্তি আমাদের দু'টো প্রামের? সেই সীমাহীন উদ্বেলিত সমুদ্রে মাত্র দু'টি তরঙ্গ বৈ তো নয়!......তবুও চেষ্টা করতে হবে। বছিরদ্দি কোথা থেকে মাথায় করে একটা টুল নিয়ে এল। স্বনির্বাচিত সভাপতির মতো টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে সেই উত্তেজিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন শান্তি সোম: বন্ধুগণ, উত্তেজনায় অধীর হয়ে যুক্তি হারিয়ে ফেলবেন না আপনারা। মুরারি বাবু সমাজের ও গ্রামের কলঙ্ক হলেও তাঁর পরিবারের মহিলারা আমাদেরই মা ও বোন। তাঁরা কি দোষ করেছেন আমাদের কাছে? একের অপরাধে অপরের গর্দান নেয়া হতো কাজীর আদালতে। এখন সেদিন নেই। মহিলাদের গায়ে কেন হাত দিতে যাবো আমরা?

এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিল না। পক্ষান্তরে, শোনা যেতে লাগলো অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জন। বেশ বোঝা গেল শান্তি সোমের যুক্তি ক্রুদ্ধ জনতার হৃদয় আদৌ স্পর্শ করেনি। তথাপি তিনি বলতে লাগলেন: দাঙ্গা থামানো আমাদের কাজ, বাধানো নয়। বন্ধুগণ, ভিন গ্রামের লোক হয়ে আপনারা যদি এই গ্রামের একখানি বাড়ীও লুঠ করেন, তবে তার ফলাফলের কথা একবার ভেবে দেখবেন। তাতে কি ঘোলঘরে আমরাই এসে দাঙ্গা সৃষ্টি করবো না?

এ প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া গেল না। মৃদু গুঞ্জন এবার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে আত্মপ্রকাশ করলো: আপনার বেদ ও পুরাণের উদারতা পকেটে ভরে রাখুন, শান্তি বাবু!

অপর কোণ থেকে এল ধারালো প্রশ্ন: এ কি স্কুলে মাষ্টারের বক্তৃতা শুনছি নাকি?

কাণের পাশে কে একজন গর্জ্জে উঠলো: বক্তৃতা দিয়ে পেট ভরে না মশাই! আমরা চাই খাদ্য। শালা মুরারির দশটা গোলাভর্ত্তি ধান আছে।—চল সব।

প্রতিধ্বনি শোনা গেল: চল।

তারপরই হল্লা সুরু হয়ে গেল। নানা ভাবে ও ভাষায় একসঙ্গে সবাই চীৎকার করে নিজের নিজের বক্তব্য বলতে সুরু করলো। মাথার ওপর সংখ্যাতীত হাতিয়ার উঁচু করে সেই বিক্ষুব্ধ জনতা এমনি হুড়োহুড়ি সুরু করে দিল যে, শান্তি সোম বৃথাই কয়েক বার এদের বোঝাবার চেষ্টা করে অবশেষে হতাশ হয়ে আমার পানে চাইলেন: কী করা যায়, গাঙ্গুলী?

সত্যিই কি করা যায়? কী করা যেতে পারে? দৃষ্টিক্ষেপ করলাম চতুর্দ্দিকে। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে সর্ব্বত্র প্রবলতম উষ্মার অভিব্যক্তি। বাঁধ ভেঙে ফেলবার পূর্ব্বক্ষণে বন্যার জল যেমন ফুলে-ফুলে ওঠে, তেমনি গগনস্পর্শী হয়ে উঠেছে এদের ক্রোধ। যুক্তির তৃণখণ্ড কি করতে পারবে?......হাঁসাড়ার জনকতক ছেলেকে দেখলাম, কিন্তু কেয়টখালীর ছেলেরা সেই জনসমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেছে! জনতার প্রবল চাপ মাঝে মাঝে আমাদের ঠেলে ফেলবার উপক্রম করতে লাগলো। পাশে দেখলাম শুধু বছিরুদ্দিকে, ছায়ার মত লেগে রয়েছে আমার সঙ্গে। ডান হাতখানা গেঞ্জির নীচে ঢুকিয়ে দিয়ে নেকড়ে বাঘের মতো ওৎ পেতে রয়েছে! শুধু একটুখানি ইসারার অপেক্ষা!

শান্তি সোম আবার ডাকলেন: দ্বিজেন!

—অকস্মাৎ লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টুলের ওপর নয়, একেবারে টেবিলের ওপর। চীৎকার করে ডাকলাম: এই, কোথায় চলেছেন সব? কোথায় চলেছেন, তাই জিজ্ঞেস করছি। মুরারির বাড়ী লুট করতে? সে বাড়ীর মেয়েদের গায়ে হাত দিতে? তাদের হত্যা করতে? কী অধিকার আছে আপনাদের, শুনি? মুরারি কাজী-বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে বলে তার

বাড়ী লুঠ করতে চান?—কেন, চলুন না, যাই একবার কাজী-বাড়ীতে? কাজী-বাড়ী লুঠ করতে পারবেন? সে হিম্মৎ আছে? ওদের তিন-তিনটে বন্দুককে অগ্রাহ্য করে কোন্ কোন্ গ্রাম আমাদের সঙ্গে কাজী-বাড়ী লুঠ করতে যেতে চান, আসুন এগিয়ে।

দ্বিধাগ্রস্ত দেখা গেল এবার জনতাকে। ওষুধ ধরেছে! যুক্তি নয়, শালীনতা নয়, বাগ্মিতা নয়, আমার স্পষ্ট কথার হুমকি ওদের বুকে ঘা দিয়েছে বোঝা গেল। যারা হল্লা করছিল, থেমে গেল তারা, যারা এগিয়ে চলেছিল, ফিরে দাঁড়াল। এই তো সুবর্ণসুযোগ! বদ্ধমুষ্টি শূন্যে আস্ফালন করে আবার সুরু করলাম: সিংহের মতো যারা বন্দুকের সম্মুখীন হতে পারে না, লজ্জা করে না তাদের শৃগালের মতো নিরস্ত্র মেয়েদের ঘরে ছোরা নিয়ে ঢুকতে?—এইখানে, এই টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট ভাষায় চ্যালেঞ্জ করছি, কেউ আমাদের সঙ্গে আসুন আর না-ই আসুন, মুরারি ঘোষের বাড়ী যে লুঠ করতে যাবে—বলে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম কী ভাবে শেষ করবো এই চ্যালেঞ্জের ভাষাটা, এমন সময় মুর্খ বছিরদ্দি দেখিয়ে দিল পথ। ঘ্যাচ করে টেনে বার করলো কোমর থেকে সেই নেপালী কুকরিখানা, এগিয়ে দিল আমার হাতে। সেই আঠারো ইঞ্চি কুকরিখানা মাথার ওপর তুলে ধরে চীৎকার করে বললাম: এই কুকরি রইলো তোলা তার জন্য। —আসুন, আসুন এগিয়ে, দেখি কার কত বড় বুকের পাটা! এই পথ রোধ করে দাঁড়ালো হাঁসাড়া আর কেয়টখালীর ছেলেরা।

বলেই বাঁ হাতে বাঁশী বার করে বাজিয়ে দিলাম তিনবার:

টা—ডট্
টা—ডট্
টা—ডট্

অর্থাৎ বিপদের সংকেত। কেয়টখালী ও হাঁসাড়া গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকেরা যে যেখানে ছিল, ভিড় ঠেলে ত্রস্তে এসে জমায়েৎ হলো টেবিলের চারি পার্শ্বে। তাদের সংখ্যা প্রায় দু'শো।

কিন্তু এমন সময় অকস্মাৎ আবার চাঞ্চল্য দেখা দিল জনতার মধ্যে। কে যেন বলে উঠলো, পুলিশ এসেছে শ্রীনগর থানা থেকে, সঙ্গে কামাখ্যা সেন। সত্যিই, এমনি চরম মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হলো সেই স্বনামধন্য কামাখ্যা সেন। এত কাল শুধু নাম শুনেছিলাম, আজ চাক্ষুষ দেখা হলো।

দেখা নয়, একেবারে মুখোমুখি হলো। জনতা দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল, কামাখ্যা সেন পাঁচ জন বন্দুকধারী সিপাই নিয়ে একেবারে সোজা এসে হাজির হলো আমার টেবিলের পাশে।

আপনার নাম?—গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

কোন্ গ্রামে বাড়ী?

কেয়টখালী।

কামাখ্যা একবার স্তব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করলো। তারপর আবার প্রশ্ন : ভোজালি হাতে নিয়ে দাঙ্গা করবার জন্য আপনি সবাইকে উত্তেজিত করছেন ?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন শান্তি সোম : না। দাঙ্গা যাতে না বেধে যায়, তার জন্য চেষ্টা করছি আমরা।

শান্তি সোমকে কামাখ্যা সেন বিলক্ষণ চিনতো। বললো : আপনিও এসে গেছেন দেখছি। ভালোই হলো, এবার পিস্ কমিটিতে বসা যাবে। গণ্ডগোল যখন কিছু হয়নি, তখন যাতে আর না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অকস্মাৎ আমার ক্যাপটার দিকে লক্ষ্য পড়লো কামাখ্যার : ওটা কাদের ক্যাপ ?

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র।

খুলুন তো, দেখি।

দৃঢ়স্বরে জবাব দিলাম : শুধু মৃতের প্রতি সম্মান দেখাবার কালেই বি-ভি-টুপী খোলে।

বি-ভি। চমকে উঠলো কামাখ্যা। নরপুঙ্গব স্পেশ্যাল অফিসার কামাখ্যা সেন। বললো : বি-ভি। মানে ঢাকার বি-ভি? মানে তেজোময় ঘোষ : সত্য গুপ্ত ? অর্থাৎ—

বাধা দিলাম : কারেক্ট করে বলুন মেজর সত্য গুপ্ত।

অ্যাঁ!—চোখ তুলে চাইলো কামাখ্যা আমার পানে। তাতে শুধু অসীম বিস্ময় নয়, ক্রোধের অগ্নিকণাও দেখতে পেলাম।

কিন্তু সে আগুনে আর লঙ্কাকাণ্ড হলো না। কারণ সঙ্গে ছিলেন শান্তি সোম। অত্যন্ত স্থির ও যুক্তিবাদী শান্তি সোম। আর কামাখ্যা সেনও বোধহয় নেপালী কুকরিখানার দৈর্ঘ্য মনে-মনে হিসাব করে দেখেছিল। খুব ভালো লাগেনি।

কামাখ্যা সেনের সঙ্গে এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। তারপর আজ পেলাম তার হত্যার সংবাদ। কালীপদ মুখার্জীকে চিনি না। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী দলের অনেক দিনের পরিকল্পনা আজ তিনি কার্য্যে রূপায়িত করতে পেরেছেন বলে মনে-মনে তাঁকে জানালাম সশ্রদ্ধ অভিবাদন।......কিন্তু টেলিগ্রাম কেন করতে গেলেন তিনি ? এমনি দুর্বুদ্ধি কেন হলো তাঁর ? কিংবা এমনি নির্দ্দেশ কে দিয়েছিল তাঁকে ?......এমনি ধারা অনেকগুলো প্রশ্ন জাগলো মনে, যার উত্তর পেলাম না খুঁজে !

কুড়ি

বহরমপুরের গরমের কথা আজও মনে পড়ে। সারা জীবন মনে থাকবে। এখানে একশো ডিগ্রি উঠলেই সাধারণতঃ আমরা আঁকুপাঁকু করতে থাকি। তার পর যদি আরও দু'-চার ডিগ্রি বেড়ে যায়, তাহলে তো ছাত্রদল প্রাতঃকালীন স্কুলের জন্য ধর্ম্মঘট করে বসে, আর চাকুরেরা জানালায় ও দরজায় ঝুলিয়ে দেন খস্‌খস্‌। কিন্তু উত্তাপ যদি আরো বেশ কয়েক ডিগ্রি বেড়ে যায়, ব্যারোমিটারের পারা একেবারে বারো বা তেরোয় গিয়ে ঠেকে, তাহলে? তাহলে এখানকার আমরা হয়তো আলুসেদ্ধই হয়ে যাবো কিংবা বেগুন-পোড়া।

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে স্কুল ছিল না আর আমরা ছিলাম না চাকুরে, মহামান্য ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের সম্মানিত অতিথি। জানালায়-দরজায় খস্‌খস্‌ নয়, আছে চিক্‌। সাবধানে সেই চিক্‌গুলো ফেলে দিতাম আমরা এবং নর্দ্দমা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে বালতির পর বালতি জল ঢেলে তৈরী করা হতো কৃত্রিম লেক। সেই লেকের তক্তপোষ-দ্বীপে বকের মতো সমাধিস্থ হয়ে বসে-বসে কাটাতে হতো আমাদের প্রত্যেকটি দুপুর।

ব্র্যাকেটের ওপর জামাগুলো যেন সদ্য উনুন থেকে নামানো পটেটো চিপ্‌স্‌, গায়ে দিলে গা পুড়ে যেতে পারে। জুতোগুলো যেন বয়লার থেকে বার-করা কয়লার টুকরো, জলে না ভিজিয়ে নিলে ছোঁবার উপায় নেই! তেমনি টেবিল, তেমনি চেয়ার, তেমনি বই, তেমনি সব!

হু-হু করে বইছে হাওয়া এলোপাথাড়ি, কিন্তু তাতে আগুনের হল্‌কা শাহারা বা গোবির। চিল্কার মিষ্টি হাওয়া সেখানে রূপকথা। অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে সেই হাওয়া সর্ব্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে অগ্নিকণা! কিন্তু রক্ষা যে, হাওয়ায় আর্দ্রতা একেবারে নেই বললেই হয়। তাই গরমে আগুন হয়ে উঠি, ঘেমে আর নেয়ে উঠতে হয় না।

রাত্রিটা কিন্তু তেমন অসহ নয়। দুপুরের সেই গরম হাওয়াটাই রাত্রে কেমন নরম হয়ে আসে অনেক ক্রোধের পর মুচকি হাসির মতো। আর রাত বারোটার পর থেকেই সেই নরম হাওয়া কেমন ভিজে-ভিজে লাগে দরদী অশ্রুর মতো। তখন চাদরখানা টেনে নিলে মন্দ লাগে না।

সুতরাং এই উত্তাপের রাজ্যে বর্ষার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান করা যায়। আকাশে মেঘ দেখলেই ময়ূরের মতো পেখম ধরে নৃত্য সুরু করিনি অবশ্য, কিন্তু আনন্দে যে আটখানা না-হয়ে, একেবারে তিন-আটা-চব্বিশখানা হয়ে পড়তাম এবং আসন্ন আনন্দোৎসবের প্রারম্ভিক ঐক্যতানের মত সকলেই যে চার-আটা-বত্রিশটি দন্ত বিকশিত করে সরবে ও সবিস্তারে সকলের কাছেই এই আনন্দ-সন্দেশ পৌঁছে দিতাম, সে কথা বেশ মনে পড়ে। মেঘের গর্জ্জন আমাদের কানে বাঁশীর সুর হয়ে উঠতো, দমকা হাওয়ার দাপাদাপিকে মনে

হতো গৌরীশঙ্কর ডিঙিয়ে-আসা মোলায়েম মৌসুমী বায়ু, আর আকাশ চিরে-চিরে সর্পিল বিজলী আমাদের মনেও চমক্ মারতো।

তার পর যেই ঝরঝর করে নেমে এল বারিধারা, বেরিয়ে পড়লাম আমরা সকালিক, মধ্যাহ্নিক, বৈকালিক, সান্ধ্য অথবা নৈশ, অর্থাৎ ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত যে কোনো সময়ের আনন্দ-ভ্রমণে। ডবলিউ বি চোদ্দ নম্বরের সবাই বেরুতো, তার পর অমর ও আমি, মতি সিং ও নৃপেন পাল, নীরেন সেন ও কুসুম গোঁসাই, সত্য বাবু, করালীকান্ত, রমেশ দাস, রবী, জীবন, জ্যোৎস্না, গুর্খা—কে নয়? দেখাদেখি উৎসাহিত হয়ে বেরিয়ে পড়তো টালী ব্যারাকেরও অনেকে। লাল নুড়ি-ছড়ানো রাস্তায় চলতো দলে-দলে ভ্রমণ। ছাতা নিয়ে নয়, বর্ষাতি নিয়ে নয়, এমন কি, ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে নয়। অফিসে যেতে হলে যেমন ধোপদুরস্ত ধুতি ও পাট-ভাঙা জামা পরে যাই, যেমন পালিশ-করা জুতো পায়ে দিই, ঠিক তেমনি ভাবে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, জল জমে প্রথমে জুতো ও পরে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে গেল, তবুও নির্ব্বিকার ভাবে চলেছে আমাদের আনন্দ-ভ্রমণ।

সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজও কিন্তু এই বর্ষায় বন্ধ তো থাকতোই না, এমন কি, একটি সেকেণ্ডও পিছিয়ে দেয়া হতো না। ফিটফাট পোষাক এঁটে জুতো-মোজা পরে এই দারুণ বৃষ্টির মধ্যেই চলতো আমাদের প্যারেড। আর দেয়ালের ওপরকার গুম্‌টিতে বর্ষাতি গায়ে এঁটে রাইফেলধারী সান্ত্রী আমাদের এই পাগলামী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে দেখতো ভিজে দাঁড়কাকের মতো। কিন্তু প্রবল বর্ষায় আমাদের নিউমোনিয়া দেখা না দিলেও অসহ্য গরমে আমাদের মাথা ধরিয়ে দিত।

ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের তেরো নম্বরে থাকতো গণেশ সাহা। ময়মনসিংহের অধিবাসী। বড়লোকের ছেলে। স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। রাজবন্দীদের মধ্যে এক দলের ছিল দারুণ পড়বার ঝোঁক। যে-কোনো বই পড়া সুরু করলেই হলো, আর তা যদি মূল্যবান কোনো বই হয় আর একবার ভালো লেগে যায়, তাহলে আর রক্ষে নেই। নাওয়া বাদ, খাবার-ঘরে খেতে যাওয়া বাদ, এমন কি নিদ্রা বা বিশ্রামও বাদ, চললো পাঠ ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সকালের পর বিকেল, বিকেলের পর রাত্রি, তার পর আবার সকাল, আবার বিকেল·····অর্থাৎ একেবারে মলাট থেকে সুরু করে মলাটে না-পৌঁছানো পর্য্যন্ত একটানা। টিপয়ের ওপর চাকর দিয়ে যাচ্ছে চা ও জলখাবার, দুপুরের ডিস ও রাত্রের প্লেট।

এই অদ্ভুত পড়ুয়াদেরই এক জন এই গণেশ সাহা।

হঠাৎ এক দিন ভোর বেলা গণেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই চোদ্দ নম্বরে প্রবেশ করলো। কমেটের মশারি তুলে ডেকে তুললো তাকে বিশেষ কথা আছে জানিয়ে।

কমেট মিলিটারী-ম্যানের মত চট্ করে উঠে বসলো। জিজ্ঞাসু নেত্রে

চাইতেই গণেশ বললো : দেখুন কমেট বাবু, আমাদের ভেতরকার কথা যাতে কর্তৃপক্ষের কানে না যায়, তাই করা উচিত নয় কি ?

কমেট তৎক্ষণাৎ সায় দিল। গণেশ বলতে লাগলো : আমিও তাই বলি। আমাদের কথা আমাদের মধ্যেই থাকা উচিত। টবিনের কানে যদি একবার যায়, তাহলে কী ভাববে টবিন, বলুন তো ? কী লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়াবে তাহলে ? এমনি লজ্জা দেবার সুযোগ কেন দোব আমরা ওকে ? অতএব, আমাদের কথা কারুকেই না জানানো উচিত। তাই না, কমেট বাবু ?

কমেট আবার সায় দিয়ে একটু বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলো : কেন, টবিন কোনো কথা জেনে ফেলেছে না কি ?

না, জানেনি এখনও। হয়তো কখনও জানতে পারবে না।—বলে সংশয় প্রকাশ করলো গণেশ : কিন্তু তবু সতর্ক হতে হবে তো! দেয়ালেরও কান আছে। কোথাকার কথা কোথায় চলে যায় বাতাসের মুখে। কিন্তু তাই বলে কথা না বলে তো থাকতে পারবে না মানুষ ? কথাই তো জীবন। কিন্তু সে কথা টবিনের কানে কেন যাবে, কমেট বাবু ? কেন ও বলবার সুযোগ পাবে—ওগো, তোমাদের সব কথা জানি।

বলেই অকস্মাৎ গণেশ মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে অনুরোধ জানালো : আমার সেই কথাটা কিন্তু কাউকেও বলবেন না, কমেট বাবু।

কি কথা ?—প্রশ্ন করলো বিস্মিত কমেট।

কিন্তু সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আবার অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো গণেশ : সত্যি, তাহলে টবিনের কাছে আর মুখ দেখানো যাবে না। বলবেন না তো ? কথা দিচ্ছেন তো কমেট বাবু ?

কিন্তু কথা না নিয়েই সে উঠে দাঁড়ালো এবং যতীশ বাবু, মনোরঞ্জন, নীতীশ, সবাইকে একে একে ডেকে তুলে সবিনয়ে জানাতে লাগলো ঐ একই অনুরোধ : আমার সেই কথাটা কিন্তু কাউকেও দয়া করে বলবেন না।

বাইরে বারান্দায় যার সঙ্গে দেখা হতে লাগলো, তাকেই ঐ একই অনুরোধ জানিয়ে যেতে লাগলো। দূর দিয়ে যে চলে যাচ্ছিল, হাঁক দিয়ে তাকে ডেকে এনে জানাতে লাগলো সেই একই অনুরোধ। শিবিরের চাকর-বাকর, ধোপা-নাপিত সবাইকে ডেকে-ডেকে ঐ একই বক্তব্য পেশ করতে লাগলো। যাকে একবার বলেছে, তাকে আবার এবং বার বার বলতে লাগলো। এমনি করে সারা শিবিরের প্রত্যেক ঘরে গিয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এসে নিজের ঘরে ঢুকলো এবং এই জুলাইয়ের গ্রীষ্মে একটা পুলওভার গায়ে চড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ে গণেশ হাত-পাখা চালিয়ে হাওয়া খেতে লাগলো।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে, পাগল হয়ে গেছে গণেশ। দেখা গেল, তার টেবিলে আধ-খোলা হয়ে পড়ে আছে Psychoanalysis of Mind সম্বন্ধে লেখা খুব মোটা একখানা দুর্বোধ্য বই। পাশেই নোট-খাতা। মর্ম উপলব্ধি

করে নোট লিখছিল সে। মনোবিকলন অধ্যয়ন করতে করতে কখন্ যে তার নিজেরই মন যুক্তিময় বুদ্ধির রাশ ছিন্ন করে মস্তিষ্কের গ্রন্থিগুলি বিকল করে দিয়েছে, টের পায়নি গণেশ।

পাগল হয়ে গেছে গণেশ।

পাগল হয়ে গেছে!

সর্ব্বত্র আতঙ্ক দেখা দিল। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, পুর্বে এই বন্দী-শিবির ছিল পাগলা গারদ। দুর্দ্ধান্ত শ্রেণীর বন্দীরাই থাকতো এখানে। মোটা শিকল দিয়ে মেঝের সঙ্গে বেঁধে রাখা হতো তাদের। মাঝে মাঝে চাবুকও চালানো হতো তাদের ওপর। কিন্তু পাগলামির কি কোনো বীজাণু আছে? চুণকাম করবার পরও দেয়ালে দেয়ালে তারা বেঁচে থাকতে পারে কি?...অদ্ভুত আতঙ্ক। কিন্তু যুক্তিহীন এই আতঙ্কে এমনিই অভিভূত হয়ে পড়লাম আমরা যে, দেখতে দেখতে অধ্যয়নের উৎকট উৎসাহ সাধারণ ভাবে কমে গেল। আর প্রতিদিনই ভোরে উঠে একে অপরের কথা বা কাজ লক্ষ্য করতো গভীর অভিনিবেশ সহকারে, পরখ্ করে দেখতে চেষ্টা করতো গণেশের হাওয়া লেগেছে কি না।...

বন্ধুরা অবশ্য দলে দলে এসে যুক্তিজাল বিস্তার করে বা বিতর্কে কোণঠাসা করে চেষ্টা করলেন গণেশের পাগলামি রোগ সারাতে। কিন্তু কোনো ফল দেখা গেল না। গণেশ সময় মত নাওয়া-খাওয়া বা শোওয়া সম্বন্ধে বেশ সচেতন, অথচ যার সঙ্গে দেখা হয়, তাকেই অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একবার অনুরোধ জানায়: দেখুন, আমার সেই কথাটা দয়া করে টবিনের কানে তুলবেন না। বুঝলেন, my earnest request....

ধীরেনদা' ছুটে এলেন, দেখলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন। গণেশ এবার আই. এ. পরীক্ষা দেবে। ধীরেনদা'র অনেক অনুরোধে সম্মতি দিয়েছিল সে। একজন ছাত্র কমে গেল।

গণেশের বাড়ীতে ও গভর্ণমেণ্টের কাছে টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হলো। ওর বাবার অনুরোধে ও তদ্বিরে গণেশকে স্থানান্তরিত করা হলো ময়মনসিংহ জেলে। বাবা চিকিৎসা করাবেন কবিরাজী মতে।

গণেশের চলে যাবার দিনটি আজো মনে আছে আমার। বেচারার জিনিষপত্র সবই অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সিপাই এসেছে ওকে নিয়ে যেতে। গণেশ বেরিয়ে এসেই কমেটকে সবলে জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললো। কমেট জিজ্ঞেস করলো: এ কি, কাঁদছিস কেন রে? বাড়ীতে যাচ্ছিস্ তো।

ক্রন্দনভাঙ্গা স্বরে জবাব দিল গণেশ: কেন আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন, কমেট বাবু? আমি তো কারুর কথা অফিসে লাগাইনি।

না, না, তাড়ানো নয়। আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। আপনার

চিকিৎসা করাবেন কি না, তাই ময়মনসিংহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনাকে। —বললো মনোরঞ্জন।

বাধা দিয়ে বললো গণেশ: ও-সব সান্ত্বনা দেবেন না আমায়, মনোরঞ্জন বাবু! জানি, ওরা আমায় অফিসে নিয়ে গিয়ে মারবে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে।— কিন্তু আমি কি কোনো গোপন কথা বলে দিয়েছি যে এই শাস্তি আমার?

তারপর এক সময় গণেশ অফিসের গেটে এল। প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলো, চোখের জলে প্রত্যেকের জামা ভিজিয়ে দিল, প্রত্যেককে মনে রাখবার জন্য জানালো আকুল আবেদন, আর ওর সেই কথাটি না-বলবার জন্য জানিয়ে গেল কাতর অনুরোধ।

গেট বন্ধ হলে ফিরে এলাম নিজের ঘরে। কিন্তু কেমন খালি-খালি মনে হতে লাগলো। কী যেন হারিয়ে গেছে!......

এই দারুণ গ্রীষ্মেই একদিন একটা বিপর্যায় কাণ্ড ঘটে গেল। পুর্ব্বেই বলেছি, টবিন মনে করতেন, যা আমরা চাইবো তাতে সম্মতি না দিলেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হবে। তাঁর আরও একটা নীতি ছিল, রাজবন্দী হ'লেও আমরা যে বন্দী, আইন ও শৃঙ্খলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পরম শত্রু, এই অনির্ব্বাণ সত্য মনে রেখে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করতেন আমাদের তা বুঝিয়ে দিতে। তাঁর অফিসে গিয়ে কিছু বলবার পুর্বেই ঝপ্ করে তাঁর সম্মুখে চেয়ারে বসে পড়ে সিগারেটে মোক্ষম টান মেরে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে তারপর কথা সুরু করাটাকে লেফটেনাণ্ট কর্ণেল টবিন খুব অপমানজনক মনে করতেন। লড়াই প্রত্যাগত ইংরেজের বাচ্চার প্রেষ্টিজ জ্ঞান ছিল সীমাহীন উৎকট! আমরাও তাই সুযোগ পেলেই একটা ঘা দিয়ে মজা দেখতাম।

এক দিন দ্বিপ্রহরে আই. এ. ক্লাশের ইংরাজী পড়ানো হচ্ছে। বাইরে থেকে প্রফেসর এসেছেন। আমরা প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র তাঁর বক্তৃতা শুনছি। প্রফেসর একমাত্র পড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার অধিকারী নন। সঙ্গে এক জন হাবিলদার এসেছেন লক্ষ্য রাখবার জন্য।

অসহ্য গরম, তাই চিকগুলো সব ফেলে দেয়া হয়েছে। মনোযোগ দিয়ে যেমন কথা শুনছিলাম, তেমনি টেরই পাইনি কখন্ টবিন চাচা এই দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়েছেন সদলবলে। দু'-চার জায়গায় ঢুঁ মারবার পর আমাদের এখানে কোনো আইন অমান্য করা হচ্ছে কি না, তা পরখ্ করবার জন্য একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে সোজা এসে আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করলেন।

প্রফেসর মধ্যপথে বক্তৃতা থামিয়ে অভিবাদন জানালে টবিন স্মিত হাস্যে তা গ্রহণ করে পর-মুহূর্ত্তে আমাদের পানে চেয়েই একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমরা সবাই নীরবে বসে আছি। কী সাংঘাতিক কথা! সম্মুখে

দণ্ডায়মান মহামান্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, আর আমরা পরম নিশ্চিন্তে রয়েছি তখনো বসে! সিংহকে দেখে ভেড়ার পাল বিন্দুমাত্রও বিচলিত নয়। প্রেষ্টিজ বুঝি রসাতলে যায়।

গর্জ্জন করে উঠলেন টবিন: Will you stand up?

গর্জ্জনের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

হাতের বেটন উঁচিয়ে টবিন আবার করলেন প্রশ্ন: Won't you stand up?

বেশ কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল। জবাব দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না একটি ছাত্রও।

টবিনের এবার ধৈর্য্যের সীমারেখা প্রায় অতিক্রম হয়ে এল। বাইরের একশো বারোর অনেক বেশী উঠলো ওঁর মাথার মধ্যেকার পারা। চোখ-মুখ লাল, কান দু'টি একেবারে রক্তে টুসটুসে, কাঁপছে টবিন।

এক পা এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর বেটনের একটা প্রচণ্ড ঘা মেরে চীৎকার করে উঠলেন: You people, I know how to make you stand up—

তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল জ্যোৎস্না সরকার। জানিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসম্মত অভিমত: No, we shall not stand up. বলে বসে পড়লো।

NO!!—ক্রোধে, বিস্ময়ে টবিন দিশেহারা-প্রায়।—You still dare to sit down. All right, I shall see—

বলেই গট-গট করে বেরিয়ে গেলেন—পশ্চাতে ব্যঘ্রাচার্য্যের বৃহল্লাঙ্গুলের মতো সড়াক্ করে বেরিয়ে গেল ডজন খানেক সিপাই। কিন্তু দরজার বাইরে যাওয়া মাত্র ক্লাশের ত্রিশ জনই একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। পুরো এক মিনিট স্থায়ী সেই অট্টহাসি।

নিশ্চয়ই এই বিদ্রূপ টবিনের কানে গেছে।

প্রফেসর বেচারা কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন। বার বার অনুরোধেও বক্তৃতা আর তেমন জমাতে পারলেন না। আর সব চেয়ে মজা এই যে, আমাদের ঘর-কাঁপানো অট্টহাসিতে তাঁর মুখের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সর্ব্ব অবয়বে একটা প্রস্তরের বর্ম্ম এঁটে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মহা অপরাধ যেন করে ফেলেছেন তিনিই।

টবিনের বেগে প্রস্থানের ফল মিনিট দশেকের মধ্যেই পাওয়া গেল। অফিস থেকে তলব এল প্রফেসরের। সেই যে তিনি গেলেন, ব্যস, আর ফিরলেন না। আপোষ-রফার জন্য ধীরেনদা' অবশ্য ছুটে গেলেন অফিসে। কি কথা হলো জানি নে। অন্ততঃ সুফল যে কিছুই হয়নি, তা ধীরেনদা'র মুখ দেখেই টের পাওয়া গেল। বেশ বোঝা গেল, রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের বরিশালীয় যুক্তি লাল মুখের প্রেষ্টিজের ইস্পাতে ঘা খেয়ে ফিরে এসেছে।

শোনা গেল, গবুচন্দ্রও ছিলেন পাশেই ; কিন্তু হবুচন্দ্র এবার যেন ৯৩ ধারার ক্ষমতাবলে শাসনযন্ত্র নিজের মুষ্টিবদ্ধই করে রাখলেন। টললেন না-এক-চুলও।......

একুশ

ভাবলাম, যাক্, বাঁচা গেল। ধীরেনদা'র তাগাদায় ও তিরস্কারে সপ্তাহে দু'দিন উত্তপ্ত ও অসহ দ্বিপ্রহরে এসে এই নীরস আই-এ ক্লাশ করতে হতো। এবার সে হাঙ্গামা চুকে গেল।

কিন্তু একটা কিছু না নিয়ে যে বন্দীরা কিছুতেই চুপ করে বসে থাকবে না। কিছু না পেলে তারাই একটা কিছু সৃষ্টি করে নেয়, তার পর টানতে থাকে তার জের।

এক দিন উষা পাল ও ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এসে হাজির গোপাল ঘোষকে সঙ্গে করে। থিয়েটার করতে হবে। জিজ্ঞেস করলাম : তা এতে আমার কি করবার আছে?

বলেন কি!—বিস্ময় প্রকাশ করল উষা : সংবাদ কি আমরা সংগ্রহ না করেই এসেছি? বিক্রমপুরের হাঁসাড়া-কেয়টখালীর দিকে অভিনয়ে যে আপনার নামডাক খুব, তা আমরা জেনে গেছি। গোপালদা' যদি আপনার সঙ্গে জোটেন, তা হলে এখানেই তো আমরা ষ্টার-মিনার্ভা সৃষ্টি করে দেখিয়ে দিতে পারি—

বাধা দিলাম : কিন্তু দেখাবে কাকে? আমাদের দর্শক কোথায়?

ধীরঞ্জন বললো : এই তিনশো ত্রিশ জনের ত্রিশ জনই না-হয় থাকবে ষ্টেজে, বাকি তিনশো জন দর্শক তো পাওয়া যাবে। তারপর চাকর-বাকর আছে, ধোপা-নাপিত আছে, সিপাইরাও কি আর দেখতে আসবে না? চাই কি, গিরিজাও আসতে পারে সপরিবারে।

কি বই?

সীতা আর মন্ত্রশক্তি।—বললো উষা।

রাজি না হয়ে আর উপায় আছে? সুতরাং মহলা সুরু হয়ে গেল নিয়মিত ভাবে। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক "মিউট মিলটনের" সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়লো। দেখা গেল, আমাদের মধ্যে শক্তিশালী নটেরও অভাব নেই।

কিন্তু অ্যামেচার ক্লাবে যা হয়, এখানেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। ভূমিকা-লিপি প্রতিদিনই পরিবর্ত্তিত হতে লাগলো এবং মহলায় জনসমাগম শনৈঃ শনৈঃ হ্রাস পেতে লাগলো। দেখা গেল, হরিপদ চক্রবর্ত্তীর যেমন নায়কোচিত চেহারা ও স্বাস্থ্য, অভিনয়েও তিনি তেমন পারদর্শী। 'শৃঙ্খলে'র সম্পাদক বিনয় সেনও চমৎকার অভিনয় করেন, তেমনি উষা এবং সতীশ। নারী-চরিত্রের অদ্বিতীয় অভিনেতা হচ্ছেন রবি লাহিড়ী, তারপর ধীরঞ্জন, সুধীর ঘোষ ইত্যাদি।

ঘন ঘন পরিবর্ত্তনের পর চূড়ান্ত ভাবে যে ভূমিকা-লিপি দাঁড়ালো, তাতে সীতা নাটকে আমার ভূমিকা নির্দিষ্ট হলো লব, আর মন্ত্রশক্তিতে

মৃগাঙ্ক। রামের ভূমিকাই ছিল, কিন্তু সীতারূপী ধীরঞ্জনের নাকি আমায় "প্রাণেশ্বর" বলে ডাকতে ভারী হাসি পায়। তাই গোপাল ঘোষ এলেন রফাকর্ত্তারূপে বাল্মীকির ভূমিকা বিনয় সেনকে দিয়ে। ব্যবস্থাপনার অধি-নায়করূপে এগিয়ে এলেন কামাখ্যা রায় অর্থাৎ কামাখ্যাদা'।

কিন্তু এই নাটকাভিনয়ের পুর্ব্বেই একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন হলো। তাতে অর্কেষ্ট্রা পার্টির ঐক্যতান, বাঁশী, সেতার, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতির একক বাজনা, আবৃত্তি এবং অবশেষে বিভিন্ন নাটকের নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়। দীনবন্ধু ঘোষাল কেরিকেচারের ভার নিল। রাখাল ঘোষ এরও পর একটি একাঙ্কিকা কৌতুক নাটকের ব্যবস্থা করলেন।

সাজাহান নাটকের নির্ব্বাচিত দৃশ্যের অভিনয়ে আমি নাটমঞ্চে দেখা দিলাম সাজাহানরূপে। লোলচর্ম বৃদ্ধের মতো ন্যুব্জদেহ, বাম অঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু ও সর্ব্বদা কম্পমান এবং খঞ্জের মতো চলাফেরা, অথচ চক্ষে আগুনের ফুলকি আর কণ্ঠস্বরে বজ্রের নির্ঘোষ। সে যুগে এই ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিনয় তখনো আমার দেখবার সৌভাগ্য না হলেও বিশ্ববিশ্রুত প্রশংসা আমি শুনেছি এবং এই দুরূহ ভূমিকাটি কেমন অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে তিনি অভিনয় করে থাকেন, তাও বহুমুখে জানতে পেরেছি। এই শোনা ও জানার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে এবং সেই সঙ্গে নিজের চিন্তা, যুক্তি ও মৌলিকতা মিলিয়ে এমনি অভিনয় আমি সেদিন করে ফেললাম যে, পরের মাসের 'শৃঙ্খল' পত্রিকায় আমোদ-প্রমোদ বিভাগে লিখবার জন্য এগিয়ে এলেন স্বয়ং বিনয় সেন পার্কার হাতে নিয়ে। ঘোষণা করলেন, সমালোচনা লিখবেন তিনি নিজে এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যা লিখেছিলেন, হুবহু ভাষা তার মনে না থাকলেও ভাবার্থ আজো ভুলিনি। তিনি লিখেছিলেন : 'দ্বিজেন বাবুর অনবদ্য অভিনয় দেখতে-দেখতে মাঝে মাঝে অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় দেখছি বলে আমাদের ভ্রম হয়েছে। স্বাস্থ্যবান যুবক হয়ে এবং বিশেষ করে সেনাবাহিনীর জি-ও-সি হয়ে কী ভাবে যে তিনি এক লোলচর্ম্ম অশীতিপর বৃদ্ধের ভূমিকায় এমনি অনন্যসাধারণ অভিনয় করলেন, তা মনে করে বিস্মিত হতে হয়।'

সুতরাং সীতা ও মন্ত্রশক্তির অভিনয়কালে দর্শকের ভিড় পড়ে গেল এবং স্বয়ং গিরিজা দত্তও এলেন সপরিবারে এবং টবিন সাহেবকেও সঙ্গে নিয়ে। অবশ্য অভিনয় সুরু হবার কিছুক্ষণ পর টবিন স্মিত হাস্যে বিদায় নিলেও গিরিজা সপরিবারে বসে রইলেন একেবারে শেষ পর্য্যন্ত। পরদিন আমায় অফিসে ডাকিয়ে অজস্র প্রশংসা করলেন।

আমাদের নাটকাভিনয় এত জমে গেল যে এর পর জনকতক বন্দী উৎসাহী হয়ে একটা ষ্টেজই তৈরী করবার সংকল্প করলেন এবং চাঁদা তোলা তৎক্ষণাৎ সুরু হয়ে গেল।

টবিনের সঙ্গে খিটিমিটি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। চিঠি লেখা নিয়ে,

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়ে, পীড়িত বন্দীদের চিকিৎসা নিয়ে, ঠিকাদার কর্ত্তৃক জিনিষপত্র সরবরাহ নিয়ে—কী নিয়ে নয় ?

পূর্ব্বেই বলেছি টবিন যুক্তির ধার ধারতেন না। কোনো ব্যাপারে বেশীক্ষণ আলোচনা চললেই তাঁর মিলিটারী মস্তিষ্কের সেলগুলিতে রক্তের প্লাবন দেখা দিত। শিক্ষিত বন্দীদের প্যাঁচালো যুক্তির কোদাল পায়ের তলায় মাটি কেটে দিচ্ছে বলে মনে হতো তাঁর। সুতরাং প্রায়ই আলোচনার মাঝখানটিতেই লাল মুখ আরও লাল করে অকস্মাৎ যবনিকা টেনে দিয়ে নিতান্ত অভদ্রের মতো এমনি আচরণ করতেন যে, গোপাল গুপ্ত তো এক দিন পায়ের স্যাণ্ডেলই প্রায় খুলে ফেলেছিলেন। সঙ্গে ঠাণ্ডা-মেজাজী সুধীন সরকার না থাকলে সেদিনই একটা মারাত্মক কাণ্ড বেধে যেত। আমাদের দাবীগুলো নিয়ে প্রতিনিধি-দল যখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন, টবিন তখন প্রথম দিকে বেশ ভারিক্কি চালে আলাপ সুরু করলেন। কিন্তু গোঁয়ারতুমি-ভর্ত্তি তাঁর মন্তব্যগুলো ক্ষুরধার যুক্তির ফলকে প্রতিনিধি-দলের অন্যতম সদস্য সুধাংশু ভট্টাচার্য্য যখন কেটে ফেলতে সুরু করলেন, তখন একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে অকস্মাৎ টবিন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্ধত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন : তোমাদের দাবীগুলো একেবারেই অযৌক্তিক। অতএব, এবার পথ দেখতে পার।

সেই পথ নির্ব্বাচনের মারাত্মক সভাটাই হলো আগষ্ট মাসের শেষ দিকে। দলভেদ, মতভেদ, পথভেদ যতই থাক, পৃথক্ পৃথক্ চৌকায় camp politics অর্থাৎ ঘরোয়া রাজনীতির কচকচি যতই চলুক না কেন, অনুশীলন-যুগান্তরের ধূমায়িত রেষারেষি যতই থাক না কেন,- বৃহত্তর প্রয়োজনে, যেখানে সমগ্র বন্দীশিবিরের ব্যাপার জড়িত, যেখানে সাধারণ ভাবে বন্দীদের আত্মমর্য্যাদা আহত, সেখানে, সেকালে দেখেছি, সবাই, দল উপদল-নির্ব্বিশেষে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন, হাতে হাত রেখে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেছেন।

একালে অগ্রগামী চিন্তাধারা ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম যুক্তিবাদ সৃষ্টি করেছে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোষ, অপরের ওপর নির্ভর করবার ক্ষীণতম দুর্দ্দিনও যার দেখা দেয় না কোন কালেই। শম্বুকের মতো নিজের চারিদিকে যে অনতিক্রম্য গণ্ডী তুলে রেখেছে, সেই স্বল্প-পরিসরতার মাঝেই লাভ করে সে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ। চরম শান্তি তার সেইখানেই সমাহিত। প্রাণের বিপুলতা ক্ষ্যাপা বন্যায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলেও কোনো কালেই তা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যাবার উদ্দামতা দেখাবে না। একালে তাই দেখতে পাই ফাইল-দুরন্ত ঐক্য, শতাধিক সর্ত্তযুক্ত মিলন। একালে তাই জনমতেরই লজ্জাকর পরাজয় ঘটেছে বার বার ব্যক্তির প্রতিযোগিতার আসরে। সেকালের দল সংগঠনের মূলে আবেগ ছিল অনেকখানি, মন দিয়ে মন জয় করবার সংকল্প ছিল দুর্জ্জয়, পরিণামের অনিশ্চয়তা স্বীকার করে নিয়েই সেকালে আন্তর্দলীয় সহযোগিতার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হতো। বস্তুতন্ত্রবাদের হাপরে পুড়িয়ে একালের নিছক কলা-কৌশলের

খেলা নয়, সেকালের ষ্ট্র্যাটেজির পশ্চাতে ছিল সৈনিকের ভাবাবেগময় সংকল্প, তার সর্ব্বান্তরিক শপথ।

তাই তো দেখলাম, বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিতর্কে, বিনা আলোচনায় আগষ্টের সেই স্মরণীয় সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো মারাত্মক এক প্রস্তাব: পনেরো দিনের সময় দিয়ে টবিনকে দেয়া হবে এক চরম পত্র। আমাদের দাবীগুলো যদি না মেনে নেয় সে, তাহলে আজ থেকে ষোড়শ দিবসেই প্রয়োগ করা হবে একেবারেই বন্দীর তীক্ষ্ণতম অস্ত্র—অনশন। আমৃত্যু অনশন। প্রথম সুরু করবে বিশ জন, তার পর প্রতি সপ্তাহে নতুন দশ জন করে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

একটি শক্তিশালী সর্ব্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে সেদিনকার মত সভার কাজ শেষ হলো।

চরম পত্রকে টবিন কিন্তু পরম কৌতুক সহকারে গ্রহণ করে প্রথমটা বেশ নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন: Are you determined to die?

জবাব দিলেন প্রভাত নাগ: Of course, if our demands are not conceded to.

পাগল যেমন অকারণে খিলখিল করে হেসে ওঠে, তেমনি করে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন টবিন। বেরিয়ে যাবার মুখে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে গেলেন: I am sorry you will have to lose your life then.

গিরিজা কিন্তু গ্রহণ করলেন সাপ্রু-জয়াকরের গৌরবময় ভূমিকা। দু'টি পরস্পরবিরোধী ফোর্সের একটির যদি সামান্য একটু কম বেগ থাকে, তাহলেই তো একটা রেজালটেণ্ট বার করা যেতে পারে। আর সেটা যদি সহনীয় হয় তাহলেই তো গ্রহণীয় বলে উভয় পক্ষকেই আবেদন জানানো যায়। বিস্তর মাথা ঘামিয়ে ফেললেন গিরিজা দত্ত। গোটাকতক দাবী তো এখনই মিটিয়ে দেয়া যায়, কয়েকটার সম্বন্ধে সাহেবের সঙ্গে একটু পরামর্শ দরকার, দু'তিনটে দাবী যা আছে, তা গভর্ণমেণ্টকে না জানিয়ে কিছু করা সঙ্গত হবে না, আর বাকি তিনটে?—ও তিনটে ছেড়ে দিন প্রভাত বাবু, একটা মিটমাট হয়ে যাক।

জবাব দিলেন অনন্ত দে: অনশনে দু'চার জন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার পর ছাড়াছাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে, গিরিজা বাবু। আজ উঠি।

বিলক্ষণ, তা কি হয়?—হাল ছাড়তে চাইলেন না গিরিজা: স্বীকার করি আমাদের অনেক ত্রুটি আছে। কারণ আমাদের হাত পা বাঁধা। কিন্তু সবগুলিই কি আমাদের দোষ, সেটাই বিবেচনা করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাই আপনাদের। এক জায়গায় বাস করে কেন ঝগড়া করবো আমরা, সেটাই আমি বুঝতে পারছিনি। মীমাংসার পথ তো বার করতে হবেই।

সে তো খোলাই আছে।—জবাব দিলেন দেবজ্যোতি: সব পথই গেছে বন্ধ হয়ে, খোলা আছে একটি মাত্র দিক। সেই দিকেই তো যাবো বলে স্থির করেছি আমরা। আলোচনা অনেক হয়ে গেছে এই শিবির খোলবার পর

থেকেই। এত বেশী যে, সবই শেষ পর্য্যন্ত আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়ে যায়।

যতীশ গুহ যোগ দিলেন: তাই এবার একটা কাজ করা যাক্‌, কি বলেন গিরিজাবাবু? কাজের ঝুঁকিটা অবশ্য বেশী হয়ে গেছে। তা আর কি করা যাবে। ক্ষুদিরামের কাছে না গিয়ে হয়তো যাওয়া যাবে যতীন দাসের কাছে। কিন্তু তাঁরা ওখানে গিয়ে বোধহয় এক ঘরেই থাকেন। তাই না, গিরিজাবাবু? ওখানে তো টবিন নেই।

গম্ভীর হয়ে গেলেন গিরিজা ও-ছু'টি নাম শুনে। শুধু বললেন: দিয়ে যান অ্যাপলিকেশন। দেখা যাক্‌ কোনো মীমাংসা সম্ভব কিনা।

কিন্তু কেনো মীমাংসাই সম্ভব হলো না। আমাদের পুরো প্রস্তুতি চলতে লাগলো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনশন-সংগ্রামের প্রস্তুতি। ভিড় পড়ে গেল প্রথম দলের তালিকা তৈরীর সময়। যতীন দাসের বংশধরেরা মৃত্যুর উল্লাসে নৃত্য করে উঠলো। যতীন দাস ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সেরই মেজর। সুতরাং বি-ভি দলের কাছে এসে পৌঁছোল যেন স্বর্গত: সেই অমর শহীদের অনুচ্চারিত আদেশ।......

সংগ্রাম পরিষদ নিজেরা বাছাই করে যে তালিকা প্রস্তুত করলেন, তাতে স্থান পেল পঁয়ত্রিশ জন। বি-ভির ছিল শুধু বীরেন ঘোষ। মুষ্টিযোদ্ধা, ইস্পাতদেহী, বহরমপুর বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর অন্যতম সেক্‌শন কমাণ্ডার বি. ঘোষ।

সমগ্র শিবিরে নেমে এল থমথমে ভাব। আসন্ন কালবৈশাখীর উপক্রমণিকার মতো। বুলেটের বিরুদ্ধে বুলেট নয়, আঘাতের উত্তরে প্রত্যাঘাত নয়। একেবারে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। হৃদয় দিয়ে, মনোবল দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করার চেষ্টা। পরিষ্কার গান্ধীজীর টেক্‌নিক। প্ররোচনায় উত্তেজিত হলে চলবে না। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, ভেবে-চিন্তে প্রতিটি পাদক্ষেপ। শত্রুপক্ষ চাইবে আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে। যুক্তিহীন কথার ঝড় সৃষ্টি করে, বিতর্কের ঝগড়া লাগিয়ে, হয়তো আড়াল থেকে ছু'খানা ইট ফেলে দিয়েই চাইবে আমাদের হিংস্র করে তুলতে। তার পরই হুকুম হবে: ফায়ার!

অবশ্য, আমরা জানতাম, আমাদেরই মতো ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে, বিন্দুমাত্র প্ররোচনা ব্যতীতই ইংরেজের বাচ্চা টবিন অনায়াসে গুলী চালাবার হুকুম দিতে পারে। জিভে তার এতটুকু জড়তা দেখা দেবে না।

অনশনকারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য এবং তাঁদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে সকল বন্দীই পত্র লেখার সুযোগ ত্যাগ করলেন, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন, রান্না-ঘরের কর্তৃত্ব ত্যাগ করা হলো, খেলাধুলা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হলো, হাতখরচের টাকা থেকে একটি জিনিষও কেউ আর কিনলেন না, গান-বাজনা, ঐক্যতানবাদন সব থেমে গেল। কোলাহলমুখর শিবিরে নেমে

এল মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা। সবারই মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে, কথা ফুরিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ স্থগিত। শুধু প্রতিদিন 'শৃঙ্খল' পত্রিকার বিশেষ দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে অনশনকারী বন্ধুদের অবস্থা ও কর্ত্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতার বার্ত্তা নিয়ে। কার্টুন নয়, রস-রচনা নয়, ছুরির ফলার মতো ধারালো মাত্র কয়েকটি সংবাদ—কার বমনোদ্রেক দেখা দিয়েছে, কে শয্যাগ্রহণ করেছেন, কার টেমপারেচার হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে উদ্ধত টবিনের স্পর্দ্ধোন্মত্ত মন্তব্য : Let them die!

সত্যিই, একটি-একটি করে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে আর একটু-একটু করে এগিয়ে চলেছেন এঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। আত্মসম্মান যেখানে আহত, ন্যূনতম অধিকার যেখানে পদদলিত, জীবনের মূল্য সেখানে অকিঞ্চিৎকর—এই এঁদের সর্ব্ব অন্তরের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করে গেছেন টেরেন্স ম্যাকসুইনী, তারপর মেজর যতীন দাস গেঁথেছেন তা পাকা করে, আর আজ পঁয়ত্রিশ জন বিপ্লবী বন্দী খাড়া করে তুলছেন অটল বিশ্বাসের ইমারত।

রাত্রে বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম বটে, কিন্তু ঘুম আসতো না বহুক্ষণ! বার বারই মনে হয়েছে এই পঁয়ত্রিশটি পরিবারের কথা। ক্ষীণায়মান আশা নিয়ে আজো তাঁরা অপেক্ষা করছেন সুপ্রভাতের। কিন্তু দীর্ঘ রজনী যে দীর্ঘতর হতে চলেছে এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার অজগরের মতো ফণা তুলে যে সব-কিছু গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে, সে দুঃসংবাদ কি পেঁ ৗছেছে তাঁদের কাছে?

বাইশ

কেটে গেল পুরো একটি সপ্তাহ। প্রথম-প্রথম অনশনব্রতীরা দল বেঁধে বিকেলে, সূর্য্যাস্তের অনেক পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে এলে বেড়াতে বেরুতেন। দিন সাতেক পর থেকে আর তা সম্ভব হলো না; হলেও বন্ধু বন্দীরা তা বন্ধ করে দিলেন। প্রথম সপ্তাহশেষে আবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল এই দলে যোগ দেবার জন্য। সংগ্রাম পরিষদ বাছাই করলেন তা থেকে এবার পঁচিশ জনকে। প্রথম সপ্তাহের পঁয়ত্রিশ জন বৈকালিক ভ্রমণ ত্যাগ করলেও দ্বিতীয় সপ্তাহের এঁরা আবার তা সুরু করলেন।

অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল অনুশীলনের অরবিন্দ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। সে মাত্র পনেরো মিনিট। ঘাবড়াবার কিছু নেই তাতে। আবার একদিন দেখলাম যুগান্তরের হিমাংশুর বেশ জ্বর দেখা দিয়েছে। ডাঃ সরকার এসেছেন। পরীক্ষা শেষ করে অনেক দ্বিধার সঙ্গে বললেন: অবশ্য আপনাদের নীতি নিয়ে তর্ক করবার অধিকার নেই আমার। কিন্তু হিমাংশু বাবু এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন যে, শুধু লেবু-জল দিয়ে কতখানি আর শক্তি দিতে পারবেন ওঁকে? Vitality কমে গেলে ওষুধ দিয়ে কি আর রোগ সারানো যায়, নিরঞ্জনবাবু?

সবাই চিন্তিত হয়ে উঠলো। নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: কি করা যেতে পারে তাহলে?

ইতস্তত: করে সরকার বললেন: যদি বলেন, তাহলে না হয় কিছু গ্লুকোজ ইনজেকশন—

একশো তিন জ্বরের মধ্যেও হিমাংশু শুনতে পেয়েছে সে কথা। রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টি উন্মীলন করে ধুঁকতে ধুঁকতে জবাব দিল সে নিজে: ইনজেকশনই যদি নিতে পারি, তাহলে খেতে দোষ কি, ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু ঘাব্‌ড়ে গেলেন: না, তা বলছি না, তবে—

তবে-টবে থাক্, ডাক্তারবাবু। যদি পারেন, খানিকটে বুদ্ধির ইনজেশকশন দিয়ে দেবেন আপনাদের মনিবকে। বলবেন তাকে, বরিশালের ভাষাও যেমন মিঠে ভদ্রতার অপেক্ষা রাখে না, তেমনি বরিশালের গোঁ-ও একেবারে বন্য শুকরের গোঁ-এর মত। ষ্টার্ট করলে একেবারে ফিনিশ পর্য্যন্ত না গিয়ে সে নিশ্বাস ফেলতে জানে না।

নীরবে বিদায় নিলেন সরকার।

প্রথম দিনের অনশনব্রতীরা সবাই শয্যা গ্রহণ না করলেও আর বেরুতেন না মাঠে। ইজিচেয়ারে বসে বই পড়তেন। কেউ খেলতেন তাস, কেউ বা ক্যারম। আমার আজো স্পষ্ট মনে পড়ে, অনশনের বোধ হয় চতুর্দ্দশ দিবসেও বিকেলে মাঠে বেড়াতে দেখেছি বি-ভির বীরেন ঘোষকে। সেই

মুষ্টিযোদ্ধা বীরেন ঘোষ, ঢাকা জেলে যার প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিলেন একদা ডেপুটি জেলর আশুবাবু।

খেলাধুলা বন্ধ, প্যারেডও স্থগিত। তাই পায়চারী করছিলাম মাঠে। দেখি হাসপাতালের পথ দিয়ে আসছে বীরেন। দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম : শরীর কেমন?

ঠিক আছে। জবাব দিল বীরেন।

চেয়ে দেখলাম। মুখমণ্ডলের সেই প্রাণ-প্রাচুর্য্যের দীপ্তি খানিকটে কমে গেছে। হাতের মোটা মোটা আঙ্গুলগুলোও যেন একটু সরু মনে হলো। বিরাট থাবার ব্যাপ্তিও বুঝি কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। কেমন যেন ঢ্যাঙ্গা-ঢ্যাঙ্গা মনে হচ্ছে ইস্পাতদেহী বীরেন ঘোষকে। কণ্ঠ যেন দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরে এখনো অনুরণিত সেই ঢাকা জেলের বীরেন ঘোষের অটল শপথ। ঘুষি দিয়ে নয়, এবার মনোবল নিয়ে একবার দেখে নেবে সে। পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কাকে বলে বীরেন তা জানে না।

সংগ্রাম পরিষদের সদস্যগণ এবং সাধারণভাবে সকল বন্দীই অনশনব্রতীদের খোঁজ-খবর নিতেন সারাদিন। সংগ্রামে যে আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত, এই সুসংবাদ পরিবেশন করে উৎসাহিত করে তুলতেন তাঁদেরকে। শুধু তাই নয়, এই পনেরো দিনের মধ্যে সারা শিবির দু'দিন খাদ্য প্রত্যাখান করে নিরম্বু উপবাস করেছে সহবন্দীদের প্রতি সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ।

তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম দিন যে তালিকা প্রকাশিত হলো, তাতে আমারও নাম রয়েছে। সুতরাং সকালবেলাই ভারী মাত্রায় ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ নিলাম ও চাদরে দেহ আবৃত করে সটান বিছানায় শুয়ে থাকলাম। এবার অনশনব্রতীর সংখ্যা দাঁড়ালো আশী জন।

কোথা দিয়ে প্রথম দিন কেটে গেল, সকালের মিঠে রোদ পড়ন্ত বেলার বিষণ্ণ আলোয় নিষ্প্রভ হয়ে এল, কখন ধীরে ধীরে নেমে এল সন্ধ্যার আর্ত্ত অন্ধকার, টেরই পেলাম না তা। ভাবাবেগের গতিবেগে প্রথম দিনটা যেন একেবারে ছুটে পালিয়ে গেল তাড়া-খাওয়া হরিণশিশুর মতো।

দ্বিতীয় দিনের সকালে ঘুম ভাঙতেই অকস্মাৎ মনে হলো গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল খেলাম পুরো দু'গ্লাস লেবুর রস দিয়ে। প্রথমে মনে হলো গলা পর্য্যন্ত ভরে গেছে, কিন্তু তারপরই পাকস্থলীর কোন কোণে ওটুকু জল যে তলিয়ে গেল, হদিস পেলাম না তার। ভেজা গলা শুকিয়ে গেল। মনে পড়লো, কাল খাইনি। কিন্তু দিনে ও রাতে কি খেতে পারতাম, মনে পড়লো তা। কিচেন সরকারী তত্ত্বাবধানে যাবার পর খাদ্যের অবনতি যে হয়েছে শোচনীয়ভাবে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু ওরাই যা দেয়, একেবারে অখাদ্য নয় তা। সকালে খানকয়েক লুচি আর আলুর তরকারি; দুপুরে ডাল, তরকারি, মাছ, দৈ আর রাত্রে মুড়িঘণ্ট, ছোলার ডাল

আর আলু-পটলের ডালনা। এই মেনু চলছে সেই যেদিন আমরা চৌকার তত্বাবধান ছেড়ে দিয়েছি সেদিন থেকে। কাল কিন্তু এগুলো খাইনি।

অনশন যাঁরা এখনো করেননি, তাঁরা গিয়ে খেয়ে আসেন, আর যাঁরা অনশনব্রতী, সরকারী তত্বাবধানে তাঁদের পুরো খাদ্যও পরিপাটি করে সাজিয়ে এনে তাঁদের টেবিলে রেখে দেওয়া হয়। না খেলে সকালের জলখাবার দুপুরে, দুপুরের খাবার বিকেলে আর রাত্রের খাবার পরদিন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের মনোবলের ওপর এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত বৈ আর কিছু নয়। টেবিলে সাজানো থরে থরে সুস্বাদু আহার্য্য, অথচ স্পর্শও করবো না তা! প্রলোভন জয় করতে হবে।

দ্বিতীয় দিনের সকালে মনে হলো এমনি অটুট মনোবল কাল দেখিয়েছি আমি। দিনের বেলায় কী খাবার এনে রেখে গিয়েছিল, ভ্রূক্ষেপও করিনি তার প্রতি, কিন্তু রাত্রে খাবারগুলো চোখে পড়েছিল। মুড়ীঘণ্ট থেকে কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসতেই ফিরে একবারটি দেখেছিলাম। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম, কর্ম্মচারীরা পুকুর চুরি চালাচ্ছে। পাশ করিয়ে নিচ্ছে হয়তো ঘি, গরম মসলা, কাটারিভোগের চিড়ে আর রুইয়ের মাথার বিলটি, আর দিচ্ছে গোটাকতক কাতলা বা মৃগেল মাছের মাথা আলু-পেঁয়াজ দিয়ে আচ্ছা করে ঘুঁটে, কড়া ঝাল দিয়ে আর হাঁটুপ্রমাণ ঝোল রেখে। ঘি যাচ্ছে বোধ হয় গিরিজা বা পবিত্রের বাড়ীতে। আর শুধু কি ঘি? তেলের টিনও নিশ্চয়ই জমাদারদের ও বাবুদের বাড়ীতে যায়। তাই ঐ কাতলা ও মৃগেলের মাথাগুলোই সাঁতলে নেয়নি ভালো করে। তাই তো এমনি বোঁটকা গন্ধ!

আর, আমরা কিচেন ছেড়ে দেবার পর আমাদের চাকর-বাকর বাবুর্চ্চিরাও বেশ ফাঁকি দিচ্ছে। তাই তো দেখলাম আলু-পটলের ডালনাতে সব আস্ত আস্ত মশলার গুঁড়ো লেগে রয়েছে। আর কী রং ডালনার ঝোলের। ফ্যাকাশে।

রং সম্বন্ধে বাড়ীতে সবার চাইতে বেশী খিটিমিটি করেন আমার মা। ফরিদপুর জেলার খালিয়া গ্রামের ধনী জমিদার কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদুরে কন্যা গিরিবালা। সেকালের জমিদার। নায়েব-গোমস্তা, পাইক-পেয়াদা, চাকর-বাকর ভর্ত্তি খালিয়া গ্রামের বিখ্যাত "বড়বাড়ী"। জমিদারকন্যা যেমন পারতেন ঢেঁকিতে ধান ভানতে, বালি দিয়ে মুড়ি আর খৈ ভাজতে, তেমনি আহার্য্য সম্বন্ধেও ছিল তাঁর শ্যেন দৃষ্টি। হলুদ ও লঙ্কায় টকটকে রং না হলে মা তা ছুঁতেনই না। মায়ের খানিকটে রুচি-পছন্দ ছেলেতেও যে সংক্রামিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সরকারী লোকগুলো জানেই তো যে, আমরা এই খাবার স্পর্শও করবো না, তাই বোধ হয় নিজেরাও হেলায়-ফেলায় যা-খুশী তাই যেমন-তেমন করে নেড়ে-চেড়ে দিয়ে যায় যেমন থালা সাজিয়ে, তেমনি ফিরিয়েও নিয়ে যায় থালা ভরে।

দ্বিতীয় দিনের রাত্রির কথা মনে পড়ে। অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। বিকেলে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় বেশ ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিছানা-

বালিশ রোদে দিয়েছিল হরিমোহন। তাই বালিশে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ আর ঝিমিয়ে-আসা উত্তাপটা কেমন আপন-আপন মনে হয়। তবু ঘুম আসছে না কেন ?......

সাধারণ অনশনের সপ্তদশ দিবসে আমার অনশনের তৃতীয় দিন। আশ্চর্য্য, কর্তৃপক্ষের টনক আজো নড়েনি। টবিন একেবারে পুরো-দস্তুর মিলিটারী দেখা যাচ্ছে।

সকালবেলা আমার ঘরে এলেন ভোলাবাবু, সংবাদ দিলেন, টবিন আজ প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়েছে।

অকস্মাৎ অন্ধকারে যেন একটা লাইট হাউস দেখতে পেলাম। প্রতিনিধিদের যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, নিশ্চয়ই টবিন তখন আপোষের কথাই পাড়বে। কিংবা ও-ব্যাটা হয়তো গররাজীই ছিল, কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছে সরকারী হুকুম। এবার চাঁদ যাবে কোথায় ?

ভোলাবাবু বললেন : অনুশীলনের ননী সেনের দারুণ বমির ভাব দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। বমির ভাব এলেই ননী সেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাছাড়া ওঁদের আরো দু'জনের দারুণ জ্বর দেখা দিয়েছে। ডাঃ সরকার বলে গেছেন নিউমোনিয়া হতে পারে।

জিজ্ঞেস করলাম : তাহলে ?

তাহলে আর কি! জলের মত বললেন ভোলাবাবু : আজ যদি মীমাংসা না হয়ে যায়, তাহলে অনশন চালানো মুশকিল হবে। গোপাল গুপ্ত তো স্পষ্টই বলেছেন, এই cause এর জন্য তো ছেলেদের মরতে দিতে পারি না।

আবারও প্রশ্ন করলাম : তাহলে ?

তাহলে করতে হবে honourable retreat ; নইলে আরও দেরী করলে আমাদের মধ্যেই হয়তো মতভেদ দেখা দেবে আর কর্তৃপক্ষ তার সুযোগ নিয়ে divide and rule নীতি প্রয়োগ করবে। আরও, দিবাকরবাবুর বিছানার নীচে নাকি পেন্সিলে-লেখা কয়েক টুকরো কাগজ পাওয়া গেছে। তাতে নাকি পবিত্রকে সম্বোধন করে আমাদের মতভেদের কথা ও অনশন-সংগ্রাম আর বেশী দিন চালাতে না পারার কথা লেখা আছে।

দিবাকরের কী দশা হলো ?

ভোলাবাবু জবাব দিলেন : আপাততঃ কিছু না। তবে বীরেনবাবু বলছেন, ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আজকের আলোচনার ওপর সব নির্ভর করছে। আমি দেখিনি সে চিঠি। যতীশদা'র কাছে আছে।

ভোলাবাবুর কাছে আরও সংবাদ পেলাম আমাদের সর্ব্বদলীয় ঐক্যে ফাটল দেখা দেবার উপক্রম হয়েছে। নানারূপ গুজব রটানো হচ্ছে। যে-কেউ অফিসে গেলেই তাকে চর বা সুবিধা-প্রত্যাশী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অনশন-ব্রতীদের মধ্যেও কেউ কেউ নাকি scientific hungerstrike চালাবার কথাও বলছেন। বৈজ্ঞানিক অনশন, মানে খেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে না-খাবার ভাণ

করা। কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দেবার জন্য প্রকাশ্যে অনশনব্রতীর মতো নিষ্ঠা দেখিয়ে গোপনে সামান্য কিছু করে আহার করে গেলে অনশনও চালানো যায় আরও দীর্ঘকাল। এর প্রবর্ত্তক নাকি বরিশালের সতীন সেন।

ভোলাবাবু চলে যাবার পর আশা ও আশঙ্কায় মন আমার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পরাজয় বরণ করে নিতে হবে? কি হয় দু'চার জন প্রাণত্যাগ করলে? কিন্তু গোপাল গুপ্ত যা বলেছেন, তাও তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—শয়তান গভর্ণমেণ্টর উচ্ছেদ সাধনের জন্য যারা নিজেদের দিয়েছে বিলিয়ে, তারা কিনা অবশেষে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধে ও খানিকটে অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নেবে নিঃসহায়ের মতো? এমনি নীরব সত্যাগ্রহীর মৃত্যুই কি বিপ্লবীর কাম্য?

বেলা বারোটা বাজতেই দেখলাম, চাকর হরিমোহন এসে আমার খাবার টেবিলে রেখে গেল। সঙ্গে যে সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি আবার এক গ্লাস জল ভরে রাখবার হুকুমও জানিয়ে গেলেন। হরিমোহনও হাসি চেপে এক গ্লাস জল টেবিলের ওপর রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজকে দেখছি আবার রান্না হয়েছে মুর্গীর মাংস। অর্থাৎ অন্ততঃপক্ষে আশী জনের বরাদ্দ মাংসটুকু বিকেলে হুল্লোড় করে অফিসে বসে যেমন সবাই খাবে, তেমনি ছাঁদা বেঁধে নিয়েও যাবে গিন্নী ও আণ্ডাবাচ্চাদের জন্য। খাবার লোক নেই, তার আবার মাংস। কিন্তু অকস্মাৎ এই মেনু পরিবর্ত্তন কেন? লোভ দেখানো আর ক্রমেই তা তীব্রতর করে দেখানো?

মনে পড়ে গেল, এই অনশন-সংগ্রাম সুরু হবার পূর্ব্বে যেদিনই সত্যবাবু মুর্গীর মাংসের ব্যবস্থা করতেন, সেদিন শুধু আমি নয়, ডবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরের সবাই যথারীতি সবার শেষে খেতে গিয়ে আর ভাত বা অন্য কিছু খেতাম না, খেতাম শুধু মাংস। বিলম্বে যাবার জন্য পাছে আমাদের ভাগ্যে অবশিষ্ট আলুর ঝুস্ ও গোটাকতক মাংসহীন ঠ্যাং মাত্র জোটে, তাই সত্যবাবু রান্না হওয়া মাত্রই বড় এক ডেকচি মাংস পৃথক্ করে রাখতেন আমাদের জন্য। সদাশয় সত্যবাবু! খাইয়ে খুশী হতে যেমন ঢাকা জেলে দেখেছিলাম নীরেনবাবুকে, তেমনি এখানে দেখছি সত্যবাবুকে। মহানুভব ব্যক্তি!

আর আমরা এক-এক জন প্লেটের পর প্লেট সাবাড় করে চলেছি নিবিষ্ট মনে সাধনা করবার পোজ নিয়ে। অপরের প্লেটে মাংসের পাহাড় ধূলিসাৎ হলো কিনা, ভ্রূক্ষেপও নেই সেদিকে। সে কাজ সত্যবাবুর, আমাদের হোষ্টের। প্লেটের পাশে জমছে শুধু চুর্ণীকৃত অস্থি। স্তূপ হয়ে উঠছে।

খাঁটি গাওয়া ঘি, পেঁয়াজ রসুন ও ঝাল দিয়ে সত্যবাবু রান্নার যা ব্যবস্থা করতেন, মুর্শিদাবাদের নবাব-বাড়ীর বাবুর্চ্চিও তার কাছে হার মেনে যায়। আহারের বিবরণ শুনে-শুনে আমাদের কম্পাউণ্ডার বঙ্কিমবাবুর ভারী লোভ হলো একদিন স্বাদ গ্রহণের। রাত্রে চুরি করে এসে খেয়ে গেলেন মাংস আর পোলাউ। তার পর তাঁকে নাকি পেটের অসুখে ভুগতে হয়েছিল প্রায় দিন

পনেরো। বলেছিলেন তিনি : ও কি মশাই ঝোল? শুধু ঘি আর তেল। পুরো একখানা লাক্‌স্‌ গেছে হাতের ঘি ছাড়াতে। পেটের আর দোষ কি বলুন!

ঘড়ি দেখলাম, প্রায় বারোটা বাজে। আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই নিশ্চয়ই টবিনের অর্ডারলি আসবে আমাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে যাবার জন্য। এই সতেরো দিনের অনশনে সমগ্র শিবিরে কেমন একটা বিপর্য্যয় অবস্থা দেখা দিয়েছে। নিয়ম-নিষ্ঠা একেবারে ভেঙে পড়েছে। শৃঙ্খলার লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই কোথাও। সর্ব্বোপরি, গোপাল গুপ্তের কথা ফেলে দেয়া যায় না। আমাদের দাবীগুলোর জন্য সংগ্রাম চালাতে প্রস্তুত আমরা, কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নেয়া যায় না। উচিতও নয়। বাইরে গিয়ে বিপ্লবীর অসংখ্য কাজ আছে। জেলের মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দিলে সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে নাম ছাপতে পারে, সভা করে গলায় ফুলের মালা পড়তে পারে, অভিনন্দন-পত্রও পাওয়া যেতে পারে সুদৃশ্য রূপোর কাসকেটে, কিন্তু দেশের কাজ তাতে কতখানি হবে, বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে সর্ব্বহারাদের কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কঠিনতম যে দায়িত্ব কিশোর বয়সেই স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নিয়ে আমরা যাত্রা সুরু করেছি, সে দায়িত্ব পালনে অণুমাত্রও শিথিলতা দেখালে দেশবাসীর কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য আমরা! জেলীয় জীবনের বিশ্রি অসুবিধাগুলির জন্য আমরা জানাতে পারি তীব্র প্রতিবাদ, দেখাতে পারি ক্রুদ্ধ বিক্ষোভ এবং এতেও যদি সুফল কিছু না হয়, তাহলে—আমার মনে হয়, একদিন সদলবলে বিদ্রোহ করে জেল ভেঙে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সশস্ত্র সিপাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু, নিরুপায়ের মতো শিবিরের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিনা প্রতিবাদে নেহাৎ গোবেচারা ভদ্রব্যক্তির মতো বর্ণহীন মৃত্যু আমাদের জন্য নয়!......

তবে আপোষ আজ হয়ে যাবেই। যদি হয়, তাহলে দু' একদিনের মধ্যেই আবার চৌকা আসবে আমাদের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে। আবার সত্যবাবুর হোটেল দু প্যারী! কিন্তু আর মাংস ভালো লাগে না। এবার বলবো শাক-সব্জী ও তরকারি চালাতে। সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পাতলা করে মুসুর ডাল। মাছ চলতে পারে। তবে আর রুই-কাতলা নয়, এবার ছোট মাছের ঝোল গোলমরিচ আর আদা দিয়ে আর কালজিড়ে ফোঁড়ন। পাতিনেবু তো থাকবেই।

গরম পড়েছে অসহ্য। ঘরের অন্যান্য অধিবাসীরা কে কোথায় পালিয়েছে একটুখানি ঠাণ্ডার প্রত্যাশায়। একা আমি। সময়ও যেন আর কাটতে চায় না। সেই কখন বিকেল হবে, আমাদের প্রতিনিধিরা যাবেন অফিসে। মিটমাটের সংবাদ এলেই হয়তো আজ রাত্রে পাওয়া যাবে ঘোলের সরবৎ, কমলালেবুর রস। কিন্তু সতেরো দিন যাঁরা অনশনে আছেন, তাঁদের কথা

পৃথক। আমার তো সবে আজ তৃতীয় দিবস। ঝোলের সঙ্গে গরু চালের একমুঠো ভাতও আমার পক্ষে অন্যায় কিছু হবে না। এমন কি, ঐ যে মুর্গীর মাংস রেখে গেছে, ওথেকে দু'খানা আলু তুলে খেলেই কি অমনি আমাশা ধরে যাবে? মাত্র তিন দিনে শরীরের যন্ত্রগুলো এমন কিছু বেতো হয়ে যায়নি যে, দু'খানা আলুর টুকরোও হজম হবে না।

মাংসের বাটিটা হাতে তুলে নিলাম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম, সত্যিই রান্না বিশ্রি, মাছের ঝোলের মত। বেশী সেদ্ধ করে ফেলেছে, হাড়-মাস আলাদা হয়ে গেছে। তবুও মুর্গীর মাংস, সেরা মাংস। আপোষ তো হয়ে যাবেই আজ, মাত্র দু'-তিন ঘণ্টা বাকি। কী আর এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে যদি দু'খানা আলু তুলে মুখে দিই—

এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে ঢুকলেন ভোলাবাবু।

দ্বিজেনবাবু, আপোষ হয়ে গেছে। টবিন নিজেই নোটিশ দিয়ে অনেক-গুলো দাবী মেনে নিয়েছে। বাকিগুলোর জন্য আমাদেরও বর্ত্তমানে আর তাগাদা নেই।—পরে হবে, এই স্থির হলো সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে এই মাত্র।—আমি আসছি আপনার সরবৎ আর লেবুর রস নিয়ে।

ভোলাবাবু বেরিয়ে যেতেই মনে হলো জীবনে এত বড় সুখকর সংবাদ কখনও পাইনি, আর বোধহয় পাবোও না। এবার আর চুরি করে দু'টো আলু কেন, সবগুলো আলুই খেতে পারি। আর পুরো বাটিটাই সাবাড় করে দিলে কার কি বলবার আছে? কারণ—The hunger strike is over—ভার্সাই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে।

তেইশ

কিন্তু মহামান্য বৃটিশরাজের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করেছি আমরা যে, সন্ধিপত্র is nothing more than a scrap of paper অর্থাৎ তুচ্ছ এক টুকরো কাগজমাত্র। সংগ্রাম যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন দিনকতক আলাপ-আলোচনার পর বিজেতা দলের ডিক্‌টেশন ও বিজিত দলের সাময়িক-ভাবে নিরুপায় নতি-স্বীকারের ফলে কিছু কাল ও কিছু সময় অপব্যয় করে যে আপোষনামা প্রণীত হয়, গাল-ভরা ভাষায় তাকেই তখন বলা হয় সন্ধিপত্র। এই সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা আজ অবধি দুনিয়ায় কেউ মেনে নেয়নি, মেনে চলেনি ; তাই তো দুনিয়ায় আজো হানাহানির নেই এতটুকু কমতি।

অবশ্য, ছাই চাপা দিয়ে আগুন ঢাকবার চেষ্টা হয়েছে বহুবার। যুক্তির শাণিত খড়েগ জমাট ভাবাবেগকে খান্ খান্ করে কেটে ফেলে দিয়ে অথবা তোষামোদ করে, হাতে-পায়ে ধরে, বিনতি-মিনতির মরা-কান্না কেঁদে অসংখ্য বার চেষ্টা করা হয়েছে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার। কিন্তু হায়, ছিপি-খুলে-রাখা শিশির মধ্যে থেকে কর্পূর উড়ে যাওয়ার মতো সদিচ্ছা ও সহনশীলতা, আপোষ-রফা ও সন্ধির সাধুতা কখন্ একসময় যে ছেড়ে চলে যায়, টের পাওয়া যায় তখন, যখন একেবারে শোনা যায় তূর্য্যধ্বনি, শুনতে পাওয়া যায় খাপখোলা তলওয়ায়ের ঝনৎকার, দিগদিগন্ত যখন প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে যুধ্যমান সেনাদলের বিজয়-গর্জ্জনে। কাগজের টুকরোখানা তখন সমাধি লাভ করে ওয়েষ্ট পেপারের ঝুড়িতে।

অনশন-সংগ্রামে জয়লাভ করেছি আমরা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। একে কোনক্রমেই জয় বলা যায় না। যে দাবীর তালিকা পেশ করতে গিয়ে একদিন উদাত্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের কণ্ঠ মেঘ-গর্জ্জনের মতো, বিপর্য্যয় আসন্ন দেখে আর একদিন সেই কণ্ঠেরই স্বরগ্রাম আনলাম আমরা নামিয়ে, কমিয়ে আনলাম দাবীর সংখ্যা। তারপর একদিন নিজেরাই গরজ করে, আগ্রহ দেখিয়ে উদ্ধত টবিনের আপোষের সর্ত্তগুলি এক-এক করে গলাধঃকরণ করতে হলো তিক্ত বটিকার মতো। মনে মনে অবশ্য খুশী হলোনা এক জনও। ফলে, এর পর থেকেই কর্ত্তৃপক্ষের সাথে কারণে-অকারণে হামেশাই আমাদের খিটিমিটি চলতে লাগলো।

রাত্রে ঘর বন্ধ করবার পূর্ব্বে ওরা যখন গুনতি করতে আসতো, প্রায়ই ভুল হতো ওদের। কারণ গুটানো বিছানার মধ্যে একটি লোক কি ভাবে ঘণ্টা-খানেক লুকিয়ে থাকতে পারে, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি গাড়োয়ালী মগজে ছিল না। তাই দরজায় তালা এঁটে ওরা সারা শিবির তন্ন-তন্ন করে তল্লাসী করে মরতো নিরুদ্দিষ্টের জন্য। তারপর ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে গলদঘর্ম্ম শরীরে যখন আবার গুনতি করতো, সবিস্ময়ে এবার খাতা খুলে দেখতো যে গুনতি মিলে গেছে।

কিন্তু বেশী দিন চললো না এই খেলা। দিবাকর নিজেই বা তার কোনো উৎসাহী সাকরেদ কোনো ছুতো করে অফিসে গিয়ে হয়তো শ্রীমান পবিত্রের কর্ণকুহরে ঢেলে দিয়ে এসেছে এই গুপ্ত ক্রীড়ার রহস্য। তাই দেখা গেল, এবার ওরা বাইরের মাঠ তল্লাসী করবার পূর্ব্বে ঘরের বিছানা উল্টে দেখে, খাটের নীচে ও পাইখানাতেও উঁকি মারে।

গাড়োয়ালী সিপাইদের সঙ্গে আমাদের পুরাতন দোস্তালীর কথাও বোধহয় কী ভাবে টের পেয়ে গেছেন পবিত্র সরকার। তাই, অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল, গাড়োয়ালী সেনাদল বদলি হয়ে গেছে, আর তাদের স্থানে এসেছে আনকোরা পাঠান সিপাই। এদের প্রত্যেকেই অন্ততঃ ছ'ফুট লম্বা, শরীরে মাংস ও মেদের চাইতে মোটা মোটা হাড়, খুব ষ্টাইল করে কামানো গোঁফ আর বব্ ছাঁটা চুলে ঘাড়-কামানো। সারা মুখমণ্ডলে কেমন যেন একটা রুক্ষতার ছাপ, দু'পাঁচ মিনিট কথা কইলেই তা আরও স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠতো। শিবিরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই বোধহয় এদের ফল্ ইন্ করিয়ে কামাণ্ডাণ্ট টবিন শিবিরে যেসব সরকার-বিরোধী ডাকাত ও নরঘাতকদের আটকে রাখা হয়েছে, প্রাঞ্জল ভাষায় তাদের কুকীর্ত্তিগুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং বিনা পরিশ্রমে আমাদের মাসিক খাদ্য ও অন্যান্য ব্যয়-বাবদ মোটা টাকা বেরিয়ে যায় বলেই যে সিপাইদের তলব বৃদ্ধির সদিচ্ছা সদাশয় সরকারের মনে সর্ব্বক্ষণ কাঁটার মতো বিঁধলেও তাঁরা কার্য্যে তা পরিণত করতে পারছেন না—গবুচন্দ্র গিরিজাও নিশ্চয়ই ঝোপ বুঝে এই কোপটি মেরে দিয়েছেন।

গেটের বাইরে এদের রুক্ষ মেজাজে যে মনোবৃত্তি ইনজেক্ট করে দেয়া হয়েছে, শিবিরের অভ্যন্তরে ডিউটিতে এসে তারই তিক্ত অভিব্যক্তি পাওয়া যেতে লাগলো প্রতি পদে।

আমাদের-চাকর-বাকর-রাঁধুনীদের গুনতি হতো দিনের মধ্যে দু'বার। গাড়োয়ালী সিপাইরা রসুই-ঘরে ঢুকে সর্দ্দার কয়েদীর কাছ থেকেই সব তথ্য নিয়ে চলে যেতে, আমাদের দৈনন্দিন কাজে অনর্থক বাধা সৃষ্টি করতে চাইতো না। আর পাঠানরা এসেই সর্ব্বপ্রথম আইন প্রয়োগ করলো এদেরই বেলায়। হুকুম হলো, বারোটা বাজলেই হাতের সহস্র কাজ ফেলে রেখে জেলের নিয়মের মতো এই সব সাধারণ কয়েদীকে ফাইল করে বসতে হবে ব্যারাকের বারান্দায়-বারান্দায়। এই কয়েদীর সংখ্যা প্রায় দু'শো। সিপাইরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এক-এক করে এদের গুনতো—একবার নয়, একাধিক বার।

অর্থাৎ প্রায় একটি ঘণ্টা সময় নষ্ট হতো আমাদের। নয়া কিচেন-ম্যানেজার দিলীপবাবুর সঙ্গে এই দুর্ব্যবস্থা নিয়েই প্রথম ওদের সেক্সন-কমাণ্ডারের সঙ্গে বেশ বিতর্ক হয়। কমাণ্ডার নিয়মের বাঁধন এতটুকু শিথিল করতে রাজী নয়; ফলে, অসুবিধে হতো সীমাহীন। অতগুলো লোকের কিচেনে রাবণের চুল্লীর ওপর সারি সারি বিরাটকায় ডেকচি ও কড়াইতে রান্না চলেছে, এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠলো—ব্যস, সবাই চলে গেল কিচেন ছেড়ে। ম্যানেজার

দিলীপবাবুর তখন সঙ্গীন অবস্থা। কোন্‌টা সামলাবেন তিনি—কোন্ ডেকচিটা বা কোন্ কড়াইটা ?

এ নিয়ে অফিসে রিপোর্ট করেও কোন সুফল হয়নি। ওঁরা বলেন, নিয়মের ব্যতিক্রম তো ওরা কিছু করে না, শুধু একটু বেশী মেনে চেলে। তা নিয়মভঙ্গের কথা আমরা উচ্চারণ করি কিভাবে ? ওদেরই একটু বলে-কয়ে নেবেন, আমরা বাধা দোব না।

কিন্তু বলা-কওয়া চলে তাদেরই সঙ্গে, যারা যুক্তি বোঝে ও মানে। এদের কাছে সে আশা বৃথা। মেসিনের মত এরা সর্ব্বঅবস্থায় ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করে চলে অক্ষরে-অক্ষরে। নিজের কিছু বুদ্ধি থাকলেও তা খাটাবার মত মনোবৃত্তি বা সৎসাহস এদের নেই। তাই আমাদের সঙ্গে এদের ঠোকাঠুকি ক্রমে বেড়েই চললো।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমের আয়োজন করছি, এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে গোলমাল শোনা গেল। দ্রুতপদে কমেট এসে বললো : শীগ্‌গির চলুন দ্বিজেনবাবু, ওদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার লেগে গেছে।

ছুটে বেরিয়ে এলাম। কিচেনের কাছে গিয়ে দেখি একটি ছোটখাটো জনসমাবেশ। জনকয়েক সিপাইকে ঘিরে একদল রাজবন্দী চীৎকার করে বচসা সুরু করে দিয়েছেন এবং সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, সেই দলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ঘরের মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তার হাতে একখানা স্যাণ্ডেল। ছ'ফুট দীর্ঘ সিপাইয়ের মুখের কাছে স্যাণ্ডেল তুলে বলছে সাড়ে চার ফুট দীর্ঘ মনোরঞ্জন : চোপ রও উল্লুক, বেশী বাত বোলেগা তো এক জুতিসে দাঁত তোড় দেগা।

আমরা ক'জন গিয়ে পড়তেই ঝগড়াটা শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বচসাতেই শেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু বেশ অনুমান করলাম, কোনোদিন কোনোরকম সুযোগ পেলেই এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংস্র সিপাইগুলো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। আমাদের মধ্যেও সবাই এমন ধীর, স্থির ও যুক্তিবাদী ছিলেন না বা নিয়মানুগ ছিলেন না যে, সংঘর্ষ সর্ব্বদাই চলবেন এড়িয়ে আর যদিই-বা অপ্রত্যাশিতভাবে তা এসে পড়ে, তা হলে ন্যূনতম বিতর্কের মধ্যেই তা সমাধিস্থ করবার চেষ্টা করবেন অথবা দরখাস্ত ও প্রতিনিধিত্ব দ্বারা বিভাগীয় শাস্তির দাবী জানাবেন।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমনি দাঁড়ালো যে, যে-কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে সামান্য একটি দেশলাইয়ের কাঠি এসে পড়লেই এই বারুদখানা প্রচণ্ড নির্ঘোষে বিস্ফোরিত হবে। সুতরাং আমরা সেই কিয়ামৎ রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলাম রুদ্ধশ্বাসে। পুঞ্জীভূত মেঘের ভীম হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, সর্পিল বিদ্যুতের আগ্নেয় ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে আকাশ চিরে চিরে ফেলছে, পাগলা হাওয়ার মাতাল গতিবেগ আসন্ন ঝটিকার আগমনী গাইছে......আর দেরী নেই। এখানেও হয়তো ঘটবে হিজলীর পুনরাবৃত্তি !......

একদিন বিকেলে আমি আর খেলার মাঠে যাইনি, ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ছিলাম হিটলারের আত্মজীবনী। ঘরে আর কেউ ছিল না, হরিমোহন আবার ঝাঁট দিচ্ছিলো ঘরখানা।

এমন সময় অকস্মাৎ মতি সিংহ ছুটতে ছুটতে এসে বললেন: শীগগির যান দ্বিজেনবাবু, ওদিকে কমেটবাবুরা খেলার মাঠে একদল সিপাইকে ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছেন হকি ষ্টীক দিয়ে।

ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসেই দেখলাম রীতিমত ছুটোছুটি পড়ে গেছে। দেখলাম, বীরেন ঘোষ মশারি টাঙ্গাবার লোহার সরু দু'খানা রড নিয়ে ছুটে চলেছে। ডাকতেই থামলো।

কী ব্যাপার? কোথায়?

এক নিশ্বাসে বলে গেল বীরেন ঘোষ: যাচ্ছি খেলার মাঠে। বিমলবাবু আর কমেট হকি ষ্টীক দিয়ে দুটো সিপাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে ওরা বোধহয় এসে গেছে দল বেঁধে লাঠী নিয়ে, আমরা গ্রহণ করেছি ওদের চ্যালেঞ্জ। খুনোখুনি একটা হবেই।—বলেই সে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলে গেল।

এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। এড়ানোর কথা এখন আর চিন্তা করা যায় না, ফলাফলের রক্তাক্ত অনিশ্চয়তা স্বীকার করেই এগিয়ে যেতে হবে। সূচনা করেছে কমেট অর্থাৎ বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর অন্যতম সেক্সন-কমাণ্ডার অর্থাৎ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের ভ্যানগার্ডের একজন সৈনিক! অতএব জি-ও-সির আর মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা করবার কিছু নেই।

মাঠের প্রান্তে এসে দেখলাম, মাঠে লোকে লোকারণ্য। সবার হাতেই কোনো না কোনো হাতিয়ার। দুটো আহতকে কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় শাসিয়ে গেছে পাঠান সিপাই, আবার আসছে তারা তৈরী হয়ে। ডাকাতদের একবার দেখে নেবে। সেই দেখা দেবার সুযোগ দানের জন্যই প্রতীক্ষমান বন্দী-জনতা। চোখের কোণে কোণে দেখলাম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আবেগে ও উত্তেজনায় সবারই কণ্ঠ রুদ্ধ, আসন্ন সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় সামান্যতম চাঞ্চল্যও কোথাও নেই!

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলাম সম্মুখে। কারুকে কিছু প্রশ্ন করবার সময় ছিল না। ভোলাবাবু নিঃশব্দে এসে আমার হাতে একখানা হকি ষ্টীক গুঁজে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু, এমনি সময় অকস্মাৎ শিবির প্রকম্পিত করে পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠলো। চতুর্দ্দিকে বিপদ-সংকেতসূচক বাঁশী শোনা যেতে লাগলো। বোঝা গেল, সম্মুখ সংগ্রামে এগিয়ে না এসে পাঠান সিপাই বেছে নিয়েছে আইনানুগ পথ। ঘণ্টি শুনে তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে আসবার বশ্যতা স্বীকার করবো না আমরা, তা হলেই আমাদের ওপর নির্ব্বিচারে বলপ্রয়োগের নিয়মতান্ত্রিক শক্তি ও সমর্থন ওরা পেয়ে যাবে। কিন্তু ওদের এই ষ্ট্রাটেজি উপলব্ধি করতে আদৌ দেরী হলো না আমাদের। নিমেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো এবং দ্রুতপদে যে

যার ঘরে যে শুধু ফিরে এলাম তাই নয়, একেবারে নিরীহ সুবোধ বালকের মতো অন্য হাজারো কাজে ডুবে গেলাম। তাড়াহুড়োতে দশ নম্বরের বিমল চক্রবর্ত্তী আর ডাবলিউ-বি চোদ্দ নম্বরের কমেট আর ভোলাবাবু এসে ঢুকে পড়লেন আমাদেরই ঘরে।

খট-খট করে প্রত্যেকটি ঘর তালা বন্ধ হয়ে গেল এবং গট-গট করে ডবল মার্চ্চ করে শিবিরের অভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করলো সশস্ত্র পাঠানের বিরাট একটি দল। গুনতি সুরু হয়ে গেল।

সন্ধ্যে তখন সবে উৎরে গেছে। কমেট ও ভোলাবাবু তাঁদের রক্তমাখা জামা ও ধুতি বদলে নিয়ে নিবিষ্ট মনে দাবা খেলতে বসে গেছেন, সুধাংশুবাবু লিখছেন কোন্ জরুরী পত্র, সমরেন্দ্র পাল আর অমর খেলছে ক্যারম আর আমি আমার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আবার তুলে নিয়েছি হিটলারের আত্মজীবনী। বিমল চক্রবর্ত্তীও তাঁর রক্তমাখা ধুতি ছেড়ে ফেলে পরেছেন ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের একটি লুঙ্গি। খুলে বসেছেন একটি ভাঙ্গা হারমোনিয়াম। কেউ শুনুক বা না শুনুক, গান একখানা তিনি গাইবেনই। এখন হারমোনিয়াম তা সইতে পারে ভাল, না-হয় যাক্, ভেঙ্গে যাক্।

অভিনয় করছিলাম সবাই, তাই আমাদের কাণ ছিল অত্যন্ত সজাগ, মন ছিল অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। বার বারই মনে হচ্ছিলো, এবার তো প্রত্যেক ঘরে আমরা মাত্র চারজন বা ছয়জন। তালা খুলে একটি-একটি ঘরে যদি ওরা হানা দেয়, তাহলে? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো অন্যান্য ঘরের সবাই শুধু গর্জ্জনই করবে নিষ্ফল আক্রোশে, দংষ্ট্রাঘাতের সুবর্ণ সুযোগ আর পাবে না। আশঙ্কা হলো, নিশ্চয়ই ওরা এইবার খুঁজে বার করবে তাদের, এগিয়ে এসে যারা ষ্টীক চালিয়েছে বেপরোয়াভাবে।

অকস্মাৎ চমক ভাঙলো: হ্যাল্লো জি-ও-সি!

বারোজন পাঠানের একটি দল। এবার আমাদের ঘরে গুনতি হবে। বললাম: ইয়েস?

আপনাকে না মাঠে দেখলাম হকি খেলতে? ভারী ফাষ্ট´ ক্লাশ খেলেন তো আপনি!

বুঝলাম, ওরা সনাক্ত করতে পারছে না। বললাম: ঐ একটা খেলাই আমি পারিনে সুবাদার সাহেব! আর শরীরটে আজ খারাপ, তাই এই বইখানাই পড়ছি দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর থেকে। A very good book—

যাঁরা আছেন, সবাই কি এই ঘরের?

সুধাংশুবাবু বললেন: না সুবাদার সাহেব। পাগলা ঘন্টি পড়েছে তো, তাই যে যেখানে পেরেছে, ঢুকে পড়েছে। জনতিনেক বন্দী অন্য ঘরের।

বিমলবাবু এদের প্রতি দৃক্‌পাত না করে প্রাণপণে সুরের সঙ্গে স্বর মেলাবার কসরৎ করছেন। সুবাদারের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হলো।

আচ্ছা, উনি খুব ভাল গাইতে পারেন বুঝি?

কমেট ফস্ করে হেসে জবাব দিল : ও ইয়েস। ধরা পড়বার আগে নিখিল ভারত মিউজিক কনফারেন্সে উনি বরাবর স্বর্ণপদক পেয়ে আসছিলেন। অনেকদিন চর্চ্চা না থাকাতে গলাটা একটু ধরে গেছে—I mean—

কুটবুদ্ধি নাজির খাঁ এই পরিহাস বেশ বুঝতে পারলো। বলে উঠলো : I see—

তারপর সদলবলে বেরিয়ে গেল। ভাবলাম, এ যাত্রা ফাঁড়া কাটলো। কিন্তু আধ ঘণ্টা কেটে যেতেও দরজা খোলবার গরজ না দেখে আবার আশঙ্কা হতে লাগলো, সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয় এরা। আরও মিনিট পনেরো কেটে যেতেই পাশের কক্ষ থেকে নৃপেন পাল চেঁচিয়ে খাস কুমিল্লার ভাষায় জানিয়ে দিল সুধাংশুবাবুকে যে, এরা যাদের হাতে মার খেয়েছে, তাদের খুঁজছে। কুমিল্লার ভাষায় এ জন্য যে, বাংলা কিছু-কিছু সমঝাতে পারলেও বাঙ্গাল ভাষা ওদের কাছে গ্রীক্!

সংগ্রামের জনতিনেক নায়কই তো আমাদের ঘরে। কৌশলে এঁদের বাঁচিয়ে দিতে হবে। বিমলবাবু অবশ্য এতে সহজে রাজি হলেন না। খাপখোলা ছুরির মতো বিমলবাবু। যেখানেই চলেন, কেটে দিয়ে রক্তস্নান করে যান। Via media বলে কোনো শব্দ তাঁর অভিধানে নেই। যদি আরও শক্তিশালী ইস্পাতের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়, টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যেতে চান তিনি। কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাবেন না কোনমতেই। কোনো হিসেব, কোনো কৌশল, কোনো ষ্ট্রাটেজীর বালাই নেই তাঁর, বন্য শুকরের মতো দুর্নিবার তাঁর গতিবেগ!......

অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করা গেল বিমলবাবুকে। তিনি চুপ করে থাকবেন, কথা কইবো আমরা। বিশেষ করে সুধাংশুবাবু।

অনেকক্ষণ পর এবার বোধ হয় একেবারে নিশ্চিত হয়ে আবার এসে আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো দুর্বৃত্ত নাজির খাঁ আর তার সঙ্গীরা। এসেই আদেশের সুরে অনুরোধ জানালো : বিমলবাবু, চলুন, আপনাকে আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বোঝা গেল কিসের এত গরজ, কেন এতখানি ভদ্রতা। শিবিরের অন্যতম প্রতিনিধি যুক্তি-বিশারদ সুধাংশুবাবু এগিয়ে এলেন ধারালো যুক্তি নিয়ে। আমি এলাম নানা হাল্কা কথায় ওদের জিঘাংসার উত্তাপ খানিকটে কমিয়ে দিতে, সমরেন্দ্র পাল এলেন সামরিক কুচকাওয়াজের ঔৎসুক্যময় গল্প ফাঁদতে, কিন্তু দেখা গেল এবং দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যে, ভবি ভোলবার নয়।

অগত্যা কমেট এগিয়ে এসে বললো : চলিয়ে, হাম ভি যায়েগা হামারা ডবলিউ বি চৌদ নম্বরমে।

ভোলাবাবুও যেতে চাইলেন কিন্তু নাজির খাঁ বলছে যে, সবার আগে সে বিমলবাবুকে তাঁর দশ নম্বরে পৌঁছে দেবে, তার পর—

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম নিমেষের জন্য। বিমলবাবুর হকি ষ্টিকের

আঘাতেই যে একজনের মাথা ফেটে গেছে এবং জখম হয়েছে জনকতক, এতক্ষণে এরা তা বুঝতে পেরেছে এবং সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পেরেছে। ওরা সংখ্যায় দশ বারো জন, এবং ওদের হাতে বিলিতি বেতের মোটা রেগুলেশন ষ্টীক আর আমাদের একেবারে খালি হাত। তথাপি বিমলবাবুর রণ-হুঙ্কার আর প্রচণ্ডভাবে এলোপাথাড়ী ষ্টীক চালাবার বীভৎস দৃশ্য এখনো ওদের মনে ভাসছে। তাই বুঝি ওঁকে বারান্দায় একক করে নিয়ে......

বিমলবাবু কিন্তু তখনো পরম নিশ্চিন্তে হারমোনিয়ামের সঙ্গে কুস্তি করছেন আর মোটা কাঁচের আড়াল থেকে রহস্যময় চোখে সেদিকে চেয়ে অমর মৃদু-মৃদু হাসছে।

কী যে করবো এই নাছোড়বান্দা দস্যুদের সঙ্গে বুঝতে পারলাম না; এমন সময় বিমলবাবুই নেমে এলেন খাট থেকে: চলিয়ে সুবাদারজী, হামারা ঘরমেই চলিয়ে। বা কি বাত এহি হ্যায়, গুনতি তো মিল্ গিয়া, অভি তো লম্বর খোল দিয়া যায়গা।

কথা কইবার আর অবসর পেলাম না আমরা। বিমলবাবুকে নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল। আমাদের দরজায় তালা পড়লো।

কিন্তু মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ড হবে। তার পরই অকস্মাৎ এমনি একটা তীব্র চীৎকার দেয়ালে-দেয়ালে আছাড় খেয়ে উঠলো যে, আমাদের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো! সে চীৎকার বর্ণনা করবার ভাষা আজো তৈরী হয়নি। আর্ত্তনাদ তাকে বলতে পারিনে, বলতে পারিনে অসহায় মেষশাবকের করুণ ক্রন্দন। রাইখষ্ট্যাগে প্রবেশের প্রাক্কালে রক্তাক্ত লালফৌজ হের হিটলারের সাক্ষাৎ পাবার অধীর আগ্রহে যে উল্লাসধ্বনি করে উঠেছিল, নরপিশাচ নাজির খাঁ ও তার পাঠান অনুচরদের কণ্ঠে যেন শুনেছিলাম তারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু দুর্ব্বৃত্তদের সমবেত বুটের ঠোক্করে, বেণ্টের ঘায়ে ও রেগুলেশন লাঠীর নৃশংস আঘাতে নিরস্ত্র, নিঃসঙ্গ, নিঃসহায় একজন সহ-বন্দীর কণ্ঠ থেকে যে অদ্ভুত একটা শব্দ বার হয়েছিল, তাতে ঠিকরে পড়েছিল তাঁর সর্ব্বঅন্তরের ঘৃণা, ধিক্কার, ক্রোধ ও দুঃখ। খাঁচার ইঁদুরকে জলে ডুবিয়ে মারবার কাপুরুষতা ঐ সরকারী সেনাদলেরই শোভা পায়। বিমল চক্রবর্ত্তী ছিলেন খাঁটি ইস্পাত, সাময়িকভাবে হলেও দুমড়ে থাকবার রণনীতি তাঁর ধাতে সয় না।

তাই, একেবারে খালি গায়ে, খালি হাতে নেকড়ে বাঘের মত যুঝেছেন তিনি এই বারোটি ছ'ফুট দীর্ঘ পাঠানের সঙ্গে, তারপর একসময় সংজ্ঞা হারিয়ে রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়েছেন ব্যারাকের বারান্দায় উল্কা পতনের মতো, মহীরুহ পতনের মতো!

ইস্পাত ভেঙ্গে গেছে!......

চব্বিশ

সত্যিই, ভেঙে গেছে।

পরদিন ভোরে দরজা খুলে দিতেই ছুটে গেলাম দশ নম্বরে। শুভ্র শয্যায় প্রসারিত বিমল চক্রবর্তীর ইস্পাত দেহ, ব্যাণ্ডেজে একেবারে ঢাকা। মাথার কয়েকটি ক্ষত নাকি প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ আর তেমনি গভীর।

বললাম : না বেরিয়ে এলেই পারতেন। গোলমাল যা-কিছু ঘরেই হতো, আমরা যোগ দিতে পারতাম।

ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন বিমলবাবু : সেই জন্যেই তো বেরিয়ে এলাম। কনেটবাবুর দিকে বার বার চাইছিলো ওরা, যদি চিনে ফেলে? এতগুলো লোকের হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে, এতটা হবে ভাবিনি।

সমস্ত বন্দীর ওপর ওদের যে আক্রোশ, তাই মিটিয়ে নিয়েছে একা আপনার ওপর দিয়ে।—বললো অমর।

হাসতে চেষ্টা করলেন বিমলবাবু : তা হয়তো হবে।

এমনিই এরা। সকলের বিপদ, সকলের ঝুঁকি, সকলের সংকট বুক পেতে নেবার জন্যই যেন এদের জন্ম। যাড়ে জোয়ালের মত এসে পরের হাঙ্গামা চেপে বসে, না পারা যায় উপড়ে ফেলে দিতে, না পারা যায় শান্ত মনে সইতে, তারপর বাধ্য হয়েই কাঁধ লাগাতে হয়, একটু ধ্বস্তাধ্বস্তিও করতে হয়, শরীরের স্থানে স্থানে হয়তো ছড়েও যায়—এই অসহায় অবস্থার কথা জানি। আত্মীয়জনের জন্য আত্মনিগ্রহ, প্রেমিকের জন্য অস্তিত্ববিলোপ, পড়শীর জন্য জীবন বলিদান, এও জানি। কিন্তু এদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এরা, কোনও দিক দিয়ে এতটুকুও মিল নেই। জেলে এসে যাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়, জেলের বাইরে গিয়ে সারা জীবনে যাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের আদৌ সম্ভাবনা নেই, শুধু তাদেরই নয়, অচেনা, অজানা, অদেখা যে যেখানে আছে, তাদের সবার সবটুকু দুঃখ ও বেদনার পশরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে মাথায় তুলে নেবার হিম্মৎ দেখেছি এমনি জনকতক বন্দীর। দুনিয়ার সবটুকু বিষ নিঃশেষে পান করবার মতো নীলকণ্ঠ এরাই।......

বেশী কথা কয়না, নেই হাঁক-ডাক, নেই আড়ম্বরের জৌলুস। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে আচমকা এদের আবির্ভাব ঘটে, তারপর যীশুখৃষ্টের মতো চলে এদের তিলে-তিলে আত্মবলিদান। মৃত্যুর সঙ্গে এদেরই পাঞ্জা লড়াই চলছে নিশি-দিন, প্রাণ দেবার জন্য এরাই করে কাড়াকাড়ি। পরাধীন দেশের অলামী এই দধীচিকুল, তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি সর্বান্তরিক প্রণতি।......

দিন পনেরোর মধ্যেই বিমলবাবু অনেকটা আরোগ্য লাভ করলেন বটে, কিন্তু শিবিরের কয়েদীদের মধ্যে একটা চাপা ক্রোধের আগুন

ধূমায়িত হতে লাগলো। পাঠান সেনানায়ক সুবাদার নাজির খাঁকে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হতে সরিয়ে দেবার মারাত্মক পরিকল্পনাও কেউ কেউ আঁটতে লাগলেন গোপনে-গোপনে। প্রতিনিধি দল অফিসে যাওয়া সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করলেন, রান্নাঘরের ব্যাপারেও দিলীপবাবুর উৎসাহ একেবারে কমে গেল, খেলার মাঠে খেলোয়াড়ের অভাব দেখা যেতে লাগলো, বিভিন্ন দলীয় পত্রিকায় নাজির খাঁর এই নৃশংসতার প্রতিশোধ নেবার জন্য গরম গরম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগলো, 'শৃঙ্খল' পত্রিকায়ও করা হলো এর তীব্র নিন্দাবাদ।

সরকারীভাবে সংগ্রাম ঘোষণা না করলেও সংগ্রামী আবহাওয়ায় সারা বন্দীশিবির থম্ থম্ করতে লাগলো। টবিন এ সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন এবং গিরিজা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁকে যে, এই নালিশ-বিহীন উদাসীনতা আসন্ন ঝটিকারই পূর্ব্বাভাস, অতএব—

অতএব এক মাসের মধ্যেই পাঠান সেনাদল বদলী হয়ে গেল আর তাদের স্থানে এল বিহারী রেজিমেন্ট। আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি আজও যে, একদল বন্দী নাজির খাঁর কাপুরুষ আক্রমণের পশ্চাতে কমাণ্ডাণ্ট টবিনের পরোক্ষ সমর্থন উপলব্ধি করে বিপ্লবীদের কালো খাতায় মোটা হরফে তাঁর নাম তুলে দিয়েছিলেন এবং যে-করে-হোক জনতিনেক শিবির থেকে পলায়নের ফন্দী আঁটছিলেন। তাঁদের দু'চারজন বন্ধু লোহার রড্ ও সাবল গোপনে সংগ্রহ করে সাগ্রহে টবিনের শিবির পরিদর্শনের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, এক-আধটা নরহত্যা রোধ করবার শক্তি তখন আর কারুর ছিল না। কিন্তু, সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের ওপর 'জঘন্য' আক্রমণ চালাবার যে ক্ষুদ্র বিবরণ প্রকাশিত হলো, তার ফলে আমাদের মনে এলো এক নতুন চেতনা, সমগ্র বন্দীশিবিরে এল এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পত্রিকায় যা পড়েছিলাম, হুবহু সবটুকু আজ আর মনে নেই। তবুও যেটুকু মনে পড়ে, তা-এই—

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। রাত্রিকাল। পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের মোজাইক-করা পিচ্ছিল মেঝের ওপর হাজারো আলোকের নিম্নে চলছে সাহেব-মেমদের যুগল নৃত্য। রম্বা-সম্বা, জাজ্! চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর প্রায় আড়াই বৎসর কেটে গেছে। সুতরাং নিশ্চিন্ত! একদা যারা আতঙ্কে সমুদ্রে জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই আবার হাসিমুখে ফিরে এসেছে শহরে। বিপ্লবীদের কেউ কেউ সম্মুখ সংগ্রামে নিহত, আহত, আবার কেউ-বা তখনো আত্মগোপন করে উধাও হয়েছেন। শহরে তাই আবার স্ফূর্ত্তির বাজনা বেজে উঠেছে, চলছে আবেশময় নৃত্য—

অকস্মাৎ প্রত্যেকটি জানালা ও দরজায় দেখা গেল আগ্নেয়াস্ত্রধারী আক্রমণকারী। কেউ কিছু বলবার পূর্ব্বেই তাদের হাতের রিভলবার ও বন্দুক-

গুলি একসঙ্গে গর্জ্জে উঠলো—গুম গুম্ গুম্! ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বৈদ্যুতিক আলোকের ঝাড় চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, সুরার পাত্র মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, ভাঙ্গা টেবিল চেয়ারে নৃত্যবাসর একেবারে কণ্টকিত, নরনারীর আর্ত্ত চীৎকারে শুধু ইনষ্টিটিউট নয়, চারিদিকের পাহাড় পর্য্যন্ত মুখরিত।

অবিরাম গুলী ও বোমা-বর্ষণের ফলে নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর দল কে কোথায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে, মরে গেছে, বিপ্লবীরা তার সংবাদ রাখেনা। রেলিং-ঘেরা বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে এই অভিযান পরিচালনা করছিলেন মহীয়সী বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদেদার।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবেনা, কাজ শেষ করে আত্মহত্যা করবে।

কাজ শেষ হয়ে গেছে। সবগুলো বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে, সব ক'টি বুলেট কাজে লাগানো হয়েছে। অন্ধকার নৃত্যশালায় শোনা যাচ্ছে শুধু সভয় চীৎকার, পলায়ন-পরা ইসাডোরা ডানকানদের করুণ ক্রন্দন, ফ্রেড এ্যাষ্টায়ারদের তীব্র আর্ত্তনাদ। ফলাফল সঠিকভাবে কিছু জানা সম্ভব না হলেও বুঝিয়ে দেয়া গেছে এই সত্য যে, অস্ত্রাগার আক্রমণের পর নিশ্চিন্ত বিলাসের সময় আজো আসেনি, পলাতক হলেও আজও মাষ্টার দা' জীবিত!

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবেনা।

বোঝা গেল, এতক্ষণে শহরে সংবাদ পৌঁছে গেছে, এখনই হুড়মুড় করে এসে পড়বে লরী-লরী ভর্ত্তি বন্দুকধারী সৈনিক, আসবে মেশিন গান, ষ্টেন গান, লুইস গান...

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবেনা।

সামরিক জ্যাকেটের পকেট থেকে ক্ষুদ্র একটি প্যাকেট বার করে সাদা পাউডারটুকু মুখে ঢেলে দিলেন প্রীতিলতা।

মাষ্টারদা'র নির্দ্দেশ : ধরা দেবে না।

ধরা তো দিলামনা মাষ্টারদা'। তোমারই পায়ের তলায় বসে একদিন দীক্ষা নিয়েছিলাম যে অগ্নিমন্ত্রে, বুকের রক্ত দিয়ে তারই মর্য্যাদা রক্ষা করলাম। এগিয়ে যারা চলেছে, তাদের বলে দিও মাষ্টারদা' যে, পথের ধারে পড়ে রইলো যে বোনটি, তার জন্য শোক করোনা, চোখের জল ফেলোনা, পরাধীন ভারত তাদের ডাকছে, আর্ত্তস্বরে ডাকছে...ইনক্লাব জিন্দাবাদ...

প্রীতিলতা ঢলে পড়লেন। নীল ঠোঁট দু'খানিতে তাঁর লেগে রইলো সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের যুধ্যমান বিপ্লবীর রণহুঙ্কার : ইনক্লাব জিন্দাবাদ...

পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউট আক্রমণের রক্তরাঙা কাহিনী ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে রইলো......

টরিন-গিরিজা-পবিত্র এ্যাণ্ড কোম্পানীর মাথায় একটা সত্য ঢোকেনি যে, আমরা সব বনবিহঙ্গ, জোর করে শিকল এঁটে খাঁচায় ভরে রাখা হয়েছে।

নবাবী খানা, মূল্যবান আসবাবপত্র, অখণ্ড বিশ্রাম, একটানা নিশ্চিন্ত জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিয়ে অবশ্য সেই খাঁচাকে সোনার খাঁচার রূপ দেবার চেষ্টা করে বন্দিত্বের মধ্যেই একটা বেলোয়ারী আকর্ষণ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বনবিহঙ্গ খাঁচাকে ভালবাসতে শেখে কি? সামান্যতম দুর্ব্বল মুহুর্ত্ত পেলেই যে সে পালিয়ে যাবে, ওরা তা ঠাওর করতে পারেনি। পবিত্র সরকার অবশ্য কোনোদিনই শিবিরের মধ্যে আসতো না। কিন্তু এখানে তো তার চর রয়েছে। একেবারে কিলবিল করছে বলতে পারিনে, তবুও দু'চারটি আমাদের জানা ও দু'চারটি অজানা সাকরেদ তো আছেই। তারাও কিন্তু এবার একেবারেই ধারণা করতে পারেনি।

ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের পনেরো নম্বর কক্ষের পশ্চিম দিকে যে গোটাতিনেক ক্ষুদ্র কুঠরী আছে, পুর্ব্বে তা ছিলনা। অবশ্য পাগলাগারদকে রাজবন্দী শিবিরে পরিণত করবার পুর্ব্বেই ওগুলো তৈরী হয়েছে। কিন্তু ছিলনা বলছি এ জন্য যে, তা না হলে পনেরো নম্বরের যে দু'টো বৃহদাকার ভেন্টিলেটার দুটী কুঠরীর মধ্যেকার দেয়ালে আজও রয়ে গেছে, সেদুটো রাখবার কোনো সার্থকতা নেই। যে দেয়ালে ভেনটীলেটার, সেই দেয়ালের বাইরেই ঘর তৈরী করবার পর এই ভেনটীলেটারের আর কি প্রয়োজন আছে?......

কর্ত্তৃপক্ষের এই মূঢ়তার সুযোগ আমরা পুরোপুরি নেবার সিদ্ধান্ত করলাম। ঐ কুঠরীগুলিতে নিরালায় নিবিষ্ট মনে পরীক্ষার পড়া পড়বার জন্য ক'জন পরীক্ষার্থী কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি সংগ্রহ করলো। একখানা টেবিল, একখানা বা দু'খানা চেয়ার ও বই-খাতায় ঘরগুলো ভরে উঠলো। টবিন মেজাজ দেখিয়ে বললেন: ঘরের তালা তোমরা কিনে নেবে, কিন্তু তার চাবি থাকবে অফিসে।

তথাস্তু।

কিন্তু একটি তালার যে দু'টো চাবি থাকে, এই সহজ সত্যটি ওদের বোধ হয় খেয়াল হলোনা। তাই দ্বিতীয় চাবিটি পড়ুয়াদের বাক্সের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। ভোরে ঘরগুলো খুলে দেবার সময় সিপাই এই কুঠরীগুলোও খুলে দিয়ে যেত।

ফ্রেমে-আঁটা জালের ঢাকনি অবশ্য ভেনটিলেটারে ঝুলছে। কিন্তু তা খোলা যায় জালের দরজার মতই। তালা লাগাবারও ব্যবস্থা আছে বটে পনেরো নম্বরের মধ্যে, কিন্তু তীক্ষবুদ্ধি সিপাইদের ওদিকে একেবারেই নজর পড়েনি। কেন, তা তাদেরই জিজ্ঞেস করতে হয়।......

শীতকাল। মাস ও সঠিক তারিখ মনে নেই। বহরমপুরের শীতও প্রচণ্ড, রাত দশটা বাজবার অনেক পুর্ব্বেই বন্দীরা লেপের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সিপাইরা যথাসময়ে এসে গুনতি করে যেত। মশারীর নীচে লেপ মুড়ি দিয়ে নিদ্রিত বন্দীকে আর ডেকে তুলতো না বিহারী সুবাদার। শুধু উঁকি মেরে মুখখানা দেখেই চলে যেত। প্রত্যেক ঘরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার

প্রতিই ছিল তাদের কড়া নজর, অধিবাসীদের তারা চিনতে চাইতো না। বিশেষ করে পাঠান সিপাইদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকে।

ফরিদপুরের সুধীন আর ময়মনসিংহের বারীন একদিন পনেরো নম্বরের কান্তি বর্দ্ধন আর সুশীল সরকারের সঙ্গে সেই রাত্রির মত সীট বদলে নিল অর্থাৎ ওরা দু'জন এল পনেরো নম্বরে আর এরা দু'জন গেল ঘুমোতে ওদের ঘরে। রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিট হতেই সিপাইরা এসে যথারীতি গুনতি করে দরজায় তালা এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে গেল। সুবিধে হচ্ছে, অতি দীর্ঘ ব্যারাকের প্রশস্ত বারান্দাটি মাত্র একদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে। রাত্রের বন্দুকধারী সিপাই এই বারান্দা দিয়েই সারারাত পায়চারী করে, নীচে ঘাসে নেমে সারা ব্যারাকটি ঘুরে দেখবার নিরর্থক ঔৎসুক্য বোধ করে না।

রাত দু'টো বাজতেই উঠে পড়লো সুধীন আর বারীন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অপর দুজনও। বারান্দার সিপাইয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলো একজন মশারীর মধ্যে বসেই। ঘরে আলো নেই বটে, কিন্তু বৃহদাকার জানালা ও দরজাগুলো খোলা থাকায় কেমন একটা স্তিমিত দ্যুতি। এতে ওদের বেশ সুবিধেই হলো।

পনেরো নম্বরই ওয়েষ্টার্ণ ব্যারাকের একদিকের শেষ ঘর। সিপাই খট্ খট্ করে বুট বাজিয়ে পনেরো পর্য্যন্ত এসে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আবার এক-পা এক-পা করে চলে যায় এক নম্বরের দিকে। অর্থাৎ একবার চলে গেলে ফিরে আসতে অন্ততঃ আট মিনিট সময় লাগে। এই আট মিনিটের মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

সুধীন ও বারীন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একখানা এনভেলাপে পুরে নিয়েছে, গোপনে সংগ্রহ-করা কয়েক শো টাকাও নিয়েছে দু'জনে—ব্যস্, এবার রেডি!

মশারীর মধ্যে সন্তর্পণে বসে যে সিপাইর ওপর লক্ষ্য রেখেছিল, সিপাই চলে যেতেই সে সংকেত জানালো, রেডি!

একটি ভেনটিলেটারের নীচে একটি টেবিল ও তার ওপর একখানা চেয়ার খাড়া করতেই নাগাল পাওয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ালো ওরা। আলিঙ্গনের পালা শেষ হলো। ধীরেন বললো: Wish you safe journey ……ওপারে একটি পাঠ-কক্ষের মধ্যে অবলীলাক্রমে পর-পর বারীন ও সুধীন নেমে গেল।

আবার চুপচাপ! আবার সিপাইকে একবার টইল দিয়ে যাবার সময় দিতে হবে। ইতিমধ্যে বারীন তালার দ্বিতীয় চাবি দিয়ে পাঠ-কক্ষের শিকের দরজা অর্গল মুক্ত করেছে।

সিপাই এসে ঘুরে চলে গেল। আবার সংকেত জানানো হলো, রেডি!

কক্ষের দরজা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এল দু'জনে একখানা টেবিল নিয়ে। ত্রিশ গজের মধ্যেই বাইরের দেয়াল, মাত্র দশ ফুট উঁচু। দেয়ালের পাশে টেবিল, টেবিলের ওপর একখানা চেয়ার—ব্যস্, নাগাল মিলে গেল।

পর-পর দুজনে দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল।

ভোরে দরজা খুলে দিতেই দু'জন বন্দী গিয়ে দেয়ালের পাশের সেই টেবিল ও চেয়ার নিয়ে এসে আবার পাঠ-কক্ষে যথাস্থানে রেখে দিল।

শীতের ভোর! দরজা খুলে দেবার সময়ও বেশ অন্ধকার থাকে। তাই ওদের কেউ লক্ষ্য করলো না। ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল বলা যায়।

তার পরের দিন দিনের বেলাটা কাটলো বেশ নিশ্চিন্তে। বারীন ও সুধীন যে তত্‌ক্ষণে কলকাতাগামী ট্রেণে চেপে বসেছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম, কারণ কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

ছুতো করে দু'চারজন মাঝে মাঝে অফিসে গেলেন ওদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে। সারা অফিস নিয়মিত কাজ করে চলেছে। বোঝা গেল, আমাদের কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে।

পঁচিশ

কিন্তু ফ্যাসাদ বাধলো সেদিন রাত্রে। প্রথমতঃ গুনতি মিললো না বার বার গুনেও। তারপর খাতা নিয়ে এসে সুবাদার মিলিয়ে মিলিয়ে বার করলো যে, ইসটার্ণের এগারো নম্বরের বারীন দাস আর সাদার্ণের চার নম্বরের সুধীন ভট্টাচার্য্য অনুপস্থিত।

ওদের ঘরের অন্যান্যদের প্রশ্ন করে জানতে পারলো যে, রাত্রে খাবার-ঘরেও নাকি ও দু'জনকে দেখা গেছে। দিলীপবাবুও সায় দিলেন। সুতরাং গোটাকয়েক পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ্চ নিয়ে সারা শিবির তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান চললো। প্রত্যেকটি স্নানের ঘর, ব্যায়াম-ঘর, শিবিরের প্রত্যেকটি বৃক্ষ, টালী ব্যারাকের ছাদ, কিচেন, খাবার-ঘর, সরবৎ-ঘর, খেলার মাঠের ধারে মেহেদী গাছের বেড়ার পাশে, এমন কি, বড় ড্রেনটাতেও পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করে প্রায় ত্রিশজন সিপাইয়ের একটি দল একেবারে গলদঘর্ম্ম হয়ে এসে আমাদেরই ঘরের সম্মুখে বারান্দায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়লো।

এবার কী করা যায়? কী করা যেতে পারে? টবিন না-হয় বাস করেন বন্দীশিবির থেকে অনেক দূরে। কিন্তু গিরিজা দত্তের বাড়ী তো এই পাশেই। বুড়ো রাত্রের গুনতি মেলার ঘণ্টাটি না শুনে ঘরের আলো নেবান না, ঠায় বসে থাকেন। কজন জমাদার, সুবাদার ও সুবাদার-মেজরের মধ্যে সলা-পরামর্শ হলো অনেকক্ষণ। তারপর দেখলাম, দল বেঁধে ওরা চলে গেল এবং একটু পরই মধুক্ষরা ঠং শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম, গিরিজা দত্ত রাত্রের মত চোখ বুজবেন, কিন্তু সকালের লোমহর্ষণকারী সংবাদ ওঁকে পাগল করে দেবে কিনা কে জানে।

পরদিন সকালে আমাদের কর্ম্ম-চাঞ্চল্য যথারীতি সুরু হয়ে গেল। যেন কিছুই কোথাও ঘটেনি, যা ছিল একেবারে হুবহু তাই আছে। আদৌ চিন্তিত হলামনা এদের উদ্বেগ ও তৎপরতা দেখে, কারণ বারীন ও সুধীন ততক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে কলকাতা পৌঁছে গেছে। কাপড়-জামা ওরা কিছু নিয়ে যায়নি। প্রথমতঃ, নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসুবিধে, তারপর ট্রেণে সাধারণ পোষাকে উঠলে অন্যান্য হাজারো ডেইলি প্যাসেঞ্জারের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেয়া সহজ। আবার ওদের ফেলে-যাওয়া জিনিষপত্র সবই যদি তেমনি সাজানো থাকে, তাহলে শেষ পর্য্যন্ত ওগুলো যাবে অফিসে, সেখান থেকে গুদামের নাম করে গুদাম-বাবুর বাড়ীতে। তাই, যাবার পূর্ব্বে ওরা দামী ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সবই বিলি করে দিয়ে গেছে বন্ধুদের মধ্যে।

বেলা নয়টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই এলো বিরাট তল্লাসী দল। শুধু বিহারী রেজিমেণ্ট নয়, বাইরের বি-পি মার্কা দারোগা, লাল পাগড়ী ও জন-কতক আই-বি অফিসারও এসেছেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো তল্লাসী। বাক্সের জিনিষপত্র মেঝেতে নামিয়ে, বিছানা খুলে ও তুলে, জলের কলসী উলটো করে, ধোপা-বাড়ীর ধুতি ও জামার পাট খুলে, প্রত্যেকটি বই ও খাতার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা—সে এক অভূতপূর্ব্ব তল্লাসী। বেলা সাড়ে বারোটায় যে-সব আপত্তিকর মালপত্র ওরা নিয়ে গেল, তার মধ্যে দেখলাম, কাঁচের ভাঙ্গা গ্লাসের টুক্‌রো, খালি তেলের বোতল, কতকগুলি ইট, প্যাকিং কেসের লোহার পাত কিছু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিকেলের দিকে আবার এলেন শহরের ও কলকাতা থেকে আমদানী-করা জনকতক আই-বি অফিসার। সাদা পোষাকে এসে তাঁরা একেবারে সাদা কথাই বললেন যে, বারীন দাস ও সুধীন ভট্টাচার্য্য যে-করে-হোক শিবির থেকে পলাতক। কীভাবে—সেটা বার করবার জন্য তাঁরা এসেছেন আমাদের কতকগুলো প্রশ্ন করতে।

অমনি প্রতিবাদ উঠলো উত্তাল হয়ে।

—আপনাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে আমরা বাধ্য নই।

—বারীন ও সুধীন পালিয়ে গিয়ে থাকলে কি করে দেয়াল টপকে বা অন্য উপায়ে পালালো, তা বার করবার ডিউটি আপনাদের, আমাদের নয়।

—এ কি আপনাদের লর্ড সিংহ রোড পেয়েছেন ?

—মণি বোসকেই কেয়ার করলামনা, বয়লার প্রুফ হয়ে বেরিয়ে চলে এলাম, তা আবার আপনারা!

এমনি অজস্র প্রতিবাদ ও শ্লেষ। কিন্তু বাপ-মা তুলে গালিগালাজ করলেও আই বি-র লোকদের মেজাজ কখনো খারাপ হয়না এতটুকুও, আর তেমনি অটুট এঁদের ধৈর্য্য!

তথাপি প্রশ্ন: বেশ, আপনারা না-ই বললেন। কিন্তু ওঁদের ব্যক্তিগত বন্ধু কারা বলুন, আমরা তাঁদের কাছে যাই। দেখি, তাঁরা কী বলেন!

ধমক দিল বিভূতি: সবাই আমরা ওঁদের বন্ধু। তাই বিশেষ করে উল্লেখ করবার মতো কেউ নেই। আমাদের কোনো প্রশ্ন করলে আমরা তার কোনো জবাব দোবনা। সুতরাং—

হ্যাঁ, যাচ্ছি। তবে ওঁদের ঘর দু'খানা আমরা একবার দেখতে চাই। তা পারবো কি ?

নিশ্চয়ই।—বলে এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন যতীনবাবু। ওঁরা চারিদিক ভাল করে নিরীক্ষণ করে ওদের চেয়ারে একবার বসে ও পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে, খাট ও টেবিলের নীচেটা ভাল করে পরীক্ষা করে, অবশেষে আই-বি কুলকলঙ্কের মতো, অকাট মূর্খের মতো দরজা ও জানালার মোটা মোটা

শিকগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। তারপর একসময় বিষণ্নমুখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেলেন।

তার দুদিন পর সুবাদার গোপনে আমায় বললো যে, বাঙালী লোগ মন্ত্র জানে। তাই বিল্লি হয়ে ড্রেনসে পালিয়ে গেল। নইলে এত সান্ত্রী আছে, পালাবে কেমন করে? আই-বি লোগও তাই বলেন।

বিহারী রেজিমেণ্ট ও আই-বি কর্ত্তাদের ধারালো বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে সেদিন প্রাণ ভরে হেসেছিলাম মনে আছে। এবং আমার সঙ্গে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু এদের তৎপরতা নিয়ে আদৌ ব্যস্ত ছিলাম না আমরা।

আই-বি অফিসার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে প্রায়ই বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে যেত: আপনাদের বাতি জ্বালাতেও আর কাউকে বাইরে রাখবোনা। The Revolutionary activities are completely checked by us—আমরা সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ওদের এই আত্মশ্লাঘাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে ১৯৩২ সালেই এতগুলো বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, বন্দীশিবিরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেও গোপনে এইসব সংবাদ পেয়ে আনন্দে ও গর্ব্বে আমরা অধীর হয়ে উঠতাম।

জানুয়ারী মাসে লাকসাম জংশনের কাছে শিকল টেনে ট্রেণ থামিয়ে ডাকের বগী থেকে রিভলবার দেখিয়ে ছয়জন যুবক ইনসিওর খামগুলো নিয়ে সরে পড়ে। চারজন যুবক ঢাকা শহরে পুলিশের জনৈক সার্জ্জেণ্টের রিভলভার ছিনিয়ে নেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে দুটো ডাকাতি হয়। মার্চ্চ মাসে ঢাকা জেলার দু'টি স্থান থেকে বন্দুক ও রিভলবার চুরি হয়। বন্দুকের মালিক টের পেয়ে বাধা দিতে এসে রিভলবারের গুলীতে নিহত হন। ফরিদপুর জেলার চরমুগুরিয়া পোষ্ট অফিসে পাঁচজন সশস্ত্র বিপ্লবী হানা দেয় ও অফিস লুঠ করে। এপ্রিল মাসে চারিটি স্থানে মেইল ডাকাতি হয়। রংপুরে একটি ট্রেণ ডাকাতি ও কলকাতায় একটি দোকানে ডাকাতি হয়। মে মাসে ঢাকা শহরের নিকট তেজগাঁওয়ে শিকল টেনে ট্রেণ থামানো হয় এবং জনকয়েক যুবক গার্ডকে রিভলভারের গুলীতে আহত করে জনৈক যাত্রীর কাছ থেকে ত্রিশ সহস্রাধিক টাকা নিয়ে একখানি ট্যাক্সিতে সরে পড়ে। ঢাকা শহরে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীর দেহরক্ষীকে আটক করে তার আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়। জুন মাসে রংপুরে একটি জমিদার গৃহ থেকে কতকগুলি বন্দুক ও রিভলভার অপহৃত হয়।

২১শে জুলাই কুমিল্লায় সাইকেল-আরোহী জনৈক বিপ্লবীর রিভলভারের গুলীতে ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ই. বি. ইলিসন মারাত্মকভাবে

আহত হয়ে পরে মারা যান। ৫ই আগষ্ট কলকাতায় 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার অফিসে প্রবেশ করবার সময়ে সম্পাদক স্যার এ্যালফ্রেড ওয়াটসনের প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। এই মাসেরই শেষদিকে ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্র্যাসবিকে গুলী করা হয়। তারপর পাহাড়তলীর স্মরণীয় ঘটনা। ২৮শে সেপ্টেম্বর স্যার এ্যালফ্রেডের গাড়ী থামিয়ে আবার তাঁর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট সি. এ. ডবলিউ লিউকের মোটর থামিয়ে তিনজন বিপ্লবী তাঁকে গুলী করে। তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন।......

এই তালিকায় আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করা হয়নি। সে-সব মিলিয়ে হিসেব করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, বাইরে তখনো যারা রয়ে গেছে, বিপ্লবের ঝাণ্ডা একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তারা অবনমিত করেনি।

সুতরাং আই-বি কর্ত্তাদের সহর্ষ ঘোষণা যে একটা নিছক ধাপ্পা ব্যতীত আর কিছুই নয়, ওটা যে আমাদের উৎসাহের অনির্ব্বাণ শিখায় জলসিঞ্চনেরই অপপ্রয়াস মাত্র, তা মনে মনে বেশ উপলব্ধি করতে পারতাম। মুখে অবশ্য দুঃখ ও বেদনার মুখোস এঁটে ভয়ার্ত্ত কম্পিত কণ্ঠে নিবেদন করতাম: আপনাদেরই জয়জয়কার! এবার তাহলে......

ছাব্বিশ

১৯৩৩ সাল পড়তেই অকস্মাৎ নতুন করে মনে পড়লো আমি একজন পরীক্ষার্থী এবং আর মাস দেড়েক পরই সুরু হবে সেই আই. এ. পরীক্ষা। ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার সাত বৎসর পর এই চব্বিশ বৎসর বয়সেও আমি আই. এ. পরীক্ষা দোব। দোব বললে ভুল বলা হবে, দিতে হবে। ধীরেনদা'র আদেশ। বই কিন্তু নিজের একখানাও নেই, পাঠ্য বই কিনে টাকার অপব্যয়ও করতে রাজী নই আর তারপর শিবিরের হাজারো কাজে ও অকাজে ব্যাপৃত থাকার দরুণ নিবিষ্ট মনে পড়বার সময়ই-বা কোথায় আমার? তা হোক্। তথাপি......। এই তথাপির গোঁ কিছুতেই ছাড়লেন না বরিশালীয় দাদা। বললেন, পরীক্ষা দেবার জন্য আমার প্রয়োজন কালি, কলম ও খাতা, বইয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর বিশ্ব-বিদ্যালয়কে তাঁর কাল্পনিক স্ত্রীর ভ্রাতার সম্মানিত আসনে বসিয়ে আমার লেখার ওপর তাদের আঁচড় কাটবার অক্ষমতার কথা যে কণ্ঠে, যে উৎপ্রেক্ষা দিয়ে, যে ভাষায়, যে নাদ-পদ্ধতিতে, যেভাবে বর্ণনা করলেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, সিনেট হাউসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীরেনদা' যদি একদিন এমনি একটি অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দেন, তাহলে সম্মুখে কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে নিশ্চয়ই বন্যা দেখা দেবে এবং সিনেট হাউসের ঐ মোটা-মোটা থামগুলি চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। এমনি জ্বালাময়ী ভাষা।

একেই বলে বরিশালীয় ভাষা। বাংলা দেশে কেন, সমগ্র ভারতে, এমন কি, বোধহয় সমগ্র বিশ্বে এই একটিমাত্র জেলা আছে, যেখানে নব-পরিণীত স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে curtain lecture বলে কোনও বস্তু নেই। কারণ ফিস-ফিস করে কথা বললে বোধহয় সে দেশে কেউ শুনতে পায়না আর যে বলে তাকে সমাজ-চ্যুত করা হয়, তার ধোপা-নাপিত বন্ধ করা হয় এবং হয়তো তাকে জেলা থেকে বার করে দেয়া হয়। বরিশালের সবিনয় অনুরোধ অন্য দেশে কমাণ্ডার-ইন-চীফের আদেশ। আর বরিশালের আদেশ অন্য দেশে ফাঁসীর হুকুম। এই একটিমাত্র জেলা—যেখানকার কথায় মোলায়েম শব্দ একটিও নেই, নরম সুর নেই, উচ্চারণে আদৌ নেই সংকোচ! সদ্য-ছড়ানো ঝামার খোয়ার ওপর দিয়ে ষ্টীমরোলার যেমন প্রচুর শব্দ করে ও ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে এগিয়ে যায়, এবং চেপে, দুমড়ে, ভেঙে, সব-কিছু একেবারে পালিশ করে দিয়ে যায়, ঠিক তেমনি বরিশালের বিশ্রাম্ভালাপ শুনলে মনে হবে বুঝি বচসা হচ্ছে আর তর্ক শুনলে মনে হবে বুঝি হাতাহাতি সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু বরিশালে হাতাহাতি বলে কোনো শব্দ নেই। ছোরা-ছুরি, লাঠালাঠি, আর তার চাইতে নরম কিছু মানেই ঘুসোঘুসি। কালি-কলমের ব্যাপার সেখানে নেই কিছু। আপোষ-রফার

সুযোগ নেই। রক্তপাত ব্যতীত কোনো ঝগড়া মিটতে পারে বলে বরিশালবাসী বিশ্বাস করেন না।

কিন্তু দেখেছি এবং দেখে বিস্মিত হয়েছি, বরিশালের প্রত্যেকটি বন্দী শিশুর মতো সরল। সামান্যতম কূটনীতিজ্ঞানও নেই তাঁদের। রেখে-ঢেকে কথা তাঁরা বলতে জানেন না। শালীনতার অনুশাসনগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে স্থান, কাল, পাত্রের গুরুত্ব ওজন করে, হিসেব করে, বিচার করে বক্তব্য পেশ করবার রীতি তাঁদের রপ্ত নয়। খাপ-খোলা তলওয়ারের মতোই তাঁরা স্পষ্ট ও সত্য। এককথায় বলতে গেলে সে যুগে বরিশালের বন্দীরাই ছিল বাংলা দেশের হাইল্যাণ্ডার্স, জার্ম্মানীর ষ্টীল হেলমেট্‌স, রাশিয়ার কসাকস !.....

সুতরাং ধীরেনদা'র নির্দ্দেশ অনুযায়ী সহবন্দীদের বই ধার করে পাতা ওল্টাতে সুরু করলাম। পরীক্ষা এসেছে দ্বারে।

সঙ্গে সঙ্গে নাটকও। অতি উৎসাহী উষা পাল আর ধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সাফল্যমণ্ডিত নাটক মন্ত্রশক্তি ও সীতার পুনরভিনয়। অগণিত দর্শকগণের তাগিদে মাত্র দুইরাত্রির জন্য। মৃগাঙ্ক ও লবের পার্ট আমার মুখস্থ আছে। তাহলেও কো-এ্যাক্টর? সুতরাং উষা ও ধীরঞ্জনের তাগিদে নিয়মিতভাবে না হলেও প্রায়ই মহলায় যোগদান করতে হয়। ধীরেনদা'র কঠোর নিয়মানু-বর্ত্তিতার ভ্রূকুটি এক্ষেত্রে কিন্তু একেবারে শান্ত। কেউ চরের মত এই মারাত্মক সংবাদ তাঁর কাণে পৌঁছে দিলে তিনি নস্যি দিয়ে দন্তধাবন করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর-একবার তাঁর কাল্পনিক স্ত্রীর ছোট ভ্রাতার আসনে বসিয়ে দিয়ে বলতেন: নে, হইছে। হেইয়া লইয়া তর মাথাডা না ঘামাইলেও চলবে হানে, বোঝছো মনু ?

তৎক্ষণাৎ মনু হনুর মতো এক লম্ফে পগার পার হয়ে আত্মরক্ষা করতো। স্থির হলো, পরীক্ষার্থীদের অসুবিধার সৃষ্টি না করে পরীক্ষার ফাঁকে-ফাঁকে নাটক দু'খানি হবে দু'-দু'বার করে।

তথাস্তু।

কিন্তু এই ১৯৩৩ সালের এই ফেব্রুয়ারী মাসেই দূর চট্টগ্রামের অখ্যাত গৈরালা গ্রামে যে মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকা মারফৎ এবং পরে বিস্তৃতভাবে অন্যান্য গুপ্তপথে বহরমপুর বন্দীশিবিরে এসে পৌঁছোল, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তার ফলে সমগ্র শিবিরের শৃঙ্খলা ও সহজতা অন্ততঃ সাময়িকভাবে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

মারাত্মকতম সংবাদ, মাষ্টারদা' ধরা পড়েছেন !......

গৈরালা গ্রামের দূরত্ব ধলঘাট থেকে মাত্র তিন মাইল। অস্ত্রাগার আক্রমণের পর ও বিশেষ করে ধলঘাট যুদ্ধের পর এদিকটায় তখন গ্রামে গ্রামে সামরিক বাহিনীর তাঁবু পড়েছে। সারাদিন ও সারারাত তারা প্রকাশ্যভাবে গ্রামের

পথে-পথে ঘোরাঘুরি করে, সন্দেহ হলেই কোনো গ্রামবাসী বা পথিককে নানা রকম প্রশ্ন করে, সদুত্তর দিতে না পারলে তার আর লাঞ্ছনার অবধি থাকে না।

ঠিক এইসময় গৈরালা গ্রামের বিশ্বাসদের বাড়ীতে বিপ্লবীদের গুপ্ত আড্ডা। সেদিন সেখানে এসে জমায়েৎ হয়েছেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্ত্তী, মণি দত্ত, ও সুশীল দাশগুপ্ত। পলাতকদের এই গুপ্ত আশ্রয়-স্থলের তদারকের ভার ন্যস্ত আছে এই গ্রামেরই অধিবাসী নেত্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিপ্লবী দলের সভ্য ব্রজেন সেনের ওপর।

প্রথমটা নেত্র কিছুই জানতো না, সন্দেহও হয়নি একটুও। কিন্তু লক্ষ্য করতো সে, ব্রজেন দু'বেলাই তার বৌদিকে দিয়ে খাবার প্রস্তুত করিয়ে নিয়ে যায় পাশেই এক বাড়ীতে, বিশ্বাসদের বাড়ীতে। কেন? কারা ওখানে আছেন? আমার বাড়ীতে এসে বসে খেতে তাঁদের অসুবিধা কিসের?...... অনুসন্ধিৎসা শনৈঃ শনৈঃ বেড়ে গেল নেত্র সেনের। স্ত্রীকে মিঠে কথায় ভুলিয়ে সেদিন তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতে বেগ পেতে হলোনা তাঁর যে, ওঁরা সবাই পলাতক, অস্ত্রাগার আক্রমণের দলীয় লোক আর ওঁদের মধ্যেই এসে আছেন পরম পুজনীয় সুর্য্য সেন।

সুর্য্য সেন?—চমকে উঠলো নেত্র। একেবারে সুর্য্য সেন? সেধে এসে অতিথি হয়েছেন?......মানসনেত্রে দেখতে পেলো নেত্র সেন, যথাস্থানে সংবাদটি সে পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে আর কর্ত্তৃপক্ষ খুশী মনে গুনে গুনে তার হাতে তুলে দিচ্ছে দশ হাজার টাকার কারেন্সী নোট।.... লোভী ও পাপাসক্ত মন তার একেবারে লক্-লক্ করে উঠলো।

সম্মানিত অতিথিদের আরও যত্ন করে খাওয়াবার জন্য সে সরলা স্ত্রীর কাছে দাবী জানালো এবং প্রস্তাব করলো, সে সেদিনই শহরের হাটে গিয়ে কিনে আনবে নানা রকম তরি-তরকারী ও মাছ। স্ত্রীর মন আনন্দে ও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠলো।

কনিষ্ঠ ব্রজেনও বুঝতে পারলো না দাদার এই শহরযাত্রার গূঢ় উদ্দেশ্য কি! আর ততটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টাও করলো না সে, কারণ স্থির হয়ে আছে, সেদিনই গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সবাই চলে যাবেন আর-একটি গুপ্ত আশ্রয়স্থলে।

রাত প্রায় এগারোটায় অনভিজ্ঞা বৌদি ও একনিষ্ঠ কর্ম্মী ব্রজেন যখন সম্মানিত অতিথিদের চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাওয়াতে বসালেন, তখন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলেন না তাঁরা গ্রামের পায়ে-চলা মেঠো পথ এড়িয়ে ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়ে অন্ধকারে ভল্লুকের মতো নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৈরালা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন ওয়াম্স্লি চল্লিশজন রাইফেলধারী গুর্খা সৈনিক ও অফিসার নিয়ে।......

আহার শেষ হতেই অকস্মাৎ বমি করে ফেললেন মাষ্টারদা'। কল্পনা

দাদাকে ঠাট্টা করলো, কিন্তু ব্রজেন হয়ে উঠলো ব্যস্ত। ওষুধের ব্যবস্থা করা উচিত! এই রাতেই যে সরে যেতে হবে অন্যত্র!

ছুটে এল সে নিজেদের বাড়ীতে। দাদা কোথায়? দাদা?......কিন্তু এ কি!! সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো ব্রজেন, নেত্র সেন একটি হারিকেন লণ্ঠন শূন্যে তুলে ট্রেণের গার্ডদের সিগন্যাল দেবার মতো করে আন্দোলিত করছে। কেন? কেন?

চট্ করে সমস্ত রক্ত তার মাথায় উঠে এল। ছুটে এল সে সূর্য্য সেনের কাছে এই সংবাদ দিতে এবং পরামর্শ দিতে যে, আর একটি মুহূর্ত্ত ও নষ্ট না করে এখনই স্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

তৎক্ষণাৎ সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

But it was too late.. ...দেরী হয়ে গেছে! দেরী হয়ে গেছে!

অকস্মাৎ কয়েকটি রকেট বোমা ফেটে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার গ্রাম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। লক্ষ্যবস্তু ও নিশানা ঠিক করে নিয়ে চল্লিশটি রাইফেল একসঙ্গে গর্জ্জে উঠে সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

চ্যালেঞ্জ, এসেছে চ্যালেঞ্জ! ধলঘাট, জালালাবাদ, পাহাড়তলীর চ্যালেঞ্জ! কিন্তু কৌশলী সূর্য্য সেন সম্মুখীন হবার সহজ সাহস না-দেখিয়ে এবার আশ্রয় নিলেন ষ্ট্রাটেজীর! শত্রুকে বিভ্রান্ত করে বোকা বানিয়ে এবার বার করতে হবে নিঃশব্দে পলায়নের পথ।

সবাই প্রস্তাব করলো, তারা যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখবে সেনাদলকে। সেই অবসরে সরে পড়বেন মাষ্টারদা'। মাষ্টারদা' বললেন, না, তা হয়না। তিনি যাবেন সবার শেষে।

বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে পাশেই যে ঝোপজঙ্গল, তাতে গা-ঢাকা দিতে হবে, তারপর বিশ্রি ময়লাপূর্ণ গড়টি হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে একবার ওপারে যেতে পারলেই আর কে পারবে দেখতে আমাদের?

সুশীল দাশগুপ্ত এগিয়ে এল। কল্পনাকে পার করে দিল পাঁজাকোল করে, তারপর আর-একজন, তারপর আর-একজন। এবার মাষ্টারদা'র পালা। তুলে নিলে সে তাঁকে অবলীলাক্রমে। কিন্তু যেই বেড়া পার করে দেবে, এমন সময় অকস্মাৎ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত একটা গুলী এসে লাগলো তার হাতে। পারলো না বেচারা!

মাষ্টারদা' হামাগুড়ি দিয়ে সরে এলেন একটু দূরে। একটা প্রকাণ্ড গাছ বেয়ে উঠে ওপারে পড়তে পারলে আর শব্দ হবার আশঙ্কা নেই। নিঃশব্দে বেয়ে উঠলেন, নিঃশব্দে ওপারে নামলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একজন রাইফেলধারী সৈনিকেরই গায়ে। প্রাণপণ শক্তিতে তাঁকে চেপে ধরে চীৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করলো সে।

আবার ফাটলো গোটাকয়েক রকেট বোমা, আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বনভূমি। মাষ্টারদা' ধরা পড়লেন, সঙ্গে ধরা পড়লো ব্রজেন সেন।......

কেমন যেন, গম্ভীর হয়ে গেলাম সবাই। হাসি ও খুশী কে যেন কেড়ে নিয়ে গেছে! কী যে ভাবি সারাদিন, নেই তার মাথা, নেই মুণ্ডু! খেলতে ভালো লাগেনা, নাটকের মহলাও বন্ধ হয়ে গেল লোকাভাবে। পড়ার বই খুলে বসলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। চট্টগ্রামের বন্দীরা তো জলস্পর্শই করলেন না দিনকয়েক। বাধা দিলাম না আমরা। যুক্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে গেলাম না বোঝাতে যে, শোক ত্যাগ করে শাঁখ তুলে নাও, তূর্য্যনিনাদে আহ্বান জানাও বাংলার সমস্ত বিপ্লবীদের, মাষ্টারদা'র গ্রেপ্তারের মূল্য আদায় কর কড়ায় গণ্ডায়!......নীরবে দুর থেকে শ্রদ্ধা জানালাম এই অশ্রুকে। জানি, এই অশ্রু একদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠে টগবগ করে ফুটতে থাকবে, রূপায়িত হবে তাজা লাল রক্তে আর সেই রক্তেরই আলতা পরিয়ে দিতে হবে আমার দেশজননীকে। আজিকার এই অশ্রু সেই অনাগত সুদিনেরই পুর্ব্বাভাস! তাই ঝরুক না বিন্দু বিন্দু। .....

সেদিনকার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে ষ্টেটসম্যান্ যা লিখেছিল তার কতকটা আজও মনে পড়ে।......লোকটির আকৃতি এত সাধারণ, প্রকৃতি এমনি বৈশিষ্ট্যহীন আর তার চলাফেরা এমনি গেঁয়ো যে, গোয়েন্দা বিভাগ দীর্ঘ তিন বৎসর আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে খুঁজে বার করতে পারেনি। অথচ সংবাদ পেয়েছে তারা এবং নির্ভুল সংবাদই পেয়েছে যে, সূর্য্য সেন চট্টগ্রামের বাইরে যায়নি। কখনো কুলির বেশে, কখনো কৃষকের বেশে, কখনো-বা ঝাঁকামুটের বেশে এই লোকটি চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাম্পানওয়ালার ছদ্মবেশে সূর্য্য সেন পার্ব্বত্য নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে সংগঠনের কাজে, এই সংবাদ পেয়েও গোয়েন্দা বিভাগ একে চিনতে পারেনি, ধরতে পারেনি। আজ সেই মাষ্টারদা' ধরা পড়েছেন। মনে হলো, আমাদেরও গলায় পড়েছে ফাঁসীর রজ্জু।......

কী যেন হারিয়েছি আমরা। কী এক অমূল্য বস্তু! শুধু পরম আত্মীয় নয়, পরম পুজ্য। মনে হলো হারিয়েছি যেন নিজেরই হস্ত, নিজেরই চক্ষু, নিজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে যেন গৈরালা গ্রামের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ক্যাপ্টেন ওয়ামস্‌লির রিভলভারের বুলেট!......

নেত্র সেন নিশ্চয়ই পেয়েছে দশ হাজার টাকা। কিন্তু টাকায় যার মূল্য নির্দ্ধারণ করতে পারা যায়না, এমনি কী এক অমূল্য বস্তু সে হারালো, জানতেও পারলোনা সে। সমগ্র বিপ্লবী জাতির পৃষ্ঠে অতর্কিতে মীরণের মতো কী করে যে সে ছুরিকাঘাত করলো, মূর্খ বোধহয় তা বুঝতেই পারলো না।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের খানাপিনা ও আনন্দ-উৎসবের ফেনিল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নেত্র সেন কল্পনাই করতে পারবে না যে, শৃঙ্খলিতা দেশজননীর *চক্ষু দু'টির কোণে তখন তপ্ত রক্তাশ্রু চক্-চক্ করে উঠছে অন্ধকারে সাপের মাথার মণির মতো।......*

সাতাশ

কিন্তু, কালের ব্যবধানে মানুষ নিকটতম আত্মীয়ের তীব্রতম বিয়োগ-ব্যথাও ভুলে যায়।...

তাই, ধীরে ধীরে আবার কর্ম্মচাঞ্চল্য দেখা দিল বন্দীশিবিরে। পরীক্ষা দিলাম আমি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকও হলো। নাটকে যথাপুর্ব্বং প্রশংসা অর্জ্জন করলাম বটে। কিন্তু প্রশ্নপত্রের জবাব কী রকম দিলাম, পরীক্ষকদের কতখানি মনোরঞ্জন তা করতে পারবে, তখনই তা জানবার পথ কোথায়? প্রত্যেক দিন প্রশ্নপত্র পেয়েই তৎক্ষণাৎ লেখা সুরু করতাম আমি, তারপর যখন দেখতাম পুরো নম্বরের জবাব দেয়া হয়ে গেছে, তখন ফাউনটেন পেন পকেটে গুঁজে উঠে দাঁড়াতাম, একটিবার রিভাইজ করবারও ধৈর্য্য থাকতো না। এমনই ছিল আমার স্বভাব।

পাশে বসে অনিল সেন প্রমাদ গুনতো। কারণ তাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হতো আমারই লেখার ওপর। আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে যতখানি পারতো সে নকল করে নিত পরম নিষ্ঠার সঙ্গে, তারপর শেষের পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমার অনুপস্থিতিকালে সে বেচারা হয় ছবি আঁকতো, নয়তো প্রাণপণ চেষ্টা করতো এক-আধটা প্রশ্নের জবাবে অন্তত: এক-আধ লাইন লিখবার জন্য। আশ্চর্য্য, এই অনিল সেনও কিন্তু পাস করেছিল আই-এ পরীক্ষায় তার তেরছা দৃষ্টির দৌলতে।

পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ায় অন্তত: ধীরেনদা'র চোখ-রাঙানি থেকে রক্ষা পেলাম এবং সেজন্যই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলাম।......

এরপরই সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যে নকল অধিবেশন আহ্বান করা হয়, আজও তা স্পষ্ট মনে পড়ে।

ইসটার্ণ এ্যানেক্সি অর্থাৎ টালি ব্যারাকের সম্মুখে খোলা ময়দানের চতুর্দ্দিকে বিচিত্র রংয়ের সুজনী টাঙ্গিয়ে পরিষদ-কক্ষ তৈরী করা হলো। তক্তপোষের ওপর টেবিল-চেয়ার পেতে স্পীকারের আসন তৈরী হলো। তার নীচেই আসন নির্দ্দিষ্ট হলো পরিষদ-সেক্রেটারীর। তারপর অর্দ্ধবৃত্তাকারে স্থান নির্দ্দিষ্ট হলো বিভিন্ন দলের, যথা—মুসলীম লীগ, কংগ্রেস, অনুন্নত সম্প্রদায়, স্বতন্ত্র দল, জাতীয়তাবাদী মুসলিম, হিন্দু মহাসভা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এবং ট্রেজারী বেঞ্চ আলোকিত করে বসলেন হোম মেম্বার, ডেপুটি হোম মেম্বার, সেক্রেটারী, মন্ত্রিগণ ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদীরা ভগৎ সিং-এর মতো পরিষদে বোমা নিক্ষেপ করতে পারে আশঙ্কায় সদস্যগণের নিরাপত্তার ভার দেওয়া হলো পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের ওপর। শুধু তাই নয়, সাদা পোষাকে আই-বি ও এস-বির কর্ত্তারাও সন্ত্রাসবাদীদের তল্লাসে তৎপর হয়ে উঠলেন। দর্শকদের প্রবেশ করতে দেয়া হবে, কিন্তু দেহ-তল্লাসীর পর।

১৯৩৩ সালের ১৭ই মার্চ্চ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন সুরু হলো বেলা দু'টোয়।

স্পাকার হিমাংশু আইন পরিষদ-কক্ষে প্রবেশের প্রাক্কালে সেক্রেটারী পুষ্প চাটার্জ্জী গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন : Gentlemen, Mr. President.

সদস্যেরা উঠে দাঁড়ালেন। স্পাকার আসন গ্রহণ করবার পর তাঁরা উপবেশন করলেন। স্পাকারের আদেশে এবার সুরু হলো interpellations অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নগুলি যথারীতি বিভিন্ন দলের নেতা সাহিত্য সভার কাছে পুর্ব্বেই পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন দল ও সরকারী দল মনোনীত হবার পর প্রশ্নগুলো হোম মেম্বার রাখাল ঘোষের হাতে দেয়া হয়েছিল।

প্রথমেই প্রশ্ন করবেন মুসলীম লীগের নেতা মতি সিং। যেমনি বার্ণিশহীন আবলুসের মতো কালো, তেমনি অস্থিচর্ম্মসার দেহ। এরই ওপর তিনি বারো আনা দামের লুঙ্গি পরেছেন ও মাথায় জিন্না টুপী ও গালে কৃত্রিম দাড়ি এঁটেছেন। হাতে করে এনেছেন কিচেন ম্যানেজারের কাছ থেকে চেয়ে একটি কম্বু।

বিচিত্র সুরে কোরআণের একটা বয়াৎ উচ্চারণ করে তিনি প্রশ্ন করলেন : হোম মেম্বার মহোদয় দয়া করিয়া জানাইবেন কি সেক্রেটারীয়েটে গেজেটেড অফিসারের পদে শতকরা কতজন মোছলমান নিযুক্ত আছেন ?

রাখাল ঘোষ জবাব দিলেন : শতকরা ৮ জন।

—গভর্ণমেণ্ট এই সংখ্যাবৃদ্ধির কথা চিন্তা করিয়াছেন কি ?

—উপযুক্ত প্রার্থী পাইলেই চিন্তা করা হইবে।

চীফ হুইপ ধীরেন সোম অতিরিক্ত প্রশ্ন করলেন : উপযুক্ত প্রার্থীর জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কি ?

হোম মেম্বার এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না।

এরপর দাঁড়ালেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা নিবারণ দত্ত। উসকো-খুসকো চুল, ছেঁড়া খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে, সারা মুখে বসন্তের দাগ, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। Depressed ও Oppressed class-এর মুখপাত্র বার-কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রশ্ন করলেন মাদ্রাজী উচ্চারণে ইংরেজী ভাষায় : Will the Honb'le member in charge of Home (Police) Department please state the reason why all scheduled caste inhabitants of the village of Keshiary in the district of Midnapur had to leave the village leaving behind their belongings ?

মন্ত্রী সুধীন সরকার তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : Only a few have left for personal reasons.

—Is it not a fact that a caste Hindu Zamindar persecuted them mercilessly?

—No.

—Oh, the Depressed and Oppressed class!—বলে অনুন্নত দলের দরদী নেতা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বসে পড়লেন।

এবারে প্রশ্ন করবেন কংগ্রেসী দল অর্থাৎ পরিষদে শক্তিশালী বিরোধী দল। দলের মুখপাত্র কমরেড কুশা গান্ধী-ক্যাপ মাথায় দিয়ে এসেছেন। হাঁটু অবধি মোটা খদ্দর, খালি পা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, গায়ে জামা নেই, শুধু চাদর আর গলায় মোটা যজ্ঞোপবীত।

প্রশ্ন: গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া বলিবেন কি, বর্ত্তমানে বাংলায় কতজন বিনা বিচারে আটকবন্দী আছেন?

জবাব: ৩২৫৮ জন।

প্রশ্ন: গ্রামে ও গৃহে অন্তরীণদেরও কি ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে?

জবাব: আজ্ঞে হাঁ।

—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইঁহাদের আটক রাখিবার কারণ কি?

—কারণ, প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতে গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ দেখা দিয়াছে যে, ইঁহারা এমন সব প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য, যাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য হইতেছে হিংসামূলক পন্থায় আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন করা।

বিরোধী পক্ষ থেকে 'শেম শেম' ধ্বনি শোনা গেল।

কমরেড কুশা প্রশ্ন করলেন: কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া তাহা জানাইবেন কি?

জবাব দিলেন হোম মেম্বার: না। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

আবার হল্লা সুরু হলো। সরকারী দল 'হিয়ার হিয়ার' করে উঠতেই বিরোধী দল খ্যাঁকশিয়ালের ডাক ডাকলো। দর্শকদের মধ্যেও গণ্ডগোল সুরু হলো। স্পীকার হিমাংশু আইন হাতুড়ি পিটলেন: অর্ডার অর্ডার।

হিন্দু মহাসভার একজন সদস্য নাক ডাকিয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিলেন। বৈধতার প্রশ্ন তুলে মুসলীম লীগের ডেপুটি লীডার অনন্ত সরকার স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। স্পীকার এই প্রশ্ন বাতিল করে দিয়ে বললেন: সংবিধানে নিদ্রা সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং পরিষদ-গৃহে অধিবেশন চলতে থাকাকালে নিদ্রা আইনবিরুদ্ধ বলা যায় না।

আবার প্রশ্ন করলেন কংগ্রেসী দলের নেতা কমরেড কুশা: ইঁহারা ডাকাতি, নরহত্যা, বোমাপ্রস্তুত প্রভৃতি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন কি?

হোম মেম্বার জবাব দিলেন: তাহা প্রকাশিতব্য নয়।

প্রশ্ন : গভর্ণমেণ্ট কোন্ কোন্ সূত্রে এইসব সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন? তাহার মধ্যে সবগুলিই কি বিশ্বাসযোগ্য?

জবাব : জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না।

আবার হিয়ার হিয়ার, শেম শেম, হল্লা, চীৎকার ও স্পীকারের হাতুড়ীর ঘা।

ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন যখন এইভাবে পুর্ণোদ্যমে চলছে, বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তখন কিন্তু নীরব ছিল না। গোপনে তারা বোমা ও রিভলভার প্রস্তুতে রত। মাণিকতলায় নয়, কিচেনের কাছে আমতলায় ছাঁচ তৈরী করে রিভলভার তৈরী করছেন টিটু নাহা। এস-বি দারোগা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই সংবাদ এনে পৌঁছে দিলেন পুলিশ কমিশনার দ্বিজেন গাঙ্গুলীর অফিসে। ব্যস, অমনি চললো একদল সশস্ত্র সিপাই, তল্লাসী হলো, কিন্তু আপত্তিকর পাওয়া গেল না কিছুই। পরিষদ-কক্ষে তবুও প্রবেশের ব্যাপারে কড়াকড়ি বাড়িয়ে দেয়া হলো। দু'জন সার্জেণ্ট পাঠিয়ে দেয়া হলো স্পীকারের দেহরক্ষী হিসেবে আর প্রবেশ-দরজায় দাঁড়ালো চারজন।

বৃটিশ রাজত্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে পারে কি?......

এবার স্পীকার আহ্বান জানালেন ডেপুটি হোম মেম্বার প্রভাত নাগকে তাঁর প্রস্তাব পরিষদে পেশ করবার জন্য।

প্রভাত নাগ উঠে দাঁড়ালেন। সুন্দর চেহারা, চসমা চোখে, তার ওপর সাহেবী পোষাক। স্বভাবতঃই তিনি সুরু করলেন ইংরেজীতে : I am just coming from my home at London. When I had been there I met Mr. Ramsey Macdonald...অর্থাৎ লণ্ডনে থাকাকালে ম্যাকডোনাল্ডের মেয়ের বিয়েতে একটি ভোজসভায় আমি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে যখন তাকে Communal Award সম্বন্ধে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, জানাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তখন সে স্পষ্টই আমায় বলেছিল, ভারতে অসংখ্য সম্প্রদায়, সংখ্যাতীত তাদের ভাষা, একেবারে পরস্পরবিরোধী তাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার। সেখানে এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের লোকের হুঁকোতে তামাক খায় না। সুতরাং সম্প্রদায়গত অধিকারের কথা ভারতে অবশ্যই বিবেচ্য। ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর কল্যাণসাধনের যে পবিত্র দায়িত্ব বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছেন, তা পালন করতে হলে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের। ......এমনিভাবে প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় মাঝে মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি করে ডেপুটি হোম মেম্বার প্রভাত নাগ চমৎকার একটি বক্তৃতা দিয়ে শেষ দিকে গদগদ ভাষায় বললেন : এইজন্যই এসেছে এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি নিজেরা আলাপ আলোচনা করে যখন কোনও মীমাংসায় আসতে পারলো না, তখন অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে, নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেই ম্যাকডোনাল্ডকে এই শুষ্ক ও নীরস কর্ত্তব্য পালন করতে হয়েছে। ভারতবাসীর জন্য তার দরদ সীমাহীন।

Oppressed ও Depressed classএর নায়ক নিবারণ দত্ত তাঁকে সমর্থন করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। বরিশালীয় বাংলা ও মাদ্রাজী ইংরেজী মিলিয়ে তিনি বারবারই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওপর বর্ণহিন্দুদের অসংখ্য অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন এবং একমাত্র এই Communal Awardই যে সেই অত্যাচার রোধ করতে পারে, তাও ব্যক্ত করতে ভুললেন না।

এমনিভাবে প্রত্যেক দলই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করবার পর যখন হিন্দু মহাসভার নেতা গোপাল গুপ্ত সপুষ্প শিখা দুলিয়ে, পৈতা দেখিয়ে, বৃহদাকার গীতা আন্দোলন করে, হাত-পা ছুঁড়ে, একেবারে খাস ফরিদপুরী গ্রাম্য ভাষায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, মুসলিম লীগ, অনুন্নত সম্প্রদায়, এমন কি, স্পীকারকেও ম্লেচ্ছ নামে আখ্যাত করে গালিগালাজ সুরু করলেন, অধিবেশন তখন শুধু যে জমেই উঠলো তাই নয়, অতিদ্রুত তা এগিয়ে চললো ক্লাইমেক্সের পানে।

বাধা এলো চতুর্দ্দিক থেকে, বৈধতার প্রশ্ন, অধিকারের প্রশ্ন, অবমাননার প্রশ্ন উঠলো বহুবার। কেউ টেবিল চাপড়াতে লাগলেন, কেউ বেড়ালের ডাক ডাকতে লাগলেন, কেউ শুধু চীৎকারই করতে লাগলেন ; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে, বেদ ও পুরাণের কথা তুলে, চণ্ডী ও গীতার শ্লোক উচ্চারণ করে, যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি মুনিদের অমর জীবনীর পর্য্যালোচনা করে হিন্দু মহাসভার যোগ্যতম নেতা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপাল গুপ্ত, তর্কচূড়ামণি, স্মৃতিতীর্থ, সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয় অগ্নিক্ষরা ভাষায় যে বক্তৃতা দিলেন—

এমন সময় অকস্মাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। পুলিশ কমিশনারের সতর্ক প্রহরা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে একজন বিপ্লবী গোপনে রিভলভার নিয়ে প্রবেশ করে ভালো মানুষটির মতো দর্শকের আসনে বসে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। গোপাল গুপ্তকে থামিয়ে দেবার জন্য যেই হোম মেম্বার রাখাল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে পার্লিয়ামেণ্ট-বিরোধী ভাষায় shut up বলে চীৎকার করে উঠলেন, অমনি সম্মুখে লাফিয়ে পড়ে সেই বিপ্লবী ফস্ করে রিভলভার বার করে পর পর তিনবার গুলীবর্ষণ করলো। আমতলায় তৈরী রিভল-ভারের ট্রিগার এখানে বিপ্লবীর আঙ্গুলে টানলেও শব্দ হলো তার পাশের টালি ব্যারাকে। চাবির মধ্যে দেশলাইয়ের বারুদ পুরে টিটু নাহা যথাসময়ে আওয়াজ করে দিলেন। কিন্তু তাহলে কি হবে? রাখাল ঘোষকে যে মরতেই হবে, নইলে অমল মজুমদার শহীদ হবে কি করে? অতএব হোম মেম্বার Oh my God! Oh my Virgin Mary! বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মুসলিম লীগের নেতা মতি সিং ইয়া আল্লাহ্ বলে দাড়ি এবং কল্লু ফেলে রেখেই পলায়ন করলেন। Depressed ও Oppressed classএর নেতা নিবারণ দত্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। গোপাল বিদ্যাভূষণ মহাশয় উন্মুক্ত কাছা কিছুতেই আর খুঁজে পেলেননা। হৈ-চৈ, চীৎকার

ও ছুটোছুটির মাঝে বিপ্লবী পকেট থেকে পটাসিয়াম সায়নেড-এর প্যাকেট বার করে মুখে ঢেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো শহীদ হয়ে এবং সেইসময় অকস্মাৎ বিউগল ধ্বনির মাঝে সশস্ত্র সিপাইদল নিয়ে গট্‌-গট্‌ করে মার্চ্চ করে প্রবেশ করলেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্ট অর্থাৎ দ্বিজেন গাঙুলী খোলা রিভলভার হাতে নিয়ে।

হুকুম হলো : Hands up everybody or I will shoot.

সকলেই গৌরাঙ্গের পোজ-এ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আটাশ

এমনিভাবে বন্দী-জীবনে মাঝে মাঝেই ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করা হতো একঘেয়েমি দূর করবার জন্য। এই একঘেয়েমিটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো। নানাবিধ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিলেও গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে বপন করতেন একঘেয়েমির বীজ। হয়তো তা রাজসিক একঘেয়েমি। চারবেলা নবাবী খানা আর দায়িত্বহীন অফুরন্ত অবসর, প্রতিদিন একই লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, একই শয্যায় শয়ন—এই-যে অনড় একঘেয়েমী, এর কটু প্রভাব প্রথমে আচ্ছন্ন করে সারা মন, মনকে পাণ্ডুর করে দিয়ে নেমে আসে সারা দেহে, প্রতি শিরা-উপশিরায়, প্রতি রক্তকণিকায়, অস্থিমজ্জায়।··ব্যস্, তাহলেই সিদ্ধ হলো গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। মরফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে অকেজো করে দিল তাজা ঘোড়াকে! .....

এই অভীষ্ট সাধনে গভর্ণমেণ্ট যে একেবারে ব্যর্থকাম হয়নি, তার প্রমাণ রবী লাহিড়ী। একদিন দুপুরে খেতে যাবো, এমন সময় শুনলাম, সাদার্ণ ব্যারাকে রংপুরের রবী লাহিড়ী নাকি খেতে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে অকস্মাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেছে।

খেতে আর যাওয়া হলো না। এসে দেখলাম, দেবেশ ও বিমল বাবু মাথায় হাওয়া করছেন কপালে জলপটি দিয়ে।

রবী লাহিড়ী শিবিরের সুন্দর স্বাস্থ্যবান দেহধারীদের অন্যতম। অনেক-বার সে পেশী নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছে শিবিরে এবং বাইরে রংপুর শহরে। বন্ধুরা সম্প্রতি কোনো অসুখের কথাও জানে না বললেন। ভালো হয়ে রবী লাহিড়ী বললো যে, ক'দিন থেকে কেমন যেন দাঁড়ালেই হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে যায় আর চোখে অন্ধকার দেখে!

কিন্তু কেন? কেন এমনি হলো?.. কোনো সদুত্তর সে দিতে পারলোনা, আমরাও কিছুই অনুমান করতে পারলামনা।

এমনি করে ফরিদপুরের পরেশ রায় একদিন পড়ে গেলেন। আর একদিন সত্য ব্যানার্জ্জীর দুই হাঁটুতেই বাতের ব্যথা দেখা দিল। এবং সর্ব্বশেষ একদিন রবী বসুর গলা দিয়ে ঝলকে ঝলকে উঠতে লাগলো রক্ত!

ছুটে গেলাম। দেখলাম, শয্যায় লম্বমান তার বলিষ্ঠ দেহ। কিন্তু এখন আর দেহ নেই মনে হলো, যেন দেহের একটা বিরাট খাঁচা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

থুথু ফেলার পাত্রে রক্ত, দু'কসেও তার শুষ্ক চিহ্ন দেখা গেল। ডাক্তার এলেন, দেখলেন, পরীক্ষা করলেন, বললেন, টি-বি at galloping stage!

বুঝতে পারলাম, রবীর আর জীবনের আশা নেই। তথাপি টবিনের সঙ্গে

পরামর্শ করে সেদিনই পাঠানো হলো তাকে শিউড়ি জেলে চিকিৎসা ও আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য। মুখে আশার কথা গালভরা ভাষায় প্রকাশ করলেও মনে মনে দারুণ উৎকণ্ঠায় একেবারে বিচলিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সৌভাগ্য রবীর, সেখানে অনেকটা ভালো হয়ে উঠছে বলে মাসখানেক পর সে নিজেই পত্র লিখেছে দেখলাম।

কোনো নির্দ্দিষ্ট অসুখই আমায় ধরেনি সত্যি, তথাপি কী জানি কেন, ওজন আমার নিয়মিতভাবে কমে যাচ্ছিল। একঘেয়েমি রোগ আমায় ধরতে পারেনি জানি। খেলা-ধুলায়, ব্যায়ামে, সর্ব্বপ্রকার সভা-সমিতিতে সর্ব্বত্রই আমি যোগদান করতাম এবং আমার অংশটি খুব অকিঞ্চিৎকর ছিল না কখনো। তথাপি, কীজানি কেন, ওজন আমার কমে যেতে লাগলো। স্লো পয়জনের কথা কোনো কোনো বন্ধু বললেন বটে, কিন্তু তরিতরকারী ও অন্যান্য খাদ্যবস্তু ঠিকাদার এনে অফিসে পেঁৗছে দেবার পরই তো আমাদের ম্যানেজার সেসব ওজন করে ভেতরে নিয়ে আসেন, তাতে বিষ মেশাবার সুযোগ ওরা পাবে কোথা থেকে? আর বিষ মেশালে তার প্রক্রিয়া কি শুধু বাছা-বাছা জনকতকের মধ্যেই দেখা যাবে?

অবশ্য এজন্য চিন্তিত হইনি আদৌ। কারণ জন-কতক বন্ধুর যে যুক্তিহীন ও দুঃখজনক পরিণতি দেখলাম, তার সঙ্গে তুলনায় আমার কোন কিছুই হয়েছে বলে স্বীকার করা যায় না। একদিন ডাঃ সরকারকে নিভৃতে পেয়ে সাধারণভাবে রাজবন্দীদের স্বাস্থ্যহানির কথা তাঁকে বললাম এবং টবিন চাচা নিজে বা কোনো এজেণ্ট মারফৎ আমাদের খাদ্যে যে বিষও মিশিয়ে দিতে পারেন, এমনি একটা অভিমত ঝপ্ করে ছেড়ে দিয়ে ডাঃ সরকারের ভাবগতি লক্ষ্য করতে লাগলাম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। না, দেখলাম, আমার আশঙ্কা অমূলক। বেচারা কিছুই জানে না এবং এমনি নৃশংসতা যে হতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারে না।

তবে ডাঃ সরকার রবী লাহিড়ী, পরেশ রায় প্রভৃতির এমনি আকস্মিক দুর্ব্বলতা ও সাধারণভাবে সবার ওজন হ্রাস ও কারুর কারুর এই বয়সেই বাত-ব্যাধি আক্রমণের কথা উল্লেখ করে এর পশ্চাতে একটি কারণের কথা ব্যক্ত করলেন এবং নানাভাবে যুক্তি দিয়ে তা সমর্থন করতে লাগলেন। সে দিন অবশ্য তাঁর যুক্তি শুনে খুব হেসেছিলাম।

কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে ডাঃ সরকার সেদিন কঠোরতম অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই যে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা, তার উল্লেখ করে তিনি বললেন: ভগবান আছেন কি নেই, সে প্রশ্ন নয়, দ্বিজেনবাবু। এটা স্বতঃসিদ্ধের মতো সত্য যে, প্রকৃতি একটি বাঁধা-ধরা নিয়মে চলেন, একটি ছক-কাটা পথেই তাঁর আনাগোনা। এই প্রকৃতিই নরের পাশে এনে দিয়েছেন নারী এবং নারীর পাশে নর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাতে কোনোদিনই-না দেউলে হয়ে যায়, শ্মশান হয়ে যায়, সেজন্য এই নর-নারীর মিলনে যেমন আঁতুড়-ঘর

হেসে ওঠে, তেমনি একদিন ফুলঝরার মতো তাদেরকে ঝরে পড়তে হয় শ্মশানে। এই যে নিয়ম, আপনারা এই নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন অহর্নিশি। কিন্তু দ্বিজেনবাবু, প্রকৃতির বিরোধিতা করলেই তো জয়লাভ অবধারিত বলে মেনে নেয়া যায় না। তাই কঠিন ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা পালন করেন, অর্থাৎ আপনারা, তাঁদের অমনিসব যুক্তিহীন ব্যাধিতে কষ্ট পেতে হয়। Biological factকে অস্বীকার করলে ভূগর্ভের উত্তাপে জল পড়লে যা হয়, তাই হবে। সে বাষ্প একদিন উত্তাল হয়ে উঠে কোথা-না-কোথা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়বেই। একদিন কায়রোতে—

বলেই ডা: সরকার আবার তাঁর সেই মধ্য-প্রাচ্যের অফুরন্ত ও থ্রিলিং অভিজ্ঞতার ইতিহাস খুলে বসলেন এবং আগামী যুদ্ধ কবে ও কার কার সঙ্গে বাধতে পারে, এবং তাহলে জয়লাভের সম্ভাবনা কার বেশী, সে সম্বন্ধে নানা তথ্য ও গবেষণামূলক এক দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করলেন। আমি বাধ্য হয়ে একটা ছুতো করে রণে ভঙ্গ দিলাম। ঘরে এসে হাসলাম প্রাণ ভরে। নরের পাশে যে নারী রেখেছেন প্রকৃতি দেবী, তা তো জানি; রেণু, লতিকা, বীণা ও অশোকার মধ্য দিয়ে তা মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছি; কিন্তু ওদিকে ভালো করে দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবসর কোথায় আমাদের?

আমাদের পথ চলেছে যেদিকে, সেদিকে শুধু ময়না কাঁটার ঝাড় আর বাবলা গাছের সারি। পথে ছড়ানো মরুভূমির বালি, উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে সেই তপ্ত বালুকারাশি এলোপাথাড়ি উড়তে থাকে। পথের ধারে নেই কোনো কাজলা-দীঘি, নেই মানস-সরোবর! সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে পাই বালির সমুদ্র অতি দূরে গিয়ে দিক্‌চক্রবালের সঙ্গে মিশে গেছে। সেই পথে আমাদের যাত্রা! কখনো আকাশে শুনতে পাই কালবৈশাখীর রণ-হুঙ্কার, কখনো শীতের পুরু কুজ্‌ঝটিকা তুলে ধরে অনতিক্রম্য বাধা, কখনো নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার চতুর্দ্দিক থেকে এসে গ্রাস করে পাইথনের মতো।......তবুও আমরা চলেছি সেই পথে নিশিদিন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন। কী আমাদের লক্ষ্য, কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থান, কবে শেষ হবে আমাদের এই অবিশ্রাম চলা, আদৌ জানিনে তা। কিন্তু এই চলার পথে যাত্রা করে ভুলে গেছি আমরা কোথায় ফোটে শিউলি ফুল, কোথায় শোনা যায় ভ্রমরার গুনগুনানি, কোন্ কালো চোখের কোণে খেলে বিদ্যুৎ, কোন্ কোমল হৃদয়ে ডাকে ভাবাবেগের বন্যা!...

নারীকে আমরা করে চলেছি সম্পূর্ণ অস্বীকার।

অকস্মাৎ একদিন হুকুম এল যতীশ গুহকে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে যেতে হবে অফিসে। বুঝলাম তাঁকে এবার নিয়ে যাচ্ছে হয় হিজলীতে, নাহয়

বক্সা দুর্গে। বলতে গেলে এই প্রথম বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্যদের প্রতি কর্তৃপক্ষের আঘাত।

কিন্তু বিস্মিত হলাম তাঁকে দল বেঁধে বিদায় দিতে গিয়ে। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে একেবারে বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। দূরে দাঁড়িয়ে কিছুতেই বিশ্বাস হলো না আমাদের। কিন্তু যতীশবাবু হাসিমুখে একখানা দশ টাকার নোট আন্দোলিত করে দেখালেন। এবার আর অবিশ্বাস করবার কিছু রইলো না। যতীশবাবুর হাতে টাকা দিয়েছে মানেই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় ভাড়া তাঁকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তিনি মুক্ত।

মুক্ত। কথাটা কেমন যেন নতুন শোনাতে লাগলো। আর খানিকটে বেসুরোও বটে। আর কেউ নয়, স্বয়ং যতীশ গুহ। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কতকগুলি Action এর পরিকল্পনাই যে শুধু তাঁর ছিল, তা নয়, কয়েকটাতে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেন। আমার এই আখ্যায়িকাতেই পরে আবার এই যতীশ গুহের উল্লেখ করতে হবে। তখনই জানা যাবে, গভর্ণমেণ্ট এই লোকটিকে অকস্মাৎ ঐভাবে মুক্তি দিয়ে কী মহাভ্রমই না করেছিলেন এবং সেই ভুলের কী মর্ম্মান্তিক পরিণামই না তাঁদের হজম করতে হয়েছিল নীরবে!......

এই ধরণের অদ্ভুত মুক্তির পশ্চাতে গোয়েন্দা বিভাগের কী গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতাম আমরা। মিহি জালে ছেঁকে ধরবার মতো প্রথমতঃ গোয়েন্দা বিভাগ দলে দলে গ্রেপ্তার করতো। স্বভাবতঃই তখন এই বিশেষ এলাকায় বিপ্লবীদের তৎপরতা ব্যাহত হতো। নিশ্চয়ই দু'একজন, যারা জাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে, তারা ভাঙ্গা আসর আবার জমিয়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। তাই কিছুদিন অতিবাহিত হলে নেতৃস্থানীয় একজনকে অকস্মাৎ একেবারে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়ে অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর ওপর নজর রাখা হতো গোপনে—তিনি কোথায় কোথায় যান, কে কে আসেন তাঁর ওখানে, কি কি কথা হয়, এসব দেখবার ও জানবার চেষ্টা করা হতো। ফলে, হয়তো সন্ধান পাওয়া যেত আরও কিছু বিপ্লবীর। তখন আবার জাল ফেলা হতো।

কিন্তু আমরা এসব তথ্য বেশ জানতাম বলেই সমঝে ও সামলে চলতাম সর্ব্বদাই। যতীশ গুহ আবার সেই সমঝে ও সামলে চলবার দলের মুখপাত্র। সুতরাং খুশী হলাম মনে মনে গভর্ণমেণ্টের এই নির্বুদ্ধিতায়। আমরা কেউ দীর্ঘকাল বাইরে যেতে না-পারলেও একা যতীশ গুহই যে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করতে পারবেন, সে বিশ্বাস আমাদের আছে।

যতীশ গুহ বিদায় নেবার পরই চললো নানা গবেষণা ও বিতর্ক। গভর্ণমেণ্ট নাকি ধীরে ধীরে মুক্তি দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন। ব্যারাকে ব্যারাকে এই বিষয়ে চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা। কিন্তু হায়, শিকে ছিঁড়লো বোধহয় ঐ একটি বিড়ালেরই ভাগ্যে!

টবিন-গিরিজা এ্যাণ্ড কোম্পানীর সঙ্গে তেমন আর ঠোকাঠুকি নেই।

মোটের উপর একভাবে কেটে যাচ্ছে বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি। বোধহয়, শান্ত আবহাওয়াকে কোনো কূটনৈতিক কারণে আরও আনন্দময় করে তোলবার উদ্দেশ্যেই একদিন বিকেলে অকস্মাৎ দেখলাম এসেছে শিবিরের মধ্যে বেড়াতে চাকর সঙ্গে করে ছু'টি ৬।৭ বছরের ফুটফুটে মেয়ে। শুনলাম ছু'টি মেয়েই গিরিজার।

কিন্তু অনেকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওদের পানে। অনেক কাল পর যেন নতুন জিনিষ দেখতে পেলাম। ছুনিয়ায় যে শুধু আমরা নেই, এরাও আছে, সেদিন যেন আবার নতুন করে অনুভব করতে শিখলাম। সৌন্দর্য্যের স্কেল দিয়ে মেপে দেখলে হয়তো মেয়ে ছু'টির নাক-মুখ-চোখে অনেক গলদ আছে, রূপবতীর সংজ্ঞার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলাতে গেলে কিংবা এদের প্রতিটি অবয়ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চুলচেরা পরীক্ষা করে দেখতে গেলে হয়তো এরা আদৌ সুন্দরী নয়, তাই প্রমাণিত হবে। কিন্তু বাস্তব পরীক্ষার কথা বাদ দিয়ে আমাদের নীরস শুষ্ক মনে অকস্মাৎ গোলাপ ফুলের মতো দলের পর দল মেলে ফুটে উঠে এই ছোট মেয়ে ছু'টি যে আনন্দের শিহরণ এনে দিল, সত্যিই তা অনির্ব্বচনীয়!

আমাদের জগতে যেন নতুন জিনিষের অকস্মাৎ আমদানী হয়েছে, যা আমাদের অপরিচিত ও অবজ্ঞাত!......ছু'-চারটে কথা বলাবলির মধ্য দিয়ে সহজেই আমরা ওদের ছু'জনকে আপন করে নিলাম এবং তারপর সবাই মিলে সমবেতভাবে এমনি আদর সুরু করে দিলাম যে, প্রায় এক ঘণ্টা পর সুধাংশু বাবু ও নৃপেন পাল মেয়ে ছু'টিকে আমাদের আদরের কবল থেকে একরকম উদ্ধার করে নিয়ে চাকরকে দিয়ে একেবারে শিবিরের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এবং বারণ করে দিলেন, যেন আর কোনোদিন এদের না নিয়ে আসে।

সত্যিই, একেবারেই যেন ভুলে গেছি বাইরের কথা, বাড়ীর কথা। প্রায় দেড়বছর হলো রেণুর বিয়ে হয়ে গেছে। যতই সে আমার জন্য ভাবুক, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সেখানকার পরিবেশে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে আদৌ ভুল হয় না মেয়েদের। তাই মনের দরদ এখন স্থানান্তরিত হয়েছে চিঠির ভাষায়। মাঝে মাঝে এখনো আসে বটে, তবে হয়তো এরপর আর আসবে না।

ছোট বোন হেনার বিয়ে হয়ে গেছে। এখান থেকেই খানকতক বই অবশ্য পাঠিয়েছি উপহারস্বরূপ, কিন্তু বই দিয়ে যেতে-না-পারার ছুঃখ কি আর ভোলা যায়? পাড়ার ছেলেদের কথাও মনে পড়লো। সর্ব্বকার্য্যে যারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো আমারই ওপর এবং নির্ভর করে পরম নিশ্চিন্তে যারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো সাফল্য একেবারে নিশ্চিত জেনে, আজ তারা না-জানি কত অসহায় হয়ে পড়েছে!

এমনি করে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের কথা আমার মনে ভেসে উঠলো। মনে হলো বহুদিন নয়, বহুকাল এদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

কে জানে, কবে, কতকাল পরে আবার তাদের সুখ-দুঃখের মধ্যে ফিরে যেতে পারবো ?

কিন্তু বহরমপুর বন্দীশিবিরে যতীশ গুহ চলে যাবার কিছুকাল পর দ্বিতীয় যুগান্তকারী সংবাদ এল, বরিশালের আরও দু'জন বন্দীসহ আমার প্রতি স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ।

স্বগৃহে বা গ্রামে অন্তরীণের আদেশকে কোনোদিনই আমরা ভাল চোখে দেখতাম না। কারণ এই অর্দ্ধস্বাধীনতাকে নানাবিধ বিধি-নিষেধ দিয়ে এমনি করে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয় যে, যে-কোনো সময়ে একেবারে অনিচ্ছায়, এমনকি অজানতেও তার কোনোটা ভঙ্গ হয়ে যাবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। তারপর বন্দীশিবিরে দু'একজন দিবাকর সেনগুপ্ত বন্দীর ছদ্মবেশে এসে আমাদের গোপন সংবাদ গোপনে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে পারে বটে, কিন্তু গ্রামে বা স্বগৃহে চৌকিদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থেকে সুরু করে গ্রামের প্রত্যেকটি লোকই সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অনায়াসে বিবেক বিক্রয় করে দিতে পারে।

তবে এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জেলের মধ্যে যে কর্ম্ম-তৎপরতা একেবারে থাকে স্থগিত, বাইরে গিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে, সতর্কতার সঙ্গে তা চালু করা যেতে পারে। বুদ্ধির লড়াইতে পুলিশ চিরকালই পরাজয় স্বীকার করেছে আমার কাছে। তাদের কাছে চিরদিনই আমার চ্যালেঞ্জ ছিল, কোনো ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পার যদি, কর; ঐ অর্ডিন্যান্স, বিনা বিচারে রাজবন্দী করে রাখা, ও তো তোমাদের দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। নির্দ্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আদালতের সমক্ষে আনতে না পেরে কাল্পনিক সন্দেহবশে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করে রাখা।

দীর্ঘ সাত বৎসরের বন্দি-জীবনে আমার এই চ্যালেঞ্জ যে অটুটভাবে আমি রক্ষা করে চলেছি, এই কাহিনীতেই তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে। সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে, যেকোনো মামলায় জড়িয়ে দেবার জন্য পুলিশ ও আই-বি কর্ত্তারাও কী পরিশ্রম ও ষড়যন্ত্রই না করেছিলেন!……

আমার বিদায়ের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্ব্বপ্রথম আমি বহরমপুর বন্দীশিবির সেনাবাহিনীর জি-ও-সি, তারপর সাহিত্যসভার সম্পাদক, তার পর নাটক, খেলা-ধুলা, ব্যায়াম ও সর্ব্ব ব্যাপারেই আমার বিশেষ যোগাযোগ ছিল। তাই সংবাদ পাবার দশ মিনিটের মধ্যেই এমনি অনেকগুলো সংক্ষিপ্ত বিদায়-সভার অনুষ্ঠান হলো। অবশেষে খেলার মাঠে গেলাম। সেনাবাহিনী সেখানে ফল্-ইন্ করে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল। মিলিটারী বোর্ডের চেয়ারম্যান পরেশ সান্ন্যাল আমাকে নিয়ে গেলেন। আমি গার্ড-অব-অনার পরিদর্শন করলাম ও প্রত্যেকটি সৈনিকের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বিদায় গ্রহণ করলাম।…

বহরমপুর ষ্টেশনে এসে জানা গেল ট্রেণের একটু দেরী আছে। তাই বিশ্রামাগারে নয়, বাইরে প্লাটফরমে মালপত্রের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। নানাবয়সের ও নানাচেহারার অসংখ্য নরনারী চলা-ফেরা করছে। ষ্টেশনের কর্ম্মতৎপরতা দেখলাম। সবই যেন নতুন মনে হলো। শুধু ষ্টেশন কেন, বাইরের আকাশ, গাছপালা, কর্ম্মমুখর জগতের প্রত্যেকটি নর ও নারীকে একেবারে অভিনব ও অপরূপ মনে হতে লাগলো।......

একদল মহিলা কেন জানিনে বারবারই আমাদের লক্ষ্য করছেন। ওঁরাও যে বহরমপুর শহরের লোক নন, তা সহজেই অনুমান করলাম, নিশ্চয়ই কোনো বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। উঠলাম কিন্তু আমরা একই ইণ্টারক্লাশ বগিতে, তথাপি দৃষ্টিক্ষেপে তাঁদের আমার সঙ্গে কথা কইবার প্রবল আগ্রহ দেখা গেলেও বোধহয় সঙ্গী আই-বি দারোগা ও সশস্ত্র সিপাইদের দেখে তাঁরা ইতস্তত: করছিলেন।

কিন্তু গোয়ালন্দে এসে যখন ষ্টীমারেও আমরা একই ইণ্টারক্লাশ কামরায় উঠলাম, তখন ওদের মধ্যে বর্ষীয়সী যিনি, তিনি এগিয়ে এলেন।

তুমি কি বহরমপুর থেকে আসছো, বাবা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরাও ওখানে গিয়েছিলাম আমার ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে। প্রভাত গুপ্ত--প্রভাত গুপ্ত আমার ছেলে।

পদধূলি গ্রহণ করলাম। বললাম: আমি তাঁদের খুব চিনি।

তারপর তাঁরা সবাই আমায় ঘিরে বসলেন এবং খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওখানকার খাওয়া-থাকা, সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে নানাপ্রশ্ন করতে লাগলেন। স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ পেয়ে যাচ্ছি শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: কী যে করেছ তোমরা, তা আমরা জানিনে, টেরও পাইনে। এমনি কাজ কেনই বা করতে যাও, বাবা? পারবে কি তোমরা ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে?

বললাম: সারা অন্তর দিয়ে আমরা কিন্তু মা তাই বিশ্বাস করি।

মা বললেন: বিশ্বাস করতে পার এবং বিশ্বাস রাখা ভাল। কিন্তু তোমরা তো জান না, তোমাদের এমনিভাবে জেলে নিয়ে গেলে মা-বাবার মন কতখানি ভেঙে পড়ে? সারারাত আমাদের ঘুম হয় না। ভাবি, সেখানে কি জানি তোমাদের খেতে দিচ্ছে কিনা, শোবার জায়গা দিচ্ছে কি না, কি জানি সেখানে তোমাদের ওপর নির্য্যাতন করছে কিনা। এইসব ভাবনাতেই আমাদের আয়ু যায় কমে আর বেঁচে থাকতেও সাধ হয় না।

মায়ের গলার স্বর ভারি হয়ে এল। জবাব আমি দিতে পারতাম, যুক্তি দেখাতে পারতাম প্রচুর, কিন্তু কিছুই করলাম না, কিছুই বললাম না। নীরবে বাংলাদেশের অসংখ্য মায়ের ভর্ৎসনা যেন শুনতে লাগলাম পরম শ্রদ্ধাভরে।......

গৃহে ফিরে গেলে জানি, আমারও মা এমনিভাবে তিরস্কার করবেন আমায়, কত দুঃখ জানাবেন, এই সর্ব্বনাশা পথত্যাগের জন্য কত অনুরোধ জানাবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারা অন্তর দিয়ে এ বিশ্বাসও রাখি, এই বাংলা দেশের মায়েরাই দামাল ছেলেদের রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজেদের হাতে সাজিয়ে,— মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন উষ্ণীষ, কোমরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন তীক্ষ্ণধার তরবারী, বক্ষে এঁটে দিয়েছেন বর্ম্ম আর ললাটে এঁকে দিয়েছেন রক্তাক্ত তিলক, তারপর আশায চুম্বন দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন রণক্ষেত্রে। বাংলার বিপ্লবীদের অসামান্য সাফল্যের পশ্চাতে রয়েছে মায়েদেরই নীরব আশীর্ব্বাদ!......

এসে নামলাম সেই লৌহজংএ। তারপর নৌকাযোগে এলাম সেই শ্রীনগর থানায়, সেখানে একটু বিশ্রাম করে সেই পুঁটিমারা খাল দিয়ে এলাম আবার আমাদের গ্রামের সন্নিকটে। মাঝির মাথায় বাক্সবিছানা চাপিয়ে রওনা হলাম গ্রামের দিকে।

গ্রামে প্রবেশের প্রাক্কালে সর্ব্বাগ্রে দেখা হয়ে গেল আমার পুরাতন মাঝি বছিরদ্দি শেখের সঙ্গে। ব্যাটা বিরাট একটি ঘাসের বোঝা মাথায় করে যাচ্ছিল, দূর থেকে ক্ষেতের আইল ধরে একজন ভদ্রলোককে মালপত্র নিয়ে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর যেই চিনতে পারলো, অমনি বোঝা ফেলে দিয়ে পাগলের মত ছুটে এল কাছে। মাটিতে একেবারে সটান শুয়ে পড়ে দুই হাতে পদধূলি গ্রহণ করতে লাগলো। বাধা দিলাম, শুনলো না। বলতে লাগলো: আইছেন—আইছেন কত্তা? হঃ, কদ্দিন ভাবছি কত্তা কবে আইবো। গেরাম এক্কেবারে খালি হইয়া গেছে। ভালোই লাগে না আর কোনো কিছু।—হেই মাঝি, দে ব্যাটা দে, বাক্সবিছানা আমার মাথায় তুইল্যা দে।

বলে সে মাঝিকে আর কোনোকথা বলতে না দিয়ে বাক্স ও বিছানা একরকম কেড়ে মাথায় তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে ছুটে চলে গেল গ্রামে ও আমাদের বাড়ীতে সুসংবাদটা পৌঁছে দিতে।

ধোপাবাড়ী ডাইনে রেখে প্রবেশ করলাম পাড়ায়। তারপর বাঁদিকে পড়লো গিরিশ কাকার বাড়ী, তারপর হেরম্বদা'র বাড়ী, তারপরই বিলাস কাকার সেই বৈঠকখানা, গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে যেখানে ছোট-খাটো একটা সভা হয়েছিল। ডানদিকে ঘুরে একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে আমাদের বাড়ী। দেখলাম, আমায় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন মা, বাবা, বৌদি'রা, ছোট ভাই রঙ্গলাল!

বছিরদ্দি শেখ অনর্গল ভাষায় তখনো বক্তৃতা ক'রে কি তাঁদের বোঝাচ্ছে।

সেইদিন থেকে সুরু হলো স্বগৃহে অন্তরীণের জীবন।......

ঊনত্রিশ

যাঁরা সঠিক সংবাদ রাখেন না, স্বগৃহে অন্তরীণের কথা শুনেই হয়তো তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। এই ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন যে, যাক্ গে, তবুও তো জেল নয়, স্বগৃহ অর্থাৎ বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়জন ও প্রতিবেশীর সান্নিধ্য-সমৃদ্ধ শান্তিময় আবেষ্টনী। নেই এখানে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশ ক্রাউনের প্রতিনিধি হবুচন্দ্র রাজা উদ্ধত টবিন আর তাঁর যোগ্য দোসর ও মন্ত্রী গবুচন্দ্র গিরিজা। নেই পাঠান সিপাইয়ের দুর্বিনীত অসহ আচরণ, তল্লাসীর নামে নেই আই-বি অফিসারদের অবমাননাকর ব্যবহার, নেই গুনতি আর লক্-আপের দৈনন্দিন ঝামেলা।

রান্নাঘরে বসে এখানে বৌদিদের সঙ্গে খোসগল্প করেই কাটিয়ে দেয়া যাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, জ্যোৎস্নারাতে আমাদের ছাদে জমানো যাবে আবার সেই পারিবারিক অফুরন্ত আড্ডা, সারাটি দিন পুকুরের পশ্চিম পাড়ে হিজল গাছের কোণে ছোট ছিপ নিয়ে বসে দিব্যি তোলা যাবে প্রায় প্রতিটানেই পুঁটি, ট্যাংরা, বেলে অথবা টাকি। স্বভাবতঃই তাঁরা ভাববেন, স্বগৃহে অন্তরীণের সঙ্গে মুক্তির পার্থক্য একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।

অপরে যা-ই ভাবুন বন্দীশিবিরের সঙ্গে তুলনায় স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থাকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখতাম না আমরা। সর্ব্বক্ষেত্রেই যে সর্ত্তহীন মুক্তিদানের পূর্ব্বেই শুধু স্বগৃহে এনে কিছুদিন আটক রাখা হতো, তা একেবারেই সত্যি নয়। আমার নিজের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। বরং অসময়ে মুক্তির পশ্চাতে পুলিশের যে নীতি আছে, স্বগৃহে অন্তরীণ করবার বেলাতেও তাই। অর্থাৎ, বিশেষ কোনো এলাকা থেকে গুপ্ত সমিতির আরও কিছু সদস্যকে মাটির তলা থেকে লোভ দেখিয়ে বাইরে এনে হাতকড়া লাগানোই এর উদ্দেশ্য। অনেকটা, খাঁচার মধ্যে ছাগল পুরে হিংস্র ব্যাঘ্রকে ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা। আর এমনই ফাঁদ, চক্রব্যূহের মতো অভ্যর্থনার বেলায় যে সীমাহীন উদার, কিন্তু বিদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ।......

সরকারী অফিসারদের স্বাক্ষরযুক্ত যে হুকুমনামা হাতে দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণের আদেশ জারী করা হয়, তার দুইটি সর্ত্ত এমনি :

এক : স্বগ্রামের সীমানার মধ্যে থাকতে হবে চব্বিশটি ঘণ্টা আর সন্ধ্যে ছ'টা থেকে ভোর ছ'টা পর্য্যন্ত থাকতে হবে একেবারে স্বগৃহের চারখানি দেয়ালের মধ্যে।

দুই : কোনো ছাত্র, শিক্ষক অথবা ভিন্ন গ্রামের কারুর সঙ্গে কথা কওয়া নিষেধ।

আমার বেলায় কর্ত্তারা খেললেন আর একটি বিশেষ রকমের চাল। দিনের বেলা আমার চলাফেরার সীমানা নির্দ্দিষ্ট হলো শুধু আমাদের কেয়টখালী গ্রাম

নয়, আশেপাশের দু'-চারখানা গ্রামও নয়—একেবারে গোটা বিক্রমপুর বলা চলে। পুবের সীমানা হলো তালতলা, পশ্চিমে নির্দ্দিষ্ট হলো আড়িয়ল বিল, দক্ষিণে লৌহজং এবং উত্তরে সীমানা হলো ধলেশ্বরী নদী। এই বিস্তীর্ণ এলাকার পরিধি অন্যূন ১৬৮ বর্গ মাইল।

যাঁরা ভেতরের সংবাদ রাখেন না, তাঁরা হয়তো খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠবেন একথা শুনে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে—একটি বিরাট এলাকায় ঘোরাফেরা করবার সুযোগ দিয়ে অসংখ্য চর লাগিয়ে আমার গতিবিধির রিপোর্ট সংগ্রহ এবং সুযোগ বুঝে একএকটি করে আরও কর্ম্মীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা।

এটা সহজেই ধরতে পেরেছিলাম আমি। দিনের বেলায় বিরাট এলাকায় অবাধে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা দিয়ে আবার ভিন্ গাঁয়ের কারুর সাথে কথা কইতে বারণ করে দেবার পশ্চাতে যে গূঢ় অভিসন্ধি আছে, সহজ লজিকেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু ধরা পড়বার এই সহজ সত্যটাই ঐ "বুদ্ধি শাখা"র অশেষ বুদ্ধিশালীদের মগজে একটু বিলম্বে ঘা দেয়। ট্রাজেডি ঐখানেই!

বাড়ীতে এসে আমি বেশ বুঝতে পারলাম ওরা গভীর জলের আরো গোটাকতক মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে সুগন্ধ 'চার' করে লোভনীয় 'টোপ' ফেলতে চায়। ফলে, এবার সুরু হলো আমার সঙ্গে ওদের বুদ্ধির লড়াই।

প্রথম দিনেই মনে-মনে সংকল্প করলাম যে, আমার ও অন্যান্য বন্ধুদের অবর্ত্তমানে যে যোগাযোগ-গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, শুধু তাই জুড়ে দেয়া নয়, স্বগৃহে ফিরে আসার পুর্ণ সুযোগ নিয়ে এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে মূর্খ Intelligence Branch অর্থাৎ আই-বি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে ওদের মারাত্মক ভুল কোথায়! বুদ্ধির লড়াইতে ওদের ধরাশায়ী করাই আমার ব্রত হয়ে দাঁড়ালো।

আমাদের বাড়ীতে একখানা একতলা দালান আছে। খুব বড়-বড় কোঠা। তার দক্ষিণের কোঠাটি আমি দখল করলাম। আমাদের বাড়ীতে প্রবেশের সদর এদিকে। তাই মা আপত্তি করলেন না।

অন্যান্য দশজন শুভানুধ্যায়ীর মতোই বাবা সরকারী হুকুমনামা পাঠ করে আশান্বিত হয়ে উঠলেন, এবার ওরা ছেড়ে দেবে শুধু একটুখানি চুপ করে থাকলেই। কিন্তু মা আমায় জানতেন একটু বেশী নিবিড়-ভাবে। তাই নিজে আশার আলোকরেখা দেখতে পেলেও আমার কাছে এলেন যাচাই করতে।

কি রকম দিলি আই-এ পরীক্ষা?

হেসে জবাব দিলাম: পাশ করে যাবো।

শুধু পাশ!—মা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন: প্রশ্ন বুঝি খুব শক্ত এসেছিল আর জেলের মধ্যেও বোধহয় স্বদেশীর পোকা তোমায় কামড়ানো ছাড়েনি?

কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলাম : না, না, পোকা নয়। আসল কথা, বই যে একখানাও কিনিনি। পরের বই ধার করে পড়ে শুধু পাশই করা চলে মা, ষ্ট্যাণ্ড করা যায়না।

পাশেই প্রকাণ্ড কাঁচের আলমারী ভর্ত্তি নতুন বইয়ের সারি দেখিয়ে মা জিজ্ঞেস করলেন : এই বাইরের বইগুলো কিনতে পারলি আর পাঠ্য বইগুলো—

বাধা না দিয়ে পারলামনা : শুধু কি তাই, বহরমপুরে রাজবন্দীদের প্রত্যেকটি কাজেই যে আমায় যেতে হতো—

মা গম্ভীর হলেন : কেন, ঐ তিনশো বন্দীর মধ্যে কি তুমি একাই ছিলে মাতব্বর ?

কী জবাব দোব ? চুপ করে থাকলাম। মা রেগেছেন, এবার বকবেন।

কিন্তু না, তা নয়। মাথার বালিশের পাশে ঝপ্ করে বসে পড়ে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন : সে কথা যাক্। আমার একটা কথা রাখবি বল্ ?

কি কথা ?

আগে রাখবি বল্ ? কথা দে—

কি কথা, বল না!

না। আগে কথা দিতে হবে।

ইতস্তত: করে বললাম : দিতে পারি শুধু একটি কথা বাদে। আর সেটা যে কী কথা, তা তো তুমি জানোই মা!

হাত থেমে গেল। গাঢ় গলায় মা বললেন : তা জানি, তুমি কথা দেবে না। কত আশা ছিল তোমার বাবার, তুমি বিলেত যাবে, ব্যারিষ্টার হবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এখন দেখছি, তোমায় জেলের বাইরে রাখাই মুস্কিল ?

আবহাওয়া হাল্কা করবার জন্য বলে উঠলাম : কেন, এই তো জেলের বাইরে এসেছি। তোমার কোলে মাথা রেখেছি। গল্প করছি—

মা হেসে ফেললেন। বললেন : কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে যারা চুপি-চুপি এসে এই ঘরে ঢোকে, অন্ধকারেই বসে ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়, আবার একসময় চোরের মত পা টিপে-টিপে যারা বেরিয়ে যায়, তারা যে বেশীদিন তোমায় বাইরে থাকতে দেবেনা, তা আমি জানি।

বললাম : ওদের কী দোষ ?

মা বললেন : দোষ ওদের নয়, দোষ তোর নিজের।

কিন্তু পুলিশ টের পাবে না। দেখো তুমি মা. কাজ আমাদের চলবেই আর ওরা ভাববে আমি গুড বয়ের মতো খাই আর ঘুমোই।

মা বুঝলেন হুকুমনামা দেখে বাবা উল্লসিত হয়ে উঠলেও তাঁর সে ভুল করবার দুর্দ্দিন এখনো আসেনি। মা আমায় চেনেন।

সত্যিই, কালক্ষেপ না করে কাজ সুরু হয়ে গেল। গোপনে বৈঠক হলো অনেকগুলো। একসঙ্গে বসে বিতর্ক-সভা নয়—পৃথকভাবে। এলো সুবোধ চক্রবর্ত্তী, এলো মধু ভট্টাচার্য, ইন্দু সরকার ; এলো কানাই ব্যানার্জ্জী, বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও পরাণ চ্যাটার্জ্জী। আর আমাদের গ্রামেই তৈরী হয়ে উঠলো বিপদভঞ্জন চ্যাটার্জ্জী, খগেন চক্রবর্ত্তী, অনাথ চক্রবর্ত্তী ও মণি চ্যাটার্জ্জী।

স্থির হলো সর্ব্বাগ্রে সংগঠন, তারপর ট্রেনিং, তারপর পরিকল্পনানুযায়ী এ্যাক্‌শন! বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিশালী বিভাগের সঙ্গে সুরু হলো বুদ্ধির লড়াই। দুনিয়ার যে-কোনো কামানের লড়াইয়ের মতোই এটা মারাত্মক ও ভয়াবহ। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় রেখেছি সজাগ কাণ-খাড়া বুলডগের মতো। শত্রুর অনুপ্রবেশের প্রত্যেকটি পথে অহর্নিশি রয়েছে অতন্দ্র পাহারা। অবিশ্বাস করছি দেয়ালকে, সন্দেহ করছি সন্দেহাতীত সুহৃদকে। নিজের ছায়াকে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস নেই নিজের হাতকে। ক্ষুরধার বুদ্ধির কাঁটাগুলো উঁচিয়ে রেখেছি সজারুর মতো। সাপের মতো বুকে হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে যেতে হবে শত্রু-সীমানায়। সন্তর্পণ অনুসন্ধানে বার করতে হবে লখীন্দরের লৌহ-গৃহের অসতর্ক ছিদ্র।……কামানের লড়াইয়ে তবু আছে বিরামের আশা, সন্ধির আশ্বাস, ভার্সাইয়ের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু বুদ্ধির লড়াই চলে অবিশ্রাম একটানাভাবে। সুরু আছে এর, শেষ নেই। মজঃফরপুরে হয়েছে এর সূত্রপাত, পরিণতি লাভ করেছে ইম্ফল পাহাড়ের চূড়ায়, শেষ কবে হবে কে জানে।……

ত্রিশ

বাড়ীতে এসে সংবাদ নিলাম, রেণু এখানে নেই, শ্বশুরবাড়ীতে। আসবার কথা আছে শীগ্‌গিরই। তার খোকা হয়েছে একটি।

কিন্তু কিছুতেই পারছিলাম না রেণুর মা'র সঙ্গে দেখা করতে তাঁদের বাড়ী গিয়ে। কারণ শুধু একটি এবং সে কারণটি এমনি মর্ম্মস্পর্শী যে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রেণুর দাদা ত্রিলোকেশ, ওরফে মাণিক, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক কাজে সে-ই তখন ছিল আমার দক্ষিণ হস্ত। অনেকটা হীরা সিংয়ের মত। কথা বেশী কয়না, বেশী লোক-জনের সান্নিধ্যও সর্ব্বদাই এড়িয়ে চলে। যখন যেখানে যে অবস্থায় যেতে বলা হবে, যা করতে বলা হবে, সে যাবেই এবং তা করবেই। কোনো কারচুপি, ষ্ট্র্যাটেজি বা কৌশলের ধার ধারেনা মাণিক। এগিয়ে যেতে-যেতে এক পা পেছিয়ে আসবার কূটনীতি তার অন্তর স্পর্শ করে না। কাজের শেষে সে যদি ফিরে না আসে, তাহলে বুঝতে হবে হয় কাজ শেষ হয়েছে, নইলে সে নিজে শেষ হয়ে গেছে। এর মধ্যে কোনো রফার অবকাশ নেই। Light Brigade-এর সৈনিকের মতো—

Their's not to reason why,
Their's but to do or die......

স্বেচ্ছায় সে নিয়েছিল আমার দেহরক্ষীর কাজ। সর্ব্বত্রই সে ছায়ার মতো নিঃশব্দে আমার পাশে-পাশে থাকতো। সর্ব্বদাই পকেটে বা বেল্টে থাকতো তার একটি রিভলবার। গুলী ভরা ছ'ঘরা রিভলবার। চালাতে হয়নি তাকে কোথাও আমার দেহরক্ষার জন্য, তা সত্যি। কিন্তু চালাবার ক্ষীণতম প্রয়োজন দেখা দিলেই যে বাঘের মতো মাণিক লাফিয়ে পড়বে সম্মুখে, তা সর্ব্ব অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি আমি।

ছ'বছর পুর্ব্বে আমি গ্রেপ্তার হবার কিছুদিন পর সেও গ্রেপ্তার হয় এবং রাজবন্দী করে তাকে বহরমপুরেই আমাদের পুরোনো বন্দীশিবিরের পাশেই একটি নতুন বন্দীশিবিরে অন্যান্যের সঙ্গে আনা হয়। কিছুদিন পরই পাঠানো হয় তাকে যশোহরের কোনো গণ্ডগ্রামে থানায় অন্তরীণ করে। বেরিবেরি রোগেআক্রান্ত হয়ে সে প্রাণত্যাগ করে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায়।

বাড়ীর বড় ছেলে। তাও আবার যার-তার নয়, স্বয়ং বিলাস কাকার ছেলে। বৃদ্ধ কাকার হাত থেকে সংসারের সমস্ত ভার মাণিকই স্কন্ধে তুলে নেবে, এই ছিল তাঁদের কামনা। দেওভোগের সাউদের বলেও রেখেছিলেন কাকা যে, এবার মুক্তি পেয়ে এলেই তাকে বসিয়ে দেবেন কাছারিতে, নায়েবের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ শিখিয়ে দেবেন। কাকা আর ক'দিন?

কাকীমাও সিংপাড়ার কোন্ এক ব্রাহ্মণ-কন্যার পিতাকে কথাই দিয়ে রেখেছিলেন যে, মাণিক এবার ফিরে এলেই হয়...আর কি মিশতে দেবেন গাঙ্গুলী বাড়ীর ঐ দ্বিজেন গাঙ্গুলীর সাথে ?... ...

কিন্তু হায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলী ফিরে এল বাড়ীতে, মাণিক আর এলোনা ! কী করে যাই কাকীমাকে প্রণাম করতে ? কী বলে সান্ত্বনা দোব তাঁকে ? মৃত্যু যে অবধারিত নির্ম্মম সত্য, তা জানি, কিন্তু এমনি করে অজানা অচেনা দেশে নিজের ঘরে একা-একা ধুঁকতে ধুঁকতে মরা, এর ধাক্কা কী করে সামলাবেন কাকীমা ?

তবু গেলাম, অপরাধীর মতো নীরবে মাথা নীচু করে তীব্র ভৎর্সনা গ্রহণ করবার জন্যই গেলাম। কাকীমা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন। আমি হাঁক দিতেই ত্রস্তপদে বেরিয়ে এলেন। আমি পায়ের ধুলো নেবার জন্য নীচু হতেই শুধু একটি প্রশ্নই শুনলাম কাণে: তুই তো ফিরে এলি, কিন্তু আমার মাণিককে কোথায় রেখে এলি রে ?...

সংজ্ঞাহীন দেহ তাঁর মাটিয়ে লুটিয়ে পড়লো। জ্ঞান ফিরে আসা পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করলাম না আমি। কারণ, এমনি একটি প্রশ্ন কাকীমা উচ্চারণ করবার পুর্ব্বেই আমরাও মনের কোণে দেখা দিচ্ছিল বিজলী চমকের মতো। মাণিক কোথায় ? কোথায় আমার দেহরক্ষী ? কোথায় আমার দক্ষিণ হস্ত ? ......নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই পাইনি খুঁজে। তাই পালিয়ে এলাম।

মনে পড়ে কয়েক বছর পুর্ব্বেকার কথা। কলকাতা মিডল্ রোডে থাকতো সে সহানুভূতিহীন কাকার বাসায়। বাবা পাঠিয়েছিলেন চাকরির চেষ্টা করবার জন্য। পাড়ার সুশীল চক্রবর্ত্তী কলকাতাতেই ভালো একটা চাকরি করতো। কাকার বাসায় মাণিকের লাঞ্ছনা গঞ্জনার অবধি ছিলনা; সময়মত বাড়ীতে না ফিরে গেলে প্রায়-দিনই হয় তার জন্য খাবার থাকতোনা বা কম থাকতো অথবা হয়তো একখানা থালায় সব ঢেলে দিয়ে এমনি অসাবধানতার সঙ্গে ফেলে রাখা হতো যে, বেড়ালে সব খেয়ে যেত। কিন্তু কাজের নেশায় এমনি মশগুল ছিল সে যে এসব অসুবিধাকে ভ্রুক্ষেপই করতো না। বহু জেরা করে করে সুশীল হয়তো একদিন জানতে পারতো যে গত ক'দিন মাণিকের খাওয়াই হয়নি। এই অর্দ্ধাশন ও অনশন থেকে বাঁচাবার জন্য সুশীল বিশেষ-ভাবে চেষ্টিত হয়ে উঠলো।

জুটলোও একটা চাকরি কলকাতার বাইরে খুলনাতে। কিন্তু মাণিক যেতে রাজী নয়। এদিকে সুশীল আমার গোপন সমর্থন পেয়ে মাণিকের বাড়ীতে সংবাদ পাঠিয়ে, নিজে ওর জামা-কাপড় ও খাঁকি হাফ প্যাণ্ট কিনে দিয়ে এই ব্যাপারে এমনি অগ্রসর হয়ে পড়লো যে, মাণিকের আর প্রত্যাখ্যান করবার উপায় রইলো না। খুলনা যাবার দিন স্থির হয়ে গেল। কোন্ একটি মোটর সারাই কারখানায় চাকরি। প্রারম্ভে লোভনীয় কিছু না পেলেও কামড়ে পড়ে থাকতে পারলে ভবিষ্যতে আশা আছে।

মাণিকের কলকাতা ত্যাগের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে দলের কাজে অকস্মাৎ আমারও একবার বিক্রমপুরে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল। ঢাকায় লোম্যান ও হডসন সাহেবকে গুলি করে বিনয় তখন পলাতক। নির্দ্দেশ এসেছে, একটি রিভলবার নিয়ে বিক্রমপুরে গিয়ে সেটা বিনয়ের কাছে পেঁ ৗছে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কী করে রিভলবার সঙ্গে করে কলকাতা থেকে কেয়টখালী পেঁ ৗছাই ? একটু ভাবনায় পড়লাম।......অসীম সাহসে ভর করে একদিন ট্রেণে গোয়ালন্দে শ্রীপদের কোয়ার্টার "আমীর" ষ্টীমারের ফ্ল্যাটে পেঁ ৗছলাম। সেখানে দু'-একদিন অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে অকস্মাৎ এক দিন নারায়ণগঞ্জ মেল ষ্টীমারে পাড়ি দোব স্থির করলাম।

কিন্তু পরদিন অকস্মাৎ কলকাতা থেকে মাণিক গোয়ালন্দ এসে হাজির! ক্ষুণ্ণ মনে প্রশ্ন করাতে সে তার স্পষ্ট জবাব দিল: আমার একটা চাকরি গেলে আবার চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিনয় বোস বাংলা দেশে একজনই আছে। এই মহা সত্যটি ভুলো না. বুঝলে ?

মাণিক রিভলবারটি নিয়ে কোমরের বেল্টে এঁটে নিল এবং ষ্টীমারে চড়ে বসলো। চাঁদপুর মেল ষ্টীমারে গেলাম আমরা যাতে কেয়টখালীতে অনেক রাতে পেঁ ৗছাই। অর্থাৎ অসময়ে।

কাদিরপুর থেকে হাঁটা-পথে যখন আমরা কেয়টখালী পেঁ ৗছলাম, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। আমাদের বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। গ্রাম-ও নিস্তব্ধ। মাণিক চাকরিতে না গিয়ে বাড়ী চলে এসেছে আমার সঙ্গে, বিলাস কাকা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জেনে মাণিককে আর ওদের বাড়ী যেতে দিলাম না।

মাকে ডেকে তুললাম, সোনা বৌদিও উঠলেন। বললাম. একজন অতিথি আছেন দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে বসে। তিনি খাবেন, আমিও খাবো।

মা জিজ্ঞেস করলেন: অন্ধকারে বসে ? সে কেমন অতিথি রে ?

গম্ভীর মুখে বললাম: তা জেনে তোমার কী প্রয়োজন মা ? এখন আলু আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে ভাত দাও চড়িয়ে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে।

সোনা বৌদি বললেন: তোমার অতিথিরা বেশ ঠাকুরপো! আসেন রাত বারোটায়, থাকেন অন্ধকারে বসে, খাবেনও নিশ্চয়ই অন্ধকারে এবং তারপর ভোর হবার পুর্ব্বেই বোধহয় সম্মানিত অতিথি বিদায় নেবেন ?

বললাম: হুবহু যা বলেছ! এবার দয়া করে যদি—

রান্না হলো। বৌদি বড় একথালা ভাত, ডিম ও আলু সেদ্ধ দিয়ে মেখে দিয়ে গেলেন দক্ষিণের ঘরের অন্ধকারে টেবিলের ওপর। খেলাম মাণিক ও আমি।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন ঘরের বাইরে থেকে: এই, অন্ধকারে খাচ্ছিস কেন, আলো জ্বালিয়ে নে না। অন্ধকারে খেতে নেই।

বললাম: তা পারলে তো অতিথির সঙ্গে তোমাদের পরিচয়ই করিয়ে দিতাম মা!

মাণিক নয় তো?—অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের মতো প্রশ্ন করলেন মা।

অবলীলাক্রমে সত্যের মত করে বলে গেলাম: পাগল হয়েছ, তুমি মা? মাণিক চাকরি পেয়েছে খুলনায়। কবে চলে গেছে সেখানে। আর চাকরি ফেলে কি ওকে আর এখানে আনা যায় কখনো? না আনা উচিত?

মা আর প্রশ্ন করলেন না। কিন্তু বিস্মিত হলাম মার শারলক্ হোমীয় বিচার-বুদ্ধি দেখে।......

সেই রাত্রেই পুব পাড়া থেকে অনাথকে ডেকে তুলে তাকে সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিলাম মাণিককে তিন মাইল দূরে কোলা গ্রামের বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে।

মাণিক সম্বন্ধে এমনি অনেক কথা সেদিনও যেমন মনে পড়েছিল, আজও তেমনি পড়ে। আমার জীবন-মন্দারকে ঘিরে রয়েছে মাণিকের স্মৃতি-সৌরভ। মাণিক সত্যিই ছিল মাণিক। হীরা, চুনী বা পান্না নয়, মাণিক ছিল সাপের মাথার মাণিক। নিবিড় অন্ধকারে তার স্তিমিত দ্যুতি আলোকরেখা বিকিরণ করতো চলার পথে।

সেই মাণিক হারিয়ে গেছে, সেই হীরা সিংএর মৃত্যু হয়েছে। ····

শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল। সংগঠনের কাজ। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমাদের সংগঠকরা হানা দিতে লাগলো সুচ হয়ে এবং অতি দ্রুত অথচ সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে একটি-একটি করে ছেলে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো আমার সাথে। ওদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতো প্রায়ই বিরাট মাঠের মাঝখানে হয়তো কোনো গাছের ছায়ায় ঝোপের আড়ালে। এতে দারুণ সুবিধে ছিল একটা। চারিদিকে শোনবার মতো দেয়াল নেই, দরজা-জানালার আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য করবার সুবিধে নেই। চারিদিকে বিরাট মাঠের কোথাও নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেই বা আমাদের লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বার নিশ্চয়তা আছে। অর্থাৎ, গুপ্তচরেরা আমার কোনো সংবাদই সংগ্রহ করতে পারতো না।

সে যুগে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য দিবাকর সেন চোখ ও কাণ সজাগ রেখে ঘোরাফেরা করতো হায়েনার মতো। এদের মধ্যে একদল ছিল, যারা সোজাসুজি ঢাকা আই-বি অফিসের চাকুরে। একদল এদেরই নিয়োজিত চর, কমিশনে কাজ করতো। আর একদল ছিল, যারা এদের প্রায় সবাইকেই জানতো ও চিনতো এবং পাছে এদের বিরাগভাজন হলে হাতে হাতকড়া পরতে হয়, তাই তারা যুধিষ্ঠিরের মতো সত্য সংবাদগুলি এদের প্রশ্নের জবাবে অসঙ্কোচে বিবৃত করে যেতো। এ ছাড়াও কিছু

লোক অদ্ভুত সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পুলিশের কাছে বা গুপ্তচরদের কাছে অযাচিত ভাবে স্বদেশীদের সম্বন্ধে যত সত্যকথা সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রকাশ করতো ফলাফলের কথা আদৌ চিন্তা না করেই।

অর্থাৎ নিয়োজিত, কমিশনপ্রাপ্ত, স্বেচ্ছাব্রত অথবা অসাধারণ সত্যবাদী অজস্র লোক বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামে কিলবিল করতো এবং তার ফলে কোন্ গণ্ডগ্রামের কোন্ অন্ধকার ঘরে কখন নিঃশব্দে একটি সুচ পড়েছিল, তার গ্রাফিক সংবাদ যথাসময়ে গিয়ে পেঁছিতো ঢাকা শহরে গ্র্যাসবি সাহেবের দপ্তরে। বিশ্বাস করবার ঝুঁকি ছিল ভয়ানক, আস্থা-স্থাপনের বিপদ ছিল সীমাহীন। কিন্তু এইসব বাধা-বিপত্তি ও আশঙ্কার মধ্যেই চললো আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাময় গুপ্ত অভিযান। গভর্ণমেণ্ট যেমন চালাকি করে দিনের বেলায় ঘুরে বেড়াবার জন্য দিয়েছিল আমায় প্রায় গোটা বিক্রমপুর, আমিও তেমনি ওদের চালাকির পুর্ণ সুযোগ নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে বেড়াতাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই পাখারা যেমন কুলায়ে ফিরে যায়, আমিও তেমনি ফিরে আসতাম কেয়টখালাতে আমাদের বাড়ীতে আমার দক্ষিণের কোঠায়।

কিন্তু তাই বলে সারারাত কি গুড বয়ের মতো বিশ্রাম নিতাম আমি? লোক-দেখানো সাধুতা ছিল বটে, কিন্তু তারপরই, রাত একটু বেশী হলে গ্রামের কর্মচাঞ্চল্য কমে এলে, পথঘাট নির্জ্জন হলে, শোবার ঘরের আলোগুলো নিবে গেলে হয়তো মান্দারবাড়ী শ্মশানঘাটের ওপারে বট গাছটার নীচে একটি টর্চ্চ জ্বলে উঠলো। ক্ষুদ্র টর্চ্চ, ফোকাস করা প্রদীপের আলোর মতো। টর্চ্চধারীর সংকেত বোঝা গেল, তাই খুলে গেল দাক্ষণের কোঠার দরজা নিঃশব্দে। নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে বেরিয়ে এলাম। কোথায় গেলাম কার কার সঙ্গে কথা বললাম এবং কখন আবার ভোর হবার পুর্ব্বেই ফিরে এসে নিজের জন্য সংরক্ষিত খাটখানায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মতো শুয়ে পড়লাম, টিক্‌টিকিরা আদৌ হদিসই করতে পারতো না তার।

প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে যাই থানায় হাজিরা দিতে। শ্রীনগর থানা আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় চার মাইল দুরে। যেতে হয় ষোলঘর গ্রামের মধ্য দিয়ে, স্কুলের পাশ দিয়ে, তারপর দেলভোগ গ্রামের সাউদের কাছারিবাড়ীর পুব দিকের সড়ক দিয়ে, তারপর থানার পাশেই খালের ওপরকার পোল পার হয়ে। কিন্তু এ যাওয়া-আসাও ব্যর্থ হতে দিই না। ষোলঘরেআমাদের শক্তিশালী একটা ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছে। ষোলঘর বাজারের বিলাস সাহার বিরাট চালের দোকানের বৃহৎ বাঁশের মাচার ওপর বসে-বসে অতুল লক্ষ্য রাখতো পথের পানে। গোয়ালবাড়ীর নীচে দিয়ে বাজার এড়িয়েও যাওয়া যায়, কিন্তু পুর্ব্ব ব্যবস্থামত আমি ওপথে যাই না। চালের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় অতুলের সঙ্গে আমার হয় দৃষ্টি-বিনিময়,

অনুচ্চারিত ভাষায় হয়ে যায় আমাদের আলাপ। তারপর থানা থেকে ফেরবার পথে আমি বাজারের কাছাকাছি এসে ধরি চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ী যাবার রাস্তা। তাঁর বাড়ী ছাড়িয়ে একটু উত্তরে গেলেই একটি বৃহৎ দীঘি। সেই দীঘির পারে অনেকগুলো আম ও চালতে গাছ। অযত্নে তার নীচে জঙ্গল জন্মে গেছে। সেই আম ও চালতে বনে হয়তো ইতিমধ্যেই বসে গেছে জরুরী একটি বৈঠক। আমার যোগদানে তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

একদিন এমনিভাবে থানায় যাবার পথে মাঠের মধ্যে ষোলঘর হাই-স্কুলটাকে দেখেই মনে হলো, এই স্কুলটাকে দখল করতে হবে। ষোলঘরে আমাদের ছেলেদের মধ্যে স্কুলের ছাত্র কেউ ছিল না, সুতরাং নিজেকেই পথ বার করতে হবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সঙ্গে নিলাম বিপদভঞ্জনকে। তারই বয়স একটু কম, স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে চট্ করে হয়তো পারবে মিশতে। তখন বেলা প্রায় বারোটা। পুরো দমে স্কুল সুরু হয়ে গেছে। ক্লাশ এইটের যে-কোনো একজনকে সুযোগ বুঝে ডেকে আনবার নির্দ্দেশ দিলাম বিপদভঞ্জনকে। অপেক্ষা করতে লাগলাম অনতিদূরে একটা কাঁঠাল গাছের ছায়ায়।

একটু পর একটি পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা বাজতেই দেখি, বিপদভঞ্জন একটি ছেলেকে সঙ্গে করে এগিয়ে আসছে। বুদ্ধিতে ও স্বাস্থ্যে দীপ্ত ছেলেটির চেহারা।······বোঝা গেল, বিপদভঞ্জনের পছন্দ আছে।

কাছে এসে সে বিস্মিত নেত্রে আমার পানে চাইতেই বললাম: ভাই, কিছু মনে করো না। তুমি ক্লাস এইটে পড় তো? তোমাদের ক্লাশে সমীর বিশ্বাস নামে কোনো ছাত্র আছে কি?

সমীর?—ছেলেটি মনে করবার চেষ্টা করলো: না, মনে পড়ছে না তো! সমীর—সমীর—ও হ্যাঁ, একজন আছে, কিন্তু সে তো বিশ্বাস নয়, কুণ্ডু।

কুণ্ডু? না:, আমি চাই সমীর বিশ্বাসকে।—আচ্ছা, কী রকম দেখতে বল তো?

ছেলেটি বিবরণ দিল: এই লম্বা-চওড়া চেহারা, খুব ভালো ফুটবল খেলে। পড়াশুনায় কিন্তু একেবারে গোল্লা।

বললাম নিরাশার সুরে: না:, সে ছেলেটি দেখতে ছোটখাটো, অনেকটা তোমার মতো।—তোমার নাম কি ভাই?

বিজনকুমার বসু।

কিন্তু ভারী মুস্কিলে পড়লাম তো ভাই। সমীর আমাদের লাইব্রেরী থেকে একখানা বই পড়তে নিয়ে এসেছে সে আজ প্রায় এক মাস হবে। বলে এসেছিল ক্লাশ এইটে সে পড়ে।

কোথায় আপনাদের লাইব্রেরী?

ঐ তো বাঁড় য্যে পাড়ায়। চেন তুমি বাঁড় য্যে পাড়া? তোমার বাড়ী কোন্ দিকে?

বিজন জবাব দিল : আমার বাড়ী ষোলোঘরে নয়, হরপাড়ায়।

বাঁচলাম।......বললাম : যেও না তুমি একদিন লাইব্রেরীতে, অনেক ভালো ভালো বই আছে, পড়তে পারবে।—এই তো লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান। এর নাম রবীন সরকার।

বিপদভঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলো বিজন : কখন আপনার লাইব্রেরী খোলা থাকে, রবীন বাবু ?

বিকেলে ৪টে থেকে রাত ৭টা পর্য্যন্ত! আমি না থাকলেও তোমার অসুবিধে হবে না!—যাকে ওখানে পাবে, তাকেই বলবে, সেই তোমায় বই দেবে পড়তে।—বলে রবীন নামধারী বিপদভঞ্জন বিজনের কাঁধে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বললো : তোমাদের ক্লাশে মাষ্টার গেছেন। এবার যাও। কাল ছুটির পর এসো পাঁচটার—আমি থাকবো! কেমন, আসবে তো ?

আচ্ছা।

বিজন চলে গেল।

এমনি করে ষোলঘর স্কুলে প্রবেশ করা গেল বিজনের হাত দিয়ে এবং এমনি করেই কৌশলে আমরা গ্রামের পর গ্রামে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। যে-কোনো ছুতোয়, যে-কোনো ওজর দেখিয়ে আমরা যে-কোনো একজনের সঙ্গে আলাপ করতাম ও অন্তরঙ্গতা করে ফেলতাম। তারপর একটি—একটি করে টেনে-টেনে এনে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিতাম।......

একত্রিশ

হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম রেণু এসেছে।

বর্ষাকাল। ওদের পাড়া ও আমাদের বাড়ীর মধ্যেকার পথ বর্ষার জলে একেবারে ডুবে গেছে। নৌকো ব্যতীত তখন এক পা-ও কোথাও যাওয়া যায় না।

খোঁজ নিলাম। চাকর মহাদেব বেরিয়ে গেছে নৌকো নিয়ে কিছু গাব ফল পেড়ে আনতে। ভাবলাম, থাক গে, এত তাড়া কিসের? রেণুই তো আসবে জেল-ফেরৎ আমার সঙ্গে দেখা করে আমায় অভিনন্দন জানাতে। সবে তো এসেছে সে! নিশ্চয়ই একটু পরেই সে গুরুদাসকে সঙ্গে করে এসে হাজির হবে আমার ঘরে।

আবার 'আনন্দবাজার' পত্রিকখানি তুলে নিলাম। কিন্তু পড়বো কি? ইংরেজী ভাষায় প্রাপ্ত সংবাদগুলির এমনি কটমট বাংলা তর্জ্জমা করেছে পত্রিকার বার্ত্তা-বিভাগের কর্ত্তারা যে, একেবারে পড়তেই ইচ্ছে করে না।...... বিরক্তির আর অবধি রইলো না। কাগজখানা ফেলে দিয়ে দক্ষিণের বড় লেবু গাছে লেবু আরও হচ্ছে কি না দেখতে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে জানি নে কখন এসে পড়েছি একেবারে উত্তরদিকের দোতলার পশ্চিমের ঝুল-বারান্দায়। ......ঐ যে, রেণুদের ঘাটে বাঁধা রয়েছে সেই ছই-ওয়ালা নৌকোখানা। ছইয়ের মধ্যে এখনো বিছানাটা পড়ে আছে। একটা ছোট বালিশ ও দুটো ক্ষুদ্রাকার পাশ-বালিশ। রেণুর ছেলের বিছানা। কী নাম ওর? কেউ জানে না আমাদের বাড়ীতে?......থাক্ গে, না জানলো। রেণু তো আসছেই একটু পরে, তখনই জানা যাবে।.... প্রায় দেড় বছর পর এসেছি জেল থেকে। আসবে না রেণু দেখা করতে? তারই আসা উচিত নয় কি?

একটা লোক এসে ছোট বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে গেল। মরণি পিসিমা এক পাঁজা বাসন নিয়ে এসে ঘাটে বসলেন কথার যন্ত্র খুলে। শ্রোতা থাক্ বা নাই থাক, তারা কেউ উৎসাহ বা আগ্রহ বোধ করুক বা নাই করুক, মরণি পিসিমা বকে যাচ্ছেন অনর্গল। শ্রান্তি নেই, এমন কি বিরামেরও প্রয়োজন হয় না।......কিন্তু রেণু তো এটাও ভেবে বসতে পারে যে, আমিই ছুটে যাবো তার কাছে? মেয়েরা বড্ড অভিমানী হয়, বলা যায় না।

কিছুই স্থির করতে পারছিলাম না, কার যাওয়া উচিত, রেণুর, না আমার? আমার, না রেণুর?......এমন সময় ফুল বৌদি নীচে থেকে হাঁক দিল: ভাত দেয়া হয়েছে।

চমক ভাঙলো। নীচে নেমে এলাম। দেখা গেল রেণু যতই দেরী করছে, ততই আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হচ্ছে। আমি যে ফিরে এসেছি, তা কি এখনো জানতে পারেনি সে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কি এমন

কেউ নেই যে, এই সুসংবাদটা রেণুকে জানিয়ে দেয়? সে যে কত খুশী হবে তা তো আমি সারা মর্ম্ম দিয়ে জানি।......

অবশেষে রেণু এল, কিন্তু সেদিন নয়, পরদিন। ময়দা গুলে একটি কলা-পাতার টুকরো দিয়ে তা মুড়ে উনুনে পুড়িয়ে নিয়ে সবে মাছ ধরতে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় রেণুকে নামিয়ে দিয়ে গেল ওদের চাকর। বর্ষাকাল। মাছ আর তেমন ওঠে না। তবু সেদিনটা ছিল একেবারেই ফাঁকা, কোনো এন্‌গেজমেণ্ট ছিল না। তাই সময় কাটবার জন্য নৌকা করে জলে-ডোবা ধান ক্ষেতের পাশে গিয়ে ইচ্ছে ছিল ছিপ ফেলে বসে থাকবো। যদি খায়।

রেণু বলে উঠলো: নিশ্চয়ই রাগ করেছ কাল আসিনি বলে, তাই না? কিন্তু সময় করে আসা যে কী মুস্কিল, তা তো আর জান না তুমি!

বললাম: রাগ তো করিনি আমি। আর আমি রাগ করলে কার কী যায়-আসে?

মুচকি হেসে রেণু বললো: নিশ্চয়ই যায়-আসে।—এসো তো এই ঘরে। ওসব ছিপ-টিপ রাখো। এই মহাদেব, তোর বাবু এখন আর যাবেন না মাছ ধরতে।—বলে হাত থেকে ছিপ কেড়ে নিয়ে আমার হাত ধরে একেবারে দক্ষিণের ঘরে এসে প্রবেশ করলো।

বসলাম খাটে পাশাপাশি। অনেক কথা হলো। হাল্‌কা কথা, মান-অভিমানের কথা। তার কতগুলো পত্রের জবাব দিইনি আমি, পরিষ্কার হিসেব দিল রেণু। আমিও পাণ্টা হিসেবে কতগুলো পত্রে সে মাত্র দু'চার লাইনে দায় উদ্ধার করেছে তার বিবরণ দিলাম। কথা-কাটাকাটি সুরু হয়ে গেল।

রেণু বললো: তা তো বলবেই। শ্বশুরবাড়ীর হাজারো কাজের মধ্যে সময় করে নিয়ে তোমায় লিখলাম, আর তুমি বলছো ওকে পত্রই বলে না। সংক্ষেপে ষোলো পৃষ্ঠা পত্র যিনি লিখতে পারবেন বিনিয়ে বিনিয়ে, তিনি আগে আসুন। তারপর দিন-রাত শুধু প্রেমিকার পত্র নিয়ে—

লম্বা বেণী ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিতেই রেণু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল একেবারে আমার গায়ে। তৎক্ষণাৎ গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে উঠে বসলো বটে, কিন্তু আমার গায়ে তার শরীর রীতিমত ঘা খেয়ে গেল। আজকের মন সেদিন ছিল না বলেই এই আঘাতে আদৌ চাঞ্চল্য বোধ করিনি। কিন্তু আজকের মন নিয়ে সেদিনের সেই দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করলে সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠি। কুড়ি বছরে রেণু বুড়ী হয়নি, হয়েছে যৌবনভারাবনতা। পদ্মপত্রের ওপর জলবিন্দুর মতো টলটল করেছে তার স্বচ্ছ যৌবন। উনিশটি বসন্তের মোহময় স্পর্শে যে দেহ-মন্দার প্রাণরসে হয়ে উঠেছিল ভরপুর, খোকা এসে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাতে পারিজাত হয়ে। তাই রূপ-ঐশ্বর্য্য যেন উপচে পড়ছে। এই উপচে-পড়া রূপকে বক্ষোবাসে বন্দী করে রাখতে গিয়ে একেবারে অপরূপ করে তোলা হয়েছে।......

এর পর অনেক কথা হলো দু'জনে। বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই রেণু যেন পাগল হয়ে উঠলো : সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না দাদা! এমনি ভোলা লোকের পাল্লায় পড়েছি! রোজই একটা-না-একটা নিয়ে কল্-এ যেতে সে ভুলে যাবেই। ষ্টেথেসকোপ্ নেবে তো ভুলে যাবে থারমোমিটার, আবার থারমোমিটার নিলে ভুলে যাবে ষ্টেথেসকোপ। কোনো কোনো সময় দুটোই ভুলে গিয়ে শুধু ওষুধের বাক্সটা নিয়েই রোগীর বাড়ীতে হাজির হলেন ডাঃ চক্রবর্ত্তী। তারপর মনে হলো: ঐ যা: ষ্টেথেসকোপ ?......আর রাত্রে কিছুতেই সে কল্-এ যাবে না। বলে, গ্রামের পথে চলতে ভয় করে।

ঠাট্টা করলাম : তা এমনি রূপসী গৃহিণী ঘরে ফেলে যাওয়া কি সহজ কথা ?

গায়ে মৃদু করাঘাত করে রেণু বলে উঠলো : যাও। সে জন্য নয়। আসল কথা সত্যিই ওর ভয় করে। জান না, রাত্তিরে বাইরে যেতে হলে আমাকে দাঁড়াতে হয় ওর সঙ্গে।

বলে হি-হি করে হেসে উঠলো রেণু। আরও কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফুল বৌদি এলো মুড়ি নিয়ে। সমুখের টেবিলের ওপর বাটিটা রেখে বললো : তোমাদের দু'জনের।

একই বাটি থেকে দু'জনে মুড়ি খেতে ভারী ভালো লাগছিল। ফাঁকে-ফাঁকে মুখরোচক পরিহাস কাজ করছিল নুণ ও ঝালের। বেলা কখন যে একেবারে শেষ হয়ে এসেছে, টেরই পাইনি তা।

অকস্মাৎ এক সময় ওদের চাকর এসে হাজির। সংবাদ : রেণুর খোকা কাঁদছে।

বিশ্রী বাধা পেলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম রেণুকে আটকে রেখে ওর খোকাকে আনতে। কিন্তু সে বললো : না দাদা, তা হয় না। নৌকো করে ওরা আনতেই পারবে না। সে আমার ভারী ভয় করে। আজ যাই, কাল আবার আসবো, কেমন ?

শেষ চেষ্টা করলাম : জানিয়ে রাখছি, আমি দুঃখ পাব তুমি এখনই চলে গেলে। প্রায় দু'বছর পর দেখা। কত কথা আছে, যা এখনো বলিনি তোমায়। এর পরও যদি—

ঘরের বাইরে গলা বাড়িয়ে রেণু দেখলো চাকরটা নৌকোয় চলে গেছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে কাছে এসে একেবারে আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার স্কন্ধে একখানা হাত রেখে বললো : ভারী মুশকিলে ফেললে তুমি দাদা! বল, যাই ?

চুপ করে রইলাম বসে মুখ ফিরিয়ে। একটু অপেক্ষা করে জোর করে আমার মুখ দু'হাতে ঘুরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো রেণু : বল, অনুমতি দাও।

কথা কইলাম না। সুযোগ যখন এসেছে, আজ একটা পরীক্ষাই হয়ে যাক, কে তার কাছে প্রিয়তর, খোকা, না আমি ? মাত্র এক বছর হলো যে

এসেছে তার জীবনে, সেই কি প্রিয়তর হবে সারা জীবনের বন্ধুর চাইতে ?......

কিন্তু মেয়েদের বেলায় বোধহয় তাই। খোকার বাবার কথা বলছি না, খোকার মায়ের কাছে খোকার চাইতে মিষ্টি বোধহয় আর কিছুই নেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে!—তাই দেখলাম, খুব গম্ভীর হয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবার পূর্ব্বে রেণু আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে শুধু তার গালে একবারটি চেপে ধরলো। তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

ঘাট থেকে নৌকো ছেড়ে যেতেই সমস্ত শরীর আমার অবসন্ন হয়ে গেল। অবশিষ্ট মুড়িগুলো মনে হতে লাগলো পাথরের কুচি!......

দেখা গেল, ছেলেদের আকর্ষণ করবার দুটি সহজ পন্থা আছে—খেলাধুলো আর নাটক। দুটোতেই ছিলাম সিদ্ধহস্ত। সুতরাং ঢাকা থেকে কুড়ি টাকা ব্যয় করে চমৎকার একটি ক্যারম বোর্ড আনা হলো আর বর্ষার শেষে শীত পড়তেই থিয়েটার হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

ক্যারম খেলার মাধ্যমে নিত্য নতুন ছাত্র আসতে লাগলো স্কুলের ছুটির পর। আশ্বাস দিলাম শীগ্‌গিরই প্রতিযোগিতা সুরু হবে। দক্ষিণের কোঠায় পুরো দমে যখন খেলা সুরু হয়ে যায়, তখনই হয়তো খগেন একটি ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তারপর নৌকোয় উঠে সুমুখের পুকুরটাতেই ঘুরে বেড়ায় কিছুক্ষণ। খেলার কথার মধ্য দিয়ে এসে পড়ে সিরিয়াস কথায় ...এই আমাদের দেশ। এই দেশের ওপর গত দু'শো বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে শয়তান বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং দেশের সুসন্তান যারা, তারা এই গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধনের ব্রত গ্রহণ করবেই। কংগ্রেস যে পথে চেষ্টা করেছে, সেটা আবেদন-নিবেদনের পথ, কাকুতি মিনতির পথ। কিন্তু সর্ব্ব-দেশের ইতিহাসে এর সমর্থন মেলে না। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। ঢিল মারবার জবাবে চিরকালই এসেছে পাটকেল। তাই কংগ্রেসের শান-বাঁধানো রাস্তায় না এগিয়ে যাঁরা পদক্ষেপ করেছেন বিপ্লবের বন্ধুর পথে, কুশাঙ্কুর ও কালফণির প্রাণান্তকর ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাঁদেরই উদাত্ত আহ্বান এসেছে তোমার দ্বারে .....এমনি করে বোঝানো হয় তাকে। একদিন, দু'দিন, তারপরই তাকে একদিন পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় আমার সঙ্গে।

গ্রামের চৌকিদার তমিজুদ্দী যখন-তখন এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ীতে। আমায় না পেলে মা'র কাছে জিজ্ঞেস করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে-কোথায় গেছি আমি, কার সঙ্গে গেছি, কখন ফিরবো ইত্যাদি। আর আমার সঙ্গে দেখা হলেই অকস্মাৎ বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে আমার স্বাস্থ্যের কথা, জেলের দৈনন্দিন জীবন যাপনের কথা এবং বাজে প্রসঙ্গে খানিকটে সময় কাটিয়ে যায়।

রাত্রে পাহারাতে বেরিয়ে সে দক্ষিণ দিকে এসে হাঁক দিয়ে আমায় একবার জাগাবেই এবং যথারীতি জানিয়ে যাবে : হুঁসিয়ার থাইকেন।

চালাকী বুঝতে দেরী হলো না। দারোগা বা আই-বির নির্দ্দেশ অনুসারেই যে ব্যাটা এমনি প্রকাশ্যভাবে চরগিরি সুরু করেছে, তা বুঝলাম। উপেক্ষা করে করে যখন দেখলাম ব্যাটার তড়পানি একেবারে সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে, তখন বাধা দেয়াই সিদ্ধান্ত করা হলো। চৌকিদার গ্রামেরই অধিবাসী। বহু পুরুষ ধরে ওরা এখানে বাস করছে। আর আমাদের গ্রামের শতকরা আশী জনই মুসলমান।

কিন্তু এই সবের জন্য অপরে যা করে বা করতে পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঝাণ্ডা উচ্চে তুলে ধরে শান্ত মনে তারা যা ভাবে, আমি ভাবি ও করি তার বিপরীত। গ্রামের শয়তানদের সায়েস্তা করতে হলে আমি মনে করি, প্রয়োজন ভীতি সৃষ্টির। আতঙ্ক সৃষ্টি করতে না পারলে এই বিভীষণদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। ঠাণ্ডা লজিক নয়, ক্রুদ্ধ চোখ-রাঙানিই এদের দাওয়াই। মুগুর হাতে না নিলে এই কুকুরদের ঘেউঘেউকানি থামবে না। অতএব—

একদিন বিকেলে ছেলেদের ক্যারম খেলা যখন পুরো দমে চলছে দক্ষিণের কোঠায় আর আমি পুব দিকের পরিত্যক্ত বাড়ীর ছাদনাতলায় ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজখানার পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় যেই ধূমকেতুর মতো চৌকিদার তমিজদ্দী এসে হাজির, অমনি অনাথ এসে সেই সংবাদটি জানিয়ে দিল আমায়।

তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালাম তমিজদ্দীকে।

কোনো ভূমিকা নয়, কোনো ভদ্রতা নয়, ভাষার মোলায়েমত্ব সৃষ্টির জন্য কোনো চেষ্টা নয়, একেবারে সহজ শাণিতভাবে জানিয়ে দিলাম আমার আদেশ : তোমার মতলব বুঝতে আমার দেরী হয়নি। তাই বলে দিচ্ছি, সাবধান, আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় এসো না কখনও। আর এই গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের পেছনেও যদি লাগ, তাহলে কিন্তু তোমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি আর নিতে পারবো না, তমিজদ্দী।

থতমত খেয়ে গেছে ব্যাটা। জিজ্ঞেস করলো : কী কইলেন কর্ত্তা ?

আবার বললাম যা বলেছি। জলের মত করে বুঝিয়ে দিলাম যে, ছুরি-ছোরা বা গোলা-গুলীর ভয় থাকলে এ পথ যেন সে ত্যাগ করে।..... সত্যিই যেন গোটা কয়েক ছুরির ঘা খেল তমিজদ্দী। কিছুই বললো না। বৈঠা হাতে নীরবে গিয়ে তার নৌকোয় উঠলো। বিপদভঞ্জন ঠিক তখনই আর একখানা নৌকো থেকে নামছিল।

জিজ্ঞেস করলো : কি চৌকিদার, গাঙ্গুলী বাড়ীতে কি রোজই নেমন্তন্ন থাকে তোমার ?

কেন ?

এই যে প্রায়ই দেখি তোমায় আসতে। বলি, বক্‌শিশ-ফক্‌শিশ ঠিকমত পাও তো, না সেখানেও শালা আই-বি বাকির কারবার চালায় ?

তমিজদ্দীর মাথায় খুন চেপে গেল। আমার আঘাতই তার রক্ত ঝরিয়ে দিচ্ছে, তার ওপর আবার বিপদভঞ্জনের ছুরি একেবারে হাড়ে গিয়ে ঠেকলো।

সে ফস্ করে অবমাননাকর কী একটা কথা উচ্চারণ করেই দ্রুত নৌকো ভাসিয়ে দিল। বিপদভঞ্জনও সোজা এসে নালিশ করলো আমার কাছে: চৌকিদার বাপ্ তুলে গাল দিয়েছে।

এমনি সাহস? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গেই শত্রুতা? আন্দাজ করতে পারেনি চৌকিদার আমাদের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা! আমাদের বেহিসাবী পদক্ষেপের পরিচয় যখন সে পায়নি, তখন টের পাইয়ে দেয়া যাক্ এর ভয়াবহতা। হুকুম হলো: আজ রাত্রেই—

দিন শেষ হয়ে এলো সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত, তারপর এলো মধ্য-রাত্রি। স্তিমিত জ্যোৎস্নারাত। মৃদু হাওয়ায় ধান গাছগুলি দোল খাচ্ছে। গ্রাম একেবারে নিস্তব্ধ। পশ্চিম দিকের সদর জল-পথে দু'-একখানা বৃহদাকার নৌকো চলছে আর তার মাঝির কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে ভাটিয়ালী গানের এক-আধটা কলি।

ধীরে ধীরে একখানা নৌকো এসে লাগলো তমিজদ্দী চৌকিদারের বাড়ীর পেছন দিকে অর্দ্ধনিমগ্ন কুল গাছটার পাশে। ছায়ার মত নিঃশব্দে ক'জন নেমে এল নৌকো থেকে। জ্যোৎস্নারাতে পাহারা দিতে হয় না, সুতরাং নিশ্চয়ই চৌকিদার আজ আরামে নিদ্রামগ্ন।

অনেকগুলো ন্যাকড়া কেরোসিন তেল ঢেলে ভিজিয়ে তমিজদ্দীর ঘরখানার চারিদিকে বেড়ায় গুঁজে দেয়া হলো। তারপর ফস্ করে একটা মশাল জ্বালিয়ে সেটা চারিদিকে ছুঁইয়ে দেয়া হলো লঙ্কায় পবন-নন্দনের মতো। দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। জ্বলে উঠলো তমিজদ্দীর ঘরখানা। আগুনের শিখা গাছের মাথায় গিয়ে ঠেকলো।

নিঃশব্দে যে নৌকোখানা এসেছিল, দ্রুতবেগে অথচ নিঃশব্দেই তা সোজা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেড়া-আগুনে পড়েও কিন্তু মরলো না তমিজদ্দী, কারণ অন্যান্য ঘরের লোকেরা সময়মত জেগে গিয়ে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এসে বালতি-বালতি জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে ফেললো। কিন্তু এতেই কাজ হলো আশাতিরিক্ত। পরদিনই সকালবেলা এসে হাজির তমিজদ্দী আমার বাড়ীতে।

অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম: এসো, এসো চৌকিদার। ওখানে কল্‌কে আর তামাক আছে, খাও সেজে। হ্যাঁ, তোমায় একটু প্রয়োজনও ছিল আমার। থানায় কাল আর যেতে পারবো না মনে হচ্ছে। শরীরটা ভাল নেই। রসিক কবিরাজ দেখছে, ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু হাজিরা না দিলেও তো চলে না। তাই ভাবছি একখানা চিঠি তোমার হাত দিয়ে থানায় দোব পাঠিয়ে। তুমিও

অবশ্য বলো আমার অসুখের কথা, বুঝলে ?—ও কি, বসো না টুলটায়, উঠছো কেন ?

তমিজদ্দী একেবারে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়লো : আমারে মাপ করেন কর্ত্তা।

মাপ ? কিসের জন্য ?—একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

তমিজদ্দী কেঁদে ফেলার মতো সুরেই বললো : এই কানমলা খাই কর্ত্তা, আর আমি আপনাগোর পিছনে লাগুম না।

প্রশ্ন করলাম : কেন, কী হয়েছে ?

সে কোনও কথা বললো না আর। দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে ধরে এবারে একেবারে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললো তমিজদ্দী। সরকারী প্রতিনিধি হলেও সে কেয়টখালী গ্রামেরই চৌকিদার।

মর্ম্মে মর্ম্মে টের পেয়েছে চৌকিদার যে, সরকারী চাকরির অপেক্ষা নিজের জীবন, ছেলেমেয়ের জীবন অনেক বেশী মূল্যবান! চাকরি গেলে আবার চাকরি মিলতে পারে, কিন্তু জীবন ?......

বত্রিশ

কিন্তু গ্রামে তো শুধু একটি চৌকিদারই নেই। হয়তো এমনিভাবে প্রকাশ্যে সরকারী হুকুম তামিল করবার উৎকট উৎসাহ একা তমিজদ্দীরই ছিল এবং নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল, জীবনে সে আর এমনিভাবে আমাদের পথে বাধার স্থষ্টি করতে সাহস করবে না। কিন্তু এমনি ধূর্ত্ত আরও আছে, যারা গোপনে এক টুকরো সংবাদ সংগ্রহ করে রং-চং দিয়ে, ফুল-লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে, ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করে থাকে ঢাকা শহরের আই-বি পুলিশ-সুপার গ্র্যাসবি সাহেবের শ্রীপাদপদ্মে! তারপর আরো আছে কিছু সংখ্যক আধুনিক যুধিষ্ঠির, যাঁরা জীবনের প্রতি পদে অসংখ্য অসত্যের প্রশ্রয় দিলেও আই-বি বা দারোগার কাছে হয়ে ওঠেন একেবারে সত্যের অবতার, যাঁরা 'অশ্বত্থামা হত: ইতি গজ' উচ্চারণেও নারাজ। ঠগ বাছতে গিয়ে কি শেষটায় গ্রামই উজোড় করে দিতে হবে?

সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রেই কেরোসিন তেল প্রযোজ্য নয়, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বসে শান্ত মনে নীতি নির্ণয় করা গেল। চরগুলোর তালিকা প্রস্তুত করে তাদের ওপর চরবৃত্তি করবার জন্য নিয়োগ করা হলো কিছু ছেলেকে, কিছু ছেলে আমাদের গ্রামের চতুর্দ্দিকের সীমানার ওপর গোপনে রাখতে লাগলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সীমান্তরক্ষীর মতো, সন্দেহজনক আগন্তুক কেউ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেই এদের অদৃশ্য লগ্-বুকে তা নোট করা হতো এবং যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হতো, তৃতীয় একদল যুক্তিবাদী তার্কিক ছেলেকে নিয়োগ করা হলো এইসব আধুনিক যুধিষ্ঠিরদের তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করে যুক্তির খড়্গাঘাতে এদের একে-একে ধরাশায়ী করবার জন্য। এইসব আয়ুধের কোনোটাই যেক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয় বা যেখানেই লক্ষ্যভেদে এরা অসমর্থ, সেখানেই শুধু স্থির হলো প্রয়োগ করা হবে কড়া দাওয়াই।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, তমিজদ্দী আমাদের গ্রামের আদি অধিবাসীদের একজন আর আমাদের গ্রামের শতকরা আশীজনই মুসলমান। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যও তর্খন জমির কারিগর। সুতরাং এই ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক কালো রং লাগিয়ে একেবারে বিকট করে তোলার কাজে কতকগুলো গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আত্মনিয়োগ করলো। আমি কিন্তু এসব থোড়াই গ্রাহ্য করে চলতাম আর যারা আমার আশে-পাশে চলা-ফেরা করতো আমারই ছায়ার মত, তারাও মর্ম্ম দিয়ে জানতো:

> জন্মিলে মরিতে হবে,
> অমর কে কোথা কবে?……

একদিন সকালবেলাই এসে হাজির বছিরদ্দী। ওর ছইওয়ালা একমাল্লাই নৌকো সবাই চেনে। সারা বর্ষাকালই অর্থাৎ আষাঢ় মাস থেকে সুরু করে

একেবারে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ঐ বিশেষ নৌকোখানা যে সময়ে ও অসময়ে অসংখ্যবার গাঙ্গুলী বাড়ীর ঘাটে এসে ভিড়বে, পাড়ার ও গ্রামের সবাই তা দেখে থাকে। কিন্তু কোথায় সে গেল আমায় নিয়ে, কোন্ গ্রামে, কার বাড়ীতে, সেখানে কি-কি কাজ হলো, একথা—ব্যাটাকে ফাঁসীতে লটকে দিলে জিভ বেরিয়ে পড়বে সত্য, অথচ কথা যে বেরুবে না একটিও—এ আমি নিশ্চিতভাবে জানি, যেমন করে জানি আমার নিজেকে।.....

মা ঘাটে গিয়েছিলেন কী কাজে। দক্ষিণের কোঠায় বসে আমি কী একখানা বই পড়ছিলাম, শুনতে পেলাম মার কণ্ঠ: কি, এই সকালেই আবার কোথায় যাওয়া হবে?

বছিরদ্দী অশেষ বিনয় প্রকাশ করে বললো: না না জ্যাঠাইমা, যাওনের লেইগা না। দাদার লগে আইছি একটু জরুরী কথা কইতে।

মা বললেন: যা, দক্ষিণের কোঠায় আছে। কিন্তু তুই জেনে রাখ বাছা, এবার তোকেও ধরে নিয়ে যাবে পুলিশ।

বাছা মুসলমান জবাব দিল: তা জ্যাঠাইমা, দাদাগোর মতন লোকে যদি জেলে-জেলেই জীবনটা কাটাইতে পারে, তা হইলে আমাগোর মতন চাষাভুষার জীবনের কী আর দাম? কী হইবো আর এই জীবনটা গেলে?

মা হেসে বললেন: তোকেও দেখছি পটিয়ে ফেলেছে।

বছিরদ্দী আমার কাছে এসে যা বললো হাত-পা নেড়ে ও ফিস্ ফিস্ করে, তা এই: তমিজদ্দী জমির কারিগরের সহায়তায় সারা গ্রামে প্রচার করে বেরিয়েছে যে, হিন্দুরা মুসলমানদের এই গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। তাই সেদিন চৌকিদারদের ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। আর এই দুষ্কার্য্যের পশ্চাতে যে গাঙ্গুলী বাড়ীর কর্ত্তাই আছে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং—

বছিরদ্দী বললো: সেদিন রহিম স্যাখ আর আকবর খলিফা জুইতা লইয়া ওৎ পাইতা বইসা আছিল ম্যাম্বর সাহেবের বাড়ীর পচ্চিমে। আপনি গেছিলেন না থানায় হাজিরা দিতে? ঐ পথে ফিরলেই ওরা জুইতা দিয়া আপনারে গাইথা ফালাইয়া একেবারে আইড়ল বিলে যাইয়া ভাসাইয়া দিয়া আসবো, এই আছিল ওগো মতলব।

তারপর?

বছিরদ্দী দুই হাত একত্রে কপালে ঠেকিয়ে বললো: খোদায় যারে রাখবো, তারে মারবো কোন্ শালা? আপনি সেদিন নাকি আগে গেছিলেন বীরতারার দিকে, তাই ওরা লাগুড় পায় নাই। পাথইরা বাড়ী হইয়া ঢুকছেন গেরামে।

বললাম: কিন্তু রোজই ত আর বীরতারা যাবো না, লাগুড় যদি একদিন পেয়ে যায়?

হঃ কর্ত্তা, কি যে বলেন!—বলে বছিরদ্দী ফোকলা মুখ অবজ্ঞার হাসিতে উদ্ভাসিত করে তুললো।

তারপর বিজ্ঞের মতো বললো : আমিও কইয়া দিছি ওগো—যাইস্, কর্ত্তার গায়ে হাত তোলতে যাইস্। খালি হাত দেখস্ দেইখা, কর্ত্তার কোমরে থাকে একখান পিস্তল! গোটা দশেক তো আগে ধুপ্পুর ধুপ্পুর পইড়া যাবি, তারপর যদি পাস্ তার লাগুড়!

প্রশ্ন করলাম : পিস্তল!

বছিরদ্দী মহা উৎসাহে জবাব দিল : হ, কমু না? শালারা করবো কি? থানায় যাইবো? কউক যাইয়া বড় দারোগার কাছে। তল্লাসী কইরা পাইলে তো?—আবার তার ফোকলা মুখে হাসি দেখা গেল।

বললাম : তুই ব্যাটা আস্ত গাধা। পিস্তল দেখেছিস কখনো আমার কাছে? তবে না দেখে বললি কেন যে, আমার পিস্তল আছে? ওরা থানায় জানিয়ে দিলে আমায় গ্রেপ্তার করে তো নিয়ে যেতে পারে, কয়েক মাস মুন্সীগঞ্জের হাজতেও তো রেখে দিতে পারে।—ব্যাটা পাতি নেড়ে!

বছিরদ্দী লজ্জা পেয়ে গেছে। বাহাদুরী নেবার জন্য সে যে গাল-গল্প ছেড়েছে, তা যে ফিরে এসে তীর হয়ে আমারই বুকে বিঁধতে পারে, তা আদৌ ভাবতে পারেনি সে।

সত্যিই সে পাতি নেড়ে, সরল বোকা মুসলমান।

সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জর এ যুগের মন নিয়ে বিচার করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় যে, সে যুগে এমনি নাঙ্গা ভাষায় কথা বলেও কী করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন থাকতো অক্ষুণ্ণ। অথচ সে যুগে মন ছিল সংকীর্ণ, চিন্তার সরীসৃপ বেলোয়ারী কাঁচের রঙীন গণ্ডীর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতো। ব্রাহ্মণের বিধবা মুসলমানের ছায়া পর্য্যন্ত ছুঁতেন না। প্রজারা এসে দপ্তরে বসতো নীচু টুলে, পৃথক কল্কেতে নিজের হাতে তামাক সেজে খেত, পুজো-পার্ব্বণে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা নতুন জামা পরে দেউড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে সমারোহ দেখতো।

কিন্তু আশ্চর্য্য, সে যুগেই আবার দেখা গেছে মুসলমান লাঠিয়াল হিন্দু জমিদারের জন্য প্রাণ দিয়েছে, সে যুগেই আকবর সর্দ্দার রমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য লাঠির আঘাত মাথা পেতে নিয়েছে, রহিম ও রামের এমনি সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বই সে যুগের সমাজকে গড়ে তুলেছে, তার বনিয়াদ করে তুলেছে দৃঢ়, তাকে শক্তিমান করে তুলেছে।......

আর আজ আচারে ও বিচারে আমরা যেখানে জাতিভেদের সংকীর্ণতার শেষটুকুও নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়েছি, অগ্রগামী চিন্তাধারায় আলোকিত মন নিয়ে আমরা যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণের আলোচনা করছি, সেখানে কেন এত মনোমালিন্য, কেন এত হানাহানি? শুধু সম্প্রদায় বা বসতি নয়, দেশগত পার্থক্যের গণ্ডীও ভেঙে ফেলে দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে সখ্যের আলিঙ্গনে বাঁধবার উদ্যোগ করতে গিয়ে কেন আজ দেখতে পাই ক্ষুদ্র স্বার্থের বীভৎস রূপ, কেন আজ হিংসায় মন আমাদের হয়ে উঠেছে উন্মত্ত?

আসল কথা, সে যুগে ছিল বাহ্যিক ব্যবধানের মধ্য দিয়ে অন্তরের যোগাযোগ, প্রাণের দেবতাকেই সে যুগে সম্মান দেখানো হতো। আর এ যুগের যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের সীমাহীন সতর্ক ও সপ্রতিভ করে দিয়ে আবেগের শেষ বিন্দুটুকুও শুকিয়ে দিয়েছে। তাই সম্প্রতি আমাদের আলঙ্কারিক শব্দবিন্যাসে মুখর, অন্তঃসলিলা প্রেম-ফল্গুর উৎস সেখানে শুষ্ক। Dialectic materialism-এর পূজারী আমরা, অন্তরের আবেগকে করি তাচ্ছিল্য। ছক-কাটা ধারা-উপধারায় কণ্টকিত চুক্তিপত্রের আক্ষরিক স্বর্ণপিঞ্জরে বন্দী আমাদের মন, পান থেকে চুণ খসে পড়া সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ, অথচ অভিমানের তরঙ্গাঘাতে কোথায় যে বন্ধনের ভিত্তি চাপের পর চাপ ভেঙে পড়ছে বর্ষাকালে পদ্মানদীর মতো, সে সম্পর্কে একেবারে উদাসীন।......কিন্তু, যাক্ গে সে কথা।

বিক্রমপুরে বর্ষাকাল মানে যে কী, তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা সেখানকার অধিবাসী। চতুর্দ্দিক শুধু জলে-জলাকার নয়, মাঝে-মাঝে সে জলের গভীরতা আঠারো থেকে বিশ ফুট পর্য্যন্ত হবে। আমাদের গ্রাম একেবারে আড়িয়ল বিলের প্রান্তে হওয়াতে সেখানে জল এত বেশী হয়ে থাকে যে, পুরো বর্ষার সময় প্রায় প্রতি বৎসরই জল একেবারে যে উঠোন পর্য্যন্ত উঠে আসে, তাই নয়, ঘরের মধ্যেও প্রবেশ করে। তখন একঘর থেকে অপর ঘরে যাবার জন্য বাঁশের সাঁকো তৈরী করা হয়। উঠোনে হয়তো ছোট ছোট মাছের দল মনের খুশীতে ছুটোছুটি করে এবং সূক্ষ্ম জাল দিয়ে কিছু-কিছু ধরাও যায়। কিন্তু সর্ব্বত্র জলে ডুবে যাবার ফলে বিছে, শুঁয়োপোকা, আরশুলা, ইঁদুর, ব্যাং এবং সাপগুলো এসে আশ্রয় খোঁজে একেবারে ঘরের মধ্যে, হয়তো খাটের তলায়, হয়তো কুলুঙ্গির মধ্যে, হয়তো বালিশের পাশে। হ্যাঁ, বালিশের নীচে। এবং প্রায়ই এইসব সাপ বিষধর হয়ে থাকে। যেগুলো বিষহীন, ফণাহীন, তুর-তুর করে জলে ঘুরে বেড়ায় ছোট-ছোট মাছ ধরে গলাধঃকরণ করবার প্রত্যাশায় এবং ডাঙ্গায় হানা দেয় পোকা-মাকড় কিংবা ক্ষুদ্রাকার একটি ভেকের সন্ধানে, সেই সাপগুলো প্রায়ই খুব স্মার্ট, কর্ম্মঠ। তাই এরা কখনো বেশীক্ষণ একই স্থানে থাকে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রের অন্ধকারে সন্তর্পণে এসে হয়তো আপনার তরিতরকারী রাখবার ডালাটির নীচেই একটু নিঃশ্বাস ফেলছে, এমন সময় ভোর হয়ে গেল। আপনার ভোরের তাগিদ থাকলেও সে বেচারার হয়তো সবে তন্দ্রা আসছিল, সুতরাং বিরক্তি বোধ তার হবেই। তাই যেই আপনি ডালাটি তুললেন, অমনি হকচকিয়ে উঠে সে প্রথমটা মাথা তুলে বিক্ষোভ প্রকাশের চেষ্টা করলো। কিন্তু হায়, ফণা নেই আর নেই দাঁতের গোড়ায় বিষের থলে। সুতরাং পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা ব্যতীত পথ কোথায়? তবে হ্যাঁ, কোনো-কোনটি আবার মরিয়া হয়ে উঠে হয়তো অকস্মাৎ আপনার পায়ের আঙুলটিই গপ

করে কামড়ে ধরলো যেমন করে ওরা ব্যাং ধরে বা ইঁদুরের বাচ্চা ধরে ফেলে। অবশ্য এতে বিশেষ কিছুই হয় না, সামান্য একটু ক্ষত ব্যতীত।

বিষধর সাপগুলোর কথা পৃথক। তারা বনিয়াদী পরিবারের বড় কর্তার মতো গদাইলস্করী চালে চলে, সামান্য খুঁটিনাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। সহ্য করবার শক্তি এদের প্রশংসনীয়, ডিসপেপসিয়া রোগীর মতো মেজাজ এদের আদৌ খিটখিটে নয়। ফলে যা হয়, তাই হয়েছে। আপনার খুনসুটি, আপনার সুড়সুড়ি, আপনার দুটো-একটা খোঁচাখুচিও এরা বিনা প্রতিবাদে হজম করবে অনেকক্ষণ। তারপর প্রথমটা দু-একবার নিঃশ্বাসের ঝড় তুলে জানাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। তাতেও যদি ফল না হয়, তা'হলেই তারা হাতে তুলে নেয় হাতিয়ার। কিন্তু কোনোক্রমে একবারটি যদি এরা এদের অধর ছুঁইয়ে দেয় আপনার হাতে বা পায়ে বা শরীরের যে-কোনো স্থানে, ব্যস্, তা'হলেই সুরু হয়ে যাবে তার বৈপ্লবিক প্রতিক্রিয়া, যার মারাত্মক জের কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে, কেউ তা বলতে পারে না!

বর্ষাকালে বিক্রমপুরে সর্পাঘাতে কিছু লোক প্রতি বৎসরই মৃত্যুমুখে পতিত হলেও বিক্রমপুরবাসী গোখরো, শঙ্খিনী, কোবরা, দারাস্, ঘনে প্রভৃতি বিষাক্ত সাপগুলিকে দেখে অন্ততঃ আতঙ্কে যে মূর্চ্ছা যায় না তা সত্যি।

বর্ষার জলে ডুবে-যাওয়া গাছের যে অংশ জলের ওপরে থাকে, বর্ষাকালে সাপ প্রায়ই আশ্রয় নেয় সেইসব গাছের কোটরে বা শাখায়। রাত্রে এমনি কোনো গাছে নৌকো বেঁধে রাখলে কখনো-কখনো সাপ গাছ ছেড়ে এসে নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট আশ্রয় খোঁজে নৌকোর পাটাতনের নীচে।……

সাপের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে কী করে বারকয়েক সাপের হাতে আমি পড়েছিলাম এবং প্রতিবারই রক্ষা পেয়েছিলাম কোনক্রমে। হয়তো ভাগ্যের জোরে। তবে কোনোবারই বর্ষাকালে সাপের কবলে পড়তে হয়নি আমায়।

একবারের কথা বলছি। সেটা চৈত্র মাস হবে, বিক্রমপুরে তখনো বর্ষার জল প্রবেশ করেনি। আমাদের গ্রামের ফুটবল খেলবার ছোট মাঠটি ছিল আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে শ'-তিনেক গজ দূরে।

একদিন বিকেলে ঐ মাঠে খেলাধুলার পর সুশীল আর আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী গেলাম না। আমার সঙ্গে ছিল কর্ণার্জ্জুন নাটকখানা আর তখন গ্রামে কর্ণার্জ্জুন নাটকাভিনয়ের তোড়জোড় চলছে। সবাই একে-একে চলে গেলেও আমি ঘাসের ওপর আধ-শোয়া অবস্থায় সুর করে নাটকখানা পাঠ করা সুরু করলাম, সুশীল সম্মুখে বসে অভিনিবেশ সহকারে তা শুনতে লাগলো।

পাঠ যখন বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় মনে হলো আমার কোমরের কাছে কী যেন অত্যন্ত মৃদুভাবে স্পর্শ করলো। প্রথমটা ভাবলাম সুশীল বোধহয় আমার হাণ্টারটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে, তাই লেগে গেছে অসাবধানতায়। সুতরাং আবার কর্ণের অংশ সুর করে পাঠ সুরু করলাম।

তখন চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। পুব দিকের মাঝি-বাড়ীতে দুটো-একটা আলোও জ্বলে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে তার আভা। একটু পরই মজুমদার বাড়ীতে কর্ণার্জ্জুন নাটকের মহলা সুরু হবে উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কর্ণের ভূমিকায় আমাকেই নামতে হবে। সুশীলের কোনো ভূমিকা নেই। ষ্টেজে দাঁড়াতে তার পা কাঁপে, গলা শুকিয়ে যায়, সমস্ত কথাই ভুলে যায়, স্মারকের একবর্ণও তার কাণে প্রবেশ করে না। তাই সে উৎসাহী কর্ম্মী মাত্র। বিশেষ করে আমার অভিনয়ের সে একজন অন্ধ স্তাবক। বহুবার সে আমায় পরামর্শ দিয়েছে কলকাতায় গিয়ে কোনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করবার।

অকস্মাৎ অনুভব করলাম, সুশীল আমার হাণ্টারটা আমার কোমরের ওপর দিয়ে বুকের ওপর ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু কেন? পাশে তাকিয়ে দেখি হাণ্টারটা তো আমার সুমুখেই ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। তবে? বুকের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখি একটা প্রকাণ্ড সাপ আমার গা বেয়ে উঠছে!!

তৎক্ষণাৎ একটা পালটু খেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। সুশীল ও আমি কয়েক হাত দূরে সরে এসে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখলাম সেই আবছা অন্ধকারে বিষধর সর্পটি বিরাট ফণা উঁচে তুলে দোল খাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ফোঁসফোসানি।

সুশীল বললো: গোখরো সাপ। টেরই পায়নি যে, কোনো মানুষ। তোকে এক টুকরো কাঠ মনে করে ওটা বেয়ে উঠছিল ওপরে।—ইস্, কামড়ালে বাঁধবার জায়গাও থাকতো না রে। একেবারে বুকের পাঁজরায়।

দেখলাম, সাপটা খানিকক্ষণ ফোঁস-ফোঁস করে ক্রোধ প্রকাশ করলো, তারপর ফণা নামিয়ে এঁকে-বেঁকে ঢুকলো গিয়ে পাশের ঝোপে।

এমনি আরো কয়েকবার। প্রতিবারই এমনি কাণের পাশ দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে যে, শেষ পর্য্যন্ত সাপের ভয় আমার আর ছিল না। কেন যেন আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বিধাতা সর্পাঘাতে মৃত্যু আমার জন্ম বোধ হয় ব্যবস্থা করেননি।

তেত্রিশ

মাণিকের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণ হস্ত ভেঙে যাবার পর তা জোড়া দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণ করে। যেখান থেকে যাকে পেতাম, তার মধ্যেই খুঁজে বেড়াতাম আমার হারানো মাণিককে। ইন্দু সরকার মারফৎ নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হলো এবং রীতিমত সেখান থেকে লোক যাতায়াত সুরু করলো আমাদের এখানে। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কোনো-না-কোনো সূত্রে প্রবেশ করতে সমর্থ হলাম, প্রায় প্রত্যেক স্কুলেও। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার পর অন্ধকারে বা গভীর রাত্রে গ্রামের সবাই নিদ্রামগ্ন হলে বছিরদ্দীর একমাল্লাই নৌকোখানা সন্তর্পণে এসে ভিড়তো আমাদের দক্ষিণ দিকের ঘাটে। জানালায় সাংকেতিক টোকা পড়লেই উঠে পড়তাম আমি। প্রস্তুত হয়ে নিয়ে পাশের ঘর থেকে চুপি-চুপি ডেকে তুলতাম ফুলবৌদিকে। ফুলদা কিংবা তিনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিতেন আর আমি এসে উঠতাম নৌকোয়। ফুলদাকেই শুধু জানিয়ে যেতাম গন্তব্য স্থানের কথা। কারণ জরুরী অবস্থায় যাতে অনায়াসে আমার কাছে তিনি যেতে পারেন, তার পথ খোলা রাখা দরকার ছিল।

সারারাত কাজ করে ভোর হবার পূর্ব্বেই আবার বছিরদ্দীর নৌকো এসে আমায় নামিয়ে দিয়ে যেত। টের পেতেন ফুলবৌদি ও ফুলদা। কারণ তাঁরাই দিতেন দরজা খুলে।... যেখানে গেছি, সেখানেই খুঁজেছি মাণিককে। ভাঙা হাত জোড়া দেবার চেষ্টা করেছি।

আশা যখন প্রায় চিরদিনের জন্য ত্যাগ করছিলাম, এমন সময় পেলাম এক নতুন মাণিককে। আজ তার কথা মনে পড়ে। স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, সে সময় মাণিকের অভাবটা পূর্ণ করে দিয়েছিল একা সুবোধ চক্রবর্ত্তী। তন্তর গ্রামের সুবোধ চক্রবর্ত্তী।

তার প্রতি আমার যে আদেশ যখনি দেয়া হয়েছে, তখনই সে বিনা প্রতিবাদে, বিনাবাক্যে তা সমাধান করেছে এবং তা সুষ্ঠুভাবে। তাকে বলেছিলাম প্রতি রবিবারে একটি করে নতুন ছেলে নিয়ে আসতে আমার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বেকার কাজগুলো নিখুঁত ভাবে শেষ করে সত্যিই প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সে একটি-করে ছেলে নিয়ে আসতো। এমনি নিয়ম সে পালন করে চলেছিল অনেক কাল, বোধহয় পুরো দেড় বৎসর। তারপর আরও বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে সুবোধকে আত্মনিয়োগ করতে হয়।

গর্ব্বভরে আজ স্মরণ করি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের মারফৎ সুবোধের দেশসেবার কথা। বেয়াল্লিশের আন্দোলন সুরু হবার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার করে

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সবাইকে যখন নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, সেই সময় একা এই সুবোধ চক্রবর্ত্তীই ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত, পলাতকভাবে বাংলা, বিহার ও আসামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যে সব গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে এবং ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে সেই সব সংগঠন কীভাবে যোগদান করে, ফাঁসীর ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে তারা মিত্রশক্তির পরাক্রমশালী গোয়েন্দা বিভাগের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আরাকানের পথে বর্ম্মায় সংগ্রামরত আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সেই অমর কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নেতাজীর ভারত-ত্যাগের সঙ্গে এই বি-ভি বিশেষভাবে জড়িত, আফগানিস্থানের সীমান্ত পার করে দিয়ে আসবার পরও নেতাজীর সরাসরি গোপন যোগাযোগ ছিল এই বি-ভির সঙ্গে ততদিন, যতদিন না জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করে বসে, তারপর আবার এই যোগসূত্র স্থাপিত হয় নেতাজী সিঙ্গাপুরে আসবার পর।

কীভাবে স্থাপিত হয়, কীভাবে বি-ভির কর্ম্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে, অলিখিত সেই ইতিহাস আমি জানি। আমার পরবর্ত্তী গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করবার সংকল্প আছে।

কিন্তু একা সুবোধ সে যুগে কতখানি করেছিল পলাতকভাবে পুলিশের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে, তার খানিকটে আভাস দেবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারছি না। আমার আত্মস্মৃতির সঙ্গে সুবোধের ইতিবৃত্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমার সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বিষয় এই যে, এই সুবোধ চক্রবর্ত্তীকে আমিই নিয়ে আসি প্রথম বিপ্লবী দলে।

সেটা ১৯৩০ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। বিক্রমপুরে তখনো বর্ষার জল প্রবেশ করেনি। ছোট ভাই রঙ্গলালকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম বেড়াতে ইছাপুরা গ্রামে ফুলবৌদির বাপের বাড়ীতে। গরীব হলেও এই পরিবারটির আদর-যত্নের মধ্যে পাওয়া যেত অন্তরের স্পর্শ, তাই মাঝে মাঝে যেতাম সেখানে। অবশ্য প্রমোদ-ভ্রমণে নয়, সংগঠনের অভিসন্ধি নিয়ে। বিক্রমপুরে ইছাপুরা বৃহৎ গ্রামগুলির অন্যতম। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত ও সচেতন। সচেতন শুধু দেশের সংবাদ রাখবার বেলায় নয় অথবা সরকারী ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনার ক্ষেত্রে নয়, স্বার্থ সম্বন্ধেই এরা অত্যধিক সচেতন বলে ঐ গ্রামের অধিবাসীরাই বলতেন। ফলে সুচ হয়ে এই গ্রামে প্রবেশের সুযোগও পারছিলাম না সৃষ্টি করে নিতে। চেষ্টা চলছিল শুধু।

মনে পড়ে সেদিন দুপুরবেলা রান্নাঘরে রঙ্গু আর আমি পাশাপাশি খেতে বসেছি আর ফুলবৌদি করছেন পরিবেশন। নানারকম কথাবার্ত্তার মধ্যে অকস্মাৎ রঙ্গু বললো যে, নাটকে স্ত্রী-ভূমিকার জন্য আর ভাবতে হবে না। স্ত্রী-ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করতে পারে, এমনি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। নাম মন্টু, তস্তর গ্রামে বাড়ী।

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, ওকে একদিন সংবাদ দিয়ে কেয়টখালিতে নিয়ে আসতে। রন্থু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল : আজ সে এই গ্রামেই এসেছে দাদা! ডেকে আনবো?

প্রশ্ন করলাম : এখানে, কেন?

রন্থু জবাব দিল : আজ যে এখানে নিখিল বঙ্গ পোষ্টাল সম্মেলন, না কি একটা সম্মেলন হবে, তাতে মিশরকুমারী নাটক অভিনয় হবে। মন্থু সেই নাটকে সায়ার ভূমিকায় নামবে।

বললাম ডেকে আনতে।

বিকেলের দিকে অনেক খোঁজাখুজি করে রন্থু ধরে নিয়ে এল মন্থুকে। দেখলাম বছর পনেরো বয়স হতে পারে। গায়ের রং ফরসা বলা যায় না, স্বাস্থ্যও তেমন ভালো নয়; কিন্তু সর্ব্ব অবয়বে যেমন আছে একটা লালিত্য, তেমনি বুদ্ধির ছাপ। ভালোই লাগলো।

আলাপ করলাম। জানা গেল, ইছাপুরা গ্রামে সে আরও অনেকবার নাটকাভিনয় করেছে। প্রতিবারই সুখ্যাতি হয়েছে তার। সিংপাড়া হাই স্কুলে ক্লাশ এইট-এ পড়ে।

প্রথম দিনের আলাপ হলো একান্ত ব্যক্তিগত......বাপ, মা, ভাই, বোনের কথা, আর্থিক অবস্থার কথা, সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা, ম্যাট্রিক পাশ করে সে কী করতে চায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা।

একদিন কেয়টখালী আমাদের বাড়ীতে আসতে বলে দিলাম ছেলেটিকে। সে ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলো : কেন?

বললাম : আমরাও একটা নাটক শীগ্গিরই করবো, তাতে তোমায় একটা পার্ট দোব।

প্রশ্ন করলো সুবোধ : পারবো কিনা না দেখেই পার্ট দেবেন কেন?

এই কেন-র জবাব এড়িয়ে গেলাম কৌশলে। শুধু নাটকের নায়িকা করবার জন্যই যে তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি না, এর পশ্চাতে আছে একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনা, আদৌ প্রকাশ করলাম না তা।

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুবোধ চক্রবর্ত্তী এল আমাদের বাড়ীতে। অল্প দিনের মধ্যেই সে ধরা দিল এবং একেবারে আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে পড়লো মা, বাবা, বৌদি সবার সঙ্গে মিলে-মিশে।

কাজের উৎসাহ দেখেছি তার একেবারে সীমা-পরিসীমাহীন। এমনি অত্যন্ত সরল ও হাসিখুশী হলে কি হবে, কাজের বেলায় তাকে দেখেছি কঠোরতম সিরিয়াস্ কর্ম্মী ও সংগঠক।

১৯৪১ সালে সে ছিল ঢাকা জেলা ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক। মেজর সত্য গুপ্ত প্রমুখ বি-ভির প্রায় সবাইকেই তখন গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা বন্দীরূপে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ঢাকা শহরে ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে পুলিশ হানা দেবার পুর্ব্বক্ষণে সুবোধ গা ঢাকা দিল এবং পুলিশের

ছলিয়া প্রথমটা অত্যন্ত জোরালো থাকে জেনে সে সোজা চলে গেল আসামে। সেখানে বন্ধু জ্যোতিলালের সাহচর্য্যে একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তার মারফৎ জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ গ্রহণ করে সুবোধ যুদ্ধবিরোধী সংগঠন সুরু করে দেয়। সেখান থেকে সে আসে ময়মনসিংহে, সেখান থেকে ঢাকায়, বিক্রমপুরে, ফরিদপুরে এবং অবশেষে বিহারেও গিয়ে সে হাজির হয়।

এদিকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পলাতক এই নেতার জন্য গভর্ণমেণ্ট পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। নেতাজী তখন ভারত ত্যাগ করেছেন। কেন করেছেন, তা দেশের মধ্যে যাঁরা জানতেন, তাঁদের মধ্যে সত্যরঞ্জন বক্সীও একজন। কিন্তু বাইরে কেউ নেই, নিরাপত্তা বন্দীর শৃঙ্খল গভর্ণমেণ্ট সবাইকে পরিয়ে দিয়েছেন। অতএব বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্ব্বময় কাজের ভার স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে সুবোধ চক্রবর্ত্তী ও আরো কজনের ওপর।

দ্বিধাহীনভাবে বলবো এবং জোর গলায় বলবো, সুবোধ সে দায়িত্ব প্রাণপণে পালনের চেষ্টা করেছে। কতখানি কৃতকার্য্য সে হয়েছিল, সে বিচার এখানে নয়; এখানে উল্লেখযোগ্য, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার এগিয়ে আসার সাহস। ওজর দেখিয়ে অনায়াসে সরে পড়তে পারতো সে। কৈফিয়ৎ তলব করবার জন্য বাইরে কেউ ছিল না। কিন্তু সে যে সেই জগতের ছেলে, যারা দায়িত্বের মূল্য দেয় নিজেদের জীবনের চাইতে বেশী।

বাংলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে পলাতকভাবে ঘুরে বেড়াতো সে এবং প্রত্যেক শহরে পেঁাছেই সে সেখানকার পুলিশ-সুপারের নামে একখানা চ্যালেঞ্জ-পোষ্টকার্ড ছেড়ে দিত: হ্যালো মিঃ সুপার, আমি আজ এই শহরে এসেছি। যদি পার, গ্রেপ্তার কর।

এমনিভাবে চ্যালেঞ্জ করে ঘুরতে ঘুরতে সে অকস্মাৎ ধরা পড়ে যায় ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে। বিক্রমপুরে বর্ষার জল প্রবেশ করলেও তা তখনো মাঠ-ঘাট ডুবিয়ে দেয়নি। সাহেবী পোষাক পরে সুবোধ যাচ্ছিল লৌহজং ষ্টেশনে। নৌকোর মধ্যে পোষাক পরেই সে শুয়ে রয়েছে। মাথার কাছে একটি টিনের সুটকেশ। তার ওপর স্তূপীকৃত কাগজ-পত্র ও তার ওপর একটি দেশলাই।

তখন সবে ভোরের আলো পুবের আকাশ দ্যুতিময় করে তুলেছে। গাছে-গাছে সদ্য-জাগা পাখার কিচির-মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে। দু-ধারে উঁচু খালের মধ্যে দিয়ে সুবোধের নৌকো এগিয়ে চলেছে। এসে পড়েছে কিন্তু সে একটি মারাত্মক স্থানে। শ্রীনগর থানার দক্ষিণের খালের বাঁকটা ঘুরতেই একেবারে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে পড়ে গেল দারোগার নৌকো। দারোগা তাকে ভালো করে লক্ষ্যই করেনি, করলেও হয়তো তৎক্ষণাৎ সাহেবটিকে চিনতে পারতো না। কিন্তু সঙ্গে ছিল মতি দফাদার। সুবোধদের ভক্তর গ্রামের দফাদার। শৈশব কাল থেকে তাকে সে চেনে। সে হঠাৎ বলে উঠলো: আরে, মন্টুবাবু না?

দারোগা প্রশ্ন করলো : মনুবাবু কে রে ?

আমাগো গেরামের—বলে সে আরো কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু দারোগা বাধা দিয়ে চীৎকার করে উঠলো : আরে, মনু মানে সুবোধ বাবু, সুবোধ চক্রবর্তী ? ভস্তরের সুবোধ চক্রবর্তী ?—এই মাঝি, সাবধান! আমাদের নৌকোর সঙ্গে লাগা নৌকো, তা নইলে তোকে আজ আস্ত খেয়ে ফেলবো।

তার প্রয়োজন ছিল না। খাল তখনো এতখানি সঙ্কীর্ণ যে, দারোগার নৌকোর সঙ্গে গা ঠোকাঠুকি না করে সুবোধের বেরিয়ে যাবার উপায় ছিল না। গ্রেপ্তার অবধারিত জেনে সে তৎক্ষণাৎ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে কাগজ-পত্র পুড়িয়ে ফেলে দিল এবং সহাস্যে ছইয়ের বাইরে এসে কোটটা গায়ে দিতে দিতে বললো : হ্যাল্লো হারাণ বাবু, এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলেন ?

হারাণ দারোগা খুব হুঁসিয়ার ব্যক্তি। তিনিও রিভলভার-আঁটা বেল্টটা কোমরে জড়াতে জড়াতে হেসেই জবাব দিলেন : আর বলবেন না দুর্ভোগের কথা। হলদিয়ায় ডাকাতি হবার সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলাম। সারাটি রাত থাকলাম ওৎ পেতে বসে ' কোথায়, ডাকাতের নাম-গন্ধ নেই। সারাটি রাত অনর্থক জেগে এলাম একটা ভুয়ো সংবাদের ওপর।—তারপর সুবোধের নৌকোয় অকস্মাৎ লাফিয়ে পড়ে সুবোধের কাঁধে সস্নেহে একখানা হাত রেখে সহাস্যে বললেন : তবু যা হোক, আপনাকে পেয়ে পরিশ্রমটা সার্থক হলো বলা যায়। শালা আই-বি'রা বার-বার এসে ধমকে যায় আমাদের যে, আপনি নাকি বিক্রমপুরেই ঘোরা-ফেরা করেন, অথচ মূর্খ আমরা ধরতে পারিনে।

সুবোধ হেসে বললো : তা আমায় আই-বি যে খুঁজছে, সে কথাটা একবার একটু কষ্ট করে জানিয়ে দিলেই তো আমি নিজে গিয়ে ঢাকায় হাজির হতাম ওদের অফিসে। পালিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন কী বলুন ?

সে আমি জানি।—বলে বিজ্ঞের মত হেসে উঠলেন দারোগাবাবু। বললেন : চলুন, থানায় যাই।

সবাই থানায় এসে উঠলো। বারান্দায় সশস্ত্র একজন প্রহরী বুটের আওয়াজ তুলে দারোগাকে স্যালুট করলো। ঘরে প্রবেশ করে ফাইলপত্র টেবিলের ওপর রেখে দারোগা বললেন : সুবোধ বাবু, Please excuse me, সারাটি রাত এক মিনিট ঘুমোতে পারিনি। আপনি একটু বসুন, আমি চোখ-মুখ ধুয়ে আসছি। এখুনি আসবো, কেমন ?

অত্যন্ত সহজভাবে বললো সুবোধ : কিন্তু আমার সুটকেশ ও আমার দেহ-তল্লাসীর বিদঘুটে কাজটি সেরে গেলেই ভালো হতো না কি ? তা'হলে আমিও এই বিদেশী পোষাক ছেড়ে ধুতি পরতে পারতাম।

তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠলেন দারোগা : আরে রেখে দিন তল্লাসী। কাগজ-পত্র যা ছিল তা তো দেখলাম চোখের সমুখেই পুড়িয়ে ফেললেন। আর কিছু নেই। থাকলে তার সদ্‌গতি না করে পুলিশের হাতে ধরা দেবার পাত্র অন্ততঃ

তত্তর গ্রামের সুবোধ চক্রবর্ত্তী যে নয়, এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে।—আসছি, Please don't mind—

হারাণ দারোগা সহাস্তে গৃহাভিমুখে চলে গেলেন। সুবোধও হাসলো মনে-মনে। তার পকেটে তখন একটি গুলী-ভরা ছ'-ঘরা রিভলভার।......

সেদিন শ্রীনগরের হাটের দিন। সকালেই হাট বেশ জমে যায়। ঘরের মধ্যে বসে পেছনের জানালা দিয়েই দেখা যাচ্ছে কত লোক ফিরছে আনাচ-তরকারি নিয়ে, দুধ, মাছ নিয়ে আর কত লোক যাচ্ছে সওদা করতে। দূরে খালের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, সেখানে নৌকোর পর নৌকো এসে থামছে আর নামছে হয় ব্যবসাদার, নয় খরিদ্দার।

বাইরের বন্দুকধারী সিপাইটা নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় একজন দফাদারের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। আজ বুঝি ওদের হাজিরা-দিবস। তাই দলে-দলে থানা-প্রাঙ্গণে এসে জমায়েৎ হচ্ছে দফাদার আর চৌকিদার। গ্রাম্য সরকারী চাকুরে, জানে না এরা যে, তাদেরই মহামান্য সরকার একেবারে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন এমন একটি ব্যক্তির গ্রেপ্তারের জন্য, গত দু'বছর যাবৎ যে তাদের ফাঁকি দিয়ে সফর করে বেড়াচ্ছিল সারা বাংলা দেশ, বিহার ও আসামে এবং শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মতো এখন যে বসে আছে তাদেরই সম্মুখে।

কিন্তু সুবোধ বালকের মতো বিনা প্রতিবাদে ধরা দেবে সুবোধ চক্রবর্ত্তী? হারাণ দারোগা চা ও জলখাবার খেয়ে এসে টেবিলে বসে একটি কলমের আঁচড়েই তৈরী করবে পুরো পাঁচ হাজার টাকার বিল? সুড়সুড় করে ঢুকবে সে হাজতে? কিন্তু রিভলভার? এতক্ষণ ভদ্রতা করলেও হাজতে ঢোকাবার পুর্ব্বে দেহতল্লাসী করতে গিয়েই তো বেরিয়ে পড়বে তা। সুবোধ বালকের মতো তুলে দেবে এই অমূল্য আগ্নেয়াস্ত্রটি হারাণ দারোগার হাতে? বেনীর মতো আদৌ করবে না দুরন্তপনা?... ..

বন্দুকধারী সিপাইটি দরজার কাছে নিশ্চিন্ত মনে পায়চারী করছে। মাঝে মাঝে চৌকিদার বা দফাদারের সঙ্গে মিঠে দু'একটা কথাও বলছে ও হাসছে। সেই একঘেয়ে 'দরওয়াজার' ভূমিকাতেই অভিনয় করছে বলে কাজে তার সতর্কতা বা সন্ত্রস্ততা আদৌ টের পাওয়া যাচ্ছে না। উৎসাহেরও অভাব মনে হয়।

রিভলভারের একটি গুলীতেই সিপাইটাকে ধরাশায়ী করা যায়! কিন্তু যে শব্দ হবে, তাতে ব্যারাকের সিপাইগুলো সহজেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে এবং চৌকিদাররাও, পথচারীরাও······তাতে কয়েকটা খুন করা যাবে, কিন্তু পলায়নের পথ সুগম হবে না। যতখানি সম্ভব, নীরবে কাজ হাসিল করাই উচিত।......হারাণ দারোগা মুখ ধুতে গেছে প্রায় দশ মিনিট। ফিরে আসবার সময় হয়ে এল। ফিরে আসবার পুর্ব্বেই যা করবার করতে হবে.... ..এলে আর হবে না।......দেয়াল-ঘড়ির দোলকটা টিক্-টিক্ করেছে, থানার কক্ষ

একেবারে নির্জ্জন...হাটের কোলাহল বেড়ে চলেছে...সিপাইটা বন্দুক ভর করে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে মতি দফাদারের সঙ্গে...ব্যারাকের সিপাইরা বোধহয় তাস খেলা সুরু করেছে · শোনা যাচ্ছে—আঠারো ?—আছি।...বিশ ? —আছি।...বাইশ ?—পাস এ্যাণ্ড ডাবল্ . ডিকলেয়ার...।

—অকস্মাৎ সশস্ত্র সিপাইটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড এক মুষ্ঠ্যাঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে বারান্দা থেকে রেলিং টপকে একেবারে প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়লো সুবোধ। প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল চৌকিদার ও দফাদারের দল। কিন্তু আর-এক ঘুষিতে মতি দফাদারের নাক ফেটে গিয়ে যখন রক্তের ধারা নামলো তার ঠোঁট বেয়ে, তখনই তারা বুঝতে পারলো আসল ব্যাপারটা। ডিকলেয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ব্যারাক থেকে লাফিয়ে পড়লো জনকতক সাদা পোষাকধারী সিপাই। ছুটলো হাটের দিকে প্রাণপণে, সঙ্গে যোগদান করলো চৌকিদার ও দফাদারের দল।

সুবোধ ততক্ষণে একেবারে হাটের ভিড়ে এসে মিশে গেছে। তা'হলেও নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দেওয়া যাবে না এখানে। পেছনের দল 'চোর' 'চোর' করে চীৎকার করছে। এখনই এসে পড়বে হাটে। অতগুলো লোক ঠিক ধরে ফেলবে তাকে, সাহেবী পোষাক-পরা পলাতক আসামীকে।

অকস্মাৎ সুবোধও হল্লা সুরু করলো 'চোর' 'চোর' বলে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কণ্ঠ এসে যোগদান করলো : চোর, চোর।

সুবোধ বলে উঠলো : কোথায় যাচ্ছেন মশাই ? ঐ দিকে গেছে ব্যাটা পকেট মেরে। ঐ পশ্চিম দিকে, ঐ বাবুদের বাড়ীর দিকে। ঐ দিকে ধাওয়া করুন, শালা যাবে কদ্দূর ? শালা চোর—

সবাই ছুটলো বাবুদের বাড়ীর দিকে।

শালা চোর কিন্তু ততক্ষণে এসে হাজির পুব দিকে খালের পাড়ে। বহু নৌকো বাঁধা রয়েছে লগিতে। কোনোটাতে কেউ আছে, কোনোটা শূন্য। অত্যন্ত শান্ত মনে দড়ি খুলে নিয়ে সুবোধ উঠে পড়লো একখানা ছোট নৌকোয়। প্রাণপণে বৈঠা চালাতে লাগলো।

বাবুদের বাড়ীর দিকে ধাওয়া করেছিল যারা শালা চোরকে গ্রেপ্তার করতে, কনেষ্টবল, চৌকিদার ও দফাদারের দল এসে পড়তেই সে ভুল ভাঙলো তাদের এবং বুঝতে আদৌ দেরী হলো না যে, সাহেবী পোষাক-পরা যে লোকটি চোরের সন্ধানে যেতে বলেছিল পশ্চিম দিকে, সে-ই শালা চোর, গেছে পুব দিকের খালে।

—প্রাণপণে বেয়ে চলেছে সুবোধ। হাটে এতক্ষণে নিশ্চই জানাজানি হয়ে গেছে, হল্লা সুরু হয়েছে, হুলিয়া বেরিয়ে পড়েছে, হারাণ দারোগা হয়তো রিভলবার ছেড়ে রাইফেল নিয়েই নৌকো ভাসিয়েছেন...জ্যান্ত না পারলেও, অন্ততঃ লাস নিয়ে গ্র্যাসবি সাহেবের শ্রীচরণে নিবেদন করতে পারলেও...কিন্তু ও কি, পেছনে দূরে দেখা যাচ্ছে একখানা বড় নৌকো, ছুটে আসছে তার দিকে,

একটা লাল পাগড়ীও দেখা যাচ্ছে।—ঐ তারা আসছে, কথাও এক-আধটা শোনা যাচ্ছে যেন...

কতক্ষণ আর পারবে সুবোধ। সে একা, আর ওরা অন্ততঃ একাধিক। গলা শুকিয়ে আসছে তার, সর্ব্বশরীরে তীব্র ব্যথা·· জলের মধ্যে বৈঠা আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়ে তোলা ভারী কষ্টকর। কিন্তু সংজ্ঞা হারিয়ে পাটাতনের ওপর বা জলের মধ্যে পড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত সে চালাবেই এই চেষ্টা।

পশ্চাতের নৌকো শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে বোঝা যাচ্ছে। মধ্যেকার ব্যবধান প্রতি সেকেণ্ডে কমে আসছে···ওদের উল্লাসধ্বনি স্পষ্ট কাণে আসছে··· সুবোধ একবার হাত দিয়ে অনুভব করলো—হ্যাঁ, ঠিক আছে। ধরা যদি দিতেই হয়, তা'হলে অন্ততঃ দু'জনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় করে দিয়ে তারপর···

অকস্মাৎ চমকে উঠলো সুবোধ। অদূরে একখানা ছোট নৌকোর মাঝি চীৎকার করে উঠলো : ডর নাই, ডর নাই কর্ত্তা। আসেন, ফাল্ দিয়ে আসেন আমার নৌকায়। বৈঠাটা লইয়া আসেন। কলিমদ্দী বাইচা থাকতে ধরবো আপনারে? অখনো মরি নাই—

বলতে বলতে লোকটা একেবারে সুবোধের নৌকোর গায়ে নৌকো লাগিয়ে দিল। কে এ? কী করা যায়? মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে যদি পুলিশেরই হাতে তুলে দেয়?...কিন্তু ভাববার অবসর নেই, এক-একটি মুহূর্ত্ত—

লাফিয়ে পড়লো সুবোধ কলিমদ্দীর ছোট নৌকায়। কলিমদ্দী উৎসাহ দিল : ভ্যান্, মারেন তো কয়ডা খ্যাও ঠাকুর ঠাকুর কইয়া। শালাগো কলিমদ্দীর কবজির জোর দেই দেখাইয়া, ভ্যান্—

মিথ্যে বলেনি মুসলমান মাঝি। তীর বেগে ছুটে চললো নৌকো ঘোলঘর বাজারের দিকে। পশ্চাতের নৌকা এবার ধীরে ধীরে আরও পেছিয়ে পড়তে লাগলো। আর শোনা যায় না ওদের আনন্দ-কলরব, লাল পাগড়ী আর দেখা যায় না।

ঘোলঘর বাজারে শ্রান্তদেহে অবতরণ করে সুবোধ কলিমদ্দীর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিতেই সে এক গাল হেসে বলে উঠলো : চিনলেন না কর্ত্তা আমারে?

চমকে উঠলো সুবোধ : না তো। মনে তো পড়ছে না—

ভুইলা গেছেন।—কলিমদ্দী হেসে বলতে লাগলো : হ, দুইবার কি তিন বার গেছি আপনারে লইয়া কেয়টখালী গাঙুলী বাড়ীতে। ক্যান্, এই তো সেইবার গেছিলাম দুপইর রাত্তিরে বীরতারার মজুমদার বাড়ীর কারে জানি লইয়া—

ও—মনে পড়েছে সুবোধের। তার মনে না থাকলেও কলিমদ্দী তোলেনি তাকে। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলো না সুবোধ। আরও একখানা নোট তার হাতে দিয়ে বললো : তুমিই ভাই বাঁচিয়েছ আমায়। নইলে একা সাধ্যি ছিল না আমার। ধরা পড়ে যেতাম।

কলিমদ্দী বিজ্ঞের মতো হেসে বললো : হ, হ, বুঝছি, বুঝছি। স্বদেশীগো পলাইয়াই বেড়াইতে হয়। লাগুড় পাইলে পুলিশ ছাড়বো ক্যান্? কিন্তু আমি নৌকা বাই আউজগা তিরিশ বচ্ছর। আমার লগে তোরা শালারা পারবি ক্যান্ রে? যাউক, তবু তো পারছি আপনারে বাঁচাইতে। স্যালাম কত্তা, স্যালাম।

প্রত্যুত্তরে স্যালাম জানানোই ইচ্ছে ছিল সুবোধের। অবজ্ঞাত এমনি কত লোক যে কতভাবে বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সে যুগের বিপ্লব-আন্দোলনকে, কোথাও লেখা নেই তার ইতিহাস। অপরিচয়ের কুজ্ঝাটিকার পুরু আস্তরণে চিরদিনের জন্য এরা সমাধিস্থ, দৃশ্যমান জগতের স্মৃতিপট থেকে অবলুপ্ত।... মনে মনে অসংখ্য প্রণাম জানালো সুবোধ নিরক্ষর এই গ্রাম্য মুসলমানকে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সকে সেদিন কতখানি সাহায্য করেছিল এই দরিদ্র মাঝি, তা প্রকাশের ভাষা আজও সৃষ্টি হয়নি।

চৌত্রিশ

আমি তখন কলকাতায় দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার বার্ত্তা ও সিনেমা-সম্পাদক। দীর্ঘ ছয় বৎসরের অধিককাল রাজবন্দী জীবন যাপনের পর ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করে সহ-রাজবন্দী বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর চেষ্টায় 'কৃষকে' যোগদান করি অন্যতম সহ-সম্পাদকরূপে। তারপর বার্ত্তা সম্পাদক কেশব সেনের আকস্মিক মৃত্যুর পর আমিই বার্ত্তা ও সিনেমা-সম্পাদক নিযুক্ত হই। বৈপ্লবিক রাজনীতি থেকে চিরদিনের মতো অবসর গ্রহণ করে সংসার-নীড় রচনার কাজে করেছি আত্মনিয়োগ, সারা জীবনে আর জীবনের ঝুঁকি নেবার বেহিসাবী পরিকল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিই না, এমনি একটা ছদ্ম-মনোভাব ব্যক্ত করে এবং চলাফেরায় রাজনীতি সম্পর্কে একটা ছদ্ম উদাসীনতা দেখিয়ে পত্রিকার অফিসে আমি এই চাকরি গ্রহণ করি। থাকি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে মল্লোঙ্গা লেনে।

ক্রীক রো-তে 'কৃষকে'র অফিস। পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তা রমেশ বসু বন্ধুস্থানীয় বলে প্রায় প্রতিদিনই রাত বারোটা পর্য্যন্ত আমাকেই অফিস থেকে সব কিছু গুছিয়ে নৈশ-সম্পাদকের হাতে বাকি রাতটুকুর দায়িত্ব তুলে দিয়ে বাসায় ফিরতে হতো।

১৯৪২ সালের গণবিপ্লব সুরু হয়ে গেছে তখন পুর্ণোদ্যমে! ১৪৪ ধারা অমান্য করে কলকাতার পথে-পথে বেরুচ্ছে প্রতিদিনই অগণিত শোভাযাত্রা, পার্কে পার্কে শুধু নয়, মোড়ে মোড়ে চলছে বিরামহীন সভা ও অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা, শোভাযাত্রীদের শ্লোগানে শ্লোগানে একই অনড় দাবীর প্রতিধ্বনি: কুইট্, কুইট্ ইণ্ডিয়া!......ভারতের উর্ব্বর ভুমিতে যে একবার পা রাখতে পেরেছে, লাল কেল্লার শীর্ষে উড়িয়ে দিয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক, গত দু'শো বছর ধরে যারা ভারতের প্রতিটি শিরা ও উপশিরায় মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে খাচ্ছে অগস্ত্য মুনির মতো, কুইট্ ইণ্ডিয়ার হুমকিকে যে তারা ভয় করবে না, লাঠিচালনা, কাঁদুনে-বোমা নিক্ষেপ ও গুলীবর্ষণের মধ্য দিয়ে যে তারা তাদের অনিচ্ছা ও অস্বস্তি প্রকাশ করবে, এ তো জানা কথা।

...কিন্তু তথাপি, ১৯৪২ সালে গণসংগ্রামের যে মহাতরঙ্গ সমগ্র ভারতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল প্রকাণ্ড অজগরের মতো, আঘাত হানবার উন্মত্ত আবেগে যার প্রশ্বাসে জেগে উঠেছিল ১৩২৬ সনের ঝড়, চক্‌চকে চক্ষু দুটিতে যার মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল বিসুভিয়াসের নৃশংসতা, সেই গণজাগরণের তরঙ্গাঘাতে যখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ইস্পাতের বনিয়াদ টলটলায়মান হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইসময় বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সে'র যারা তখনো জেলের বাইরে ছিল, তারা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং

লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবকে ঠিক পথে পরিচালনার বিপজ্জনক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করলো।

ঢাকা থেকে গোপনে কলকাতায় এল চঞ্চল গাঙ্গুলী। ধর্ম্মতলার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান-অধ্যুষিত একখানি নোংরা দোতলা বাড়ীর দোতলায় একটি কক্ষে সে আশ্রয় গ্রহণ করলো। ফেরারী চঞ্চলকে গ্রেপ্তারের জন্য তখন কয়েক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে আর যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপের যুগে হায়েনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দ্দিকে আই-বি ও এস-বি-র দল শিকারের সন্ধানে। কিন্তু বিপদের হিসেব করলে আর বিপজ্জনক কাজ করা চলে না। তাই চঞ্চলকে চাকরি দেয়া হলো আমাদেরই 'কৃষক' অফিসে অন্যতম নৈশ সহ-সম্পাদকরূপে। নামকরণ হলো তার কানু রায়। প্রতিদিনই রাত দশটায় কানু রায় অফিসে আসতেন এবং অফিসে বসে দু'চার লাইন লিখবার পরই একে একে এসে হাজির হতেন বাংলা ও বাংলার বাইরের কর্ম্মীরা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। প্রায় সারারাত বসে চলতো পরিকল্পনা—সৈন্যবাহী কোন্ ট্রেণখানা উল্‌টে দেবে ফিসপ্লেট সরিয়ে, কোন্ সাহেবী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের টাকার ভ্যানখানা আটক করবে, কোন্ ঘুষখোর সামরিক অফিসারের কাছ থেকে ক্রয় করবে গোটাকতক রিভলভার ও ষ্টেন গান, কোন্ প্রেসে ছাপিয়ে লক্ষ লক্ষ হ্যাণ্ডবিল ছেড়ে দেবে ডালহৌসী স্কোয়ারে...

মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অগ্রদূত বলা যায়। এই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে আমাদের পত্রিকার সম্পাদক, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু সিরাজউদ্দীনের মারফৎ। অদ্ভুত মনোবলসম্পন্ন অথচ অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ। এঁরা এমনি ধরণের লোক, যাঁরা সভায় বা কোনো প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের ব্যাক বেঞ্চে এসে চুপি চুপি বসে থাকেন ভালো মানুষটির মতো। হঠাৎ চোখে পড়লে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন অতি সাধারণ বা তার চাইতেও নিম্নস্তরের অনুল্লেখযোগ্য কাউকে মনে করে। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেও বক্তৃতা-মঞ্চে এসে এঁরা নিজের পরিচয় দিতে সীমাহীন সঙ্কোচ বোধ করেন, প্রস্তাব উত্থাপন বা সমর্থনের ঝামেলা এড়িয়ে এঁরা শুধু প্রয়োজনের সময় হস্ত উত্তোলনেই কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এঁরা চলেন রাজপথ এড়িয়ে অলি-গলি দিয়ে, সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরিচিতির গাল-ভরা বুলি উচ্চারণ করে এঁরা নিজেদের ঢাক পেটান না, এঁদেরই কাছে আসে এবং কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসুর দল, যেমন করে অপেক্ষায় থাকে ভক্তের দল মন্দিরের দরজায় ভক্তি ভরা মন নিয়ে।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্র শ্মশ্রু ও কেশ এই বৃদ্ধ মুসলমানকে প্রায়ই আমার মনে হয়েছে প্রাচীন কালের ঋষির মতো। অনেকবার গেছি তাঁর বাসায়, মৌলালীর মোড়ের প্রকাণ্ড বাড়ীখানার দোতলায়, অনেক দিন

অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। নেতাজীর প্রসঙ্গ এসে পড়লেই দেখেছি তাঁর ফরসা মুখখানা উত্তেজনায় একেবারে লাল হয়ে উঠতো। তারপর যা বলতেন, তা সমাধিস্থ ব্যক্তির আপন মনে উচ্চারিত অন্তর্বাণীর মতো। বলতেন: নেতাজীকে ঠাঁই দিতে না পারার লজ্জা আমাদের রাখবার স্থান নেই। কংগ্রেসী কূটনৈতিক চালে এই নেতাকে কোণ-ঠাসা করে রাখবার ষড়যন্ত্র যখন প্রকাশ পেল, কেন দেশবাসী তখন হাতিয়ার হাতে রুখে দাঁড়ালো না, বলতে পারেন?...কিন্তু যৌবনজলতরঙ্গ রুধিবে কে? তাই গেছেন তিনি জার্ম্মাণীতে। এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারত থেকে বৃটিশকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করে দেবার পরিকল্পনা তাঁর দেশ যখন গ্রহণ করলো না, তখন গেলেন তিনি বিদেশে সেই পরিকল্পনা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে।—বিশ্বাস করুন দ্বিজেন বাবু, বিজয়ীর বেশে একদিন ফিরে আসবেন আমাদের নেতাজী, আমি হয়তো সেদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবো না। কিন্তু আজ তাঁকে রুখবার জন্য দেশের মধ্যে যাঁরা গলাবাজি সুরু করেছেন, শত্রুপক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে যাঁরা জনযুদ্ধের বুলি আওড়াচ্ছেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে যাচ্ছি, একদিন এঁরাই এগিয়ে যাবেন সর্ব্বাগ্রে সেই বিজয়ী নেতাজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। সেদিন বেশী দূরে নয়।......

ইসলামাবাদীর এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সফল হয়েছিল বা হয়নি, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

এই ইসলামাবাদীর সঙ্গে কানু রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। কানু রায় অত্যন্ত বুদ্ধিশালী ও কৌশলী। অল্প দিনের মধ্যেই উভয়ের বয়সের বিরাট ব্যবধান ভেঙ্গে দিয়েই ইসলামাবাদীর সঙ্গে চঞ্চলের স্থাপিত হলো এমনি নিবিড় বন্ধুত্ব যে, প্রায়ই চঞ্চল কানু রায়ের নৈশ চাকরি শেষ করে গভীর রাত্রে গিয়ে হাজির হতো ইসলামাবাদীর দোতলার কক্ষে। চলতো সেখানে মারাত্মক সলা-পরামর্শ।

অকস্মাৎ একদিন গ্রেপ্তার হয়ে গেল চঞ্চল। 'কৃষক' অফিসের সঙ্গে তার যোগাযোগ কী করে পুলিশ জেনে গেছে। তাই রমেশ বোসকেও ডেকে নিয়ে গেল তারা ইলিসিয়াম রো-তে। রমেশ বোস আমাদের ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে দিল যে, কানু রায় গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। বস্তুতঃ, চঞ্চলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ব্যাপারটা এতই গুপ্ত ছিল যে, রমেশও তা টের পায়নি। চঞ্চল গ্রেপ্তার হবার পর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সমস্ত কাজের ভার গিয়ে পড়ে মুষ্টিমেয় যে ক'জনের ওপর, সুবোধ চক্রবর্ত্তী তাদের অন্যতম। সুবোধ তখন পলাতক এবং পলাতক অবস্থাতেই সে বাংলা, বিহার ও আসামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে, প্রত্যেক গুপ্ত কেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার কাজ-কর্ম্মের তদারক করছে, সংগঠনের কাজও চালিয়ে যাচ্ছে অক্লান্তভাবে।

কিছুদিন পর নেতাজীর দুর্দ্ধর্ষ আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দামান ও নিকোবর

দ্বীপপুঞ্জ দখল করে বসে, রেঙ্গুণের ওপর ভারতের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে তারা 'দিল্লী চলো' ধ্বনি তুলে এগিয়ে আসে ভারতের দিকে ইম্ফলের পথে। রেঙ্গুণে আজাদ হিন্দ ফৌজের গুপ্তচর শিক্ষালয়ের পরিচালক-প্রধান নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রেনিং-এ যাঁরা এই বিপজ্জনক কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন, তাঁদের জনকতককে ভিন্ন ভিন্ন দলে নেতাজী সাবমেরিন-যোগে গুপ্তভাবে পাঠান ভারতবর্ষে। বেয়াল্লিশের আন্দোলন তখন পুরোমাত্রায় চলছে। গণজাগরণ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত, বিমথিত করে তুলেছে এমনিভাবে যে, সমগ্র ভারতে তখন চলছে কার্য্যতঃ সামরিক শাসন, সমগ্র ভারতই তখন এক প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে। নেতাজীর প্রেরিত গুপ্ত পত্র এসে পৌঁছোয় বক্সা বন্দীনিবাসের রাজবন্দী মেজর সত্য গুপ্তের কাছে। বক্সা থেকে সেই সংবাদ হিজলী ও বাংলার অন্যান্য জেলে প্রেরিত হয়: নেতাজীর নির্দ্দেশ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফলের পথে আসামে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিকামী বন্দী বিপ্লবীরা সদলবলে কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ও সমগ্র বাংলায় গণসংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। বাংলা যদি একবার অধিকার করে নেয়া যায়, তাহলে দিল্লী পৌঁছোবার পথে বৃটিশ সেনা আর কতখানি বাধা পারবে সৃষ্টি করতে?

এই সময় মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সঙ্গে সুবোধের পরিচয় ঘটে। সুবোধের সঙ্গে আলাপে বৃদ্ধ এতটা মুগ্ধ হন যে, শেষ বয়সে তিনি একটা চরম ঝুঁকি নেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। সুবোধকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তাঁর দেশ চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরাকানের পথে নেতাজীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনই ইসলামাবাদী ও সুবোধের লক্ষ্য। কিন্তু সীমান্তে সতর্ক প্রহরা; আরও, আরাকান আজাদ হিন্দ ফৌজের দখলে যাবার পর এখানকার সতর্কতা যেন একেবারে সীমাহীন। কী করা যেতে পারে—বৃদ্ধ খানিকটে চিন্তা করলেন, তারপর স্বাভাবিক ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বললেন: সুবোধ বাবু, আমার জীবনের মাত্র কয়েক দিন বাকী। তাই চরম ঝুঁকি নেবার অসুবিধে আমার আদৌ নেই। আপনি এখন যুবক, প্রশস্ত জীবনের পথ আপনার সম্মুখে, অনেক আশা ও সম্ভাবনা আছে। বরং আপনি পেছিয়ে যান পরদার আড়ালে, আমিই প্রত্যক্ষ-ভাবে এগিয়ে যাই। যদি কিছু হয়—

বাধা দিয়ে সুবোধ বললো: যদি কিছু হয়, তাহলে আমার ওপর দিয়েই হোক তা। যদি কিছু হয়—সে চিন্তা তো কোনো দিন আমরা করিনি, মৌলবী সাহেব! অভ্যস্ত নই। আজও করতে চাইনা। বিশেষ করে নেতাজী—আমাদের নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে মৃত্যুকে গ্রাহ্যই করিনা। নিজের জন্যে চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব আর যে-ই নিক, আমরা কোনোদিন নিয়েছি বলে কেউ আমাদের বদনাম দিতে পারে না। বিনয়, বাদল, দীনেশ, কানাই, প্রদ্যোৎ এঁরা আমাদেরই শিক্ষাগুরু ছিলেন, মৌলবী সাহেব।

ইসলামাবাদী দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন সুবোধকে।

কিছুদিন পর দেখা গেল, ভারত-আরাকান সীমান্তে সৈন্যদের ও গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্য গোটাকতক সস্তা রেস্তোরাঁ স্থাপিত হয়েছে গোটা কয়েক শানকী, কাঁচের গ্লাস ও একখানা লম্বা টেবিল ও একখানা বেঞ্চ নিয়ে, আর সেই রেস্তোরাঁয় বয় হিসেবে নিযুক্ত হয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নীরেন রায় ও অজিত রায়। আরও দেখা গেল, পার্ব্বত্য পথে গামছা ও লুঙ্গি ফেরি করে বিক্রয় করে বেড়াচ্ছে জনকতক দরিদ্র মুসলমান—উপেন সরকার, জগদীশ ভৌমিক প্রভৃতি। ভারতীয় সেনারা এই সব রেস্তোরাঁয় বেশ আড্ডা জমিয়ে ফেললো এবং সস্তা গোমাংস ও চাপাটি খেয়ে তারা মনের আনন্দে সীমান্ত পাহারা দিতে লাগলো। আনন্দের আতিশয্যও যে ঘটলো না কখনও, তা নয়। অসতর্ক মুহূর্ত্তে সেই আনন্দ যে গোমাংস, চা ও চাপাটির সহযোগে একেবারে বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, সে ধারণা পুরোমাত্রায় ছিল ঐ রেস্তোরাঁর বয়দের —সেনাদের নয়। তাই বীভৎস আনন্দের প্রাবল্যে হয়তো একদিন সৈন্যেরা যখন হুল্লোড় সুরু করে কোনো মিঠে ঠুংরীর একটি কলি সবাই মিলে একই সঙ্গে ভাঁজতে সুরু করেছে, ঠিক তখন চৌকার পাশে ঝোপে ছোট্ট একটি শব্দ শোনা গেল। বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ-বয় নীরেন রায়। একটু পরই ফিরে এসে জানালো, ইসলামাবাদীর জামাই সাহেব এসেছেন। অজিত তখন সিপাইদের গরুর মাংস পরিবেশনে ব্যস্ত ছিল। তার হাত থেকে কাজ নিয়ে ব্যস্ততার মাত্রা সীমাহীনভাবে বাড়িয়ে দিয়ে নীরেন চোখের ইসারায় অজিতকে রওনা হতে বললো।

বাইরে ঝোপের আড়ালে জামাই সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। বললেন: এই সুযোগ। এই সময়টাই ওরা খানাপিনায় এত মত্ত থাকে যে, হাতী গলে গেলেও টের পায়না তা। বোধহয় পেতে ইচ্ছেও করেনা।

তারপর দুজনে পাহাড়ের সর্পিল ঘুর-পথে বহু চড়াই ও উৎরাই পেরিয়ে, পাথর থেকে পাথরে উল্লম্ফনে ধেয়ে-চলা পার্ব্বত্য ঝরণা অতিক্রম করে এসে হাজির হলেন একেবারে চট্টগ্রাম সীমানার শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে বিদায় নিলেন জামাই সাহেব। তারপর একাই রওনা হলো অজিত রায় সেই বিপদসঙ্কুল পথে,......তারপর কী করে সে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাইদের সাক্ষাৎ লাভ করে এবং অবশেষে একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে পৌঁছে বাংলার সঙ্গে আরাকানের পার্ব্বত্য পথে গুপ্ত যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে, সে প্রসঙ্গ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

শুধু এইটুকুই আমি বলতে চাই এবং জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, সে যুগে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের যেসব সদস্য নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হয়, সেই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সর্ব্বদায়িত্ব তখন যাদের স্কন্ধে ন্যস্ত ছিল, সুবোধ চক্রবর্ত্তী তাদের একজন।......

কিন্তু ১৯৪৫ সালে এক দুর্যোগের রাতে এই সুবোধ চক্রবর্ত্তী সত্যিই ধরা পড়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন শেষ অধ্যায় রচিত হচ্ছে। ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে পশ্চিম দিক থেকে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে মিত্রবাহিনী, পুব দিক থেকে বার্লিনের দ্বারদেশে আঘাত হানছে কালান্তক যমের মতো রুশ বাহিনী আর স্রোতের মুখে তৃণের মতো ইতালীকে ভাসিয়ে দিয়ে, নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে আসছে মার্কিন বাহিনী। তিন দিকের ক্রমবর্দ্ধমান চাপে রাইখষ্ট্যাগ তখন টলটলায়মান। হিটলারের চোখে নিদ্রা নেই, নেই তিলেকের অবসর। উনচল্লিশে যে সোনার স্বপ্ন রঙীন ফানুসের মতো ইয়োরোপের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, পঁয়তাল্লিশের কালবৈশাখীর ঝাপটায় তা ছিঁড়ে গেছে, চুপসে গেছে, এক টুকরো তুচ্ছ কাগজের মতো ধুলোয় গড়িয়ে পড়েছে। রাইখষ্ট্যাগের মাটির নীচে বসে হিটলার অন্তিম দিনের প্রতীক্ষা করছেন!......

ঠিক এমনি সময়ে জুন মাসের এক রাত্রে সুবোধ সন্তর্পণে এসে আরোহণ করলো ফুলবাড়ী ষ্টেশনে অপেক্ষমান ট্রেণের একটি নির্জ্জন কামরায়। নারায়ণগঞ্জে যাবে সে। সেখান থেকে মুন্সীগঞ্জ। সেখান থেকে বিক্রমপুর সফরে।

ব্ল্যাক আউটের যুগ। দীর্ঘ কামরায় আলোর সংখ্যাই শুধু কমানো হয়নি, যেটি আছে, সেটিও মিটমিটে প্রদীপের মতো এবং তাও যত্ন করে ঢাকা। আলোরেখা যাতে জানালার বাইরে গিয়ে না পড়ে। প্লাটফরমেও তাই। আলো নেই, আলোর আভা। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, দমকা হাওয়া মাতামাতি করে গেছে। এখনও চলছে তার জের টিপিটিপি করে। ষ্টেশন প্রায় জনশূন্য, ট্রেণও তাই! ভালোই হলো—মনে মনে উচ্চারণ করলো সুবোধ।

ভালোই হলো—মনে মনে উচ্চারণ করলো ঐ লোকটি, বিশ্রামাগারে টিকিট-জানালার পাশে বসে যে নিদ্রার ভাণ করে ঝিমোচ্ছিল। ভালোই হয়েছে—মনে মনে প্রতিধ্বনি তুললো রাস্তার ওপারে পানের দোকানের একজন খরিদ্দার। ভালোই হয়েছে—ইসারায় সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঝিরঝিরে বর্ষার মধ্যেই রমনার দিকে সাইকেলে ছুটলো একজন লুঙ্গিপরা মুসলমান। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পলাতক নেতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কী যে ভালো ফাঁদ রচিত হলো, তার খানিকটে আভাস পাওয়া গেল ট্রেণখানা চলতে সুরু করতেই।

হঠাৎ একটা লোক উঠে এল দরজা খুলে, প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত থেকে আর একজন এবং পাশের কামরা থেকে পাদানীর ওপর দিয়ে আর একজন। একজন বসে পড়লো ওদিকের দরজার পাশে, আর একজন

ওপাশের জানালায় আর তৃতীয় ব্যক্তি এসে ঝপ করে বসে পড়লো প্রায় সুবোধের পাশেই।

ভালো লাগলো না সুবোধের।

লোকটা রুমাল দিয়ে ভালো করে মুখমণ্ডল মার্জ্জনা করে বলে উঠলো: উঃ, কি বিশ্রি বৃষ্টি নেমেছে দেখেছেন? আর একটু হলেই ট্রেণটা ফেল করেছিলাম! সব ভিজে গেছে। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে বলতে পারেন?

ভালো লাগলো না সুবোধের। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিল সে: তা এগারোটা হতে পারে।

হয়েছে!—মহা ভাবনায় পড়ে গেল লোকটা: অত রাত্রে আর এই বর্ষার মধ্যে যদি ঘোড়ার গাড়ী না পাওয়া যায়? ভারী মুশকিলে পড়বো তো তাহলে—আচ্ছা, আপনি কি নারায়ণগঞ্জেই যাবেন?

জবাবটা এড়িয়ে গেল সুবোধ: গাড়ী যদি না পান আর যদি হেঁটে না যাওয়া যায়, তাহলে ষ্টেশনেই থাকবেন শুয়ে।

লোকটা জিজ্ঞেস করলো: আপনি কোথায় যাবেন জানতে পারি কি?

ভাল লাগলো না সুবোধের। বিরক্ত হয়ে জবাব দিল: ওখানেই যাবো।

ওখানেই থাকেন বুঝি? র‍্যালী ব্রাদার্সে কাজ করেন?—লোকটার প্রশ্নগুলো অর্থবোধক মনে হলো। কিন্তু সে জবাবের প্রত্যাশায় না থেকে বলে যেতে লাগলো: আর মশায়, ব্ল্যাক আউটের চোটে কি আর কিছু দেখবার উপায় আছে, না চেনা যায়? র‍্যালীতে কাজ করে আমার এক বন্ধু, আমি তো ভেবেছিলাম আপনিই বুঝি সে!—বলে লোকটা হা-হা করে হাসতে লাগলো, তারপর বললো: মাপ করবেন, মশাই। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

ভালো লাগলো না সুবোধের। এ ঔৎসুক্য কেন? গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার আগ্রহ কেন?... . সে চট্ করে জবাব দিল: রবীন্দ্রনাথ দত্ত।

একটুখানি নিস্তব্ধতা। ওপাশের লোকদুটো এদিকের বেঞ্চে এসে বসেছে। উদাসীনভাবে তাকিয়ে রয়েছে জানালার বাইরে অপস্রিয়মান নিবিড় অন্ধকারের পানে ভাল মানুষের মতো।... ট্রেণের গতি বেড়ে গেছে। শব্দ হচ্ছে। হুইসেল শোনা যাচ্ছে। ছ্যাকড়া ট্রেণে ঝাঁকুনি লাগছে বেশ।... কিন্তু কিছু ভালো লাগছে না সুবোধের। নিশ্চয়ই তিন জনের যোগাযোগ আছে!—তাহলে কি শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়লো সে?

হঠাৎ ভালো করে পরখ্ করবার জন্যই সুবোধ বলে উঠলো: আমি এই দোলাইগঞ্জেই নামবো, বুঝলেন?

সে কি, এই বৃষ্টির মধ্যে!—লোকটা ভদ্রতায় একেবারে গলে পড়লো: না, না, তা কি হয়? নরায়ণগঞ্জেই চলুন না। গাড়ী না পেলে আপনার ওখানেই না হয় যাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় লোকটি প্রশ্ন করলো : নারায়ণগঞ্জেই আপনার বাড়ী বুঝি ?—বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এল সে।

চাকরি, না ব্যবসা ?—প্রশ্ন করলো তৃতীয় ব্যক্তি এবং সেও এগিয়ে এল কাছে।

না, না, আদৌ ভালো লাগছে না সুবোধের। বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইলো না আর যে এরা তাকে সহজে ছাড়বে না। সঙ্গে অবশ্য কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই তার। থাকলে একাই মহড়া নেয়া যেত এই তিন জনের। ওদের জামার নীচে কি আছে, সে হিসেব কোনোদিনই করেনি সুবোধ, কোনোদিনই করেনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স !...তবে কি চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়বে ?···বোঝা গেল দোলাইগঞ্জে এরা নামতে দেবে না তাকে। তবু চেষ্টা করতে হবে।

ট্রেণের গতি মন্থর হয়ে এল। দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন। সুবোধ উঠতে যেতেই অকস্মাৎ খচাং করে কামরার দরজা খুলে গেল, হুড়হুড় করে প্রবেশ করলো দশ-বারো জন সশস্ত্র পুলিশ, সঙ্গে খোলা রিভলবার নিয়ে একজন দারোগা। মুহূর্ত্তে সুবোধকে ঘিরে ফেললো তারা। দারোগা বললো : রিভলবার আছে কিনা, দেখে নাও ভালো করে।— তারপর বিনয় প্রকাশ করলো : I am extremely sorry Subodh Babu—

দ্বিতীয় লোকটা বলে উঠলো সমর্থন করে : সত্যিই দুঃখিত সুবোধ বাবু—না. না, রবী বাবু। কিন্তু দোলাইগঞ্জেই তো আপনি নামবেন বলছিলেন না, চলুন, এখানেই নামবেন।......

অর্থাৎ সুবোধ চক্রবর্ত্তী ধরা পড়ে গেল। সে যুগে আই-বি ও পুলিশের টেরর্ সুবোধ চক্রবর্ত্তী। দীর্ঘকাল পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে পালিয়ে বেড়িয়েছে যে !

ঢাকা থেকে সুবোধকে গোয়ালন্দ নিয়ে আসা হলো পরদিনই। কিন্তু মোমেণ্ড বা আফগান ষ্টীমারের ইণ্টারক্লাশ নয় কিংবা জন দুই সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনা আর একজন আই-বি অফিসার নয়। সুবোধের জন্য কাজে লাগানো হলো স্বয়ং ঢাকার পুলিশ সুপারের ব্যক্তিগত মোটর লঞ্চখানি—'ফেয়ারী প্রাণ।' সাহেবের সুসজ্জিত কামরায় স্থান গ্রহণ করলো পলাতক আসামী সুবোধ চক্রবর্ত্তী আর কামরার বাইরে অতন্দ্র পাহারায় সজাগ হয়ে রইলো বারোজন গুরখা সৈন্য ও একজন হাভিলদার। জন দুয়েক আই-বি অফিসারও চললেন চলনদার হয়ে। পুলিশ সুপারের লঞ্চ বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে এসে পদ্মার বুকে ভেসে চললো ময়ুর-পঙ্খীর মতো।......

গোয়ালন্দেও এমনি অভিনব ব্যবস্থা। সুবোধ চক্রবর্ত্তীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে একদল সশস্ত্র গুরখা আর প্লাটফরমে অপেক্ষমান স্পেশ্যাল ট্রেণ।—হ্যাঁ, স্পেশ্যাল। মাত্র একখানা বগী পেছনে বেঁধে হিস হিস করে ষ্টীম ছাড়ছে লৌহ-দানব।

সদলবলে সুবোধ গিয়ে আরোহণ করলো সেই স্পেশাল ট্রেণে। ট্রেণ সোজা এসে হাজির হলো শিয়ালদা ষ্টেশনে। সেখানে থেকে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো তাকে আই-বি অফিসে লর্ড সিংহ রোডে, তারপর প্রেসিডেন্সি জেলে নিরাপত্তা বন্দীরূপে। আর শ্রীমান সুবোধ সেখানে পেঁাছেই সোজা আমার কাছে একখানা চিঠি লিখে বসলো রাজসাহী জেলে।—

'দ্বিজেনদা', মাত্র পরশুদিন আমি এখানে এসেছি। জেল গেট-এ আই-বি অফিসার জিজ্ঞেস করছিলেন একটি মাত্র প্রশ্ন, আপনাকে আমি চিনি কি না। আমি জবাব দিলাম: সুবোধ চক্রবর্ত্তী আর দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে আপনি যদি চিনে থাকেন, তাহলে এ প্রশ্ন আর করতেন না। তাদের পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা অচ্ছেদ্য !......

রাজসাহী জেলে আমি তখন নিরাপত্তা বন্দী। ডুয়ার্সের মেটেলীতে ছিলাম একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। জলপাইগুড়ির আই-বি অকস্মাৎ একদিন সেখানে হানা দিয়ে আমায় নিয়ে আসে। আমি সংসারী, সাধু-সজ্জন, স্বদেশী-ওয়ালাদের সঙ্গে আদৌ নেই যোগাযোগ—ভাগাবেগ দিয়ে এই কথাগুলি এমনিভাবে বলেছিলাম রাজসাহী জেলের অফিসে আই-বি ইনস্‌পেক্টার প্রমোদ দাশগুপ্তকে যে, সহবন্দীরা আশা করছিলেন আমার সুদিন বেশী দূরে নয়। সংবাদ পাঠানো হয়েছে মেজর সত্য গুপ্তকে বক্‌সা বন্দীশিবিরে—যাতে বন্ধুরা কেউ আমার সঙ্গে পত্রালাপ না করে।

মুক্তির আশায় দিন গুনছিলাম গুড বয়ের মতো, এমন সময় সুবোধের চিঠিখানি একেবারে বোমার মতো এসে পড়লো। জলপাইগুড়ির খগেন দাশগুপ্ত ডেকে বললেন: কি মশাই, যান, এবার বাড়ী যান। চার বছরের পলাতক আসামী ধরা পড়ে জেলে এসেই স্মরণ করেছেন আপনাকে। আপনার রিলিজ আর ঠেকায় কে?

কমলেশ এসে বললো: দাদা, এবার?

কালীপদ এসে বললো: আমরাই তো সব দুষ্টু ছেলে, কিন্তু সুবোধদা'?

সরল গুহ বললো: আর রক্ষে নেই দ্বিজেনদা', আরো তিন বচ্ছর!......

পঁয়ত্রিশ

পূর্ব্বেই বলেছি, অভিনয়ে আমার দক্ষতা ছিল সর্ব্বজনস্বীকৃত। স্বগৃহে অন্তরীণে এসে সেই দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। সুরু হলো সীতা ও ষোড়শী নাটকের মহলা। সুবোধকে দেয়া হলো উর্ম্মিলা ও ষোড়শীর ভূমিকা। একদিকে যেমন পাড়ার ও গ্রামের ছেলেদের মধ্যে তীব্র উৎসাহের সঞ্চার হলো, তেমনি আমদানী করা হতে লাগলো নিকটবর্ত্তী গ্রামের ছেলেদের—কাউকে শিল্পীরূপে, কাউকে সংগঠকরূপে আবার কাউকে কর্ম্মকর্ত্তার সাহায্যকারী হিসেবে। উদ্দেশ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠন। আমাদের বাড়ীর পুব দিকে আমাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠিদের বাড়ী ছিল এক কালে। তারপর তাঁরা কুমিল্লার দিকে কোথায় স্থায়িভাবে বসবাস করছেন। টিনের ঘরগুলো প্রায় সবই বিক্রী করে দেবার পর প্রাঙ্গণটি বেশ প্রশস্ত হয়ে উঠলো এবং সেখানে এক প্রান্তে আমাদের রঙ্গমঞ্চ খাড়া করা হলো।

কিন্তু নাটকের রাত্রে আর এক বিভ্রাট। দুর্ম্মুখের ভূমিকায় রসিক কবিরাজ এতকাল মহলা দিয়ে অকস্মাৎ নাটকের দিনে সে অনুপস্থিত। তার ভাই অবশ্য সংবাদ দিয়ে গেল যে, তার দাদা নাকি একটা জরুরী মামলার ব্যাপারে অকস্মাৎ গেছেন মুন্সীগঞ্জে, রাত সাতটার মধ্যে অবশ্য এসে পৌঁছোবেন বলে গেছেন।

আর সাতটা। দশটা বাজতে চললো, অথচ রসিক কবিরাজের দেখা নেই। বর্ষাকাল হলে কী হবে, ওদিকে নৌকোযোগে দর্শক এসে জমায়েৎ হয়েছেন প্রায় হাজারখানেক। মিনিট গুনে বিজ্ঞাপিত সময়ে অভিনয় আরম্ভ করবার রেওয়াজ শহর থেকে গ্রামে গিয়ে তখনো পৌঁছোয়নি, তাই রক্ষে। নইলে ড্রপসিনের আর অস্তিত্ব থাকতো কি না সন্দেহ। ডে-লাইটগুলোও নিশ্চিহ্ন হতো। গ্রামদেশে সে যুগে সন্ধ্যায় সুরু হবে জানলে সবাই নৈশ আহার শেষ করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, অবশেষে হেলতে-দুলতে এসে হাজির হতেন অভিনয় দেখতে। ওতে দোষ নেই, এমন কি, তেমন তীব্র আপত্তিও জানাতেন না দর্শকেরা। কিন্তু রাত দশটা পর্য্যন্ত যাঁরা ঠায় বসে আছেন, পর-পর খানকতক ঐক্যতান বাদন শুনিয়েও তাঁদের নীরবে আরও একটু ধৈর্য্য ধরবার অনুরোধ জানাবার মুখ আর নেই। তাই অবশেষে স্থির করা হলো যে, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কথা দর্শকদের কাছে পুর্ব্বাহ্নেই সরলভাবে নিবেদন করে নোব। বলে নোব যে, আজকের সীতা নাটকের দুর্ম্মুখের ভূমিকায় একজন একেবারে আনকোরা নয়া শিল্পীকে নামাচ্ছি জোর করে। তিনি এই ভূমিকায় জীবনে অভিনয় করেননি, মহলাও দেননি। অতএব, তাঁর অভিনয়—অভিনয় বলে যেন গণ্য করা না হয়।

স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি, ফুলবৌদি আর তাঁর দূর-সম্পর্কীয় একটি বোন সে সময় আমাদের দালানের মধ্যিখানকার কোঠায় খাটে শুয়ে-শুয়ে নাটকের এই নাটকীয় বিভ্রাট নিয়ে আলোচনা ও অন্যান্য এলোমেলো হাসি-ঠাট্টা করছিলাম। আমি মাঝখানে, আমার একপাশে ফুলবৌদি ও অপর পাশে সেই মেয়েটি—নাম রেবা। রেবার সঙ্গে আমার কেন, ফুলবৌদিরও কোনো নিকট-আত্মীয়তা নেই। না থাকলেও সে প্রায় বারই ফুলবৌদির সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতো এবং বাড়ীর মেয়ের মতো প্রায়ই একাদিক্রমে দু'-চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত থেকে যেত। তাই আমাদের পরিবেশে তার সংকোচ দূর হয়ে গেছে। রেবার বয়স ষোলোর কাছাকাছি হবে। খুব ফর্সা রং, চোখা-চোখা গড়ন, আর কথাগুলো ভারী মিষ্টি। ভালো যে লাগতো তাকে, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

রসিক কবিরাজের যখন টিকিটিরও আর দেখা নেই আর দর্শকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার আশঙ্কা যখন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, তখন চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেই ষ্টেজের দিকে যাবো, ফুলবৌদি বাধা দিলেন: দাঁড়াও, না খেয়ে যেতে হবে না। নাটক সুরুই হলো না, শেষ হতে কত রাত হবে কে জানে। মাছের ঝোল দিয়ে খাও দুটি। পরে আর হবে না জানি।

সত্যিই দুটি খাবো।—বললাম ফুলবৌদিকে। আর দুটিই খেতাম আমি নাটকের রাত্রে। পেট ভরে খেলে আমি অভিনয় করতে পারতাম না। কেমন আই-ঢাই করতো আর শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসতো। স্মারকের একটি কথাও কানে আসতো না। উইংসের পাশে বসে রেবা তখন মুচকি-মুচকি হাসতো আর মঞ্চ থেকে প্রস্থান করে তার কাছে এলেই বলতো: খোকাবাবুর ঘুম পেলো নাকি? বিছানা পেতে দোব ষ্টেজে? আমি অবশ্য তাকে মুখ ভেংচে গ্রীণ-রুমের দিকে সরে যেতাম। তবুও শ্রান্তি যেন আর কাটতে চাইতো না। বিছানার কথা সত্যিই মনে পড়তো।

ফুলবৌদি রান্নাঘরের দিকে গেলেন খাবার দিতে। আমিও তাঁর যাবার একটু পরই উঠতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ রেবা দু'হাতে আমায় বেষ্টন করে অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠলো: আমি তোমায় চাই, দ্বিজুদা!

চমকে উঠলাম। আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না এমনি অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য!.....অডিটোরিয়ামে অমার্জ্জনীয় বিলম্বের জন্য মৃদু গুঞ্জন তখন সুরু হয়ে গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে যে, একজন অভিনেতা নাকি তখনো এসে পৌঁছোয়নি। সেই জন্যই রং-চং মেখে পোষাক-পরিচ্ছদ পরে এদিকে-ওদিকে নির্লিপ্তভাবে ঘোরাঘুরি করছেন লক্ষ্মণ, বাল্মীকি, সীতা ও অষ্টাবক্র। স্বয়ং রামরূপী আমি বাড়ীতে ফুলবৌদি ও রেবার সঙ্গে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম রসিক কবিরাজের, লোক পাঠাচ্ছিলাম বার বার তার বাড়ীতে।

এমনি চিন্তাভারাক্রান্ত মন নিয়ে যখন বিপদের বার্ত্তা,—তা সে যতই অপ্রিয় ও বিস্বাদ ঠেকুক না কেন দর্শকের কাছে—সকলের সমক্ষে যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করে দেবার সংকল্প করেছি দুর্ম্মুখের মতো, ঠিক সেই অসময়ে অকস্মাৎ এ কী বিভ্রাট !......রেবা শুধু আমার দিকে ফিরে শোয়নি, সে আমায় একখানা হাত দিয়ে রীতিমত জড়িয়ে ধরেছে। ষোলো বছরের সুডৌল হাতখানি মাধবীলতার মতো পোষাক-আঁটা আমার বুকের ওপর দিয়ে ক্রস্ করে এপাশে এসেছে। আমার কাঁধে রামের কুঞ্চিত কেশদামের মধ্যে সুন্দর মুখখানি তার গুঁজে দিয়েছে, যেমন করে ভীরু পায়রা ঠোঁট গুঁজে দেয় নিজের পালকের মধ্যে। এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ষোলটি বসন্তের ইন্দ্রজাল স্পর্শে বসরাই গোলাপের মতো ফুটে-ওঠা তার শরীর আমার পাশে এসে ঠেকেছে।

ভাবলাম, হয়তো রেবা ঠাট্টা করছে, যেমনি ঠাট্টা ও হরদম করে থাকে আমার সঙ্গে বৌদির বোন হয়ে। তাই এক মুহূর্ত্ত ফিরে চাইলাম তার মুখের দিকে, তার চোখের দিকে। কিন্তু আজো মনে পড়ে এবং স্পষ্ট মনে পড়ে, সেদিন, ঘরের সেই আবছা আলোয় রেবার মুখে দেখেছিলাম শ্রীরাধিকার মত তনুমনপ্রাণ অকুণ্ঠভাবে সমর্পণের নিরুদ্ধ আবেগের অভিব্যক্তি, আমার পানে চেয়ে-থাকা তার পলকহীন চোখে দেখেছিলাম ডেসডিমোনার অতলস্পর্শ প্রেমের সমুদ্র! ভাষাহীন সেই আবেদন সংবেদনশীল মনে সহজেই তরঙ্গ তুলে থাকে। যে গ্রহণ করে সেই ফুলের মালা, বসরাই গোলাপের সেই ফুটন্ত সম্ভার, মনে হয় সেই হয় ধন্য !...

আমি কিন্তু রেবাকে তার আবেগচঞ্চল আবেদনের জবাবে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসলাম : আমাকে চাও মানে ?

সে জবাব দিল : চাই মানে তোমায় বিয়ে করতে চাই।

বিয়ে ? .... একটু চিন্তা করলাম। সিনেমার রূপালী পর্দ্দায় চলমান ছবির মতো অনেকগুলো চিত্র পর পর মনের পর দায় ঝলকে উঠলো। বিয়ে ? বিয়ের কথা ভাববার অবসর কোথায় আমাদের ? সরকারী বুদ্ধি বিভাগ যে বুদ্ধি ব্যয় করে আমায় পাঠিয়েছে স্বগৃহে অন্তরীণ করে, তা যে তাদের কী মহা অপব্যয় হয়েছে, সেটাই তো প্রমাণ করে দিতে হবে আমাকে। সুকঠিন সেই কাজে অহর্নিশি ব্যস্ত থাকার পর আর কি সময় আছে ভাববার কোথায় ফুল ফুটলো, কার মনে জেগে উঠলো বেলোয়ারী তরঙ্গ, কিউপিডের সোনার তীর কার কোমল বুকে এসে অলক্ষ্যে ঘা দিয়ে বসলো !......

তবু চেষ্টা করে নির্দ্দয় হলাম না এবার। কাঠখোট্টার মতো নীরস ভাষায় শ্লেষের প্রত্যাঘাত হেনে বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা না করে সমস্ত বুদ্ধিটুকু নিয়ে এলাম একেবারে হাতের মুঠোয়। বললাম : আমায় বিয়ে করে যে তুমি নিজেই বিপদে পড়বে, রেবা! স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য আমার

থাকতে পারে, কিন্তু রোজগার করিনে আমি একটি পয়সাও। তারপর কী অনিশ্চিত আমাদের জীবন, তাও তো তুমি জানো, তুমি বোঝ। আজ তোমার পাশে শুয়ে গল্প করছি, হৈ-চৈ করে থিয়েটার করছি, কালই হয়তো কোথাকার এক ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিশ দিল আমায় জড়িয়ে, আর হয়ে গেল আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, এমন কি, ফাঁসীও—

রেবা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো আমায়। বললো: ওসব অলক্ষুণে কথা বলো না, দ্বিজুদা।

বাধা অগ্রাহ্য করে বলে যেতে লাগলাম: তার চাইতে আমি শুনেছি কোন্ এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা চলছে। শুধু কুলের দিক থেকে তারা একটু খাটো বলেই নাকি তোমার বাবা মত দিচ্ছেন না। আমি বরং তোমার বাবাকে বুঝিয়ে মত করাবার ভার নিচ্ছি। কি বল রেবা?

রেবা কোনো জবাব দিল না, বোধহয় জবাব দিতে পারলো না। শুধু অনুভব করলাম, সে যেন আরও নিবিড়ভাবে চেপে ধরলো আমায়।

এমন সময় রক্ষা করলেন ফুলবৌদি। অকস্মাৎ এসে হাজির: তোমায় খাবার দিয়েছি, ঠাকুরপো।

চল রেবা, আমার সঙ্গে খাবে চল।—বলে ওকেও তুলে নিলাম সঙ্গে করে। তারপর একসঙ্গে বসে খেলাম। খাওয়া শেষ হবার পুর্ব্বেই সংবাদ এল দুর্ম্মুখ এসে গেছে। রসিক কবিরাজ মুন্সীগঞ্জ থেকে সোজা নৌকো করে চলে এসেছে আমাদের ঘাটে।

আশ্বস্ত হলাম। রেবাকে বললাম: ব্যস, দুর্ম্মুখ এসে গেছে। জানকীরে দিতে হবে নির্ব্বাসন।—চল, দেখাচ্ছি এবার রামের কেরামতি।

রেবা মুখ ভ্যাংচালো।

প্রায়ই আমি বেরিয়ে যেতাম বছিরদ্দীর নৌকো করে। সন্ধ্যার পর হলে তো সোজাই ছিল, দিনের বেলাতেও তেমন কঠিন কিছু ছিল না। কারণ বছিরদ্দী নৌকোর দুদিকে ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে ঢেকে নিয়ে আমায় তার বিবিতে রূপান্তরিত করতো এবং এমনি নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্তভাবে বৈঠা বেয়ে জারী গানের কলি ঐ হেঁড়ে গলায় ভাঁজতে-ভাঁজতে চলতো যে, কারুর সাধ্যি ছিল না যে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করে।

কিন্তু, সর্ব্বত্রই আর বছিরদ্দীকে নিয়ে যাওয়া চলে না, তা সে যতই বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হোক। তাই মাঝে-মাঝে নিজেরাই বেরিয়ে পড়তাম নৌকো ভাসিয়ে। খগেন, বিপদভঞ্জন, অনাথ, সুবোধ এরা সব সাজতো মাঝি, আর আমি কখনো পুলিশের পোষাকে, কখনো দর্জিপাড়ার নতুনদা'র ফিনফিনে পরিচ্ছদে নৌকোয় বসে থাকতাম। সারা রাত নৌকো চলতো। কেয়টখালী থেকে তত্তর হয়ে আবিরপাড়া, রাজদিয়া হয়ে মধ্যপাড়ার মধ্য দিয়ে কোনো-

দিন চলে গেছি হয়তো একেবারে ফুরসাইল অর্থাৎ তালতলায়। তারপর ফিরে আসবার সময় আরও অনেকগুলো গ্রাম ঘুরে ভোরের আলো পুবের আকাশে ফুটে ওঠবার পুর্ব্বেই এসে পৌঁছে যেতাম ঘরের ছেলে ঘরে।

আমার সোনাদা' বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বছর দুই মধ্য-প্রাচ্যে কাটিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন নানারকম সামরিক পোষাক তাঁর বাক্স ভর্ত্তি ছিল। আমি এবার সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মনোযোগী হলাম। ব্রিচেজের ওপর চড়িয়ে দিলাম সামরিক গলাবন্ধ কোট। কাঁধের ওপর গোটা কয়েক ষ্টারও দিলাম এঁটে, মাথায় বারান্দাওয়ালা টুপী আর পায়ে পট্টি ও ব্রাউন বুট। খোলা ছিপ জাতীয় সরু নৌকোয় উঠে বসতেই মাঝি খগেন অনুচ্চকণ্ঠে অপর মাঝি দু'জনকে "হাফিজ" হুকুম দিল। নৌকো আমাদের ঘাট ছেড়ে, গ্রামের সীমারেখা অতিক্রম করে ছুটে চললো তাজপুরের দিকে।

শ্রাবণ মাস। পুরো বর্ষাকাল। চতুর্দ্দিক জলে-জলাকার। ধানগাছগুলি অবশ্য জলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাথা উঁচু করে জলের ওপরেই গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোজাসুজি ধান-ক্ষেতের মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে দিলে ধানগাছের কোনো ক্ষতি হতে পারে মনে করেই আমাদের নৌকো ক্ষেতের আইল ঘুরে একটু ঘুর-পথে এগিয়ে চলেছে। সামরিক কোনো বিশিষ্ট অফিসারের মতো মুখের ভাবখানা করে বসে আছি আমি একেবারে মাঝখানে। নাকের নীচে স্পিরিট গাম্ দিয়ে আঁটা সরু গোঁফটা মাঝে-মাঝে আঙুল দিয়ে অনুভব করে দেখছি ঠিক আছে কি না। দু'একখানা নৌকো আমাদের বিপরীত দিক থেকে এসে আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছে, কিন্তু নির্ভীকভাবে চলেছি আমরা। মাঝে-মাঝে ঘড়ি দেখছি আমি ক্ষুদ্র টর্চ্চের আলোয়—দশটা বাজতে তখনো বিশ মিনিট বাকী।

তাজপুরের পশ্চিম দিকের গ্রামে প্রবেশ করে কিন্তু আমাদের পথ ভুল হয়ে গেল। খাল মনে করে যেপথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম পরম নিশ্চিন্তে, অকস্মাৎ দেখলাম সেটা খাল নয়, আমরা এসে পড়েছি একটি পুকুরের মাঝখানে। এদিক-ওদিক চেষ্টা করে পথ আর ঠাওর করা গেল না এবং মাঝি খগেন একসময় হতাশভরে বলে ফেললো : আজ ধরা পড়তেই হবে।

বললাম : দাঁড়াও, জীবনে ধরা পড়িনি। যদি পড়ি, তাহলে রাজনৈতিক কাজের ইতিহাসে এই হবে আমার প্রথম বিচ্যুতি।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অন্ধকার এতই গাঢ় যে, যে ভুল পথে আমরা প্রবেশ করে বসেছি এই পুকুরে, এখন ফিরে যাবার সেই পথটাও আর খুঁজে পাচ্ছি না। পুরো বর্ষায় গাছপালা সব ডুবে গিয়ে শুধু চতুর্দ্দিকে দেখা যাচ্ছে তাদের মাথাগুলো আর নিবিড় অন্ধকারে সেগুলো যেন তুলে ধরেছে অনতিক্রম্য কালো যবনিকা। এমনি অবস্থায় বার বার জলমগ্ন গাছের ডালে আমাদের ডিঙ্গি ঘা খেতে লাগলো। বড় পাঁচ

ব্যাটারীর টর্চ্চ একটা আছে বটে, কিন্তু এখন জ্বালানো কি নিরাপদ ? এমন কি, ক্ষুদ্র টর্চ্চটাও জ্বালিয়ে আর ঘড়ি দেখতে পারছি না। ওদিকে তাজপুরে মণীন্দ্র হয়তো সব রেডি করে বসে আছে। একটি মিনিট দেরী আমি জীবনে করিনে। কী ভাববে সে।

এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, একখানা বাড়ী থেকে জন দুই মহিলা অনেক-গুলো বাসন নিয়ে এসে জলের ধারে বসলেন। তাঁদের সঙ্গে স্তিমিত কেরোসিনের ডিবা। এই গাঢ় অন্ধকার ওতে যেন গাঢ়তর হয়ে উঠলো এবং আমাদের পথ যেন হয়ে উঠলো আরও ভয়াবহ! দেখলাম, খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জন নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে বৈঠা চালাচ্ছে বটে, কিন্তু উৎসাহ যেন শেষ হয়ে এসেছে তাদের। বোধহয় নিশ্চিতভাবে জেনে বসে আছে যে, আজ আর উপায় নেই।

আমি কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নই। বললাম: মাঝি, চল তো ঐ ঘাটের দিকে, মহিলারা যেখানে বাসন ধুচ্ছেন।

স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কইতে বোধহয় ওরা চমকে উঠলো এবং আমার প্রস্তাব শুনে বোধ হয় প্রমাদ গুনলো।······নৌকো মহিলাদের প্রায় কাছাকাছি আসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম: দেখুন, কিছু মনে করবেন না। বলতে পারেন আপনাদের গাঁয়ের চৌকিদার-বাড়ী কোন্ দিকে ?

এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য আমার সহকর্ম্মী মাঝিরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো কি না জানিনে। মহিলাদের মধ্যে একজন বললেন যে, ঐ বাড়াটিই চৌকিদারের।

এগিয়ে গেলাম আরো ঘাটের দিকে। আমার পোষাকের পিতলের বোতামগুলো ও চোখের চশমা কেরোসিনের ডিবার আলোয় চক্‌চক্ করে উঠলো।

প্রশ্ন করলাম: কোথায় সে ?

সভয়ে জবাব এল: সে তো বাবু খাওয়া-লওয়া করছে। অখনই বাইর হইবো পাহারায়।

ডাকুন তাকে।—আদেশ জারী করে ঘাট থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। মাঝি খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জনকে অন্ধকারে ঠিক দেখতে না পেলেও ওদের বিস্ময়ের সীমা যে অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তা মনে-মনে অনুভব করতে পারছিলাম।

একজন মহিলা কাজ অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই ছুটে গেলেন বাড়ীতে এবং দেখা গেল, একটু পরই এক হাতে লম্বা বল্লম ও অপর হাতে একটি হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ত্রস্তপদে এগিয়ে আসছেন চৌকিদার-পুঙ্গব। এসে পাড় থেকেই বার-কয়েক স্যালাম জানিয়ে ছুটে এসে উঠলো তার ডিঙ্গি নৌকোয় এবং নৌকো বেয়ে চলে এল আমাদের নৌকোর গায়ে।

বুঝলাম, সে ভেবেছে তার সেরাজদীঘা থানার দারোগা আমি। তাতে

অবশ্য আপত্তি ছিল না আমার, কিন্তু নিজের থানার দারোগাকে সে চেনে নিশ্চয়ই। সুতরাং—

প্রথমেই পরিচয় দিলাম : আমি আসছি ঢাকার পুলিশ সাহেবের দপ্তর থেকে। কী নাম যেন তোর ?

আইগা, বরকত আলী।

হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তোর নামেই নালিশ আছে অনেকগুলি। তুই পাহারা দিস্ তো রোজ ?

আইগা, হ।

তবে নালিশ যায় কেন ? গ্রামের সবাই তোমার দুষমন বলতে চাও নাকি ? কেন তারা বলে যে তুমি প্রায়ই নাকে তেল দিয়ে দিব্যি ঘুমোও। তোর বউ কয়টা ?

গভীর লজ্জায় একে-বেঁকে বরকত আলী জবাব দিল : আইগা তিনটা।

ছোটটার বয়স কত ?

আইগা, বছর বারো তো হইবোই।

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম : বছর বারো তো হইবোই।—শালা, বদমাস্ কোথাকার ! বারো বছরের খুকিকে সাদী করেছ তুমি বেয়াল্লিশ বছরের বুড়ো ? আর সেটাকে নিয়ে সারারাত পড়ে থাকলে পাহারা দেবে তোমার কোন্ চাচা আর ফুফারা, তাই শুনি। এই গ্রামে যে কেউ তোমায় দেখতে পারে না কেন, তা বুঝলাম। কিন্তু চাকরি তো থাকবে না তোর। কিছুতেই থাকতে পারে না।

বরকত আলী পারে তো আমারই নৌকোয় উঠে এসে একেবারে আমার পায়ের ওপরে লুটিয়ে পড়ে, এমনি ভাবখানা দেখিয়ে কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললো : হুজুর, তাইলে খামু কি ? আটটা পোলা মাইয়া যে না-খাইয়া মরতে লাগবো, হুজুর !

ধমক দিলাম : হুজুরের পয়সা খুব সস্তা কিনা, তাই শালা তুমি বৌ নিয়ে থাকবে সারাটা রাত আর গ্রামে প্রত্যেক রাত্রেই দু'-চারটে চুরি হতে থাক্। বল্ শালা, কাজে আর কামাই করবি কি না।

বরকত আলী নাক-কান মলা খেয়ে আল্লার নামে ও অন্যান্য পীর-পয়গম্বরের নামে জিভ কেটে শপথ করলো হাজারো বার যে, আর একটি রাত্রিও সে কামাই দেবে না, এবারটা তাকে রেহাই দেওয়া হোক্।

বললাম : এবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু শালা, বলে রাখছি তোকে, যদি আর-একখানা দরখাস্ত যায় আমাদের ওখানে, তাহলে মহিম চক্কোত্তির হাতে তোর মরণ আছে রে শালা। বুঝলি, হারামজাদা ?

হারামজাদা ও শালা মর্ম্মে-মর্ম্মে যে অনুভব করেছে, তা বোঝা গেল। অকস্মাৎ নরম সুরে আবেদনের ভাষায় বরকত আলী বললো : আইবেন না হুজুর বাড়ীতে, পান তামুক—

বললাম : না, সময় নেই। আবার তাজপুরের চৌকিদার ব্যাটার ওখানে

যেতে হবে।—এই ব্যাটা, চল্ তো, তাজপুরের পথটা আমায় দেখিয়ে দিবি।

মহানন্দে বরকত আলী তার ডিঙি ভাসিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের অনুসরণ করতে বলে। গ্রামের বাইরে এসে তাজপুরের রাস্তা আমার মাঝিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার প্রাক্কালে সে আবার বারকয়েক সবিনয় স্যালাম জানিয়ে ও ভবিষ্যতে আর ত্রুটি না-হবার প্রতিশ্রুতি ও গ্যারান্টি উচ্চারণ করে যখন তার গ্রামের দিকে নৌকো ভাসিয়ে দিল, আমার মনের হাসি তখন মুখেও ফুটে উঠেছে।

বরকত আলীর নৌকো দূরে সরে যেতেই খগেন প্রশ্ন করলো: তাহলে মহিম দারোগা সাহেব, কোন্ চৌকিদারের বাড়ী যামু এ্যালা?

তাজপুর সরকার-বাড়ীর পুব দিকে একটি বিরাট দীঘি, সেই দীঘির উত্তর দিকে অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে একটি কাঁঠাল গাছ, সেই গাছের নীচের অন্ধকারে মণীন্দ্র আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। দূরে থাকতেই একবার টর্চটা জ্বালিয়ে বার-তিনেক আন্দোলিত করতেই ওখান থেকে তেমনি ক্ষুদ্র টর্চের আন্দোলন দেখা গেল।

কাছে যেতেই সে এগিয়ে এল। প্রশ্ন করলাম: সব রেডি?

সব রেডি।

কোথায় বসছি আমরা?

ঐ মন্দিরের মধ্যে।

মন্দিরের মধ্যে! ঠাকুর-বিগ্রহ কিছু নেই ওর মধ্যে?

না।

নৌকো থেকে নিঃশব্দে নেমে মণীন্দ্রকে অনুসরণ করলাম। মাঝিরা সবাই নিঃশব্দে নৌকোতেই অপেক্ষা করতে লাগলো। পুকুরের পুব দিকে মন্দির। মন্দিরের কাছাকাছি এসে মণীন্দ্র বললো: আপনি গিয়ে বসুন। ভেতরে মাদুর পাতা আছে। আমি লীলাকে নিয়ে আসছি।

একটু পরই দরজা নিঃশব্দে খুলে লীলা প্রবেশ করলো। মণীন্দ্র গলা বাড়িয়ে বলে গেল: আমাদের দাদা আর আমার বোন লীলা।—বাইরেই অপেক্ষা করছি আমি। তিনবার টোকা দিলেই দরজা খুলবো।—নিশ্চিন্তে কথা বলুন আপনারা, পাড়ার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই মন্দিরের মধ্যে রইলুম শুধু লীলা আর আমি আর জমাট অন্ধকার! অনুভব করে লীলাকে কাছে টেনে নিলাম।

তারপর সুরু হলো আমাদের আলাপ। ছক-কাটা পথেই এগিয়ে যেতে লাগলাম, সামান্য ও লঘু আলোচনার মধ্য দিয়েই এসে পড়লাম গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গে: স্বাধীনতার সংগ্রামে সীতারামের মতো ছেলেরা যেমন যোগদান করবে, তেমনি শ্রীর মতো তাদের সাহায্য করবে দেশের মেয়েরা। সীতারামের কামানের গোলা মাথায় করে এনে দিয়েছিল শ্রী। ঠিক তেমনি তোমাদেরও

অনেক কাজ করবার আছে, লীলা। জননী হয়ে সন্তান পালন করবে, সুসন্তান তৈরী করবে, এমনি প্রসপেক্টের জৌলুসে আমাদের আস্থা কম, কারণ আমরা গ্রহণ করেছি ভাঙনের ব্রত। গতি চাই, চাই বেহিসাবী পরিকল্পনা ও তা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তাই জননী হয়ে সুসন্তান তৈরী করবার জন্য অপেক্ষা না করে আমরা চাই বোন হয়ে এগিয়ে এস তুমি—ভাইয়ের পাশে পাশে, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে, জীবনের সর্ব্বসম্ভাবনা ও রঙীন ভবিষ্যৎ পশ্চাতে ফেলে রেখে। পারবে না, লীলা ?

লীলা আমার হাতে হাত রেখে বললো : ছোড়দা'র কাছে সবই শুনেছি দাদা ! সব কিছুই বিলিয়ে দেবার সংকল্প নিয়েই তো এসেছি তোমার কাছে।

প্রায় এক ঘণ্টা কথা হলো। এমনি অন্ধকারে লীলার সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গ আলোচনা হলো, অথচ সে দেখতে পেলো না আমার মুখ। দিনের বেলা কোথাও দেখলে চিনতে পারবে না আমায়। বিপ্লবী দলের রিক্রুটমেণ্ট এমনি কঠিন সতর্কতার সঙ্গেই হতো।

সেই অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে প্রণাম করে একসময় বিদায় নিল লীলা আমায় আবার আসবার অনুরোধ জানিয়ে।

ফিরে এসে নৌকোয় যখন উঠলাম, তখন রাত প্রায় একটা। আকাশ মেঘে একেবারে সমাচ্ছন্ন। একেই নিবিড় অন্ধকার, তার ওপর সেই অন্ধকারে জমাট মেঘগুলো যেন বিরাটকায় দৈত্যের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাতাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। থমথমে ভাব, আক্রমণের পুর্ব্বক্ষণের মতো। বৃষ্টি হবেই।

কিন্তু তাই বলে একটি মিনিটও বিলম্ব করা চলে না। আকাশের অবস্থা দেখে তারপর যাত্রা করবার মতো সহজ কাজে তো আমরা বেরোইনি। কিংবা যাত্রা স্থগিতের কথাও ওঠে না। যে কাজে বেরিয়েছি, কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা তাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারলেও সে বাধাকে আমরা গ্রাহ্য করিনা। শুধু তাই নয়। সর্ব্বত্র ঠিক সময়মত পৌঁছে ঠিক কাজটি শেষ করে এগিয়ে চলবো আমরা আমাদের লক্ষ্য-পথে। বাধা এলে ধরবো তাকে চেপে দু'হাতে, করবো তার সঙ্গে লড়াই। তারপর হয় বিজয়মাল্য পড়বে আমাদের গলায়, নয় মৃত্যুর তুহিনশীতল বক্ষে এলিয়ে পড়বো নেল্‌সনের মতো।......

চড় চড় করে বৃষ্টিও সুরু হলো। মণীন্দ্র চেনে আমাকে, তাই অপেক্ষা করবার নিষ্ফল অনুরোধ আর উচ্চারণ করতে সাহস করলো না। মাঝি খগেনকে শুধু একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আড়াইটেতে আর-একটা এনগেজমেণ্ট আছে। বৈঠা তুলে নিয়ে সে প্রস্তুত হয়ে বললো : Let us start......

আমাদের ডিঙ্গি নৌকো তাজপুরের ঘাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। গ্রামের

আকাবাঁকা খাল পেরিয়ে বাইরে মাঠে এসে পড়তেই মুষলধারে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে পাগলা হাওয়া। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় আর তীরের মতো এসে বিঁধতে লাগলো গায়ে।

মাঝিদের খালি গা, কষ্ট হতে লাগলো তাদেরই বেশী। ডিঙ্গি নৌকোয় ছই থাকে না, তাই ঠায় ভেজা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। মাঝখানে পাটাতনের ওপর বসে রইলাম আমি আর ওরা প্রাণপণে বেয়ে চললো। আকাশ ভেঙ্গে তখন বর্ষা নেমেছে। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে চিরে বিদ্যুতের সর্পিল চমক্। এলোপাথাড়ি বইছে বাতাস। একহাত দূরের কিছুও দেখা যায় না। দেখবার জন্য চোখ খোলা যায় না, এমনি বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়। নৌকোয় জল জমে যাচ্ছে মুহুর্মুহু আর আমি অর্থাৎ মহিম দারোগা বার বার সেঁওতি দিয়ে সেই জল-ছেঁচে ফেলছি। সামরিক পোষাক ভিজে গেছে, ঘড়ি ভিজে গেছে, আমার কৃত্রিম গোঁফ কোথায় ভেসে গেছে কে জানে, একেবারে খোলা মাঠের মাঝখানে বৃষ্টি ও বাতাসের তোড়ে আমাদের ডিঙ্গি টলমল করে উঠছে।

তথাপি, তথাপি, তথাপি বেয়ে চলেছি আমরা অবিশ্রামভাবে সেই নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে। পৌঁছুতে হবে কেয়টখালী গ্রামে ঠিক আড়াইটের মধ্যে। সেখানে কদমতলায় অপেক্ষায় বসে থাকবে সুবোধ—সুবোধ চক্রবর্ত্তী।

একটি মিনিট নষ্ট করবার উপায় নেই।

ছত্রিশ

বীরতারার কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছলাম, বর্ষণ তখন থেমে গেছে বটে, কিন্তু গর্জ্জনও থামেনি আর থামেনি বিদ্যুতের চোখ-ঝলসানো তির্য্যক দ্যুতি। সময় আর কতটুকু আছে, এইবার দেখা উচিত। কোট ও রুমাল দিয়ে জড়িয়ে অতি সাবধানে পাটাতনের একখানা কাঠ দিয়ে সযত্নে ঢেকে-রাখা আমার হাত-ঘড়িটা সন্তর্পণে বার করলাম। দেখা গেল, দুটো বাজবার পূর্ব্বেই ঘড়ির অপমৃত্যু হয়েছে। শুধু ঘড়ি নয়, টর্চ্চ লাইট দুটোও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। মনে মনে হিসাব করলাম, যে গতিতে আমরা নৌকো চালিয়ে এসেছি, তাতে আড়াইটের মধ্যেই নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবো আমাদের গ্রামে।

ছয়গাঁওয়ের মধ্য দিয়ে কেয়টখালীর পুব পাড়ার বাঁড়ুয্যে বাড়ীর দক্ষিণে এসে পড়লাম। কী তিথি ছিল, আজ আর তা মনে নেই। কিন্তু মনে পড়ে, বর্ষণ-ক্ষান্ত হলেও আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘের ভার এতটুকু লাঘব হয়নি। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে জমাট অন্ধকার। কয়েক হাত দূরের কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্যে থেকে থেকে বিদ্যুতের ঝলকানিতে নিমেষের জন্য চারিদিকটা আলোকিত হয়ে উঠছিল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল মেঘের কর্ণপটহ-বিদারী নির্ঘোষ। তীক্ষ্ণনখ থাবার মধ্যে শিকারকে আটকে নিয়ে রক্তলোলুপ দৈত্য তার পানে চেয়ে মাঝে মাঝে যে আগ্নেয় হাসি হেসে থাকে, বিজলীর চমকানিতে যেন দেখতে পেলাম সেই হাসির ছুরি। পরক্ষণেই বজ্রনির্ঘোষে সেই চাপা মারাত্মক হাসি যেন সহস্র ধমকে খান্ খান্ হয়ে ফেটে পড়ছিল। বোঝা গেল, এমনিভাবে বিশ্ব-চরাচর ডুবিয়ে দিয়েও তার তুষ্টি নেই এতটুকু, দ্বিতীয় বার সর্ব্বাত্মক অভিযানের জন্য চলছে তার দ্রুত প্রস্তুতি।

দূরে বিপদভঞ্জনের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুকুরপাড়ের প্রকাণ্ড কদম গাছটা ঠাওর করা গেল। পরক্ষণেই বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখা গেল, ঠিক তার তলায় একখানি নৌকো বাঁধা আছে, ছইয়ের দুটি দিকই বেশ ভালো করে বন্ধ।

নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে সুবোধ। কিন্তু খগেন বললো: যদি সুবোধদা' না হয় দ্বিজেনদা'?

অনাথ যোগ দিল: যদি অপরের বা কোনো পুলিশেরই নৌকো হয়, তাহলে?

বিপদ বললো: এও তো হতে পারে, কোনো দৈব দুর্ঘটনায় সুবোধদা' আসতে পারেননি। এদিকে শ্রীনগর থেকে এসেছে বড় দারোগা বা ঢাকা থেকে এসেছে অবিনাশ দারোগা লুকিয়ে আমাদের ফলো করতে। আপনাকে

বাড়ীতে না পেয়ে হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে রাত কাটাচ্ছে ব্যাটা ঠিক ঐ কদম গাছটার নীচেই। আর বর্ষার জন্য ব্যাটা ছইয়ের দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।—না জেনেশুনে হঠাৎ গিয়ে ওঠা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

খগেন বললো: ওসব পুলিশ-টুলিশ না হয়ে গ্রামেরই কেউ যদি হয়, তাহলে সেও তো জেনে যাবে যে, বাড়ীতে অন্তরীণ হয়েও দাদা পুলিশের পোষাকে রাতে বাইরে ঘুরে বেড়ান। এমনি জানাজানি কি ঠিক হবে দাদা?

বিপদ বললো: এক কাজ করা যাক্। আমাদের বাড়ীরই তো পুকুর। আমি যেন দুপুর রাতে বাইরে যাবো বলে বেরিয়ে এই নৌকোখানা দেখেছি—এমনিভাবে এসে নৌকোয় উঠে একটু ডাকাডাকি করি যে, এত রাত্রে কে এই নৌকোতে এবং কি চায় সে। তাহলেই তো ব্যাপারটা জানা যাবে। আপনারা বরং পুকুরের ঘাটলায় গিয়ে একটু বসুন।

ওদের আশঙ্কা ও নিশ্চিত হবার প্রস্তাব বেশ যুক্তিপুর্ণ, সুতরাং তা ঠেলে ফেলবার উপায় ছিল না। আমাদের নৌকো খুব ধীরে চুপি চুপি এসে ওদের শান-বাঁধানো ঘাটলার কাছে লাগলো। কিন্তু সুবোধও কি আর ঘুমিয়ে পড়েছে?......দেখা গেল, ধীরে ধীরে ঐ নৌকোর পেছন দিকের ঢাকনি খুলে কে যেন বাইরে এল এবং আমাদের শুনিয়ে অথচ বেশ অনুচ্চকণ্ঠে ছইয়ের ভেতরে উপবিষ্ট কার সঙ্গে কথা কইতে লাগলো: তুই জানিসনে রাখাল, এ হচ্ছেন দ্বিজেনদা'—দ্বিজেন গাঙ্গুলী, কথা যাঁর একচুল এদিক ওদিক হয় না। নিশ্চয়ই এসে পড়বেন।......কী বললি, আড়াইটে বেজে গেছে? দু'মিনিট পার হতে চললো? হতভাগা, তাহলে দেখবি, তিনিও এসে পড়বেন।

ব্যস, সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ওদের সবাইকে বিপদদের বাড়ীতে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ভিজে জামা কাপড় বদলে নেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে আমি সেই গায়ের সঙ্গে লেপটানো পোষাক পরেই সুবোধের নৌকোতে এসে উঠলাম।

ছইয়ের মধ্যে ঢুকেই প্রশ্ন করলাম: রাখাল কে হে?

সুবোধ হেসে জবাব দিল: রাখাল গরুর পাল লয়ে গেছে মাঠে।

স্তিমিত-শিখা কেরোসিনের ডিবা জ্বলছে। মুষলধার এই বর্ষণ ছইয়ের অসংখ্য ছিদ্রপথে পাটাতনের সর্ব্বত্র চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়েছে। অর্থাৎ নিজেকে রক্ষা করবার উপায় না দেখে সুবোধ দাঁড়কাকের মতো ঠায় বসে বসে ভিজছে এই রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত। নৌকোর তলায় যখন বেশ জল জমে গেছে, তখন পাটাতন তুলে সেঁওতি করে যে জল তুলে ফেলেছে ছইয়ের ক্ষুদ্র জানালা-পথে, তা বোঝা গেল।

বললাম: একেবারে ঠায় বসে ভিজেছ? তোমার শরীর তো ভাল নয়? এই জল সইবে কেন? বিপদের ঘরে গিয়েও তো তুমি আশ্রয় নিতে পারতে।

সুবোধ জবাব দিল: মাঝিকে সেখানে পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনি কোথাও গিয়েছিলেন নাকি? একেবারে যে ভিজে জল হয়ে গেছেন।

বললাম : হ্যাঁ, কয়েক মাইল দুরে।

তার পরের কথা ও কাজ সংক্ষিপ্ত। ঐ কদমতলা থেকেই বিদায় নিল সুবোধ। একটা ছোট প্যাকিং কেস হাতে করে আমি বিপদের ঘরে এসে সুবোধের নিদ্রিত মাঝিকে ডেকে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মাঝিদের কাজ তখনো শেষ হয়নি। খগেনই ওদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান। বৈঠা তুলে নিয়ে সে বললো : চলুন দাদা, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। বিপদকে বললাম, প্যাকিং কেসটা পরদিনই ভোরে অনাথের হাতে সুবোধ গুহের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে।

কারিগর বাড়ীর পাশে এসে একটি ডুবন্ত গাছের ডালপালার মধ্যে সন্তর্পণে নৌকোখানা ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা বিদ্যুতের ঝলকানির অপেক্ষা করতে লাগলাম শ্মশানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো। আকাশ তখন অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। জমাট মেঘের স্তরে বোধহয় ভাঙ্গন ধরেছে, কারণ দু' একটা মিটমিটে তারা অকস্মাৎ তার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকিও মারছিল।

বাড়ীর কাছে এসে এমনিভাবে অপেক্ষা করবার পক্ষে যুক্তি আছে। প্রথম-রাতে বেরিয়ে পড়ে ফিরলাম রাত শেষ করে। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বগৃহে অন্তরীণ রাজবন্দীকে পরিদর্শন করবার জন্য আসতে পারেন হয়তো সরকার তরফের কোনো অফিসার। বাড়ীতে আমায় না পেয়ে—হতে পারে, হয়তো তিনি ওৎ পেতে বসে আছেন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে আমারই অপেক্ষায়। একবার ফিরে এলেই হয়।......

তাই যদি হয়, তাহলে আমার কাজ হবে খগেনকে ঐ গাছের ডালেই ছেড়ে দিয়ে একেবারে সরল সুবোধ বালকের মতো বৈঠা চালিয়ে সশব্দে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া এবং এমনিভাবে অভিনয় করা যে, যেন মাত্র খানিকটা পূর্ব্বে মলত্যাগের জন্যই আমি নৌকো ভাসিয়ে পাশেই কোথাও গিয়েছিলাম—ম্যাণ্ডার বাড়ী বা ভুঁইমালী বাড়ী। বিক্রমপুরে বর্ষাকালে এই অত্যাবশ্যক কার্য্যটি প্রায়ই যে নৌকাযোগেই সারতে হয়, সে কথা বিক্রমপুরবাসী সকলেই স্বীকার করবেন। আর অভিনয়ে আমার দক্ষতা সর্ব্বজনস্বীকৃত; সুতরাং সাক্ষীদের মনে, এমন কি অফিসারটির মনেও তখন খটকা বাধিয়ে দেওয়া কঠিন কিছুই হবে না।

কিন্তু সে সব কৌশলের আর প্রয়োজন হলো না। হরিশ্চন্দ্রের অনুকূলে বিজলী আর একবার ঝলসে উঠলো এবং দেখা গেল আমাদের দক্ষিণ দিকের ঘাটলা শূন্য। বাড়ীও নীরব, নিশ্চয়ই সবাই নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অচেতন। অতএব, আশঙ্কার হেতু নেই।

বাড়ী এসে পোষাক ত্যাগ করে দক্ষিণের ঘরে শুয়ে পড়লাম। একটা রিভলবার ও গোটা পঞ্চাশেক কার্ত্তুজ একখানা রুমালে বেঁধে রেখে দিলাম হাতের কাছে আমার টেবিলের ওপরই।......

ভোর হতে-না-হতেই আর-এক বিভ্রাট। ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার ঘরের বাড়ীর ভিতর দিককার দরজা ভেজানো থাকতো। ছোট ভাই রঙ্গলাল উত্তরের ভিটের টিনের দোতলা ঘরের ওপরের তলায় শুতো মায়ের কাছে। ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে চোখ মেলে চেয়ে দেখি রঙ্গলাল আমায় ডাকছে। সংক্ষেপে অনুচ্চকণ্ঠে সে যা বললো, তার মর্ম্মার্থ এই যে, পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেলেছে, তল্লাসী হবে।

তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে টেবিলের ওপরকার রুমালটি হস্তগত করতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল যতীন দারোগার বিনীত কণ্ঠ: দ্বিজেনবাবু, দ্বিজেনবাবু জাগেন নাকি? আবার এসেছি আমরা। উঠুন।—বলে যতীন টেবিলের কাছেই খোলা জানালা-পথে আমাদের পানে চেয়ে রইলেন।

কি করা যায়? কী করে, কোন্ উপায়ে রুমালে-বাঁধা রিভলবারটি সরিয়ে ফেলা যায়? অবশেষে রিভলবার নিয়ে ধরা দেবো এদের হাতে?……চিন্তা হলো, কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। দরজা খুলে না দিলে ওদের সন্দেহ দৃঢ় হবে।……আমি রঙ্গলালের পানে চাইলাম, সেও চাইলো আমার পানে। আমাদের চোখে চোখে কিসের ইঙ্গিত যে ঝলক মেরে গেল, টেরও পেলেন না যতীন দারোগা।

আমি খাট থেকে নামলাম। দু'চারটে অতিরিক্ত হাই তুলে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে ওঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম: এক মিনিট যতীনবাবু! জামাটা গায়ে দিয়ে নিই। সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুমোতে ঘুমোতে ঘুম যেন আর ছাড়তে চাইছে না।

বলতে বলতে ব্র্যাকেটের কাছে গেলাম মন্থর গতিতে। একটা পাঞ্জাবী নিয়ে গায়ে চড়াতে গিয়েই থেমে গেলাম এবং মহা বিরক্তি প্রকাশ করে বলতে লাগলাম: আর বলবেন না মশাই, এই পিঁপড়ের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম। তেলের গন্ধে শিয়রের বালিশ তো রাত্রে এরা আক্রমণ করবেই, তার ওপর ব্র্যাকেটে ঝোলানো জামাও যদি এরা রেহাই না দেয়, তাহলে যাই বলুন তো কোথায়?—বলে জানালার সম্মুখে গিয়ে পাঞ্জাবীটা মেলে ধরে ঝাড়তে সুরু করলাম।

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে যতীন বললেন: ও মশাই, আমার বাসাতেও তাই। এক কৌটা গুড়, চিনি বা মিষ্টি কোথাও রাখবার উপায় নেই। এই বর্ষাকালে শালারা যেন একেবারে স্বরাজ পায়!—বলে এক গাল হেসে ফেললেন।

এদিকে কাজ আমার হাঁসিল হয়ে গেছে ততক্ষণে। জানালা আড়াল করে পাঞ্জাবীটা ঝাড়বার সুযোগে রঙ্গলাল চট্ করে টেবিলের ওপর থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে চলে গেছে বাড়ীর মধ্যে এবং তা চালান করে দিয়েছে একেবারে বোন হেনার ব্লাউজের মধ্যে।

দরজা খুলে দিলাম। যতীন দারোগা জনকয়েক সিপাইসহ ঘরে এসে উপবেশন করলেন। তল্লাসী সুরু হলো এবং তা তন্ন তন্ন করে। তল্লাসীকে

আমি পরোয়া করছিলাম না, কারণ রিভলবার ও কার্ত্তুজগুলো খুব নিরাপদ স্থান লাভ করেছে। কিন্তু প্যাকিং কেসটা যে সকালবেলাতেই অনাথের নিয়ে যাবার কথা শেখরনগর গ্রামের সুবোধ গুহের বাড়ীতে। দারোগার সঙ্গে আলাপে জানা গেল, আমার বাড়ীর তল্লাসী শেষ করে ওরা পুব পাড়ার দিকে যাবে অন্ত ব্যাপারের একখানা নাকি আর্জ্জির তদন্ত করতে।

বিশ্বাস নেই এই সাপের দলকে। হয়তো তাহা মিথ্যে কথা বললো এবং হয়তো অনাথদের বাড়ীতেই গিয়ে উঠবে তল্লাসী করতে।......সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে এদের সঙ্গে নানা বাজে আলাপ আলোচনার ফাঁকেই এক মিনিট সরে এসে রঙ্গলালের সঙ্গে দুটো কথা হয়ে গেল। কাজের কথা।

কিন্তু রঙ্গলাল বাড়ী ছেড়ে যাবে কী করে? তল্লাসীর সময় কারুকে যেতেও দেবে না ওরা, আসতেও দেবে না। এই-ই হচ্ছে রীতি। কিন্তু কৌশল বার করে ফেললাম একটা। অব্যর্থ কৌশল।

তল্লাসী যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এবং আপত্তিজনক কিছুই না পেয়ে যতীন দারোগা যখন মিঠে হাসি হেসে এই অনর্থক তকলিফের জন্ত আই বি-দের বাপান্ত করে গালাগাল দিয়ে আমার ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ভদ্রলোকের ছেলের এই মিথ্যে হয়রানির জন্য অজস্র সহানুভূতি প্রকাশে গদগদ হয়ে উঠেছেন, ঠিক তখন আমি অকস্মাৎ ব্যস্ত হয়ে হেনাকে ডেকে বললাম: হেনা, চা দিলিনে দারোগাবাবুকে? তোরা বড্ড ভুলে যাস্।—বসুন দারোগাবাবু। কাজ শেষ, এবার একটু চা হোক্।

বারকয়েক গররাজী হয়ে পরে যতীন নিমরাজী হয়ে বসতেই আমি রঙ্গলালকে বললাম: যা তো রঙ্গু, হেনাকে বলে আয় একটা মামলেট করে দিতে।

রঙ্গলাল বাড়ীর মধ্যে গিয়েই ফিরে এসে দুঃসংবাদ জানালো, একটিও ডিম নেই।

কেন?—প্রশ্ন করলাম চোখ কপালে তুলে।

রঙ্গলাল জবাব দিল: তোমার কালকে সকালের কেনা ছ'টা ডিমের মধ্যে দু'টো খারাপ বেরিয়েছে আর চারটে খাওয়া হয়ে গেছে কাল রাত্রেই।

যতীন বলে উঠলেন: থাক্, থাক্। মামলেট আর লাগবে না। চা এক কাপ হলেই চলবে। আর রাজবন্দীদের বাড়ীতে কিছু খাওয়াই নাকি বেআইনী। শালা আই বি-রা—বলতে বলতে আর-একবার তিনি সরকারী বুদ্ধিজীবী বিভাগের উদ্দেশে চোখা চোখা কটূক্তি বর্ষণ করলেন।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বললাম: তা কি হয়?—যা, এখ্খুনি যা, কারিগর বাড়ী থেকে এক ডজন ডিম কিনে নিয়ে আয় গে। মামলেটহীন চা লুণহীন মাংসের মতো।

আবার যতীন বাধা দিলেন, আবার আমি তাড়া দিলাম। রঙ্গলাল এই ফাঁকে ব্যস্ততার ভাণ করে মহাদেবকে সঙ্গে করে আমাদের ছোট নৌকো

ভাসিয়ে দিল এবং কারিগর বাড়ীর মোড় ঘুরে সে অদৃশ্য হয়ে যেতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বললাম : যতীনবাবু, এবার নিয়ে তো বোধহয় বার দশেক সার্চ্চ হলো আমাদের বাড়ী। পেলেন তো না কিছুই—

বাধা দিয়ে যতীন আবার আই বি-কে গালাগাল দিয়ে বললেন : ও শালারা কী বলে জানেন ? বলে, সব সময় একটা রিভলবার নাকি আপনার সঙ্গেই থাকে। বাজারে গেলেও নাকি রিভলভারটা সঙ্গে থাকে আর ঘুমোবার সময় রাখেন ওটা হাতের কাছেই, হয়তো বালিসের তলায় কিংবা টেবিলের ড্রয়ারে। আর আপনার বাড়ীতে তো রিভলবারের কারখানা আছে। যেই আমরা রিপোর্ট দিই যে, nothing found incriminating, অমনি শালারা বলে বসে, তোমাদের সার্চ্চের খবর সে পূর্ব্বেই পেয়ে বসে আর সব কিছু সরিয়ে ফেলে। —কী মশাই, জানতেন আপনি যে আজ সার্চ্চ হবে আপনাদের বাড়ী ?

মোটেই না।

কিন্তু ডিম কিনে রঙ্গলাল তখনো ফিরছে না। বুঝলাম, সে দ্রুত নৌকো চালিয়ে চলে গেছে একেবারে বিপদদের বাড়ীতে। সেখানকার বিপদ তো কাটাতে হবে! তারপর অনাথদের বাড়ী।......

হেনা চা নিয়ে এল। মামলেটের জন্য আর একবার সুগভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ও রঙ্গলালের অহেতুক বিলম্বের জন্য সুতীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে অবশেষে কাপ্ টি এগিয়ে দিলাম যতীনবাবুর হাতে।

দারোগা কাপে চুমুক দিতে লাগলেন।

সাঁইত্রিশ

আমার ছোট ভাই রঙ্গলাল আমার কাজে শুধু সহকারী নয়, সহযোগী ছিল বলা যায়। ছেলেরাও তাকে ডাকতো রঙ্গুদা' বলে। আমার অনুপস্থিতিকালে রঙ্গলালের কথাই ছিল সবার ওপরে। বস্তুত:, বিক্রমপুরের প্রায় সব অঞ্চলেরই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের তখনকার সমস্ত গুপ্ত কার্য্যের ভার ছিল আমার ও রঙ্গলালের ওপর। দলে আমার নীচেই রঙ্গলালের স্থান হলেও পুলিশকে দেখেছি বার বারই তাকেই গ্রেপ্তার করতে। সারা বিক্রমপুরে শুধু নয়, প্রায় গোটা ঢাকা জেলার যেখানে যত বৈপ্লবিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, প্রত্যেকটা ব্যাপারেই পুলিশ এসে হানা দিত আমাদের বাড়ীতে, জোর তল্লাসী হতো এবং তল্লাসীশেষে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সবিনয়ে দারোগাবাবু নিবেদন করতেন আমার কাছে যে, রঙ্গলালবাবুকে একবার থানায় যেতে হবে। এমন সব স্থানের এমন সব ডাকাতি, বন্দুক চুরি বা পুলিশ হত্যা সম্পর্কে পুলিশ এসে আমাদের বাড়ীতে হাজির হয়েছে যে, আমরা একেবারে অবাক্ হয়ে যেতাম। সেই কাজ তো দূরের কথা, সেই জায়গাই চিনিনে আমরা।

এমনি নিরর্থক তল্লাসী করতে করতে শ্রীনগর থানার পুলিশও বেশ শ্রান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথম প্রথম তারা কঠিন নিষ্ঠা দেখিয়ে আমার সম্মুখে এসে দু'হাত শূন্যে তুলে আত্মসমপর্ণের মতো বলতো: নিন মশায়, আগে আমার শরীর তল্লাসী করে নিন। এই দেখুন, আমার পকেটে এই নোট বুক, এই মানিব্যাগ, এই পেন্সিল আছে আর কোমরে আছে রিভলবার। ছ'টা ঘরই ভর্ত্তি, কিন্তু আর বেশী কার্ত্তুজ নেই। আর আছে তল্লাসী জিনিষের তালিকা করবার এক শীট ফরম্ আর এই হচ্ছে সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট।

তারপর সুরু করতো গোটা পনেরো পুলিশ মিলে তল্লাসী। অসুবিধা তাতে আমার কিছুই হতো না, কারণ বহরমপুর শিবিরে থাকাকালীন সরকারী ব্যয়ে আমি যে আটাশ ইঞ্চি চামড়ার সুটকেসটি কিনেছিলাম, ঐটি ব্যতীত এবং ওর মধ্যে দু'চারটে জামা কাপড় ব্যতীত আমার নিজস্ব জিনিষপত্র আর কিছুই ছিল না। বারকয়েক সার্চ্চের পর ওঁরা আই বি-র হারুণ-অল্-রশীদের গাঁজাখুরি গল্পের অন্ত:সারশূন্যতা উপলব্ধি করে এবার থেকে এসে বেশ জমিয়ে বসতেন আমারই ঘরে। যেন এসেছেন আড্ডা দিতে কোনো বন্ধুর বাড়ীতে! চা ও সঙ্গে সঙ্গে মুখরোচক নানারকম গল্প হতো ঘণ্টাখানেক। জমাদার ও সিপাইদের বলে দেয়া হতো ঘরগুলোতে একবার ঘুরে আসতে। তারপর প্রকাণ্ড তল্লাসী-তালিকার ফরমখানা বার করে দারোগা অভিনিবেশসহকারে লিখতেন: Found nothing incriminating আর নীচে সাক্ষীরা স্বাক্ষর করে দিতেন একে একে। এমনি করে তল্লাসী-পর্ব্ব শেষ হতো। তল্লাসীর বেলায় যতই গোঁজামিল চলুক না কেন, গ্রেপ্তারের হুকুম থাকলে তা তো তামিল

করতে হবেই। তবুও সেটা এমনিভাবে হতো যেন ঢাকা শহরের রোনাল্ডশে শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য আমন্ত্রণ এসেছে।......এসেই দারোগা অত্যন্ত আবেদনের সুরে বলতেন : রঙ্গলালবাবুকে আজ কিন্তু একবারটি সঙ্গে যেতে হবে দ্বিজেনবাবু। যেন তা নইলে ফাইনাল খেলা দেখার টিকিটখানা নষ্ট হয়ে যাবে।

বেশ, ভালো কথা। সবাই আমার ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক চা ও গল্পের শ্রাদ্ধ এবং তল্লাসী কার্য্য সমাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে রঙ্গলাল স্নানাহার করে নিল, কোনো কোনোবার হয়তো কারিগর বাড়ী থেকে কয়েকটা ডিম আনিয়ে ডালনা রান্না করে দিলেন ফুলবৌদি। দারোগা এ্যাণ্ড কোম্পানী সেজন্য খুশী মনে অপেক্ষা করলেন আরও কিছুক্ষণ।

কিন্তু আমায় কিছুই না বলে রঙ্গলালকে গ্রেপ্তার করবার পশ্চাতে আই বি-র একটা যে উদ্দেশ্য ছিল, তা বুঝতে দেরী হলো না আমার। স্বগৃহে অন্তরীণ করবার পরই যে আমি আবার গুপ্ত কার্য্য সুরু করবো, তা তারা ভালভাবেই জানতো এবং কাজ যে সুরু করেছি পুরোদমে, তাও ওরা অন্ততঃ ধারণা করে নিয়েছে। আমার তৎপরতায় একেবারে ছেদ না টেনে ওরা ঠিক আমার পরের লোকটিকেই বার বার গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেবে—এই ছিল ওদের নীতি। এতে আমার কাজও চলবে অব্যাহতভাবে ও তার ফলে জলের তলায় যেখানে যত ট্যাংরা বা শিঙ্গি মাছ আছে, সব মনের আনন্দে ভেসে উঠবে জলের ওপর আলো ও হাওয়া পানের আশায় এবং তাদের খুটিনাটি সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে সময় ও সুযোগ বুঝে জাল নিক্ষেপ করলেই—ব্যস্, বিক্রমপুর থেকে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র ঘাঁটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যাবে। সর্ব্বশেষে টুক্ করে আবার আমায় কোনো বন্দিশিবিরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেই চলবে। এতখানি বুদ্ধি ব্যয়ের জন্য কর্ত্তাদের শুধু তারিফ নয়, প্রমোশন, বেতন বৃদ্ধি ও পুরস্কারও হয়তো মিলবে—এই ছিল যোগিনী বসুর ও জিতেন ধরের মনের আশা।

কিন্তু I. B. proposes and B. V. disposes—এই ছিল আমাদের কথা। বুদ্ধির কসরতে ওদের সঙ্গে চিরকাল পাল্লা দিয়ে চলেছি আমি। জোর গলায় যদি বলি ওরা কোনোদিনই আমায় পরাজিত করতে পারেনি, তাহলে অবিশ্বাস করবেন না আপনারা। অবশ্য, আমারই মত ডঙ্কা বাজিয়ে অথচ সতর্কতার সঙ্গে ওদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করে সারা রাজনৈতিক জীবনে একটি বারও হাতে-নাতে ধরা পড়েননি, এমনি কর্ম্মী সে যুগে আরও অনেক ছিলেন, এ যুগেও অনেক আছেন। তবে হয়তো আমার কর্ম্মজীবনে বেহিসাবী পদক্ষেপ ছিল অসংখ্য বার, লুক্ একেবারেই না করে লিপ্ দেবার ঘটনা হামেশাই ঘটতো, তাই বোধহয় ঝুঁকিও ছিল একটু বেশী। আহত হয়ে কোনো প্রেমজর্জ্জর আয়েষার সেবা-

শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা ছিল না, শ্মশান থেকে বহন করে নিয়ে গিয়ে কোনো মহানুভব ধর্ম্মদাস নাগারই মৃতদেহে পুনর্জ্জীবন সঞ্চারের আশা ছিল না। শীতের প্রাদুর্ভাবে টপ টপ করে গাছের পাতা ঝরে পড়বার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন গুলীবিদ্ধ সৈনিকের দেহ ধূলিশায়ী হয়, ঠিক তেমনি একদিন, একেবারে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবেই হয়তো চিরবিদায় গ্রহণ করবো এই পৃথিবী থেকে, এই নির্ম্মম আশঙ্কা স্বীকার করে নিয়েই আমি এগিয়ে চলতাম।......

মিঃ ব্লেকের কানের পাশ দিয়ে অসংখ্য বার গুলী বেরিয়ে যাবার ঘটনা পাঠ করেছিলাম, বুক পকেটের ইস্পাতে নির্ম্মিত তাঁর সিগারেট কেস্-এ প্রতিহত হয়ে রিভলবারের গুলী ফিরে এল, এও লিখেছিলেন সে যুগের গ্রন্থকার। নায়ক-নায়িকার মৃত্যু হলে সিনেমার আখ্যায়িকা পঙ্গু হয়ে পড়ে, এমনি শ্লেষোক্তি এ যুগে বহুবার শুনেছি। তাই দেখেছি অগ্নিদগ্ধ, খঞ্জ বা চক্ষুহীন অশোককুমার বা দিলীপকুমার নার্গিশ বা মধুবালার হাত ধরে টুক্ টুক্ করে হেঁটে হেঁটে চিত্রনাট্যের একেবারে শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত এসে উপনীত হয়েছেন গল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। ঠাট্টা যতই করিনা কেন, অবাস্তব ও আজগুবি বলে ব্লেক, মোহন অথবা সিনেমার উপাখ্যান রচয়িতাকে যতই বিদ্রূপ করিনা কেন, আমার জীবনেই সেই কাল্পনিক কাহিনী যে বহুবার সত্যে পরিণত হতে দেখেছি, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

শ্রীনগর থানার তিনজন দারোগার যে-কেউ সরকারী কোনো কাজে আমাদের গ্রামে এলে বা আশে-পাশের গ্রামে এলে অথবা উত্তর দিকে হাঁসাড়া ছাড়িয়ে কোনো গ্রামে গেলেও ফেরবার পথে একটিবার হানা দিতেনই আমাদের বাড়ীতে। কি দিনে, কি রাত্রে। ঢাকা থেকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপার অথবা মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম থানা পরিদর্শনে এলেই অসময়ে অর্থাৎ সন্ধ্যার পর একবার এসে পদধূলি দিয়ে যেতেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে সমগ্র বিক্রমপুর পরগণার স্থানে স্থানে যে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, সশস্ত্র সেই গোরা বাহিনীর একটি স্কোয়াড বাঙালী একজন দারোগাকে সঙ্গে করে প্রায়ই গভীর রাত্রে রাজবন্দীদের পরিদর্শন করবার জন্য এসে উপস্থিত হতো। পরে জানতে পারা গেছে যে, এর পরেও একেবারে সোজা ঢাকা থেকে এসে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অনেক বার, একাদিক্রমে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আশেপাশে ঝোপজঙ্গলে ওৎ পেতে বসে আমাদের বাড়ীর ওপর লক্ষ্য রেখেছেন হয় যোগিনী বসু, নয় জিতেন ধর, না হয়তো অপর কোনো ধুরন্ধর অফিসার। শত্রুপক্ষের এতখানি তৎপরতায় এটাই বোঝা যেত যে, তাদের নিদ্রা টুটে গেছে, সমাপ্ত হয়েছে টেবিলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জটলা আর বুক ঠুকে ঘোষণা করা : We have controlled all activi-

ties of the Terrorists...কিন্তু আশ্চর্য্য এবং বোধহয় বিশ্বের আশ্চর্য্যতম সত্য যে, যখনই এসেছে, তখনই তারা শান্ত ও সুবোধ বালকের মতো আমায় উপস্থিত পেয়েছে আমাদের বাড়ীতেই। কি দিনে, কি রাত্রে। বিরক্ত হয়ে অনেকে প্রশ্নই করে বসতো: সে কি মশাই, দিনের বেলাও কি আপনি বাইরে যান না? রাতেই না হয় নিষেধ আছে, কিন্তু দিনের বেলায়?

আলমারী ভর্ত্তি গ্রন্থরাজি দেখিয়ে উদাস কণ্ঠে বলতাম: ওরাই এখন আমার সঙ্গী।

আমার উদাস কণ্ঠে আদৌ আস্থা ছিল না তাঁদের, তা জানতাম।

একদিন রসুনিয়া, সেরাজদীঘা ও রাজদিয়া গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ শেষ করে ইছাপুরায় ফুলবৌদিদের বাড়ীতে এসে যখন উঠলাম, তখন রাত প্রায় ন'টা। রাতের আহারাদি শেষ হয়ে গেছে তাঁদের। কিন্তু অসময়ে অকস্মাৎ এসে তাঁদের ওপর বহু উৎপাত করতাম আমি। আরও বিশেষ করে ফুলবৌদি তখন ওখানে। সুতরাং আবার কাঠের উনুন ধরানো হলো এবং ডাল ও চাল একসঙ্গে করে চাপিয়ে দিয়ে ফুলবৌদি একান্তে প্রশ্ন করলেন: চলে যে এসেছ, ওদিকে ওরা যদি গিয়ে হাজির হয় বাড়ীতে?

হেসে বললাম: হবে না।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন বৌদি: হবে না। সব তোমার বোনাই কি না, তাই আসবার সংবাদ তোমায় জানিয়ে আসেন।—একদিন ধরাই পড়বে তুমি। এমনি পালিয়ে ঘোরা—

বললাম: সেই একদিন আর এ জীবনে আসবে না বৌদি।

ওঘর থেকে তাঐ মশায় হাঁক দিলেন: নে, আর গল্প করিস নে, পিকু। ওকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দে।

গরম গরম খিচুড়ী আর আলু-পেঁয়াজ ভাজা। ভালোই হলো নৈশ আহার। রান্না ঘরের কোণে মুখ হাত ধুয়ে সবে বড় ঘরে উঠেছি, এমন সময় দূরে গাছপালার মধ্য দিয়ে দেখা গেল লণ্ঠন নিয়ে কে যেন অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখা গেল তারা দু'জন। বাড়ীতে এসে উঠতেই দেখা গেল ফুলদা আর বছিরদ্দী। ফুলদা'র হাতে লণ্ঠন।

ফুলদা'র ভাবাবেগ চিরদিনই উগ্র। তাই ধরা গলায় হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি যা বললেন, তার মর্ম্ম এই: বিকেলের দিকে এস. ডি. ও. কালিপদ মৈত্র এসে খোঁজ করে যাবার পর সন্ধ্যার একটু আগেই এসেছিল আবার যতীন দারোগা। হেনা অবশ্য বলে দিয়েছে যে, তুই মোহনগঞ্জ হাটে গেছিস। ব্রজলালের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে যাবার সময় বলে গেছে, রাত্রেও আবার আসতে পারে। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে ফুলদা' বললেন: শীগ্‌গির চল্। এতক্ষণে ওরা এসে গেছে কি না কে জানে।

বছিরদ্দী সায় দিল : হ, চলেন কর্ত্তা, জলদি চলেন। কওন যায় না ঐ হালাগো কথা। আইসা পড়তে পারে।

এটা কিন্তু ফুলদা'রই শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন এবং বৌদিও আছেন। তাঐমশায় ওঘর থেকে বললেন : ও জামা জুতো পরুক, ততক্ষণ তোমরা ঘরে এসে বস, জিতেন।

মাঐমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন : খেয়ে দেয়ে তো বোধহয় বার হওনি। পিকু, যা তো, আবার ডালে-চালে দুটো চড়িয়ে দে। খেয়ে যাও।

ফুলদা' একেবারে জলে উঠলেন : না, না, না। এখন খিচুড়ী খাবার সময় নেই আমার। ওদিকে কী কাণ্ড হয়ে গেছে কে জানে।—এই, চল্, চল্, আর এক মিনিটও দেরী করিসনে।

বললাম : চলুন যাচ্ছি। কিন্তু কাণ্ড যদি কিছু হয়েই থাকে, তাহলে আমি গেলে কি আর তা কিছু হাল্কা হবে? বাড়ীতে আমায় না পেলেই আইনভঙ্গ হয়ে গেছে, তারপর দেরীতে বাড়ীতে গেলে সে ভাঙ্গা আর জোড়া লাগবে না।

আমার ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে ফুলদা একেবারে অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন : নে, রাখ, তোর আর যুক্তি দেখাতে হবে না। তাড়াতাড়ি গেলে ওরা আসবার পুর্ব্বেই পৌছে যেতে পারি—চল্।

ফুলদা' ঘরেও এলেন না, বৌদিও আর মাঐমার কথামত খিচুড়ী চড়াতে পারলেন না, তাঐ মশায়ের কথাও আর মানলেন না তিনি। সার্টটা কাঁধে ফেলেই রওনা হলাম। ইছাপুরা গ্রামের মাঝে মাঝে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে এসে বাজারের কাছে যখন বছিরদ্দীর নৌকোয় উঠলাম, ফুলদা' তখন একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন : বছিরদ্দী, এইবার তোর কাজ। প্রাণপণে বেয়ে চল।

তীরবেগে ছুটলো নৌকো। বছিরদ্দী আমায় বসিয়ে দিল হালে আর ফুলদা' ও সে দু'খানা বৈঠা দিয়ে নৌকো-বাছ দেবার মতো করে অতি দ্রুত জল টানতে লাগলো। বর্ষার জল তখন সবে বিক্রমপুরে প্রবেশ করেছে, ধান গাছগুলো তখনো পুরু ও ঘন হয়ে ওঠেনি। আমাদের নৌকো তাই আঁকাবাঁকা আইল বা খাল ধরে না গিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়েই সোজা ছুটে চললো। আর ঘুরপথে যাবার বিলাসিতা করবার সময়ও ছিল না। আকাশে সরু চাঁদ। তার স্তিমিত আলোয় দেখছিলাম ফুলদা' ও বছিরদ্দীর বৈঠা ঘন ঘন উঠছে আর পড়ছে। বৈঠা চালনার মধ্য দিয়েই বেশ অনুভব করছিলাম ফুলদা'র তীব্র উত্তেজনা। বছিরদ্দী তার মুসলমানী মাংসপেশীর পরাক্রম দেখাচ্ছিল আর শ্রান্তিহীন বিরামহীন বৈঠা ক্ষেপণের মাঝে আমি অনুভব করছিলাম তার মুসলমানী tenacity......

বাড়ী এসে তো একেবারে অবাক্ হয়ে গেলাম আমরা। সবাই দিব্যি

ঘুমিয়ে পড়েছেন! বাবা, মা, রঙ্গলাল সবাইকে ফুলদা' ডেকে তুললেন উত্তেজনার আতিশয্যে একেবারে হল্লা করে এবং যখন জানতে পারলেন যে, পুলিশ আর আসেনি, তখন আনন্দের আতিশয্যে হল্লা করেই বাড়ী মুখরিত করে তুললেন। সোনাবৌদির কাছে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, ও বেলার ইলিস মাছের ঝোল আছে আর ভাত যা আছে, তাতে আমাদের তিনজনের হয়ে যাবে। খিচুরী ততক্ষণে জল হয়ে গেছে, তাই আমিও বছিরদ্দী আর ফুলদা'র সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লাম।

পুলিশ অবশ্য এল আবার, কিন্তু পরদিন সকালে। যতীনবাবু বললেন: আরে মশাই, জ্বালিয়ে মারলে! বললাম, আমি একবার দেখে এসেছি, দিনের বেলায় না থাকলেও রাত্রে দ্বিজেনবাবু বাড়ীতে ফিরে আসবেনই। না, তা শুনবেন না। এস. ডি. ও. জিজ্ঞেস করলেন, মোহনগঞ্জ হাটে সে যায় কেন? বললাম, স্যার, ওটা যে তাঁর এলাকার মধ্যেই। তবুও হুকুম করলেন আর একবার রাত্রে এসে আপনাকে দেখে যেতে। বলে তো কর্ত্তা মুন্সীগঞ্জ চলে গেলেন সন্ধ্যার দিকে। বাঁচা গেল। আমিও দিব্যি ঘুমিয়ে ভোরে চা-টা খেয়ে এই আসছি। রাত্রে এসে আর আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক মনে করলাম না। —বলে হেসে প্রশ্ন করলেন: কি মশাই, বাড়ীতে ছিলেন তো কাল রাত্রে?

হেসেই জবাব দিলাম: রাত্রে এলেই পারতেন। মাংস আর পোলাউ হয়েছিল। স্বয়ং মা রান্না করেছিলেন। অনেক রাত পর্য্যন্ত রান্না হলো। পাড়ার দু' একজন ভদ্রলোক খেলেন। আপনি এলে বেশ তাস খেলা যেত জমিয়ে। এঃ, 'আপনি কি হারাইলেন', জানেন না।—বলে হেসে উঠলাম।

মহাদুঃখ প্রকাশ করে যতীনবাবু বললেন: এ হে, ভারী loss হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন, এর পর যেদিন হবে, সেদিন যেন খবর পাই দ্বিজেনবাবু!

ফস্ করে জিজ্ঞেস করলাম রঙ্গলালকে: এই ছাখ না, মাংস আর আছে কিনা? থাকলে নিয়ে আয় না একখানা প্লেটে করে। চায়ের সঙ্গে মন্দ হবে না।

হুকুম পেয়ে রঙ্গলাল তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল এবং একটু পরই ফিরে এসে সীমাহীন লজ্জা প্রকাশ করে বললো: ছিল দাদা, কিন্তু রেণু এসেছিল বেড়াতে, তাকে সবটা খাইয়ে দেয়া হয়েছে!

থাক্, থাক্, তাতে আর কী হয়েছে।—বলতে বলতে যতীন দারোগা চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে লাগলেন।

আটত্রিশ

আমাদের কেয়টখালী অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। দৈর্ঘ্যে মাইল দেড়েক আর প্রস্থে এক মাইলের মত হবে। এই গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশীজনই মুসলমান। নেই হাট-বাজার, নেই হাই স্কুল, নেই দাতব্য চিকিৎসালয়। ঘোলঘর গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় হলেও অপর পার্শ্বের হাঁসাড়া গ্রাম আমাদের হাট-বাজার, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের অভাব পুরণ করে। হাট না থাকলেও হাঁসাড়ায় বাজার বসে প্রতিদিন সকালে, হাঁসাড়া হাই স্কুলেই আমাদের গ্রামের সবাই পড়ি, ১৯২৬ সালে এই হাঁসাড়া হাই স্কুল থেকেই আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করি। হাঁসাড়ার পাশে কেয়টখালী এত ক্ষুদ্র ও নগণ্য যে, বিদেশে আমাদের গ্রামকে কেউ ঠিক চিনতে পারবে না মনে করে অনেক সময়ই আমরা বলে দিতাম যে, আমাদের বাড়ী হাঁসাড়ায়।

বিশেষ করে, আমার কর্ম্মক্ষেত্র মুখ্যতঃ ছিল হাঁসাড়া। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করলে তা স্থানান্তরিত হয় ঢাকা ও কলকাতায়। হাঁসাড়া গ্রামের সবাই আমায় চেনে। কেউ চেনে ভাল ছাত্র হিসেবে, কেউ চেনে ভালো মঞ্চাভিনেতারূপে, আবার কেউ সমাদর করে নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে। স্কুলের মাষ্টাররা আমায় খুব স্নেহ করতেন। শিক্ষাক্ষেত্র ত্যাগ করে কী করে যে আমি এই স্বদেশীদের দলে যোগদান করলাম, এ কথা আলোচনা করে তাঁরা নিজেরাই যে শুধু দুঃখপ্রকাশ করতেন, তাই নয়, অনেক সময় আমার বাবার কাছে এসে জটলা করতেন। স্বগৃহে অন্তরীণে এলে যখন তাঁরা শুনলেন যে, এতকাল পর আমি আই-এ, পরীক্ষা দেবার সময় পেয়েছি বহরমপুর বন্দিশিবির থেকে, ভারী খুশী হলেন তাঁরা। সেই পুরোনো কথা তুলে একদিন যোগেশ গাঙ্গুলী মহাশয় আবার একবার আমায় অনুরোধ জানালেন গুপ্ত সমিতি থেকে নাম কাটিয়ে নেবার জন্য।

হাঁসাড়ায় কংগ্রেস অফিস ছিল এবং সে সময় সেই প্রাথমিক কংগ্রেসের স্বনামধন্য সম্পাদক ছিলেন মৃণাল সোম। বনিয়াদী সোমের বাড়ীর লোক। কংগ্রেসের অহিংস পথে আমাদের গতিবিধি না থাকলেও কংগ্রেসের নিন্দা কোনোদিন করিনি আমি। সমাজকল্যাণকর কাজে কংগ্রেসের উপযোগিতা আমি সর্ব্বদাই স্বীকার করেছি। কিন্তু হাঁসাড়া গ্রামের ঐ প্রাথমিক কংগ্রেসের সম্পাদক মৃণাল সোম কংগ্রেসের নামে সংগৃহীত চাঁদা ও তণ্ডুলের অধিকাংশই নির্ব্বোধের মতো প্রায় প্রকাশ্যেই এমনিভাবে সরিয়ে ফেলতো যে, শুধু হাঁসাড়ায় নয়, আশেপাশের গ্রামেও তাই নিয়ে তীব্র আলোচনা চলতো। লোকটা স্বল্পভাষী, গ্যাটাপারচার ফ্রেমের চসমার ওপর দিয়ে তাকায়, চিরকালই তার দাড়ি দিনসাতেক পূর্ব্বে কামানো হয়েছে বলে মনে হয়। ময়লা খদ্দরের ফুল

সার্ট ময়লা খদ্দরের ধুতি আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। মাথায় তার কোনদিন গান্ধীটুপী দেখেছি মনে পড়ে না। এই হচ্ছেন কংগ্রেস সেক্রেটারী মৃণাল সোম। আর ইনিই হচ্ছেন—শুনে বিস্মিত হবেন না যে, ওদিককার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী গোয়েন্দা বা টিকটিকি। এই বিষকুম্ভ পয়োমুখকে প্রথমটা চিনতে পারিনি আমি আরো দশজনের মতো। গ্রামের কল্যাণকর প্রত্যেকটি কার্য্যে মৃণাল সোমকে সর্ব্বাগ্রে না হলেও অগ্রবর্ত্তীদের মধ্যেই দেখেছি, রোগীর সেবায় রাত জাগবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহে, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সঙ্গে লড়াইয়ে কুইনাইন বিতরণে, বদ্ধ জলার কচুরীপানা পরিষ্কার করবার কাজে, দরিদ্রনারায়ণ সেবায় মৃণালকে দেখেছি সীমাহীন তৎপর। কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে সে কখনো নিজেই ঢাকা চলে যেতো কাজের ছুতোয় অথবা পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখলে অপর কোনো বিশ্বাসী অনুচর মারফৎ সংগৃহীত সংবাদগুলি প্রেরণ করতো।......একেবারে কংগ্রেসের সম্পাদককে দলে টানতে পারার জন্য একদিকে যেমন আই বি-দের পারদর্শিতার তারিফ না করে পারা যায় না, তেমনি এই দু'মুখো সাপদের দেশ ও জাতির প্রতি জগৎশেঠী বিশ্বাসঘাতকতায় লজ্জায় ও ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে আমাদের।

মৃণাল সোম ব্যতীত আমাদের স্কুলের মাষ্টার দীপেন ব্যানার্জ্জী ছিলেন একজন স্পাই। আরও ছিলেন বীরেন ঘোষাল, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, ডাঃ পলাশ সাহা এবং আরও অনেকে। এঁদের একেবারে পরিহার করে চলা আমার নীতি ছিল না, খুব কৌশলে সরলতার ভাণ করে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতাম এঁদের সাথে, সব কথাই আলোচনা করবার অভিনয় করতাম নিখুঁতভাবে, কিন্তু ঠিক সময়টিতে এঁদের অলক্ষ্যে ও অজান্তে নিজের কাজটি হাসিল করে ফেলতাম।......

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জ সাহেব খেলার মাঠে নিহত হয়েছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু মেদিনীপুরের এই গুপ্ত দলের সংগঠন যে ঢাকার বি ভি কর্ম্মীরাই করেছিল, পুলিশ তা জানতো; তাই বার্জ্জ হত্যার সাত দিনের মধ্যেই আমাদের বাড়ী আবার তল্লাসী হলো এবং এবার অতিরিক্ত লোক লাগিয়ে কোদাল দিয়ে আমাদের বাড়ীর উঠান একেবারে চষে ফেলা হলো।

যতীন দারোগা গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে দক্ষিণের ঘরে এসে আমার চেয়ারে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে বলে উঠলেন: নাও, পেলাম তো এক হাজার রিভলবার?

বিস্মিতমুখে প্রশ্ন করলাম: মানে?

মানে আর কি? আপনার বাড়ীতে নাকি রিভলবারের কারখানা আছে একটা। সেখানে নাকি রিভলবার তৈরী হয় আর কোথাও পাঠিয়ে না দেয়া পর্য্যন্ত মাটির তলায় তা লুকিয়ে রাখা হয়।

বিস্ময় আরো বেড়ে গেল : রিভলবার তৈরী হয়? কারখানা আছে? বলেন কি যতীনবাবু?

আরে মশাই, একি আর আমি বলি, বলেন যোগিনী বসু আর জিতেন ধর।

হেসে বললাম : এক হাজার রিভলবার তৈরী হয়ে গেছে? ফোর্ড কোম্পানীকেও যে ফেল পড়িয়ে দেবে যতীনবাবু!

আপনার তৈরী রিভলবার দিয়েই নাকি বার্জ্জ সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে।

অ্যাঁ, বলেন কি?—একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

যতীনবাবু হাসিতে ফেটে পড়লেন।

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি মাসিক এ্যালাউন্সের জন্য যে আবেদনপত্র পাঠালাম, সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দপ্তর থেকে খুব শীগগিরই তার জবাব এল যে, তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যত সহজে এটা দমিয়ে দিতে চাইলেন, তত সহজে দমে যাবার পাত্র আমি নই। তাই এর পর বাবাকে দিয়ে একখানা দরখাস্ত করালাম যে, বিদেশ থেকে ছেলেরা মাসোহারা পাঠায় আর সারাটি মাস সেই মাসোহারার টাকায় সংসার চলে। যে যুবক কোনো কাজ না করে বসে বসে খেতে চায়, ছেলেরা তার খাওয়াপরার জন্য একটি কপর্দ্দকও দিতে নারাজ। আর স্বগৃহে অন্তরীণ করবার পূর্ব্বে রাজবন্দীর খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া পুলিশের পক্ষে উচিত ছিল। কারণ, দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে স্বগৃহে অন্তরীণ কর, এমনি কোনো আর্ত্তনাদ আমরা সরকারকে জানাইনি এবং তাকে কেয়টখালীতে প্রেরণের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেও বাড়ীর কর্ত্তাদের কারুর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। সুতরাং হয় তাকে মাসিক ভাতার সুবিধে দাও, না হয় কেয়টখালী থেকে যেখানে খুশী নিয়ে যাও।

এর ক'দিন পর আমি লিখলাম যে, এ বাড়ীতে আমাকে কেউ খেতে দিতে চায় না; সুতরাং আমায় জেলেই নিয়ে যাও। তারপর একদিন লিখলাম : কাল আমি খাইনি।

ধাপে ধাপে পরিস্থিতিটা এমনি কৌশলে ক্লাইমেক্সে এনে ফেলেছিলাম শুধু পত্রাঘাত করেই যে, অকস্মাৎ একদিন ঢাকা থেকে জনৈক আই বি অফিসার আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন এবং গভর্ণমেণ্টের এক নয়া আদেশ জারী করে আমার চলা ফেরার পরিধি একেবারে হ্রাস করে শুধু কেয়টখালী গ্রামটুকু সীমাবদ্ধ করে দিয়ে গেলেন। এতে দুঃখ পেলাম না এতটুকুও এইজন্য যে, আই বি এবার বুঝেছেন যে, রশি আলগা করে দিয়ে গভীর জলের মাছ শিকার তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভালোয় ভালোয় আমাকেই ভালো করে আটকে রাখবার নীতি তাঁরা গ্রহণ করলেন।

ওঁদের আদেশগুলো প্রকাশ্যভাবে এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে

চলতাম যে, তাতে অতি বড় সরকারী কর্ম্মচারীও লজ্জা পেত। যখন প্রায় গোটা বিক্রমপুর ছিল আমার চলাফেরার পরিধি, তখন নানা গ্রামে ফুটবল খেলতে যেতে হতো আমায়, কখনো নিজেদের গ্রামেরই পক্ষে, কখনো-বা অপর গ্রামের পক্ষে। কিন্তু যার পক্ষেই যাই না কেন, বিকেলে ছ'টার মধ্যে আমি বাড়ী ফিরে আসতাম। আমায় নিয়ে খেলতে হলেই সেদিন খেলা সুরু হতো সাড়ে চারটেতে পরিচালনা কমিটির বিশেষ অনুমোদনে। ঠিক সাড়ে চারটেতে সুরু হলে অবশ্য সাড়ে পাঁচটায় খেলা শেষ করে ত্রস্তপদে ফিরে আসতে অসুবিধে হতো না। আর যেখানেই খেলা সুরু হতে দু'দশ মিনিট দেরী হয়ে যেত, সেখানেই খেলা শেষ হবার পুর্ব্বেই মহামান্য সম্রাটের একান্ত অনুগত প্রজার মত ঠিক সাড়ে পাঁচটায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তাম আমি।

লোক-দেখানো নিষ্ঠা ধরবার বুদ্ধি সরকারী বুদ্ধি বিভাগের ঘটে ছিল না। দর্শকদের মধ্যেই থাকতো আমার এজেণ্ট ঘড়ি নিয়ে। সাড়ে পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় আহ্বান জানাতো চীৎকার করে: দ্বিজেনদা', টাইম আপ!

হাজার হাজার দর্শকেরা তা শুনতে পেতেন এবং অকস্মাৎ দেখতেন রেফারির অনুমতি নিয়ে খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসছি আমি। খেলায় আমার সুনাম ছিল, তাই যাঁরা আমায় হারালেন, তাঁরা হেরে গেলে যে একান্তভাবে আমার বিহনেই হারলেন, এ কথা জোর গলায় প্রচার করে বেড়াতেন। ফলে, লোকের মুখে মুখে কথাটা গিয়ে পেঁছিতো শ্রীনগর থানার বড় দারোগার দপ্তরে এবং পরে ঢাকার আই বি অফিসে। তাঁরা আমার নিষ্ঠায় আস্থা স্থাপন করতেন।

আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, ঐ সময়টাই কিছু কাজ করবার সময়। মাঠ ছেড়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে এসে খেলোয়াড়ের পোষাকটাও আর পরিবর্ত্তন করবার যেন ফুরসুৎ পেলাম না, সোজা এগিয়ে চললাম কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। মনে করুন, এমনিভাবে আসছি হাঁসাড়ার মুন্সী বাড়ীর মাঠ থেকে। কালীকিশোর সেনের বাড়ীর ওপর দিয়ে সোজা চলে এলাম হাঁসাড়া হাই স্কুলে। তারপর সেখান থেকে রওনা হলাম পশ্চিম দিকে মাঠের মধ্য দিয়ে। ডেপুটি ঘোষের বাড়ীর দক্ষিণ দিক দিয়ে এগিয়ে এসে নলিনী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী বাঁয়ে রেখে বাজারের কাঠের পোলটার ওপর ওঠবার সময় ডান দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম আমাদের ভুতপুর্ব্ব মাষ্টার দীপেন ব্যানার্জ্জী বাইরে পুকুরধারে এসে বসেছেন কিনা। যদি দেখি, তিনি যথারীতি ওখানে মাদুর বিছিয়ে বসে কোনো বই পড়ছেন খালের ধারের তপস্যারত বক-ধার্ম্মিকের মতো, তাহলে গুড বয়ের মতো সোজা বাজারে এসে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলাম সোজা বাড়ীর পথে। আর যদি দেখি লাইন ক্লিয়ার আছে, এ্যাকসিড্যাণ্ট হবার আশঙ্কা কম, তাহলে

বাজারের মধ্য দিয়ে সোজা চলে এলাম পশ্চিম দিকে। সেখান থেকে সুবোধ গুহের বাড়ী আর কত দূর ?......

আমি জানি এবং নিশ্চিতভাবে জানি, খেলার মাঠে যে সততা দেখিয়ে বেরিয়ে আসি আমি, তাকে পুলিশ আখ্যা দেবে ভীরুতা বলে; সুতরাং তার পরই আর ফেউ লাগানো প্রয়োজন বলে মনে করবে না অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টা।

চলাফেরার পরিধি কমে গিয়ে যখন মাত্র কেয়টখালী গ্রামে এসে দাঁড়ালো, তখনও আমার কাজে বিশেষ অসুবিধে কিছু হলো না। এর প্রধান কারণ আমার ডেপুটিরা ছিল খুব বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ। এদের নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলাম আমি। তারা আজ সবাই কোথায় তা আমার জানা নেই। কিন্তু স্পষ্টভাবে এবং গর্ব্বের সঙ্গে স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা নেই আমার যে, স্বগৃহে অন্তরীণকালে আমার কর্ম্মতৎপরতা যতটুকু সাফল্যই লাভ করেছে, তা প্রায় সবটাই সম্ভব হয়েছে আমার এই অনুগামীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অবিচল ঐকান্তিকতা ও অটল নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য। কুঠার চালিয়ে যারা জঙ্গল পরিষ্কার করে, কোদালি চালিয়ে যারা মাটি কাটে, খোয়া ভেঙ্গে তৈরী করে পাকা রাস্তা, মোটর হাঁকিয়ে সে পথে ছুটে যাবার সময় আমরা এদের কথা একবারও ভেবে দেখি কি ? তাজমহল নির্ম্মাণ করেছে যে কারিগর, যে শ্রমিক, যে দিনমজুর, কে তাদের চেনে, কে তাদের মনে রেখেছে ? এর প্রস্তর-ফলকের স্বচ্ছতায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে সম্রাট সাজাহানের যে অমর কীর্ত্তি, মমতাজের প্রতি তাঁর যে সুনিবিড় প্রেম অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে তাজমহলের স্ফটিক স্তম্ভে, দশটি মুখে আমরা তারই স্তুতিগানে আত্মহারা হই !......

আমি কিন্তু আমার সহকর্ম্মীদের একটি দিনের তরেও ভুলতে পারিনে। ত্রুটি যে তাদের আদৌ ছিল না তা নয়, কিন্তু সে ত্রুটিকে মিথ্যে যুক্তির কাঁচা রংয়ে রাঙ্গাতে না গিয়ে অকপটে স্বীকার করবার হিম্মৎ ছিল তাদের সবার। সাংসারিক কঠিন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হলেও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা তাদের কমেনি এতটুকুও ; বরং তাতে করে সাহস যেন তাদের বেড়ে গেছে শতগুণ হয়ে। সম্ভাবনাময় জীবনের বাঁধানো পাকা রাস্তা ত্যাগ করে তারা অবলীলাক্রমে এসে নেমেছে আমার সঙ্গে বিপদসঙ্কুল বন্ধুর পথে !......আজ মাঝে মাঝে অকস্মাৎ শিউরে উঠি এই ভেবে যে, ওদের জীবনের সাবলীল গতিপথে আমিই কি একটা দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করেছিলাম ওদের সবাইকে গুপ্ত সমিতিতে নাম লিখিয়ে ? মাঝে মাঝেই এই বেয়াড়া প্রশ্নটা সারা অন্তরে সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি করে তোলে। এবং তা আজও।......

এক বৃহস্পতিবার থানায় হাজিরা দিতে গেলাম না আমি। চৌকিদার মারফৎ লিখে পাঠালাম : বর্ষাকাল, নৌকো ব্যতীত থানায় যাওয়া যেতে পারে না। বাড়ীর নৌকো বাবা আমায় ব্যবহার করতে দেবেন না বলে দিয়েছেন আর নৌকো ভাড়া করে যাবার মতো সঙ্গতি কোথায় আমার ?—সুতরাং

প্রয়োজন এবং অবিলম্বে প্রয়োজন মাসিক ভাতার ও বর্ষাকালে নৌকো ভাড়া বাবদ কিছু টাকার। দয়া করে তার সত্বর ব্যবস্থা করতে আজ্ঞা হয়।

গ্র্যাল সাহেব তখন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট। অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস। পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবীদের সায়েস্তা করবার প্রকাণ্ড বিবৃতি দিয়েই তিনি অবসর-জীবনের আরাম ত্যাগ করে বিনাশায় চ তুষ্কৃতাম্ সুদূর বিলেত থেকে ফিরে এসে ঢাকা জেলার ভার নিয়েছেন ভারত গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে। খুব সত্বরই জবাব এল তাঁর কাছ থেকে: Your petition is rejected অর্থাৎ বাজে আর্জ্জি পেশ করো না। কিন্তু বৃটিশ steel prestigeএর আদবকায়দা বেশ ভাল করে রপ্ত ছিল আমার। তাই সাধনা সুরু করলাম পত্রযোগে শাক্যসিংহের মতো। কথা কেউ না কইলেও, সবাই মুখ ঘুরিয়ে থাকলেও, সবাই ভয় করলেও আমার মনের কথা আমি বলেই যেতে লাগলাম প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটিবার। অর্থাভাবের কথা বার বার বিবৃত করতে করতে এমনি অবস্থায় এসে পড়েছি বলে যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর জানালাম যে, প্রায়ই আহার মেলে না আমার, নৌকো ভাড়া করে থানায় হাজিরা দেবার মতো পয়সা নেই আমার, তার ওপর মা বাবার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার...... আর কত সয়?

কিছুদিন পর থানায় যাওয়া একেবারেই বন্ধ করে দিলাম। দারোগার ক্ষমতা ছিল না আইন অনুযায়ী আমায় গ্রেপ্তার করবার। রাজবন্দীরা গভর্ণমেণ্টের আদেশ লঙ্ঘন করলে থানার দারোগার কর্ত্তব্য হবে কালবিলম্ব না করে বিশেষ বার্ত্তাবহ মারফৎ জেলা পুলিশ সুপারকে সেই অভাবনীয় কাণ্ডের বিবরণ পাঠানো। তারপর সুপার যদি ভালো বোঝেন, তবে দারোগাকে নির্দ্দেশ দেবেন রাজবন্দীকে গ্রেপ্তার করবার। এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত থানার দারোগা পদাহত সর্পের মতো ফোঁসফোঁসাতে পারেন, পায়ে গুলী-খাওয়া খ্যাঁক শিয়ালের মতো দাঁত খিঁচোতে পারেন এবং খুব বেশী হলে গ্রেপ্তারের পাঁয়তারা কসতে পারেন। আমার ব্যাপারে যতীনবাবু বিশেষ বার্ত্তাবহ একবার নয়, বার-কয়েক পাঠিয়েও সুপারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙাতে পারলেন না।......

তার পরের ঘটনাবলী বেশ চমকপ্রদ।

এই চরম ব্যবস্থা অবলম্বনে মা'র কিন্তু সমর্থন ছিল না আদৌ। দাদারা বিদেশ থেকে মাসোহারা যা পাঠাতেন, তা ছাড়াও কিছু জমিজমা আছে আমাদের, দু'চারটে পুকুরও আছে, কয়েকশো ঘর মুসলমান প্রজাও আছে। তাই হেলায় ফেলায় না হলেও এক রকম করে চলে যেত। গভর্ণমেণ্টের কান ধরে ভাতা আদায়ের নীতি সমর্থন করলেও দাদা বা মা বাবা খেতে দেন না, এমনি নির্জলা ফাঁকি দেয়া মা'র ভাল লাগতো না। আর এই ঘোষণার অন্তরালে কোথায় যেন একটা কাঁটার খোঁচা অনুভব করতেন মা। খুব চাপা ছিলেন আমার সঙ্গে ব্যবহারে, তাই মনের বেদনা মনে রাখতেন চেপে যত দিন সম্ভব।

একদিন সকালবেলা তেল-মুড়ি খাচ্ছি আর নিবিষ্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাতা ওলটাচ্ছি, এমন সময় ধীরে ধীরে আমার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন মা।

বললেন: আজ বৃহস্পতিবার।

বললাম: হ্যাঁ, তা তো জানি। তোমার লক্ষ্মীপুজো আছে।

মা বললেন: তার জন্য তোমার ব্যস্ত হবার কারণ নেই। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আজও কি থানায় যাবিনে?

মৃদু হেসে জবাব দিলাম: না গিয়ে তো ভালই আছি মা। চৌকিদারের হাতে না যেতে পারার একটা কৈফিয়ৎ দিলেই যদি থানায় যাবার হাঙ্গামা চুকিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে মন্দ কি?

না, মন্দ আর কি! তবে সরকারী আদেশ অমান্য করলে তার ফলাফল নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার?

গ্রেপ্তার? গ্রেপ্তার তো হয়েই আছি।—হেসে জবাব দিলাম: হয়তো এখান থেকে আবার নিয়ে যাবে উলটো দিকে—গ্রামে বা কোনো বন্দিশিবিরে। তা নিক্, এখানে যেমন পদে পদে আইনভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে, বন্দিশিবিরে আর তা আদৌ থাকবে না। তখন বি. এ. পরীক্ষার পড়াটাও ভালো করে করতে পারবো। এ ব্যবস্থা ভালো নয় মা?

মা টেবিলের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন: তোর প্ল্যানমতো সরকার সব কাজ করবে বলে তুই ভাবলেও তারা তা নাও করতে পারে। থানায় না যাবার জন্য হয়তো তারা করলো মামলা, আর দিল দু'বছর জেল। সাধারণ কয়েদীর মতো কাটাতে হবে তখন। ঘানি ঘোরাতে হবে, ডাল ভাঙতে হবে, আরো কী কী যেন করায়?—বলে মা হেসে উঠলেন।

কাগজখানা বন্ধ করে রাখলাম। মা'র আশঙ্কা যে নিরর্থক নাও হতে পারে, তা বুঝিয়ে বললাম। তারপর বললাম: একেবারে মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত ওদের সঙ্গে আমার আপোষ-রফার কোনো কথাই উঠতে পারে না মা!

সত্যিই, মা'র আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা জানা গেল দিনকতক পরই।

সর্ব্বশেষে যে পত্রখানা গভর্ণমেণ্টের সমীপে পাঠিয়েছিলাম আমি, তাকে একেবারে চরম পত্র বলা যায়। লিখেছিলাম: যে বাড়ীতে আমার খাদ্য মেলে না, শোবার স্থান পাই না, সেখানে থাকা আমার কেন, কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং চাকরি একটা খুঁজে নিতে হবে আমায় পেট চালাবার জন্য। এর মধ্যে কলকাতায় একটা চাকরির সন্ধান পাওয়া গেছে। অতএব, হে বৃটিশরাজ, আগামী মার্চ্চ মাসের পনেরো তারিখে আমি কলকাতা রওনা হচ্ছি। যাচ্ছি হাঁটা-পথে ঘোলঘরের বাজার হয়ে, শ্রীনগর থানা ডাইনে রেখে, রাড়িখাল গ্রামের স্কুলের পাশ দিয়ে একেবারে কাদিরপুর ষ্টেশনে। রওনা হবো দুপুরে খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে।

প্রস্তুতি চললো আমার এবং বুঝলাম ও-পক্ষেও প্রস্তুতি চলছে সতর্কতার

সঙ্গে। প্র্যাগ সাহেব কোনোই জবাব দিলেন না, মহকুমা হাকিম কালিপদ মৈত্র বোধহয় চরম পত্রখানা বাজে কাগজের ঝুড়িতেই দিয়েছেন ছুঁড়ে ফেলে, যতীনবাবু এক-আধবার পরিদর্শনে এলে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখলাম তাঁর মুখ।

সংঘর্ষ অনিবার্য্য মনে হলো। আমিও এবার আর কৌশল নয়, একেবারে নীতি হিসাবে গ্রহণ করলাম এই চ্যালেঞ্জ। সত্যিই পনেরো তারিখে রওনা হবার জন্য রেডি হলাম।

বাবা খানিকক্ষণ রাগারাগি করলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে দাগা দেয়াই যে আমার মতো বুদ্ধিমান ছেলের উদ্দেশ্য, শ্লেষ দিয়ে বার বার একথা উচ্চারণ করলেন। মা অত্যন্ত নীরব, প্রতি কার্য্যে তাঁর গাম্ভীর্য্য প্রকট দেখা যেতে লাগলো। বৌদিরা কাছেও ঘেঁসলেন না, কারণ তাঁরা দেবরের সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় বহুবার পেয়েছেন পারিবারিক জীবনে। সমিতির ছেলেরা এমনি প্রতিকুল অবস্থা স্বীকার করে নিয়েই তো নেমেছে এই সাংঘাতিক পথে। তাই মনের কোণে একটা কাঁটা বিঁধলেও মুখের রেখায় সে বেদনার বিন্দুমাত্র আভাসও দেখা গেল না তাদের।...যাত্রা করবার দিনটি অতিক্রত এগিয়ে আসতে লাগলো।

অকস্মাৎ বারোই মার্চ্চ আমাদের বাড়ী তল্লাসী হলো। নামমাত্র তল্লাসী। শেষে যতীনবাবু জানালেন যে, থানায় হাজিরা না দেবার জন্য আমায় গ্রেপ্তার করা হলো।

চমৎকার। এর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। ধাপে ধাপে উত্তেজনা সৃষ্টি করে যে কাহিনী অতি দ্রুত ক্লাইমেক্স-এর শিখরে উঠতে চলেছে, এমনি একটা কিছু না হলে তা মনোজ্ঞ হবে কেন ?...চলে এলাম শ্রীনগর থানায়। সেখান থেকে পরদিনই গিয়ে হাজির হলাম মুন্সীগঞ্জ সাব জেলে। প্রথম শ্রেণীর বিচারাধীন আসামীর পর্য্যায়ে রাখা হলো আমায়।

পরদিন অপরাহ্নে যথারীতি জেল পরিদর্শনে এসে কালিপদ মৈত্র আমার দীর্ঘ জুলপী দেখিয়ে বললেন হেসে : এই দেখ, যুগান্তর দলের চিহ্ন, কানের ডগা পর্য্যন্ত জুলপী।—আর কলার-তোলা হাফ সার্ট দেখিয়ে বললেন : আর এই হচ্ছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের প্রতীক—Don Dare Devil মারবার জন্য রিভলবার যেন উঁচিয়েই রেখেছে—অ্যাঁ।—বলে হো হো করে হেসে উঠলেন, সঙ্গী মহকুমা পুলিশ অফিসারও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে।

ঊনচল্লিশ

সে যুগে মহকুমার ক্ষুদ্রাকার জেলে (যাকে সহজ ভাষায় বলা হয় সাব জেল) পদার্পণের সৌভাগ্য জীবনে যার একটিবার হয়েছিল, নিশ্চয়ই আজও তার স্মৃতিপটে প্রস্তর ফলকে লেখার মতো খোদিত হয়ে আছে অবিস্মরণীয় একটি ব্যক্তির কথা, তিনি আর কেউ নন—জেলের কেরাণী বাবু। তিনি কেরাণী, তিনি এ্যাকাউনটেণ্ট, তিনি কিচেন-ম্যানেজার, তিনি জেলর এবং কার্য্যতঃ তিনিই সাব জেলের প্রবল পরাক্রান্ত সুপারিনটেনডেণ্ট। কাগজেকলমে অবশ্য মহকুমা হাকিমই মহকুমা জেলের সুপার, কিন্তু এই শিখণ্ডীর আড়ালে থেকে পরম নিশ্চিন্তে শাসন-শায়ক ছাড়েন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ কেরাণীবাবু মহাভারতের অর্জ্জুনের মতো। আপনার কোনো যুক্তিই যুক্তি নয়, যদি মহামান্য কেরাণীবাবু তার মর্ম্ম উপলব্ধি করতে না পারেন। আপনার কোনো সকরুণ আর্জ্জি বা রোরুদ্যমান আবেদন কোনোদিনই হাকিমের দরবারে প্রবেশাধিকার পাবে না, যদি না কমাণ্ডার-ইন-চীফ কেরাণীবাবু তাতে স্বাক্ষর করে পাসপোর্ট প্রদান করেন। কেরাণীবাবুর বিনয়াবনত ও অনড় ঔদাসীন্যে মরিয়া হয়ে উঠে যদি কোনোদিন আপনি ছয়শো অশ্বারোহীর লাইট ব্রিগেডের মতো অপরিমিত দুঃসাহস দেখিয়ে সোজাসুজি স্বয়ং হাকিমের সম্মুখেই আপনার বক্তব্য পেশ করে বসেন, তাহলে আপনার ভাবাবেগের বন্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার পুর্ব্বেই স্মার্ট মহকুমা হাকিম মিষ্টি করে দুটি হাল্‌কা কথা বাতাসে ছেড়ে দেবেন: কেরাণীবাবু, নোট করুন তো।

খুশী হয়ে উঠলেন আপনি এই ভেবে যে, এতদিন পর তবু কর্ত্তার কান পর্য্যন্ত পৌঁছলো আপনার আকুতি, হয়তো উৎফুল্লও হয়ে উঠলেন এই আশায় যে, এইবার নিশ্চয়ই একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হয়ে সুবিচার পাবেন আপনি আগামী দু'চার দিনের মধ্যেই। কিন্তু কেরাণীবাবুর নোট বইয়ের পাতা প্রতিদিনই দু'চারখানা করে এগিয়ে চলে, পেছন ফিরে তাকায় না তারা উনিশশো পাঁচ সালের বিপ্লবী বাংলার মতো। তাই ফুরিয়ে-যাওয়া নোট বইটি একদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে চিঠি বার-করে-নেয়া এনভেলপের মতো, আর একদিন জমাদার তাকে নিয়ে গিয়ে বিসর্জ্জন দেয় কোনো ডাষ্টবিনে, কোনো ডোবায় বা কোনো আঁস্তাকুড়ে। সুতরাং একদিন নয়, দু'দিন নয়, দশ দিনও নয়, মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করতে হবে আপনাকে বিরহিণী যক্ষ-প্রিয়ার মতো। সে প্রতীক্ষার আর নেই শেষ।...এমন কি, আপনার অস্তিত্বের ঝুঁকি নিয়ে এরই মধ্যে যদি আবার একদিন কম্পিতপদে এগিয়ে এসে ভীতি-ভগ্ন কণ্ঠে অধীনের বিনীত নিবেদনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন মহকুমা হাকিমকে,

তাহলেও এবং তার অনেক—অনেকদিন পরেও অনন্তকাল ধরেই হাকিমের শ্রীমুখে শুনতে পাবেন সেই একই অমৃত-বাণী বন্ধ-হয়ে-যাওয়া ঘড়ির বারোটা বেজে-থাকার মতো : কেরাণীবাবু, নোট করুন তো।

নোট বই সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তাতে বাজারের তেল নুণ-তালের হিসেব থেকে সুরু করে বাৎসরিক ব্যালান্স-সীট সবই টুকে রাখা আছে। কিন্তু ঠিক যে অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে তিনি হুজুরের হুকুম তামিল করেন নোটবুকে নোট করে, ঠিক তেমনি উৎকট উৎসাহের সঙ্গেই তিনি নোট-করা কথাগুলো একেবারে কবরস্থ করে ফেলেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার চাপে। যেন আর-একটি মিশরের মমী তৈরী করবার গুরুভার কাঁধে নিয়েছেন সাব জেলের কেরাণীবাবু।......শুধু রেকর্ড ঠিক রাখবার জন্যই মহকুমা হাকিম সারাটি দিন আদালতে হাজারো' মামলার ঝামেলা সইবার পর গৃহে প্রত্যাগমনের পথে প্রতিদিন অপরাহ্নে একবার এই সাব জেলের গরীব-খানায় আসেন হাতীর পা ফেলে নগণ্য বাসিন্দাদের ধন্য করে দেবার জন্য! যত কিছু অভিযোগই করা যাক্, যত আবেদনই জানানো হোক্, সবার জবাবে ঐ একই বাণী শোনা যায় তাঁর মুখে : কেরাণীবাবু, নোট করুন তো।...

সে সময় কেরাণীবাবুর এই লোভনীয় উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, সুরেন মৈত্র। মহকুমা হাকিম ছিলেন কালিপদ মৈত্র। এই দুই বারেন্দ্র মৈত্রের নিবিড় মিত্রতার ফলে মুন্সীগঞ্জ সাব জেলের সাধারণ কয়েদীদের তখন দুর্দ্দশার আর অবধি ছিল না এবং যে দু'চার জন বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন, তাঁরাও খুব অবমানিত বোধ করতেন।

বাইরে থেকে কোনো বন্দী প্রথম জেলে এলেই অথবা এখানকারই কোনো বন্দী সারাদিন আদালতে কাটিয়ে দিনের শেষে ফিরে এলেই প্রহরারত সিপাই প্রত্যেকের দেহ তল্লাসী করতো একেবারে তাদের উলঙ্গ করে। স্বদেশী আসামী হলেও বড় একটা রেহাই দেয়া হতো না। আর সাধারণ বিচারাধীন আসামীদের এরা নিশ্চিন্তে খাটিয়ে নিত তাদের মামলার ফলাফল বেরুবার পূর্ব্বেই। রান্নার জল টানা, রান্না করা, তরকারি কাটা, মাছ কাটা, মশলা বাটা, কয়লা ভেঙ্গে উনুন ধরানো সব কাজই এদের করতে হতো। আবার পান থেকে চুণ খসলেই 'চলতো সিপাইদের হাতে বেদম প্রহার। যে ক'জন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী ছিল, তাদের মেথর, ধোপা, নাপিত ও ঝাড়ুদারের কাজ করতে হতো আর প্রায় সময়ই হাকিম বা কেরাণীবাবুর বাড়ীর কাজে এরা ব্যস্ত থাকলে এদের কাজগুলোও এসে পড়তো বিচারাধীন আসামীদের স্কন্ধে। বিচারে নিরপরাধ সাব্যস্ত হয়ে এদের মধ্যে যারা ঘরে ফিরে যেত, তাদের অনেকেরই পিঠে কালশিরের চিহ্ন সহজে মিলিয়ে যেত না।

একটিমাত্র বৃহৎ কক্ষ সর্ব্বশ্রেণীর পুরুষ কয়েদী ও [illegible] জন্য নির্দ্দিষ্ট, তারপর সুউচ্চ দেয়ালের ওপারে জেনানা ফাটক অর্থাৎ নারী

আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষুদ্রাকার কক্ষ। স্বদেশী বন্দীদের সাধারণ কয়েদীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবার জন্যই রাখা হয় ঐ জেনানা ফাটকে। স্বদেশীরা বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীর মতো ব্যবহার পেতো কেরাণীবাবুর হাতে। সাধারণ কয়েদী, এমন কি, বিচারাধীন আসামীদেরও তাঁদের ধারে ঘেঁসতে দিতে চাইতেন না তিনি। বসন্ত রোগ বড্ড ছোঁয়াচে, বলা যায় না!…কিন্তু নারী আসামী থাকলেই এই রেসপেকটেবল্ ডিসট্যান্স আর রক্ষা করা সম্ভব হয় না, স্বদেশীদের বাধ্য হয়ে স্থান করে দিতে হয় ঐ বৃহৎ কক্ষেই, সবার সঙ্গেই। তখন কেরাণীবাবুর আর এক রূপ দেখা দেয়—আই বি-গিরি। স্বদেশীদের ওপর শ্যেনদৃষ্টি রাখতে হয় স্পাই মারফৎ এবং সুযোগ ও সাধ্যমত নিজেকেই। আর জল পরিমাপকারী ষ্টীমারের খালাসীর মতো ঘন ঘন রিপোর্ট পেশ করতে হয় হাকিমকে, নয় তো ঢাকায় বুদ্ধি বিভাগের অফিসে আর নয় তো উভয়কেই।

আমি যখন এলাম মুন্সীগঞ্জের সাব জেলে, তখন একটি নারী আসামী ছিল বলেই আমার স্থান নির্দিষ্ট হলো সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় বৃহৎ কক্ষে সবার সঙ্গে।

কিন্তু বোধহয় তৃতীয় দিনেই সুরেন মৈত্রের সঙ্গে আমার বেশ এক পশলা বচসা হয়ে গেল।

জেলের মধ্যেই ক্ষুদ্র একটি সব্জী বাগান, তাতে কিছু কিছু তরকারি ফলেছে। বেশ বড় বড় বেগুন, টমেটো, ওলকপি ফলেছে, আলুর গাছ বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে। একদিন বিকেলে গাছে জল দেবার সময় একজন আসামী একটি লাল টমেটো ছিঁড়ে খায়। সবাই শপথ করে যে, এই দুর্ঘটনা তারা কোনক্রমেই বেফাঁস হতে দেবে না। সহকর্মী ও রুম-মেটকে তারা কেরাণীবাবুর কোপাগ্নি থেকে রক্ষা করবেই। কিন্তু পরদিনই তা কেরাণী বাবুর কানে পেঁাছে যায় এবং বিচারকরূপে অপরাধীকে "কম্বল ধোলাই" দণ্ডে দণ্ডিত করে জেলের জল্লাদরূপে কেরাণীবাবু নিজেই এলেন বিচারকের হুকুম তামিল করতে।

বাধা না দিয়ে পারলাম না। বললাম: কেরাণীবাবু, আপনার হুকুম প্রত্যাহার করতে হবে?

চমকে উঠলেন ঔরংজেব যশোবন্ত সিংহের ঔদ্ধত্যে: কেন দ্বিজেন বাবু?

কারণ অতি সহজ, আপনার আদেশ বে-আইনী।

বিস্মিত হলেন কেরাণীবাবু: বে-আইনী!

জবাব দিলাম: আজ্ঞে হ্যাঁ। বিচারাধীন আসামী আর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীদের মধ্যে যে পার্থক্য অনেক, তা তো আপনার অজানা নয়, কেরাণী বাবু। বিচারাধীন আসামী আপনার এখানে কয়েদীতে পরিণত হয়েছে দেখছি। তাদের দিয়ে দিব্যি মেহনতি কাজ করিয়ে নেয়া হচ্ছে।

সেটাই আপনার বে-আইনী কাজ। তারপর যে গাছগুলোকে জন্ম থেকে তারা এত বড় করে তুললো জল দিয়ে পরিচর্য্যা করে, সেই গাছের একটি ফলও তারা ছুঁতে পারবে না, আপনাদের এই আদেশ অমানুষিক ও বর্ব্বরোচিত। এই আদেশ না মানাই উচিত।

চমকে উঠলেন চাণক্য মহারাজ নন্দের স্পর্দ্ধায়: বলেন কি দ্বিজেনবাবু!

আমাদের চারিদিকে ততক্ষণে দু'চার জন আসামী এসে দাঁড়িয়ে গেছে। দু'একজন কয়েদীও বার বার তাকিয়ে দেখছে উত্তাপের পারা কতখানি ঠেলে ওঠে! আমি বললাম ক্রুদ্ধকণ্ঠেই: এমনিই আমরা বলে থাকি কেরাণীবাবু। উঁচু দেয়ালের আড়ালে আপনারা নিরীহ ও নিরপরাধ লোক-গুলোর ওপর কী অত্যাচারই না করেন, আমরা তার প্রতিবাদ জানাই। আসামীই হোক, আর কয়েদীই হোক, তার গায়ে হাত তোলবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে? কেন আপনার সিপাইগুলো যখন তখন ওদের চড়-চাপড় দেয়?

একটু চঞ্চলতা দেখা দিল। কেরাণীবাবু আশেপাশে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে পরিস্থিতি উপলব্ধি করে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করবার চেষ্টা করে বললেন: যাক্, শাস্তি না-হয় আমি না-ই দিলাম, কিন্তু গাছের ফল এমনিভাবে যদি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, তাহলে ক্ষতি তো ওদেরই। ওদের জন্যই তো এই বাগান।

কয়েদী রহমৎ খুনের দায়ে জেল খাটছে। জীবনেরই যে পরোয়া করে না, কেরাণীবাবু তো তার কাছে মেষশাবক! হঠাৎ সে বলে উঠলো: মিছা কথা কন্ ক্যান বাবু? বাগান আমাগো লইগা, না আপনাগো লইগা? তরিতরকারী যা হইবো, তার সবটাই তো যায় হয় হাকিমের বাড়ী নয় তো আপনার বাড়ী।

কেরাণীবাবু তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন: অ্যাঁ, বলিস কি রে হারামজাদা?

রহমৎ ওতে দমবার পাত্র নয়। বললো: হারামজাদা কন্ আর যাই কন্ বাবু, এই বাগানের তরকারি আমাগো ভাইগ্যে জোটে না। তাই কি করুম, চুরি কইরাই খাওনের সাধ মিটাইতে হয়। হারাণ খাইছে একটা, আমি খামু দশটা।

এবার জমাদার এগিয়ে এল হুজুর কেরাণীবাবুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। বললো রহমৎকে: এই শালা, হাঠ হিঁয়াসে। যা, লম্বরমে যা, নাই তো মারতে মারতে ইট বানাইয়ে দিব।

বললাম: কেরাণীবাবু, বাগানের তরকারি নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে কয়েদীদের জন্য খরচা লিখে হিসাব খাতায় একটা মোটা অঙ্ক ব্যয় দেখানো যায়, তা আমি জানি। কিন্তু এই প্রতারণা আর চলবে না। এখানে যখন এসেই পড়েছি, তখন এর শেষ একবার দেখবোই।— রহমৎ, কাল এই বাগানের

বাঁধাকপির তরকারী হবে আর টমেটোর চাটনী আর আলু দিয়ে ওলকপির ডালনা—দেখা যাক্, কালিপদ মৈত্র কী করতে পারে। রাজী সবাই ?

রহমৎপ্রমুখ সকলে হল্লা করে আনন্দ প্রকাশ করলো। কেরাণীবাবু মুখখানা হাঁড়ি করে বেরিয়ে গেলেন বেগতিক দেখে।

রাত্রে আমাদের কক্ষে রীতিমত একটা সভা বসে গেল। রাজনৈতিক বন্দী মাত্র আমরা দু'জন—সত্যেনবাবু আর আমি। পরদিনের অভিযান সম্পর্কেই আলোচনা হলো। যারা দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী, তারা একবাক্যেই মত দিল বাগানের তরকারি খাবার অধিকার তাদেরই। যারা বিচারাধীন অর্থাৎ যাদের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত, দেখা গেল তাদের মধ্যেই কিছু মতভেদ আছে। নিরীহ ও নির্বিরোধী যারা, তারা গভীর আশা পোষণ করে যে, বিচারে তারা নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হবেই ; সুতরাং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবার সম্ভাবনা যখন প্রবল, তখন মিছেমিছি কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদ করে লাভ কি ? আর একদল আছে, এমনি দল বোধহয় সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালের রাজনৈতিক দলগুলিতেই দেখা গেছে ও দেখা যাবে, যারা সবাইকে এগিয়ে দেবার বেলায় যেমন সর্ব্বাগ্রে নেমে আসে রাস্তায়, তেমনি প্রথম বুলেটের শব্দ শুনেই তারা সর্ব্বাগ্রে গিয়ে আশ্রয় নেয় নিরাপদ কোটরে। যুদ্ধের প্রস্তাব এরা শুধু সমর্থন করে না, অনেক সময় তা উত্থাপন করে এবং যুদ্ধ সমর্থন করে এদের ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা গমকে গমকে একেবারে পঞ্চমে ওঠে এবং সভাস্থলে অগ্নিস্রাব ছড়িয়ে ছড়িয়ে যেন শ্রোতাদের মনে জাগিয়ে দেয় হত্যার নেশা·· কিন্তু তার পর সত্যিই যখন একদিন রণতুর্য্য বেজে ওঠে, শিবিরে শিবিরে সাজো-সাজো রব পড়ে যায়, হ্রেষারবে ও বৃংহণে আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে প্রতি-ধ্বনিত, নায়কের গুরুগম্ভীর আদেশবাণী শোনা যায়, তখন এদের আর খুঁজেও পাওয়া যায় না।……পলাশী প্রান্তর-প্রান্তে সিরাজউদ্দৌলার শিবিরে আসে দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ—কেউ অসুস্থ, কেউ অন্যত্র সাংঘাতিক ব্যস্ত, কেউ গোপনে পলায়িত, কেউ হয়তো শম্বুকের মত নিজের মধ্যেই অন্তর্হিত।……

সে রাত্রে কিন্তু ফ্লোর নিল একা রহমৎ, 'বি' ক্লাস কয়েদী। অত্যন্ত ধারালো ভাষায় সে তার বক্তব্য এমনিভাবে উচ্চারণ করলো যে, অকস্মাৎ মনে হয় সে বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক সভার সত্যিই জনৈক যুক্তিবাদী বক্তা। বললো : কোদালি চালাইয়া মাটি কাটছি আমরা, বীজ ছড়াইছি, এতটুক চারা গাছে জল দিয়া-দিয়া এতটা বড় করছি, সেই গাছে ফলছে টমেটো। খাউক—হাকিম খাইতে চায়, কেরাণীবাবু খাইতে চায়, খাউক, কিন্তু তাই বইলা আমরা কি একটাও খাইতে পারুম না ? এ ক্যামন বিচার রে মশয় ? আপনাগো মনে কি আছে খোদা জানে। আমি তো কাইল সকাল হইতেই আগে গোটাচারেক কফি আইনা ফালাইয়া দিমু গাঙ্গুলী কর্ত্তার পায়ের কাছে, তারপর যা হয় হোক্। সাত বছর তো থাকতে হইবেই, না-হয় থাকুম আরও দুই-চাইর মাস!

শ্রোতাদের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করলো: সিপাইরা যদি লাঠি চালায়, যদি বন্দুক লইয়া আইসে, তাইলে?

রহমৎ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: আরে, ও হারামীর বাচ্চাদের ঠাণ্ডা করনের দাওয়াই আমার লগেই আছে। বিশ্বাস হয় না, ছাখবেন?—বলেই সে একটা ম্যাজিক দেখিয়ে দিল। গলায় একটা আঙুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে বমি করবার মতো বারকয়েক শব্দ করলো তারপর মুখের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে টেনে বার করলো একটি সোনার বিছে হার, বললো: একটা না, এমনি তিনটা আছে। ছিড়া টুকরা টুকরা কইরা শালাগো হাতে দিলেই, বন্দুকের গুলী আর ছুটবো না, বোঝছেন?—বলে রহমৎ মনের আনন্দে হা-হা করে হাসতে লাগলো। কিন্তু হারছড়া সে বেশীক্ষণ আর বাইরে রাখলো না, আবার মুখে পুরে গিলে ফেললো।

গিলে ফেললেই হারছড়া কিন্তু গলার মধ্য দিয়ে সোজাপথে গিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে না। এদের গলার মধ্যে বোধহয় জিহ্বার গোড়ার দিকে টনসিলের কাছাকাছি স্থানে একটি গর্ত্ত থাকে, যাকে এদের ভাষায় বলা হয়, খোপড়। শোনা যায়, চোরের দলে নাম লেখাতে এলেই শিক্ষকদের প্রথম পাঠ হয় খোপড় তৈরী। মার্ব্বেলের মত সাইজের একটি সীসের বল গলার মধ্যে রেখে-রেখে ওখানটা খইয়ে ফেলা হয়, ধীরে ধীরে ওটা নরম মাংসের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরী করে। প্রায় চার ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত তৈরী হবার পর সীসের বল ফেলে দেয়া হয়। হাত সাফাই করে টাকাপয়সা, আংটি, দুল, লকেট, নাকছাবি, এমন কি, একটি গোটা হার বা একটা ফাউনটেন পেনও ঐ গর্ত্তে লুকিয়ে ফেলা যায়। জেলের মধ্যে নানারূপ অতিরিক্ত সুবিধে আদায়ের জন্ম পাকা কয়েদীরা খোপড়ে ভরে টাকা, পয়সা বা সোনার টুকরো নিয়ে আসে। রহমৎও এনেছে। টাকা দিলে যে সাপকেও বশ করা যায়, বন্দীরা তা জানতো। তাই রহমতের কথায় ও সন্ত সন্ত হারের প্রদর্শনীতে তারা বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

পরদিন কেরাণীবাবু বেশ একটা চাল চাললেন। তিনি এলেন না, এল হেড জমাদার, বললো, হাকিমবাবু নাকি আমায় তাঁর বাড়ীতে চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। অনায়াসেই সে-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, কিন্তু কালিপদ মৈত্রের মুখোমুখি ঝগড়া করে কিছু সুবিধে আদায় করা যায় কিনা, দেখবার জন্তই যাওয়াই স্থির করলাম। রহমৎকে বলে গেলাম আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আইন অমান্ত স্থগিত রাখতে। রেডি থাকবে, কিন্তু আমি ফিরে এসে সুইচ অন্ করবো।

মুন্সীগঞ্জ সাব জেলের পাশেই একটি বহু প্রাচীন দুর্গ আছে, তার নাম, যতদুর মনে পড়ে, ইদ্রাকপুর ফোর্ট। কোন্ কালে কে তৈরী করেছিলেন জানিনে। শুধু দেখেছিলাম, এর প্রধান ইমারতটি গোলাকার ও তার একাংশ একেবারে মাটির নীচে বসে গেছে। সেই গোলাকার ইমারতের ছাদে

কালিপদ মৈত্রের সুদৃশ্য বাংলো ধরণের গৃহ। অত্যন্ত প্রশস্ত অনেকগুলো সোপান বেয়ে ওপরে উঠে আসতেই ভ্যালেট স্বয়ং কেরাণীবাবু এসে অভ্যর্থনা জানালেন আমায়: আসুন, আসুন দ্বিজেনবাবু,—এই ঘরে বসুন। সাহেব এলেন বলে।

বেশ সাজানো ঘর। সোফাসেট, টিপয়, কাঁচের আলমারীভর্তি বই, ফুলদানী, দরজা জানালায় রঙ্গীন ফুল-আঁকা পরদা।

কিন্তু সাহেবের আসতে দু'চার মিনিট দেরী হওয়াতে কেরাণীবাবু আমায় আপ্যায়িত করতে চেষ্টা করলেন: রাত্রে বোধহয় আপনার খুব কষ্ট হয় দ্বিজেনবাবু, তাই না? যে মশা—

হ্যাঁ, তা হয়।—জবাব দিলাম।

কেরাণীবাবু বলতে লাগলেন: তার ওপর আবার ঐ নোংরা লোকগুলোর সঙ্গে থাকা, সে এক ভীষণ ব্যাপার! ভদ্রলোকের পক্ষে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। কিন্তু কী আর করা যায়, মেয়ে আসামীটাই তো বিভ্রাট বাধিয়ে দিলে। নইলে ওদিকের ঘরটা চমৎকার! সত্যেনবাবু আর আপনার পক্ষে গ্র্যাণ্ড হতো।

কী হতো আর কী হতে পারলো না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য আমি এখানে আসিনি। তাই চুপ করেই রইলাম। কেরাণীবাবু কিন্তু চুপ করে থাকলেন না, বলে যেতে লাগলেন: তা আমি হাকিম সাহেবকে বলেছি, মেয়েটার মামলা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলুন হুজুর, ওটাকে ঢাকায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হই। নইলে জামিনেই ছেড়ে দিন। দ্বিজেনবাবুদের একটু সুবিধে করে দিই। আপনিও একটু বলুন না দ্বিজেনবাবু! আপনার অনুরোধ হুজুর না রেখে পারবেন না।

বললাম: আমি তো আপনার হুজুরকে কোনো অনুরোধ জানাতে এখানে আসিনি কেরাণীবাবু। চা খাবার নিমন্ত্রণ তো একটা অছিলামাত্র! কেন ডেকেছেন, সেটা আপনার জানা থাকলে আপনিই বলে ফেলুন না। ওদিকে রান্নাবান্নার সব রেডি যে।

না, না, অছিলা কেন, সাহেব নিজে বলেছেন আমায়।—কেরাণীবাবু গায়ের জোরে বললেন, কিন্তু কথাটা যে আদৌ উপাদেয় লাগলো না তাঁর, তা তাঁর মুখের চেহারাতেই স্পষ্ট বোঝা গেল। কী করবেন স্থির করতে না পেরে যখন দিশেহারার মত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় স্লিপিং স্যুট পরে কক্ষে প্রবেশ করলেন স্বয়ং কালিপদ মৈত্র। রক্ষা পেলেন সুরেন মৈত্র।

প্রত্যূষে রেস্তোরাঁয় সংবাদপত্র খুলে বসে মৌজ করে চা পানের সময় মনটা যেমন হয়ে ওঠে হালকা এবং তারপর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার থেকে সুরু করে একেবারে মুচীরাম গুড়ের সম্বন্ধে নানাবিধ মুখরোচক আলোচনায় যেমন চায়ের কাপে তোলা যায় মেদিনীপুরের ঝড়, অমিতবিক্রম কালিপদ মৈত্র তাঁর ড্রয়িং রুমটিকে যেন তেমনি একটি চাচার হোটেলে

পরিণত করে বসলেন এবং হাকিমী খোলসটা একেবারে পরিত্যাগ করে হাসি পরিহাসে ও ঠাট্টাতামাসায় একেবারে উত্তাল হয়ে উঠলেন।

বুঝতে দেরী হলো না আমার যে, কালক্ষেপই এই বারেন্দ্র যুগলের একমাত্র উদ্দেশ্য। ও'দিকে আইন অমান্য করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে অস্ত্রহীন অক্ষৌহিণী, একটিমাত্র অঙ্গুলি হেলনে তারা বাগান আক্রমণ করবে অহিংস-ভাবে। উত্তেজনা টগবগ করে ফুটছে তপ্ত কটাহে তেলের মতো। ঠিক এই সময় প্রয়োগকর্ত্তাকে কৌশলে যদি অকুস্থল থেকে সরিয়ে রাখতে পারা যায়, তাহলে দপ্ করে জ্বলে-ওঠা আগুন খপ্ করে নিভেও যেতে পারে, এই এঁদের পরিকল্পনা। কিন্তু ফাঁদে গলা বাড়িয়ে দেবার মত নিরীহ গোবেচারা আমি নই। তাই আসল কথাটা এবার নিজেই বলে ফেলতে কসুর করলাম না: শুনুন, গল্প করবার জন্যই যদি আমায় ডেকে থাকেন, তাহলে অন্য সময় আসবো, আরও বেশীক্ষণ থাকতে পারবো। এখন আমি আর সময় নষ্ট করতে পারছি না। চলি।

বলে উঠতে যেতেই প্রায় হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন হাকিম মৈত্র: আরে বসুন, বসুন দ্বিজেনবাবু। চা না খেয়ে যাবেন, সে কি একটা কথা হলো? তারপর আসল কথাটাই এখনো হয়নি আপনার সঙ্গে। শুনুন। কাল আপনার ভাই রঙ্গলাল এসেছিল আপনার মামলার খবর করতে। বললাম, দাদাকে নিয়ে যাও সামান্য একটা জামিনের ব্যবস্থা করে। রঙ্গলাল আপনাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু বলতে পারে না, বললো। আমি বললাম তখনই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে। এল না, বললো, ওর নাকি অনেক কাজ আছে, সময় হবে না। অবশ্য আমি আজও রঙ্গলালকে বলে দিয়েছি আমার সঙ্গে কোর্টে দেখা করতে। তা কী বলবো তাকে?

স্পষ্ট জবাব দিলাম: জামিন তো আমি চাইনি মিঃ মৈত্র। আইন ভঙ্গ করবার আলটিমেটাম দিয়েছিলাম, আপনারা তার পূর্ব্বেই আমায় নিয়ে এলেন এখানে। আমার দাবীর তো কোনো ফয়সালা হয়নি, তাই বাইরে গেলে যে আবার আমি কলকাতা রওনা হবো।

হে-হে করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলেন কালিপদ মৈত্র। কিন্তু কথা কইলেন কেরাণীবাবু: আরে মশাই, কেন এমনি মশার কামড় খাবেন বলুন তো। মশারি আছে, টাঙ্গাবেন না। কারণ, আর কারুর মশারি নেই। ঐ ছোটলোক বদমায়েসদের জন্য এই মমতার কোনো মানে হয়, আপনিই বলুন না। আজ ওরা আপনাকে মাথায় করে নাচছে, কাল বাইরে গিয়ে আপনারই ঘরে সিঁধ কাটতে ওদের এতটুকু চক্ষুলজ্জা হবে না।

জবাব দিলাম না এসব কথার, দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। বললাম: আচ্ছা, চলি তাহলে।

কিন্তু চা—

চা আর আমি খাবোনা।

তবু আবার বাধা দিলেন কালিপদ : কিন্তু আর আপনাকে চাকরির জন্য কলকাতায় যেতে হবে না, গভর্ণমেণ্টই আপনার চাকরির ব্যবস্থা করেছেন।

মানে ?

মানে, আপনারই জেদ বজায় রয়েছে। গভর্ণমেণ্ট আপনার পনেরো টাকা মাসিক ভাতা মঞ্জুর করেছেন। And you are the only Detenu interned at home throughout Vikrampore, who is granted a monthly allowance—খুশী হলেন তো ?

আমি খুশী হলেও কালিপদ মৈত্র যে আদৌ খুশী হওয়া দূরে থাক্, অত্যন্ত অবমানিত বোধ করেছেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্র্যাশের এই অহেতুক উদারতায়, তা নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল তাঁর ললাটের কুঞ্চিত রেখায়। মনের ক্রোধ অনেক কষ্টে ঢেকে রাখতে হয়েছে তাঁকে।

খুব অল্প কথায় কালিপদের প্রশ্নের জবাব দিলাম : হ্যাঁ, হলাম। কিন্তু সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। আমাদের পিকনিকের রান্নাও এখনো চড়েনি বোধ হয়। সিপাইকে ডাকুন, কেরাণীবাবু, আমি এখন যাবো।

বলে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করলাম না। বাইরে আসতেই জনৈক প্রহরী আমার সঙ্গ নিল এবং জেলের গেট পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল। রহমতের নেতৃত্বে গোটা আটেক ফুলকপি তখন তোলা হয়ে গেছে, কিছু টমেটো, ওলকপি আর সের পাঁচেক আলু। আমি জামাটা খুলে ফেলে কোমরে গামছা জড়িয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে এইসব উত্তেজনাকর মুহূর্ত্তগুলি কূটনীতিবিদ্ বৃটীশ বা তাদের প্রতিনিধি ম্যানেজ করে থাকে। বাধা তারা আদৌ দিতে এল না, কারণ বেশ জানে বাধা কেউ মানবে না আর বাধা দিয়ে আটকানোও যাবে না। তাই তারা তাচ্ছিল্য করলো এই অভিযানকে এবং তারই মধ্য দিয়ে ফুটে উঠলো অভিযানকারীর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা ও অবাঙ্ময় তিরস্কার! আমরা বাগানের তরকারি সেদিন পেট ভরে শুধু খেলাম না, দিনের শেষে আমাদের আরও গোটাকতক দাবী যোগ দিয়ে আর একখানা আবেদনপত্র পাঠালাম হাকিম সাহেবের কাছে এবং স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলাম, আমাদের দাবী পুরোপুরি পুরণ না হলে দশদিন পরেই অনশন সুরু করা হবে অহিংস সত্যাগ্রহী হিসেবে।

কিন্তু সে সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অনশন আর সুরু করা সম্ভব হলো না ঐ কালিপদ মৈত্রেরই কূটনৈতিক চালে। জামিনে মুক্তি দেবার টোপ তো তিনি ইতি-মধ্যে ফেলেই দিয়েছিলেন রঙ্গলালের মারফৎ। রঙ্গলাল কালিপদের কাছে খুব মেজাজ দেখিয়ে চলে এলেও বাড়ীতে এসে মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতেই মা তাকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি সুরু করলেন জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্য। রঙ্গলালের সমস্ত যুক্তি মায়ের আবেগ ও উৎকণ্ঠার বন্যায় স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভেসে গেল। মুন্সীগঞ্জ ফিরে এল রঙ্গলাল এবং আমাদের পারিবারিক

মোক্তার যতীন চক্রবর্ত্তী তৎক্ষণাৎ জামিনের আবেদন পেশ করলেন হাকিমের দরবারে।

সেদিন আমার মামলার তারিখ ছিল। মামলা যে কী হবে, তা তো জানাই ছিল। যে মাসিকভাতা নিয়েই এত গণ্ডগোল, আলটিম্যাটাম ও আইন অমান্যের আয়োজন, সেই ভাতাই যখন মঞ্জুর হয়ে গেছে, তখন মামলার উত্তাপও যে অনেকখানি কমে গেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবুও বৃটিশ ক্রাউনের আত্মম্ভরিতার ইস্পাতে পাছে বিন্দুমাত্রও দাগ লাগে, বুদ্ধির পাশাখেলায় পাণ্ডবদের মতো সে একটি দানও হেরে গেছে বলে পাছে কারুর মনে সন্দেহ হয়, তাই বাইরের ঠাট সে যথারীতি বজায় রেখেই চলবে, এ আমার অজানা ছিল না। তাই সেদিনকার মামলার তারিখে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়েই আমি আদালতের পুলিশ অফিসে এসে উপস্থিত হলাম দেহরক্ষিসহ। কিন্তু দেখা গেল, কোর্টে হাজির করবার উৎসাহ যেন এদের একেবারেই নেই। ব্যাপার কি, ঠিক ঠাহর করতে না পেরে দারোগাবাবুকে ও কোর্ট ইনসপেক্টরকে জিজ্ঞেস করাতে তাঁরা উত্তরটাকে একেবারে পাশ কাটিয়ে গেলেন। বিকেলের দিকে অকস্মাৎ রঙ্গলাল এসে হাজির। বিস্ময়ের অবধি রইল না।

কি রে, তুই এসেছিস যে?

তোমায় নিয়ে যেতে।

নিয়ে যেতে!

হ্যাঁ, নিয়ে যেতে। তোমার জামিন হয়ে গেছে।

ক্রুদ্ধ হলাম: জামিনের দরখাস্ত করলি কেন আমায় জিজ্ঞেস না করে?

রঙ্গলাল জবাব দিল: কী করি, মাকে বোঝানো গেল না। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে ছেড়েছেন যে, আগে জামিনের দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করবো, নইলে নাকি রাজী হবে না তুমি জামিনে বাইরে আসতে।

আরো রাগ হলো: যা, দরখাস্তখানা ছিঁড়ে ফেলগে, আমি যাবো না।

রঙ্গলাল বলে উঠলো: বল কি, দরখাস্ত মঞ্জুর হয়ে গেছে বললাম যে।

কত টাকা?

মাত্র একশো। ইতিমধ্যেই দরওয়াজা অর্থাৎ হাজতের দ্বাররক্ষী সিপাই এসে দরজা খুলে দিল। অর্থাৎ শুধু হুকুম নয়, হুকুম তামিল করা সুরু হয়ে গেছে। বাইরে এলাম। রঙ্গলাল বললো: কালিপদ মৈত্র বললেন জেলের মধ্যে নাকি তুমি ভারী গণ্ডগোল সুরু করেছ? Hunger stike করবে বলে নাকি ordinary কয়েদীর সঙ্গে জোট পাকিয়েছ?

জবাব দিলাম না এসব প্রশ্নের। কালিপদ মৈত্রকে একটা শিক্ষা দেবার সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে গেল।……

চল্লিশ

সুবোধ ছেলের মত বাড়ী ফিরে এলেও দুরন্ত রাজবন্দীর মতো আবার ডুবে গেলাম গুপ্ত সমিতির কাজে। মাসিক ভাতায় সুবিধে হলো খানিকটে আর্থিক দিক থেকে। এর সঙ্গে গোটা দুই টিউশনিও নিলাম জোগাড় করে, ফলে মাসিক আয় দাঁড়ালো মোট পঁয়তাল্লিশ টাকা। অর্থাৎ যাকে বলে উপার্জ্জনশীল রাজবন্দী।

যতদুর মনে পড়ে, ২০শে মার্চ্চ ফিরে এলাম বাড়ীতে আর ২৬শে মার্চ্চ আবার তল্লাসী হলো আমাদের বাড়ী। যথারীতি আপত্তিজনক কিছুই না পেয়ে দারোগা যখন তল্লাসী মালের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরম্‌খানা পুরণ করছিলেন, তখন মৃদুস্বরে জানালেন আমায় যে, রঙ্গলালকে একবার থানায় যেতে হবে। রঙ্গলাল বাড়ীতে ছিল না তখন, কোথায় গেছে তা জানি না বলে দিলাম। কিন্তু তমিজদ্দী চৌকীদার তাকে নাকি বাজারে দেখে এসেছে এই একটু আগেই। সুতরাং দুটো সাদা পোষাক-পরা পুলিশ নিয়ে মহা উৎসাহে সে হাসাড়া বাজার অভিমুখে যাত্রা করলো। এইবার সে কাজ দেখাবেই!

রঙ্গলাল তখন বিপদভঞ্জনের সঙ্গে বাজারের সওদা খরিদে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় তমিজদ্দী এসে হাজির। সঙ্গী পুলিশদের পোষাক সাদা হলেও আমাদের সাদা চোখেই ধরা পড়তো তারা! সুতরাং ব্যাপারটা অনুধাবন করতে ওদের একটুও বিলম্ব হলো না। তমিজদ্দীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দু'জনের চোখের কোণে একটা ইসারা ঝলসে গেল। বিপদভঞ্জন তৎক্ষণাৎ নাটকীয় অভিনয়ের মতো কণ্ঠস্বরে ভাবাবেগের বন্যা বইয়ে দিয়ে বলে উঠলো : দাদা, আবার কত কালের জন্য চলেছেন আমাদের অসহায় করে, নিঃসম্বল করে, আমাদের অকূল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে, কে বলবে? যদিও বয়সে আপনি দাদার মতো, তথাপি কাজের মধ্য দিয়ে সত্যিই আপনাকে পেয়েছিলাম আমরা একেবারে একান্তভাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। প্রতিদিনকার মেলামেশায় হয়তো কখনো তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, আশা করি, সেজন্য ক্ষমা করবেন আমাদের ছোট ভাই মনে করে। বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে চলুন, তবু একসঙ্গে বসে একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই আপনাকে!

শেষদিকে আবেগে বিপদভঞ্জনের কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল! বোধহয় আর একটু হলেই তার চোখে অশ্রু দেখা দেবে, এমনি অবস্থায় সে রঙ্গলালের হাত ধরে নিয়ে এসে উঠলো মহেন্দ্র ঘোষের মিঠাইয়ের দোকানে। দরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এল তমিজদ্দীরাও। দোকানের উত্তর দিকেই খাল আর খালের উত্তরেই শান্তি সোমের বাড়ী। সুতরাং দোকানের পেছন দিকে, যেখানে উত্তপ্ত প্রকাণ্ড কড়াইতে রসগোল্লাগুলো সন্তরণ করছিল মনের আনন্দে,

সেখানে এসে উপস্থিত হলো দু'জনে এবং অনুচ্চকণ্ঠে বললো বিপদভঞ্জন : এইটুকু পারবেন তো সাঁতরে পার হতে? ওপারে উঠে শান্তিদা'র বাড়ীতে লুকিয়ে পড়লে শালা তমিজদ্দীর বা পুলিশের বাবারও ক্ষমতা হবে না—

রঙ্গলাল বললো : যাক্, কয়েকটা রসগোল্লা খাওয়া যাক তো, নইলে দোকানের পেছনে আসা নিয়ে ব্যাটা সন্দেহ করতে পারে।

রসগোল্লা চললো এবং সঙ্গে চললো সুযোগের প্রতীক্ষা। পকেটে টাকা পয়সা যা ছিল, ইতিমধ্যেই হাত সাফাই করে রঙ্গলাল তা ভরে দিয়েছে বিপদের পকেটে। আয়োজন সম্পূর্ণ, রঙ্গলাল খালে নিঃশব্দে নেমে পড়বে। ঠিক এমন সময় বোধহয় কিছু একটা সন্দেহ করেই তমিজদ্দী অকস্মাৎ এসে হাজির হলো একেবারে রসগোল্লার কড়াইয়ের পাশে।

প্রমাদ গুনলো ওরা দু'জন। তবুও চেষ্টা করতে দোষ কি? বিপদ বলে উঠলো : এ কি, এখানে যে চৌকিদার?

সবিনয় নিবেদন করলো তমিজদ্দী : না—এমনি। গরম রসগোল্লা কি ভালো লাগবো কর্ত্তা? সেরখানেক লইয়া চলেন, থানায় বইসা খাইবেন 'খনে। আমরাও পামু দুই চাইরডা—

আর রসগোল্লা! সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। রসগোল্লা বিপদের কাছে একেবারে নীরস ময়দার গোলা মনে হতে লাগলো।

রঙ্গলালকে নিয়ে যাবার পর দু'এক দিনের মধ্যেই সংবাদ পেলাম, সেরাজদীখা গ্রামে আমাদেরই জনৈক সদস্যের বাড়ী ঐদিনই তল্লাসী করে কিছু রিভলভারের কার্ত্তুজ পাওয়া গেছে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এতে কিন্তু আদৌ চিন্তিত হলাম না। কাজে নিযুক্ত থাকাকালে কে কোথায় ছিটকে পড়ে গেল, কার ওপর নেমে এল হাজতবাসের দুর্দ্দিন, আই বি অফিসে কার তলব পড়লো, সে হিসাব রাখতেন তাঁরা, মোটা পরদার অন্ধকার অন্তরালে বসে যাঁরা দলীয় কর্ম্মতৎপরতার কল টিপতেন।......

কিন্তু দু'চার দিন পরই মুক্তি পেয়ে ফিরে এল রঙ্গলাল। জানতে পারলাম তার মুখে অমানুষিক অত্যাচার চলেছিল তার ওপর। কোনো কৌশল, কোনো ভদ্রতা, কোনোরূপ বিচার না করে নির্ব্বিবাদে হাণ্টার চালিয়েছে তার সর্ব্বশরীরে আই বি-র দারোগা মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। নামটি আমার মনে দাগ কেটে বসে গেল পাথরে লেখার মতো।......

মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী! দি স্কাউণ্ড্রেল!

এর দু'এক দিন পরই অকস্মাৎ একদিন বিকেলে মণীন্দ্র হন্তদন্ত হয়ে আমার এখানে এসে হাজির। ব্যাপার কি?

ব্যাপার সংক্ষেপে সে যা জানালো, তা হচ্ছে এই : নাণ্টু ঘোষ, মতিলাল মল্লিক আর মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় দু'একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ নারায়ণগঞ্জ শহরের অনতিদূরে দেওভোগ গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় জনকতক মুসলমান

কৃষক তাদের সম্মুখীন হয়। কৃষকদের নানারূপ প্রশ্নের স্বাভাবিক জবাব তারা ঠিকই দিয়ে যাচ্ছিল এবং আশা করছিল এবার তারা রেহাই পেয়ে যাবে।

কিন্তু অকস্মাৎ ওদের মধ্যে একজন বলে উঠলো: সে যাই হোক, আপনাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। চারিদিকে এত ডাকাতি হচ্ছে যে, কে যে ডাকাত নয়, তা বলা শক্ত। কাজেকাজেই চলুন আমাদের বাড়ীতে, সকাল হোক, পাড়ার আরো দশজন আসুক, তারপর তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাদের যেতে দোব।

চট্ করে মাথায় রক্ত উঠলো মধুর। কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা বড় বড় তার চক্ষুদুটিতে অগ্নিকণা চক্ চক্ করে উঠলো। দেরী করা নিরর্থক মনে করে সে কোটের পকেটে হাত দিতে যেতেই নান্টু বাধা দিল, মুসলমানকে সম্বোধন করে বললো: শোন ভাই, অনর্থক তোমরা হায়রানি করছো আমাদের। আমাদের শহরে যেতে দাও। ডাকাত বলে বৃথাই সন্দেহ করছো আমাদের।

কিন্তু যুক্তির ধার ধারে না মুসলমান চাষী। সে তার গোঁ ছাড়তে নারাজ আর তার ওপর সর্বান্তঃকরণ সমর্থনও পেয়েছে আশেপাশে সবার কাছ থেকে। সুতরাং স্পর্দ্ধা তার উত্তাল হয়ে উঠলো। সে হুকুম করে বললো একজনকে: এই, দাঁড়িয়ে না থেকে এই তিনজনকে ধর, ধরে নিয়ে যা আমার বাড়ী, বৈঠকখানায় আটকে—

কথা তার শেষ হতে পারলো না। অকস্মাৎ গর্জ্জে উঠলো মতিলালের রিভলবার এবং তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হলো সেই মুসলমান কমাণ্ডার-ইন-চীফ। বেঁচে আছে কিনা বোঝা গেল না। মধুও গুলী চালালো, বোধহয় তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

তাড়া করলো ওরা এদের তিনজনকে। ছুটে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মতিলাল। ধরা পড়লো চাষীদের হাতে। অবশিষ্ট দু'জনের জন্ত আর ততটা উৎসাহ নেই ওদের। মতিলালকেই সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেল।

ছুটে পালাতে গিয়ে নান্টু তার চশমা হারিয়ে এসেছে। কোথায় পড়ে গেছে। আর পশ্চাদ্ধাবনরত চাষীরা যে ইষ্টকবৃষ্টি করছিল, তার একটি এসে পড়েছে একেবারে নান্টুর চোখের উপর। মণীন্দ্র বললো: নান্টুদা'র চোখটা লাল হয়ে ভয়ানকভাবে ফুলে গেছে। আদৌ ভালো হবে কিনা কে জানে। আর চশমা তাঁকে জোগাড় করে দিতে হবেই দু'এক দিনের মধ্যেই। নইলে, সর্বদাই যে পুরু কাঁচের চশমা ব্যবহার করতেন, তাঁকে চশমাহীন অবস্থায় দেখলে এবং চোখে আঘাত লেগেছে দেখতে পেলে লোকের মনে নানা প্রশ্ন জাগতে পারে।

খাল সাঁতরে নান্টু আর মধু এসে উঠেছে মণীন্দ্রের বাড়ীতে। দু'চার দিনের জন্ত ওদের থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেওভোগের উত্তেজনা

না কমে যাওয়া পর্য্যন্ত এবং এর জের কতদূর যায়, তা না দেখে তো আর এরা দু'জন প্রকাশ্যে বার হতে পারে না। নাণ্টু মণীন্দ্রের ওখানেই থাকবে, কারণ সেরাজদীঘাতেই একজন বিশ্বাসী চশমাবিক্রেতা আছে, যার কাছ থেকে সে চশমা নিতে পারবে বাড়ীতে ডাকিয়ে এনে। শুধু মধুর একটা থাকবার ব্যবস্থা—

তৎক্ষণাৎ বললাম: আমাদের বাড়ীতে পেঁীছে দিয়ে যাও।

বিস্মিত মণীন্দ্র প্রশ্ন করলো: আপনার এখানে?

হেসে জবাব দিলাম: তাই তো ভালো। সব চাইতে সেফ। দারোগারা এসে দেখে যায় শুধু আমায়, ভেতরে কোনো পলাতক আসামী থাকতে পারে, এ তারা ধারণাও করতে পারে না। শুধু তল্লাসী। তা সে সময় ওকে পেছন দিক দিয়ে সরিয়ে ফেলা যাবে। যাও, মধুকে নিয়ে এসো এখানে।

কিন্তু মতিলালের জন্য মণীন্দ্রের মন খচ খচ করছিল, তা বুঝতে পারলাম। সে বললো: কিন্তু মতির কী দশা হলো, কে জানে। বি ভি-র আর একটি কর্ম্মীকে বোধহয় হারাতে হলো।

দৃঢ়স্বরে বললাম: এই পথটাই এমনি মণীন্দ্র যে, দেনা-পাওনার হিসেব করে এতে চলা যায় না। পাওনার ঘরে যখন শূন্য, একেবারে শূন্য থাকে, তখন দেনার ঘর তুলতে হয় কাঁপিয়ে। খালি দিয়েই যেতে হয়। যা দিয়েছ, যা দিচ্ছ, যা দেবে, তারও কোনো হিসেব থাকে না। নিশিদিন শুধু দিয়েই যেতে হয় তিলে তিলে, আপনাকে খইয়ে, দুমড়ে, মুচড়ে একেবারে নিঃশেষ করে। তবুও মনে হয়, যা দেবার তা বোধহয় দিতে পারলাম না। পাওনার সংবাদ নিয়ে তো আর বিপ্লবের পথে পা বাড়াওনি মণীন্দ্র। এটা ব্যবসা নয় যে, লাভের অঙ্কটার একটা হদিস নিতে হবে। একে বলে নিছক্ আত্মবলিদান। দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন।......তুমি যাও, আর দেরী করো না। সন্ধ্যের পরই মধুকে এনে পেঁীছে দিয়ে যাবে।

মণীন্দ্রের আশঙ্কা মিথ্যে হয়নি। পরে স্পেশাল ট্রাইবিউনালে মতির বিচার হয় এবং তার প্রতি ফাঁসীর আদেশ হয়।

একদিন আমিও গেলাম তাজপুরে মণীন্দ্রের বাড়ীতে গভীর রাত্রে। নাণ্টুর চোখ তখন অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, চশমাও একটা নেয়া হয়েছে। মতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো নাণ্টু। দেওভোগের ঘটনার পরদিনই ঢাকা শহরে অনেকগুলো বাড়ীতে তল্লাসী হয় এবং হরিপদদের ওখানে পাওয়া যায় একটি আটঘরা অটোমেটিক পিস্তল ও পাঁচটি তাজা কার্ত্তুজ। তবুও সেখানকার ঢেউ ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ রইলো, বিক্রমপুরের দিকে আর এলো না দেখে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এইখানেই দাৰ্জ্জিলিং শহরে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর এবং জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে হত্যা করবার জন্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স যে

পরিকল্পনা করেছে, সে সম্বন্ধে নাণ্টুর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। পরিকল্পনার মূলে যিনি ছিলেন, তিনি আর কেউ নন, বহরমপুর বন্দীশিবিরের সেই যতীশ গুহ, যিনি অকস্মাৎ সবার আগেই সর্ত্তহীন মুক্তি পেয়ে আমাদের ঠাট্টা করে একখানা দশ টাকার নোট দেখিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখনই উল্লেখ করেছি যে, তাঁকে মুক্তি দিয়ে সরকারী বুদ্ধি বিভাগ কী নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছিল, ক্রমশ: তা জানা যাবে। যে নীতির বশবর্ত্তী হয়ে ওরা আমায় স্বগৃহে অন্তরীণ করেছিল, ঠিক সেই ভ্রান্ত নীতির ফলেই যতীশ বাবুকে ওরা বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেয়। তেমনিভাবে কামাখ্যা রায়কেও। এঁদের সঙ্গে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সম্পর্ক প্রকাশ্যভাবে পুন:স্থাপিত হলেই যে আই বি-র উদ্দেশ্য সফল হয়, তা জানতো বি ভি-র কর্ম্মীরা। তাই খিড়কি দ্বার দিয়ে চলতো আনাগোনা, গভীর নিশীথে চলতো সলাপরামর্শ।......

নাণ্টু মোটামুটি জানালো যতীশ গুহের পরিকল্পনা। দার্জ্জিলিং শহরে পৌঁছে ছেলেরা কোথায় থাকবে, কীভাবে থাকবে এবং কীভাবে লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গভর্ণর যখন ঘোড়দৌড় দর্শনে মত্ত থাকবেন, তখন ভবানী ও রবী...সবই বললো নাণ্টু। পরিশেষে life for life-এর জন্য জন দুই ছেলে পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলো আমায়। বলে দিলাম বিপদভঞ্জন ও সুবোধের কথা। নাণ্ট বললো যতীশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সে যথাসময়ে জানাবে আমায়। পরে অবশ্য জানিয়েছিল, এদের আর দরকার হবে না।

কিন্তু লেবং-এর ঘটনা বিবৃত করবার পূর্ব্বে সে সময়ে চট্টগ্রামে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, তার একটুখানি আভাস দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

চট্টগ্রামে তখন প্রবল উত্তেজনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। মহানায়ক মাষ্টারদা' জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসীর প্রতীক্ষা করছেন, তেমনি তারকেশ্বর দস্তিদারও। সারা বাংলার বিপ্লবীদের চোখে নিদ্রা নেই, মুহূর্ত্তের নেই বিরাম। বিশেষ করে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা একেবারে অধীর হয়ে পড়েছেন। ক্রোধের আতিশয্যে তাঁরা নিজেদের হাত কামড়াচ্ছেন! একটা কিছু করতে হবে।......

১৯৩৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর শহরের দেয়ালে দেয়ালে দেখা গেল লাল ইস্তাহার: হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্ম্মির চট্টগ্রাম শাখা ঘোষণা করছে যে, আজ এই মুহূর্ত্ত থেকে নরনারী নির্ব্বিশেষে শহরের সমস্ত ইয়োরোপীয়দের নির্ব্বিচারে হত্যা সুরু হবে। দয়াদাক্ষিণ্যের আবেদন বা যুক্তির তারা ধার ধারে না।

৭ই জানুয়ারী ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে অগণিত দর্শকের সম্মুখে। খেলা পরিদর্শনে মত্ত সবাই লক্ষ্যই করলো না যে মোটবাহক কুলির ছদ্মবেশে চারজন ভদ্রলোকের ছেলে মাঠে এসে প্রবেশ করলো এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে স্থান গ্রহণ করলো সমবেত ইয়ো-

রোপীয় নরনারীর ঠিক পশ্চাতে। মাঠের পাশেই একটি উঁচু টিলা, খেলা শেষ হলে ইয়োরোপীয়েরা জড়ো হয়েছেন সেই টিলার ওপর, এমন সময় পুলিশ সুপার টিলার পশ্চাৎ দিকের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন মোটরে। অকস্মাৎ সেই নির্জ্জন রাস্তায় দু'জন ভদ্রলোকের ছেলেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে তাঁর সন্দেহ হলো। মোটর থামালেন তিনি এবং দেহরক্ষীকে আদেশ করলেন ওদের দু'জনের দেহতল্লাসীর জন্য। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। নেমে এলেন তিনি নিজে সশস্ত্র ড্রাইভারসহ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার উদ্দেশ্যে।

তৎক্ষণাৎ একজন ছেলে তাঁর প্রতি একটি বোমা নিক্ষেপ করলো এবং ভীষণ শব্দে তা বিস্ফোরিত হলো। কিন্তু আহত হলো না কেউ। প্রত্যুত্তরে সশস্ত্র ড্রাইভারের রিভলভারের গুলী ছেলেটির ফুসফুস ফুটো করে দিল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তার প্রাণহীন দেহ। ড্রাইভারের আর একটি গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পুলিশ সাহেবের হাতে বিদ্ধ হলো। দ্বিতীয় ছেলেটি পলায়নের চেষ্টা করায় সাহেবের দেহরক্ষী তার পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং কিছুতেই তাকে ধরতে না পেরে অবশেষে সে তুলে ধরলো রিভলভার। গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লো ছেলেটি এবং সেইদিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হলো।

কিন্তু কুলীর ছদ্মবেশে যারা মাঠে প্রবেশ করেছিল, তারা এই দুর্ঘটনার সংবাদ হয় জানতো না, নয় তো জানবার প্রয়োজন ছিল না তাদের। যে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে তারা, তা সম্পূর্ণ করবার জন্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। যদি তাতে দিতে হয় প্রাণ, তবুও। তাই তারা ছুটে এল টিলার সম্মুখে, পর পর ছয়টি বোমা নিক্ষেপ করলো ইয়োরোপীয় নরনারীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু হায়, একটিও বিস্ফোরিত হলো না। বেগতিক দেখে অপরে বেল্ট থেকে টেনে বার করলো রিভলভার, ছ'বার গুলীবর্ষণ করলো ওদের লক্ষ্য করে, কিন্তু আশ্চর্য্য, একটি গুলীও কাউকে আহত করতে পারলো না। ফলে যা হয়, তাই হলো। ধরা পড়লো সবাই।

ঐ দিনই, ঐ ৭ই জানুয়ারী তারিখেই বিপ্লবীরা হানা দিল গৈরালা গ্রামে নেত্র সেনের বাড়ীতে। এইখানেই ধরা পড়েছিলেন সূর্য্য সেন নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা তা ভোলেনি, ভুলতে পারে না। যে বিশ্বাসহন্তা স্তূপীকৃত রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে বিনাদ্বিধায় মাষ্টারদা'কে তুলে দিতে পেরেছে ক্যাপ্টেন ওয়াম্‌স্‌লির হাতে, তাকে কি ভুলতে পারে চট্টলের বিপ্লবীরা ?......

নেত্র সেন আহারাদির পর শোবার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় এল এরা। থানা থেকে বা নিকটস্থ আই-বি শিবির থেকে হয়তো কোনো বার্ত্তাবহ নিয়ে এসেছে জরুরী কোনো সংবাদ! মহাউৎসাহে নেত্র সেন প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বাড়ীর বাইরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো এরা তাঁর ওপর—

যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মধ্যম পাণ্ডব দুঃশাসনের বুকের ওপর। রিভলভার নয়, বোমা নয়, তীক্ষ্ণধার ভোজালির আঘাতে আঘাতে একেবারে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললো তাঁর দেহ, ভীম পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললো তাঁর মস্তক! তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে অন্ধকারে জঙ্গলের পথে মিলিয়ে গেল তারা সরীসৃপের মতো।.....

পরদিনই প্রত্যুষে দেখা গেল বিপ্লবীদের ইস্তাহার চট্টগ্রাম শহরের দেয়ালে দেয়ালে। দেখা গেল কুমিল্লায়, নোয়াখালীতে, চাঁদপুরে। দেখা গেল ঢাকায়, ময়মনসিংহে, মেদিনীপুরে ও মুর্শিদাবাদে, দেখা গেল বাংলার প্রতিটি শহরে সেই একই বিপ্লবী ইস্তাহার। বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হয়ে গেল চট্টগ্রাম সেনট্রাল জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট, জেলার ও অসংখ্য জেলরক্ষী, যখন দেখা গেল সেই একই ইস্তাহারের একখানি আঁটা রয়েছে রাজবন্দী ইয়ার্ডের দেয়ালে আর স্বয়ং মাষ্টারদা'র ফাঁসীর ঘরের বাইরে।

মাষ্টারদা'কে বাঁচাবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। আইনের রক্তচক্ষু এই মহাবিপ্লবীর অন্তরের পানে ফিরেও চেয়ে দেখেনি, তাঁকে দস্যু, হত্যাকারী নামে অভিহিত করে চরম দণ্ডাদেশ উচ্চারণে এতটুকু কম্পিত হয়নি আইনের কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের জন্যও বিজলী চমকের মতো ঝলসে যায়নি তাদের মনে যে, নিপীড়িত জনগণের মুক্তি ও শান্তির জন্যই বিংশ শতাব্দীর ক্রুশে আত্মবলিদানে অগ্রসর হয়েছিলেন এই যীশুখৃষ্ট, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ চক্রহস্তে নেমে এসেছিলেন এই আধুনিক কালের মুরারি।......অনুগামীরা চেষ্টা করেছিল ডিনামাইট দ্বারা জেলের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে তাদের প্রিয় নেতাকে উদ্ধার করতে, পারেনি। ট্রাইবিউনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছিল, আপীল প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। নানাভাবে নানাজন চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ফাঁসীর আদেশ মকুব করতে, পারা যায়নি। সর্ব্বজনের সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর পরপারের মহাযাত্রী আত্মনিয়োগ করেছিলেন গীতাপাঠে, ধ্যানে ও প্রাণায়ামে।......

কিন্তু যাদের রেখে গেলেন তিনি পশ্চাতে, ইষ্টমন্ত্র যে তারা কখনো ভোলেনি, ভুলবে না, তারই জ্বলন্ত শপথ তারা শেষবারের মতো সেঁটে দিয়ে গেছে মাষ্টারদা'র ঘরের দেয়ালে। চিরবিদায় নেবার পূর্ব্বে অন্ততঃ জেনে যাবেন তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করেছে বাংলার বিপ্লবীরা। ঐ ইস্তাহারই তার সুনিশ্চিত স্বাক্ষর।......

একচল্লিশ

লেবং-এর স্মরণীয় ঘটনার পূর্ব্বে বাংলা দেশের আরও কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। যাঁরা এই সব কাজে অংশ গ্রহণ করেন বা সরাসরি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'একজন ব্যতীত আর কারুরই নাম উল্লেখ করলাম না কেন, আশা করি পাঠকেরা তার কারণ উপলব্ধি করবেন।

জানুয়ারী মাসে বীরভূমে একটি ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করা হয়। ফেব্রুয়ারীতে কলকাতার দু'জন পলাতক রাজবন্দীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বীরভূমের একটি পরিত্যক্ত চালের কলের মধ্য থেকে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও কয়েকটি তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। বরিশালের ঝালকাঠিতে একটি দোকানে পাওয়া যায় গোটাকতক তাজা বোমা। রংপুরের একজন উকিলের বাড়ী তল্লাসী করে পাওয়া যায় একটি লাইসেন্সবিহীন বন্দুক।

নলডাঙ্গা, কুড়িগ্রাম ও হিলি ডাকাতির মামলার রায় বেরুবার পরই মার্চ্চ মাসে রংপুর জেলায় বিপ্লবীদের তৎপরতা একটু বেশী দেখা দেয়। শহরের দেয়ালে দেয়ালে, ল্যাম্প পোষ্টে ও গাছের গায়ে বৈপ্লবিক ইস্তাহার আঁটা দেখতে পাওয়া যায়। ১৭ই মার্চ্চ জনকয়েক যুবককে রাস্তার মধ্যে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করে দুটি বন্দুক উদ্ধার করা গেলেও যুবকেরা সবাই পালিয়ে যায়। ১৯শে মার্চ্চ কলকাতার সন্নিকটবর্ত্তী আলমবাজারে জনৈক মহিলার গৃহ তল্লাসী করে পুলিশ হস্তগত করে দুটি অটোমেটিক পিস্তল। বরানগরে একটি গৃহসংলগ্ন বাগানে মাটির নীচে একটি সাবানের বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায় একটি রিভলভার, একটি পিস্তল ও অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ। বরিশালে স্থানীয় কলেজের জনৈক অধ্যাপকের গৃহ ও প্রাঙ্গণ তল্লাসীর ফলে পুলিশ হস্তগত করে অনেকগুলো বোমার খোল, অনেকগুলো তাজা কার্ত্তুজ, দুটো ছোরা, দুটো পিস্তল ও স্তূপীকৃত বিপ্লবী ইস্তাহার।

এপ্রিলের প্রথম দিকেই বালিতে জনৈক জমিদারের গৃহে গ্রেপ্তার হন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পলাতক আসামী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, বাংলার দলনির্ব্বিশেষে বিপ্লবীদের কাছে যিনি চিরকালের 'বিপিনদা'। ১৯৩১ সাল থেকেই তিনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। ১৬ই এপ্রিল ময়মনসিংহ রেলষ্টেশনে বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে দু'জন মুসলমান যুবককে রেলওয়ে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাদের মালপত্র তল্লাসী করে পাওয়া যায় একটি পাঁচঘরা রিভলভার। সরিষাবাড়ী থানার অন্তর্গত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তল্লাসী করে পুলিশ হস্তগত করে কতকগুলি রিভলভারের কার্ত্তুজ। ২৮শে এপ্রিল তমলুক থেকে আগত জনৈক যুবককে কলকাতার স্যাণ্ডেল ষ্ট্রীটে গ্রেপ্তার করা হয়, তার সঙ্গে ছিল একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও কতকগুলো কার্ত্তুজ।

এ ছাড়া আরও অনেকগুলো ছোটখাটো ঘটনার পর এল স্মরণীয় সেই ৮ই মে, ১৯৩৫ সাল। গ্রীষ্মকাল, বাংলার জবরদস্ত গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন সদলবলে গ্রাম্যাবাস দার্জ্জিলিং-এ এসেছেন। শহরের নীচেই লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ৮ই সেখানে ঘোড়দৌড় হচ্ছে। এই সময় দার্জ্জিলিং শহরে প্রায়ই ধনী লোকের আমদানী হয়ে থাকে, বিশেষ করে বাংলার রাজা-মহারাজারা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য রাজ্যের হাজারো গুরুতর কাজ ফেলে রেখেই ওপরে উঠে আসেন এবং ঘোরাফেরা করেন বিলিতি গভর্ণরের আশেপাশে যেমন করে রেস্তোরাঁর বয় ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায় টেবিল থেকে টেবিলে একখানা রূপোর থালা হাতে করে হুকুম তামিল করবার জন্য।

তখন অপরাহ্ণ, দৌড় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গভর্ণরের আসন বৈশিষ্ট্যপুর্ণ এবং এই বৈশিষ্ট্যপুর্ণ আসনে সময়োপযোগী রাজকীয় পোষাক পরিধান করে সমাসীন স্যার জন এণ্ডারসন। Governor's Cup দৌড় হচ্ছে এবার। প্রত্যেকের সর্ব্বমনোযোগ সেই দিকে। হুজুরের কাপ।......অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ও দেহরক্ষীর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এই রাজা-মহারাজার মাঝে নিঃশব্দে এসে উপবেশন করেছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের দু'জন কর্ম্মী—ভবানী চক্রবর্ত্তী ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিধানে চক্‌চকে সাহেবী পোষাক আর গৌরবর্ণ চেহারা, সুতরাং সন্দেহ হলো না কারুরই মনে।

দৌড় শেষ হয়ে গেল। ঘোড়াগুলোকে টেনে নিয়ে আসা হয়েছে ঘেরা জায়গায়, এবার জিন ও লাগাম খুলে ওদেরকে একটু বিশ্রাম করবার সুযোগ দিতে হবে পায়ে হেঁটে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। প্রত্যেকের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ, যেদিকে চেয়ে আছেন তাদের হুজুর।

ভবানী অনুচ্চস্বরে বললো: This is the time, let us start. Let both of us go to the front at point-blank range—চল্।

কিন্তু গভর্ণরের সম্মুখে না এসে রবী এল তাঁর দক্ষিণ দিকে এবং এসেই গুলী নিক্ষেপ করলো গভর্ণরের আসনের রেলিংয়ের ওপর হাত রেখে। একবার, দু'বার, তিনবার, এমন সময় বিহারের বারোয়ারীর জমিদার ভুপেন্দ্রনারায়ণ সিং ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর, ধরে ফেললেন তাকে। ঠিক সেই সময় পুলিশ সুপার ও দেহরক্ষীদের নিক্ষিপ্ত গুলীও রবীর শরীরে এসে বিদ্ধ হয়েছে। জোর করে তার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নেয়া হলো।

ভবানী কিন্তু এদিকে ফিরেও চাইলো না। কার্য্য সম্পাদনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সে, সহকর্ম্মীর দুঃখের দিকে ভ্রূক্ষেপ করবার তিলমাত্র অবসর তার কোথায়? রবীর পশ্চাতে একেবারে সোজা সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গভর্ণরের আসনের সম্মুখে, একেবারে point-blank range থেকে গুলী নিক্ষেপ করলো সে। প্রাণের ভয়ে গভর্ণর রেলিংয়ের নীচে শুয়ে পড়লেন,

লাথি খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর যেমন করে পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়ে কেঁউ কেঁউ শব্দ করে। প্রথম গুলী ব্যর্থ হওয়ায় ভবানী আবার উঁচিয়ে ধরলো আগ্নেয়াস্ত্র, এমন সময় অকস্মাৎ তাকে পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলেন পি ডবলিউ ডি-র ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ট্যাণ্ডি গ্রান। ভবানীও গ্রেপ্তার হলো।

......তারপর চললো পুলিশের বৈদ্যুতিক অভিযান......ঘিরে ফেলা হলো সমগ্র ঘোড়দৌড়ের মাঠ, দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে ছুটলো পুলিশ, ছুটলো মোটরবাসের ষ্ট্যাণ্ডে, আটক করলো শিলিগুড়িগামী সমস্ত প্রাইভেট মোটর ও ট্যাক্সি এবং লরী, মাঝপথে থামিয়ে ট্রেণের প্রত্যেকটি কামরা তন্ন তন্ন করে তল্লাসী চললো, পঙ্গপালের মতো ছড়িয়ে পড়লো আই বি ও পুলিশের দল একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের দুর্গন্ধ পেয়ে।......কিন্তু এদের সর্ব্বসতর্কতা ও প্রহরার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করে একেবারে দার্জ্জিলিং শহর থেকে ভবানী ও রবীর সহগামী যাঁরা নেমে এলেন কলকাতা শহরে, তাঁদের মধ্যেই ছিলেন বি ভি-র বিপ্লবিনী কিশোরী উজ্জ্বলা মজুমদার।

এই মামলার কথা যাঁদের মনে আছে, তাঁরাই জানেন, ক্রমে ক্রমে পুলিশ অনেককেই গ্রেপ্তার করে—মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চক্রবর্ত্তী, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, নান্টু ঘোষ এবং আরো জনকতক বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের সদস্য এবং অবশেষে উজ্জ্বলা মজুমদারকেও। মামলার সওয়াল করতে গিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর এই পরিকল্পনার পশ্চাতে যাঁদের বুদ্ধি কাজ করেছে, তাঁদের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন কামাখ্যা রায়ের নাম, যতীশ গুহের নাম। বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের এই দু'জনকে অতিবুদ্ধি দেখিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ করে এবং বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়ে কী মারাত্মক আত্মঘাতী ভুলই না করেছিল তখনকার বাংলার আই বি, সে সত্য মর্ম্মে মর্ম্মে তারা উপলব্ধি করলো।

পাবলিক প্রসিকিউটর উজ্জ্বলার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কোমলপ্রাণা নারীও যে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে কীভাবে নরহন্ত্রী হয়ে উঠতে পারে, এই কিশোরীই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাক্ষ্য ও দলিল থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, যতীশ গুহের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে নান্টু ঘোষ, মধু তাকে সাহায্য করে দক্ষিণ হস্তের মতো। তারপর যে ক্ষুদ্র দলটি দার্জ্জিলিং যাত্রা করে প্রস্তুত হয়ে, উজ্জ্বলাই ছিল সে দলের নায়িকা। সাধারণের মনে যাতে বিন্দুমাত্রও রাজনৈতিক সন্দেহের উদ্রেক না হয়, সেজন্য আধুনিকা বেশধারিণী এই স্মার্ট কিশোরী কিশোর সহকর্ম্মীদের নিয়ে এসে ওঠে একটি ব্যয়বহুল হোটেলে। সেখানে একই কক্ষে এরা বাস করতো। রাত্রে হোটেলের সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লে এই বিপ্লবিনী নায়িকা দার্জ্জিলিংএর শীতের প্রকোপে পাছে অকেজো হয়ে যায়, তাই রিভলভারের কার্ত্তুজগুলো আগুন জ্বালিয়ে সেঁকে নিত, সহকর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিত কীভাবে কাজ শেষ করতে হবে।......

লেবং-এর ঘটনার জের আমাদের বাড়ীতেও এসে পড়তে দেরী হলো না। পরদিনই ভোর না হতেই গোরা সৈন্তের একটি দলসহ প্রায় পঞ্চাশ জন লাল-পাগড়ী পুলিশ এসে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেললো। শ্রীনগর থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ তখন কলিমদ্দীন সরকার। কিন্তু তিনি আসেননি, এসেছেন এদের সঙ্গে নতুন একজন দারোগা, চিনিনে তাঁকে।

জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কোন্ থানার ?

ধমক দিয়ে জবাব এল : তা দিয়ে আপনার দরকার কি ? এখন যা বলি, তাই করুন।

চুপ করে গেলাম তীক্ষ্ণ মেজাজ দেখে। মনে মনে হাসিও পেল। আই বি বোধহয় এদের বুঝিয়েছে যে, লেবং-এ আমিও গিয়েছিলাম। কলিমদ্দীনকে পাঠায়নি, পাছে শ্রীনগর থানার দারোগা তাঁরই এলাকার রাজবন্দী বলে কিছু খাতির করে বসেন, তল্লাসীর কড়াকড়ি হ্রাস করে দেন। তাই পাঠিয়েছে ভিন্ন থানার কড়া মেজাজের লোক।

গোরা সৈন্তেরা আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের আম গাছগুলির নীচে অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে সামরিক রাইফেল, সঙ্গীন চড়ানো। একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পোষাক পরা। যেন সংগ্রাম করতেই বেরিয়েছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কঠিনতম শত্রুর সঙ্গে। ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলের ভাঙা ভাঙা দুর্ব্বোধ্য ইংরেজীতে নিজেদের মধ্যে কথা কইছে, একবর্ণও তার বোঝা দুষ্কর। ওদের যিনি কমাণ্ডাণ্ট, দেখলাম একটি হাণ্টারের মাথায় আঁটা কেমন একটা ইস্পাতের পাত প্রসারিত করে নিয়ে দিব্যি তার ওপর বসে সিগারেট ধরিয়েছেন। তল্লাসীর সঙ্গে যেন এদের সম্পর্ক নেই কিছু।

দারোগাবাবুর বোধহয় ভালো লাগলো না তা। তাড়াতাড়ি এসে কমাণ্ডাণ্টের কানে কানে কী যেন বলতেই কমাণ্ডাণ্ট অকস্মাৎ সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সামরিক আদেশ উচ্চারণ করে ওদেরকে আমাদের সমগ্র বাড়ীখানা বেষ্টন করে দাঁড় করিয়ে দিল। বোধহয় দারোগার ধারণা আমাদের বাড়ীর বোমা ও রিভলভার কারখানার শ্রমিকেরা খিড়কীর দ্বারপথে অথবা টিনের দেয়াল টপকে পালিয়ে যেতে পারে!

তারপর সুরু হলো স্মরণীয় তল্লাসী। সাদা পোষাকে আই বি-র যে লোকটি এসেছেন এই অভিযানকারী দলের সঙ্গে, তিনি অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে হস্ত ইসারায় আমায় একান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন : কিছু থাকে তো বলুন। আমি ওদেরকে অন্ত দিকে তল্লাসী করতে নিয়ে যাই, এই অবসরে সরিয়ে ফেলুন আপনি, নইলে পুকুরেই দিন না ফেলে।

চমকে উঠলাম শুভানুধ্যায়ীর নিঃস্বার্থ উপদেশের জন্ত। চোখের দৃষ্টিতে যেন দেখতে পেলাম গোখরো সাপের হাসি। কিন্তু অর্ব্বাচীন জানে না যে, অভিনয়ে আমিও বড় কম যাই না। বললাম : কিচ্ছু নেই।

লোকটা কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে দিল, বললো: মশাই, সরকারী নিমক খেয়েছি, বলা নিষেধ ; তবুও বলে দিচ্ছি আপনাকে, ওরা সবাই সব কথা বলে দিয়েছে, লেবং যাত্রার পূর্ব্বে ওরা সবাই নাকি আপনার এখানে এসে দিনকতক থেকে রিভলভারের নিশানা অভ্যাস করে গেছে আড়িয়ল বিলে। গ্রেপ্তার আপনাকে করবেই, কিন্তু তার ওপর মালপত্র যদি কিছু পেয়ে যায়, তাহলে আর রক্ষা করতে পারবো না আপনাকে ফাঁসী থেকে। একেবারে গভর্ণর কি না, তাও আবার যে সে নন, স্বয়ং জন এ্যাণ্ডারসন।

ফস্ করে প্রশ্ন করে বসলাম: দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—আমায় রক্ষা করবার জন্য আপনার এত উদ্বেগ কেন জানতে পারি কি?

লোকটি জবাব দিল: ঐ তো, বিশ্বাস হবে না আপনাদের, ভাববেন যা বলি আমরা, সবই মিছে আর লোকের মন্দ ছাড়া ভালো করিনে কখনও।—বিশ্বাস করুন দ্বিজেনবাবু, একেবারে ধর্ম্মতঃ সত্যি কথা বলছি, আপনাকে দেখতে ঠিক আমার ছোট ভাইয়ের মতো। এই তো সেদিন মারা গেছে সে। ঠিক আপনারই মতো মাথায় ঘন চুল আর চশমা। আপনারই মতো স্বাস্থ্য।······দীর্ঘনিশ্বাস একটি ত্যাগ করে তারপর লোকটি আবার বললো: তাই চাকরির মায়া ত্যাগ করে বলে দিলাম আপনাকে, যদি থাকে কিছু, বলুন, আমি নিজেই সরিয়ে ফেলছি। আমায় ওরা সন্দেহ করতে পারে না।

আবেদনের ভাষা ও তা উচ্চারণের কৌশল এত নিখুঁত যে, সত্যিই কেউ সহজে সন্দেহ করবে না এবং সরল বিশ্বাসে গলা বাড়িয়ে দেবে এই ধারালো গিলোটিনে। আমি কিন্তু অতটা সরল নই।······তাই অর্থবোধক হাসিতে মুখখানা ভরে ফেলে শুধু বললাম: বলেছি তো, কিছুই নেই।

ওদিকে পুরোদমে চলছে তল্লাসী। জনকতক পুলিশ দক্ষিণের কোঠায় ঢুকে পড়েছে। পুব দিকের দেয়ালে যে মোটা ফাটল দেখা দিয়েছে, লাঠি দিয়ে ওরা তার মধ্যেও খুঁচিয়ে দেখছে। বিছানাপত্র টেনে নামিয়েছে মেঝের ওপর, তারপর বালিশ ও তোষক মুচড়ে মুচড়ে দেখছে তুলোর মধ্যে কিছু লুকিয়ে রেখেছি কি না।

উত্তরের কোঠায় যারা ঢুকেছে, তারা পড়ে গেছে ফাঁপরে। এই ঘরে আছে গোটা ত্রিশেক ছোট বড় নানা সাইজের ট্রাঙ্ক, দুটো বাসন-কোসন ভর্ত্তি কাঠের সিন্দুক, একটি প্রকাণ্ড লোহার জাল দিয়ে ঘেরা আলমারী, চারখানা দেরাজের আর-একটি আলমারী, একটি বড় মিট্ সেফ, গোটা কয়েক সুটকেস এবং আরো মালপত্র। মাথার ওপর ঝুলছে কাপড় দিয়ে প্যাক করা গোটা দশেক লেপের বিরাটকায় বাণ্ডিল। হিন্দুস্থানী মগজ এসব দেখে একেবারে গুলিয়ে গেছে। এ কেয়া তাজ্জব বাত হ্যায়।······

এর পর একখানা দোতলা টিনের ঘর, তারপর রান্নাঘর, তারপর দক্ষিণের চারচালা টিনের ঘর···সব শেষে ওরা এল বাড়ীর পুব দিকের পরিত্যক্ত

আমাদের শরিক গাঙ্গুলীদের বাড়ীর জঙ্গলে ভরা প্রাঙ্গণে। কোদালি চালাতে লাগলো জনচারেক সিপাই।

এসবে আমার বিশেষ উৎসাহ ছিল না, উদ্বেগও ছিল না একবিন্দুও। কারণ সেদিন যা কিছু আপত্তিজনক ছিল আমার ওখানে, তার হদিস পাওয়া ওদের কর্ম্ম নয়।

ঘণ্টা চারেক তল্লাসীর পর একেবারে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেই অপরিচিত দারোগাপুঙ্গব যখন আবার আমার ঘরের টেবিলে এসে বসে দীর্ঘ তালিকায় ক্রস চিহ্ন দিতে লাগলেন, তখন ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞেস করলাম: পেলেন কিছু ?

কী করে পাবো ? সরিয়ে ফেললে সব আর পাবো কী করে ?—তারপরই বোধহয় পৌরুষে ঘা লাগলো শ্রীমানের! কপালে কুঞ্চনরেখা ফুটিয়ে তুলে প্রশ্ন করলো: ঠাট্টা করছেন বুঝি ?

বললাম: না, না, ঠাট্টা করবো কেন ? আপনার খুব পরিশ্রম হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। চা খাবেন ? এই রঙ্গলাল, একটু চা করতে বল রে হেনাকে। দারোগাবাবুকে—

Shut up—অকস্মাৎ গর্জ্জন করে উঠলো দারোগা, বললো: চালাকির আর জায়গা পাওনা, না ?—বলেই সে ঘরের বাইরে চলে এল। আমিও বাইরে এলাম সঙ্গে সঙ্গে। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম: কী বলছিস তুই ?

দারোগা বললো: যাও, ঘর থেকে গোটাকতক চেয়ার বাইরে এনে দাও, এঁরা সব বসবেন।—বলে সে ঐ গোরা সৈন্যদের দেখিয়ে দিল। ওরা সবাই আবার এসে জড়ো হয়েছে এক জায়গায়।

বললাম: সেজন্য গভর্ণমেণ্ট তোকেই তো চাকর রেখেছে। শুধু বসতে দিবি নয়, ওদের জুতোয় কালি লাগিয়ে ব্রাস করে দিবি। ব্যাটা ছোটলোক কোথাকার!

Shut up!—আবার গর্জ্জন করে উঠলো দারোগা।

সহ্য হলো না আর। অত্যন্ত উত্তেজনার ক্ষেত্রেও আমার মাথা ভারী ঠাণ্ডা থাকে বলে সুনাম ছিল আমার। কিন্তু কেন জানিনে, আজ সুরু থেকেই এই দারোগাকে সহ্য করতে পারছিলাম না; এইবার তা চরমে উঠলো! কসে এক লাথি মেরে দিলাম দারোগার তলপেটে। দারোগার বিরাট বপু ধুলিশয্যা গ্রহণ করলো।

ছুটে এল লালপাগড়ীর দল, ছুটে এল সাদা পোষাকপরিহিত আই বি-র লোক, ছুটে এল গোরা সৈন্যের কমাণ্ডাণ্ট, ছুটে এলেন বাবা ও মা, রঙ্গলাল ও বোন হেনা, সংবাদ পেয়ে ছুটে এল পাড়াপড়শী, কাকা ও কাকীমারা, এমন কি, রেণুও। সংজ্ঞাহারা ধরাশায়ী দারোগাকে সবাই ঘিরে দাঁড়ালো। মারাত্মক কাণ্ড একটা কিছু ঘটবেই। বাবা বলে উঠলেন: এ কি রে ?

মা বলে উঠলেন: এ কী কাণ্ড করে বসলি তুই ?

কাঁদো কাঁদো স্বরে রেণু বলে উঠলো : তুমি শেষটায় খুন করে বসলে দাদা ?

আমি শুধু স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে ধীরভাবে বললাম রঙ্গলালকে : এক ঘটি জল নিয়ে আয় আর একখানা পাখা।

বেয়াল্লিশ

নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনারা, এর পরই গোরা সেনাদলের সর্দার বিশ্রম্ভালাপ ত্যাগ করে স্বদেশের অবোধ্য কথ্য ভাষায় অকস্মাৎ জলদগম্ভীর স্বরে সামরিক আদেশ উচ্চারণ করলো :

Aim your—guns
Safety catch—forward
One round—fire

এবং তারপরই সেই বারোটি সামরিক রাইফেলের বারোটি তপ্ত সীসে এসে বিঁধলো আমার শরীরে, শরীর একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল দ্বিতীয় যুদ্ধে মুসোলিনীর মতো! কিন্তু তথাপি বেঁচে গেলাম রবার্ট ব্লেকের মতো অথবা মোহনের মতো। নইলে কি করে লেখা হবে রহস্য লহরী সিরিজ কিংবা মোহন সিরিজ? তাই নয় কি?

কিন্তু শুনে বিস্মিত হবেন আপনারা যে, আমার ন্যায় একজন সাধারণ যুবকের একটিমাত্র লাথি, তা সে যত প্রচণ্ডই হোক না কেন, তার ফলেই এমনি বিরাটকায় পুরুষটিকে একেবারে ধরাশায়ী হতে দেখে প্রথমটা গোরা সেনাদল চমকে উঠলো, তারপর চোখেমুখে ওদের ফুটে উঠলো সহাস্য কৌতুক, তারপর অকস্মাৎ ওদের দলপতি আমার কাছে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে অবোধ্য কথ্য ভাষায় একখানা গানই ধরে ফেললো, ট্রা-লা-লা-লা, ট্রা-লা-লা-লা......

দারোগাবাবুর ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে। প্যাণ্টের ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি একখানা রুমাল বার করে মুখমণ্ডল সম্মার্জ্জনা করছেন। আড়চোখে একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আমার প্রতি চকিতে নিক্ষিপ্ত রবিনহুডের তীরের মতো, কিন্তু নীলকণ্ঠের মতো আমার মনে সে তীরের বিষ ক্ষণিকের তরে শুধু একটা রংয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করলো মাত্র, বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

নিশ্চিত ছিলাম যে, লেবং ঘটনার পরদিনই যখন হানা দিয়েছে পুলিশ, গ্রেপ্তার তখন আমায় করবেই। কিন্তু কত আশা ও কত রঙীন পরিকল্পনা নিয়ে শোভাযাত্রা করে যেমন এসেছিল দারোগা, আই বি, পুলিশ ও গোরা সেনার দল, তেমনি শোভাযাত্রা করেই বিদায় নিয়ে চলে গেল তারা গভীর হতাশ্বাসে ভাঙা বুক নিয়ে।

ওরা বেরিয়ে যেতেই দক্ষিণের ঘরের ঢেউ-তোলা টিনের বেড়ার ওপর খবরের কাগজ সেঁটে আমি যে পুরু কাগজের দ্বিতীয় দেয়াল তৈরী করে রেখেছিলাম, তার নির্দ্দিষ্ট একটি স্থানে ব্লেড চালিয়ে খানিকটে ফাঁক করে দিতেই ভেতরে একটি ক্ষুদ্র খোপর দেখা গেল। সাবধানে রিভলভারটি

বার করে রঙ্গলালের হাতে দিয়ে বলে দিলাম ওটা সুহাসিনীর হাতে গোপনে দিয়ে আসতে।

রঙ্গলাল বেরিয়ে গেল। মনে হলো, ঢাকার আই বি ওদের কর্ত্তাদের কাছে তীব্র তিরস্কার খেয়ে হয়তো আবার একদিন এসে আমায় নিয়ে যাবে। কে জানে, ওদের সে প্রত্যাগমন পরদিনও সম্ভব হতে পারে, তাই নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আশায় কালবিলম্ব করা সমীচিন মনে হলো না।

সুহাসিনীর প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়েছে, তখন তার অধ্যায়টি বিবৃত করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পাড়ার জ্ঞাতি-কাকাদের অন্যতম মণিমোহন চক্রবর্ত্তী। ঢাকা শহরে মোক্তারী করেন। অর্থাগম যে তাতে কী পরিমাণ হয়ে থাকে, সঠিক তা না জানতে পারলেও কাকীমা ও তাঁর ডজন খানেক বাচ্চাকাচ্চার জীবনধারণের মান ও প্রণালী দেখেই তার শোচনীয়তা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যেত। আইনের অবোধ্য জটিলতা সম্বন্ধে তাঁর শ্লেষ্মাজড়িত উচ্চকণ্ঠের ধারাবাহিক বক্তৃতায় মণিকাকার সান্ধ্য মজলিস সরগরম হয়ে উঠলেও আমার অজানিত ছিল না যে, প্রায়ই তাঁর ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে চলতো ছুঁচোর অহোরাত্রি জলসা—সঙ্গীত ও নৃত্য। ঢাকা শহরে বাস করতেন তিনি তাঁর কোন্ দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার বাড়ীতে এবং প্রায় রবিবারই এসে কাটিয়ে যেতেন কেয়টখালীর পারিবারিক হাটে। শক্তি ছিল তাঁর একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, সামর্থ্য ছিল শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ, তবুও বহু ব্যক্তি ও সমাজহিতকর কাজে দেখেছি তাঁকে একেবারে নির্ব্বোধের মতো সবার আগে এগিয়ে আসতে। পরাজয়ের চূণ-কালি গালে মেখে এসেও শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে ও ওজস্বিনী ভাষায় এমনিভাবে ঘটনার বিবরণ দিতেন যে, মনে হতো যেন প্রতিপক্ষের চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে, মণিকাকার অব্যর্থ গুলী নেহাৎ কানের পাশ দিয়ে চলে গেছে, নইলে······ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই মোক্তার মনিমোহনেরই জ্যেষ্ঠা কন্যা সুহাসিনী। বছর খানেক হলো মাণিকগঞ্জে বিয়ে হয়েছে কোন্ এক যুবক মুহুরীর সঙ্গে। তাকে সুহাসিনীর মনে ধরেনি। ভিংসাই শ্রোত্রীয় কুলমর্য্যাদা এক তিলও ক্ষুণ্ন না করে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঅমুক চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ন্যায়রত্ন, বেদান্তশাস্ত্রী, সার্ব্ব-ভৌমের প্রপৌত্রং-এর সঙ্গে বৈশাখে মাসি শুক্লপক্ষে অমাবস্যাং তিথৌ কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করে তিনি যে ধরাধামে কী অমর কীর্ত্তি রেখে গেলেন, সালঙ্কারে ও সবিস্তারে সেই পরম সত্য বর্ণনায় মণিকাকার শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠ যখন গমকে গমকে সপ্তমে উঠে বিলাস কাকার বৈঠকখানা উত্তপ্ত করে তুলছিল, ঠিক সেই সময়ই আমাদের নিরালা ছাদের এক কোণে বসে সুহাসিনী বিবাহিত জীবনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা বলে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিলো আর ফুলবৌদি চেষ্টা করছিলেন তাকে সান্ত্বনা দিতে। গ্রামের মেয়ে হলেও সুহাসিনী বহুবার ঢাকা শহরে গেছে ও বাবার কাছে বাস করেছে। গ্রামের মেয়ে স্কুলে কিছু লেখাপড়াও করেছে সে। চুল কাঁপিয়ে তোলবার বিশেষ

কৌশলটি এবং শরীর জড়িয়ে সাড়ী পরবার বিশেষ ধরণটি সে শহর থেকে আহরণ করে এনেছে। বয়সও হয়েছে তার দুরন্ত আঠারো! এমনি সময় যখন তার মনের সরোবরে কল্পনার বেলোয়ারী তরঙ্গ ময়ূরের মতো পেখম তুলে নৃত্য সুরু করেছে, ঠিক সেই সময় এলো তার জীবনে মাণিকগঞ্জ শহরের এক অখ্যাত মোক্তারের তেইশ বৎসর বয়স্ক মুহুরী, নোট বই হাতে করে ও পেন্সিল কানে গুঁজে যে শিকারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় আদালতের চারিদিকে, গাছের তলায় তলায়। ফুলবৌদি বলেন, ওর স্বামী জুতো পায়ে দিতে পারে না ফোস্কা পড়ে বলে, সিনেমা দেখতে পারে না অশ্লীল বলে, আর দন্তধাবন করতে পারে না সময়াভাবে। এই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্মবীর মহাপুরুষটি কিশোরী স্ত্রীর নিদ্রিত শয্যার সন্নিধানে এসেও চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান, বড্ড বেশী স্পষ্ট মনে হয় সুহাসিনীকে, যেন অশ্লীলতার ইলেকট্রিক স্পার্ক ওর সর্ব্ব অবয়বে, ডি সি কারেন্ট! ছুঁলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে।······

নড়বড়ে হারমোনিয়ামে যেমন সুর তোলা যায় না প্রাণপণে হাওয়া দিয়েও, চাবুকের আঘাতে আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে দিলেও যেমন নিদ্রিত অশ্বের নিদ্রা আর ভাঙ্গা যায় না, ঠিক তেমনি উপর্য্যুপরি ব্যর্থকাম হয়ে নারী-জীবনের সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বশান্তি বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এসেছে সুহাসিনী অবশেষে গর্ব্বিত পিতার আলয়ে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গৃহে বিদ্যাহীনের মতো যে ছেলেটি গ্রামের বারোয়ারী তলায় মানময়ী গার্লস স্কুলে মানসরূপে দেখা দিত পাদপ্রদীপের সম্মুখে, খেলার মাঠে যার পদাঘাতে উৎক্ষিপ্ত বল গিয়ে ঠেকতো যেন একেবারে আকাশের নীলে, বিসূচিকা রোগাক্রান্তকে অনর্থক সারা রাত নার্স করে ভোরবেলা আবার তাকে বহন করে গ্রামের শ্মশানে নিয়ে যেত যে অগ্রগামী, সেই প্রিয় দেবরটি এসে স্থান করে নিল সুহাসিনীর মানস-মরুতে! প্রতিদিনকার অন্তরঙ্গতায় সেই মরুতেই ফুটে উঠলো একটি সুন্দর ওয়েসিস!

বুভুক্ষু কিরণময়ীর সম্মুখে থরে থরে সাজানো সুস্বাদু দিবাকরের অমৃত ব্যঞ্জন! অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভোজ্য দর্শনে লক্ লক্ করে জ্বলে উঠলো সুহাসিনীর অন্তরের আগুন!······

এখনও আসে গোপাল মাঝে মাঝে। দু'এক দিন থেকেও যায়। কাকীমা যে একেবারে টের পান না তা নয়, কিন্তু কন্যার ব্যর্থ জীবনের দুঃখের কথা স্মরণ করে নলচে আড়াল দিয়ে অজ্ঞতার ভাণ করেন। এই সাইকোলজি অদ্ভুত ও

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। দিনের আলোর মত সত্য!······ফ্রয়েডি মনোবিকলন মনোবিকার বলে কে উড়িয়ে দিতে পারে?

এ সবই সুহাসিনী অকপটে বলেছে ফুলবৌদিকে, আর ফুলবৌদি সবই বলেছেন আমায়। আরও বলেছেন যে, গোপালও নাকি কোন্ স্বদেশী দলে কাজ করে। গোপনে সুহাসিনীর কাছে কখনো কখনো পিস্তল রেখে যায়, ছোরা রেখে যায়—আবার নিয়েও যায় এসে। আরও একদিন বললেন যে, কিছুদিন হলো গোপাল এসে একটা ছোট্ট সুটকেস রেখে গেছে। সুহাসিনী বলে তার মধ্যে নাকি গোটা দুই পিস্তল, অনেকগুলো কার্তুজ ও খান চারেক ছোরা আছে।

এর পর আরও একটা কথা ফুলবৌদি গোপনে বলেছেন আমায় যে, আমায় নাকি খুব ভালো লেগেছে সুহাসিনীর। কিন্তু এগোতে সাহস পাচ্ছে না, কি জানি কিসের ভয়ে!······

সুতরাং স্থির করলাম, ভয় ওর ভাঙ্গিয়ে দিতে হবে। সহজেই যে এগিয়ে আসা যায় আমার কাছে, কিছুক্ষণ বেশ হাসিঠাট্টাও করা যায়, আবার ফিরে আসবার সহাস্য অনুরোধও যে শোনা যেতে পারে আমার তরফ থেকে, এ সব আপাত-সত্য সমঝিয়ে দিতে হবে ওকে। অবশ্য এই সত্যের অভিনয়ে নিতে হবে আমায় প্রাণান্তকর ঝুঁকি তা জানতাম, তবুও সেই ছোট্ট সুটকেসের ভিতরকার দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলি দুর্নিবার বেগে আমায় আকর্ষণ করতে লাগলো।······

সত্যি, আকর্ষণ সুহাসিনী নয়, আকর্ষণ সেই সুটকেস। লক্ষ্য সুহাসিনীর প্রেম নয়, লক্ষ্য সেই সুটকেসের পিস্তল, কার্তুজ ও ছোরা। কার্য্যোদ্ধারের জন্য চরম পন্থা পারবো না গ্রহণ করতে?······

এ যুগে খুব সহজ হলেও সে যুগে এমনি ঝুঁকি নেবার কথা কিন্তু খুব কম কর্ম্মীই স্থান দিতেন মনে এবং দিলেও তা কার্য্যে রূপান্তরিত করবার দুঃসাহসিক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে সীমাহীন দ্বিধা বোধ করতেন। আমার মতো ব্যতিক্রম সে যুগে খুব বেশী ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

সুহাসিনীর সঙ্গে আমার সহাস্য আলোচনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস মধ্যাহ্নে বসে একেবারে বাজে বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি, হাসি-পরিহাস, কাজে ও অ-কাজে দিনের মধ্যে অসংখ্য বার তার আমাদের বাড়ীতে আমারই ঘরে আগমন, এমনি সব রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের দ্রুতগতির মধ্য দিয়ে আমাদের দু'জনকার সম্পর্ক এমনি ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় করে ফেললাম যে, একদিন আমি একেবারে দুই আর দু'য়ে চারের মতো বেশ উপলব্ধি করলাম, সুহাসিনী আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

হ্যাঁ, সত্যিই প্রেমে পড়ে গেছে! প্রেম বলতে কী স্থূল সম্পর্ক বুঝতো সে, তাও টের পেতে দেরি হলো না আমার। কিন্তু আমার মধ্যে তখন অভিনেতা দ্বিজেন গাঙ্গুলী জন্মলাভ করেছে এবং নিখুঁত অভিনয়ের পুরস্কার যে পাওয়া যাবে গোপালের সেই স্যুটকেসটি, এই সম্ভাবনাও সত্য হয়ে মনে গেঁথে গেছে। তাই অভিনেতা দ্বিজেন গাঙ্গুলী ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো জীবনের চরম সাফল্যের দিকে !······

যে রাত্রে সুহাসিনী সেই অমূল্য দ্রব্যগুলি বয়ে এনে আমার ঘরে এসে দিয়ে গিয়েছিল, আজও তা ভুলিনি। সেদিন ছিল হয় অমাবস্যা, কিংবা তার কাছাকাছি কোনো তিথি। আকাশ সমাচ্ছন্ন ছিল ধূসর মেঘে। না ছিল বিদ্যুতের কোনো একটি চমক্, না ছিল হাওয়ার মাতামাতি। কিন্তু আসন্ন ঝড়ের ভয়াবহতা সেই গুমোটের মধ্য দিয়েই যে প্রকট হয়ে উঠেছিল, দক্ষিণের ঘরের জানালার পাশে বসে বেশ উপলব্ধি করছিলাম তা। বোধহয় লিখতে চেষ্টা করছিলাম একটি কবিতা। কী কবিতা, তার একটি লাইনও আজ আর মনে পড়ে না। কিন্তু অনেক রাত পর্য্যন্ত ফুলবৌদির দুষ্টুমির ফলে যে কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারছিলাম না রাইটিং প্যাডের কাগজে, তা আজও ভুলিনি।

রাত বারোটার পর আবার এলেন ফুলবৌদি।

কি গো কবি, আর কত পেন্সিল কামড়াবে? ঘড়ির কাঁটা তো আর তোমার মৃত পেন্সিলের অপেক্ষা রাখে না। চেয়ে দেখ একবার।

প্রায় সাড়ে বারোটা। কিছু যায় আসে না তাতে। একটা সুন্দর কাব্যময় লাইন মাথায় এসেও পেন্সিলের সিসেয় কেন আসছে না? এখনই যদি সেটিকে জোর জবরদস্তি করে প্যাডের পাতার ওপর না সাজিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কে জানে কাল হয়তো সে পালিয়ে যাবে কোথায়, কোন্ আকাশের নীলে! সুতরাং—

বললাম: তা জানি। কিন্তু এটি শেষ না করে উঠতেও পারছি না। তুমি বার বার এসে বিরক্ত করছো কেন বল তো? তুমি ঘুমোচ্ছ না কেন?

সেটা আমার খুশী।—স্পষ্টভাবে জবাব দিলেন ফুলবৌদি।

আমি বললাম: আমারও খুশী আমি সারা রাত জেগে লিখবো।

তবুও বৌদি বসে পড়লেন একেবারে টেবিলের ওপর আমার রাইটিং প্যাড চেপে। সিরিয়াস হয়ে বললেন: সারা দিন ছিলে না, সুহাসিনী অন্ততঃ দশ বার এসেছিল তোমার খোঁজে।

কেন?

মুচকি হেসে বৌদি বললেন: কেন, তা তুমিই জান। কী দিয়ে যে যাদু করেছ, সারা দিন বেচারী পড়ে থাকে আমাদের এখানে আর তুমি না থাকলে একেবারে তোমার ঘরে। তোমার লেখা সুন্দর, তোমার কথা মিষ্টি, তোমার ঘরখানা কী সুন্দর গোছানো, তোমার সবই সুন্দর আর তুমি মানুষটি এত ভালো যে তার নাকি তুলনা নেই।

হেসে বললাম: তোমার তুলনা তুমি শ্যাম।

বৌদি বললেন: সত্যিই তাই। অন্ততঃ সুহাসিনী তাই মনে করে।—তারপর একটু থেমে নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন: কিন্তু ওদিকে কদ্দূর? হলো কিছু ব্যবস্থা?

আমার প্রেমের অভিনয় কতখানি সাফল্য লাভ করেছে, জানালাম বৌদিকে। খুব শীগগিরই যে তার ক্লাইমেক্স আসছে, তাও জানাতে দ্বিধা করলাম না। কিন্তু তারপর যেই বললাম যে, ক্লাইমেক্সের পরই কালো ভারী যবনিকা ঝপ্ করে নেমে আসবে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে, তখনই বাধা দিলেন ফুলবৌদি: পারা কঠিন। জোঁকের মত ও তোমায় ধরেছে। পেট পুরে রক্ত না খেয়ে ছাড়বে বলে ভরসা করো না। আর দোষই বা কী দোব ওকে। বিয়ে দেবার সময় কাকার কি উচিত ছিল না ওর উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বার করা? তুমিই বল—

বাধা দিলাম: স্থাখ বৌদি, এমনি বে-মানান বিয়ে আশেপাশে বহু আছে। অভিভাবক বিয়ে দেবার সময় আর সবই দেখেন, দেখেন না শুধু যার বিয়ে দিচ্ছেন, তাকে। ফলে, সারাটি জীবন ভুগতে হয় ঐ বে-মানান বিয়ের সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, তাদেরকে। কিন্তু, এ ব্যাপারে সে সব কথা কেন বৌদি? স্রেফ কার্য্যোদ্ধারের জন্যই তো এই অভিনয়, তাই সেই অভিনয়টি কেমন হচ্ছে, তাই বল!

হেসে বললেন বৌদি: চমৎকার!

এবার ধমক দিলাম: শীগগির যাবে কি না বল! আমার কবিতাটি একেবারে বরবাদ করে দিলে।

হেসে চলে গেলেন বৌদি আবারও আসবার ভয় দেখিয়ে। চেয়ে দেখলাম, রাত একটা বেজে গেছে। সেই মোলায়েম লাইনটি কোথায় পালিয়ে গেছে খুঁজে পাচ্ছি না। পেন্সিলের সিসেয় দূরের কথা, মগজের কোণেও আর উকিঝুঁকি মারছে না।…বাইরে চেয়ে দেখলাম, নিবিড় অন্ধকার। দক্ষিণের জানালা দিয়ে

এবার ঝিরঝিরে হাওয়া ছেড়েছে। দূরে কোন নৌকার মাঝি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে। ভাষা ঠিক বুঝতে না পারলেও মেঠো সুরটি ভারী মিষ্টি লাগছে! নিস্তব্ধ আমাদের বাড়ী, পাড়াটাও সুষুপ্ত,……কিন্তু সেই লাইনের একটি শব্দও কি মনে আসবে না?

—অকস্মাৎ মনে হলো কে যেন পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছে ছায়ার মত। সহকর্ম্মীরা কেউ হতে পারে!…বিপদভঞ্জন? খগেন? সুবোধ?…না, কোনো স্পাই? শালা বোধহয় দেখতে এসেছে আমায়!…না কোনো চোর?…কিন্তু ঘরে জলছে আলো, জলজ্যান্ত বসে রয়েছি আমি জানালার পাশে—এমনি অবস্থায় চোর? এ কি সম্ভব?

—কিন্তু একটু পরেই সকল সন্দেহের নিরসন করে দিয়ে জানালার পাশে সহাস্যমুখে ছায়া এসে দাঁড়ালো—পাগলিনী সুহাসিনী। দরজা খুলে দিতে হলো। নিঃশব্দে ভেতরে এসে দাঁড়ালো শ্রীমতী। চেয়ে দেখলাম। সমস্ত শরীর সিক্ত, সিক্ত সাড়ী গায়ে লেপটে গেছে। মাথার সঙ্গে পাগড়ীর মত করে বাঁধা একখানা শুকনো সাড়ী, হাতে একটি বড় পিতলের কলসী। কলসী মেঝেতে রেখে পাগড়ী খুলে তার ভেতর থেকে বার করলো দুটো রিভলভার ও এক বাক্স কার্ত্তুজ। টেবিলের ওপর রেখে বিজয়িনীর হাসিতে মুখখানা ভরে তুলে অনুচ্চকণ্ঠে বললো সুহাসিনী: কেমন, পারবো না দিতে? এইবার হলো তো?—দাও পুরস্কার।

একেবারে ঝুঁকে পড়লাম রিভলভার ও কার্ত্তুজগুলির ওপর। সত্যিই রিভলভার এবং যত দূর বোঝা গেল তাজা রিভলভার। কার্ত্তুজগুলি ঠিক ফিট্ করে।—যাক্, এতদিনে সত্যিকার সাফল্যলাভ সম্ভব হলো। প্রেমের অভিনয়ে এবার অনায়াসেই ছেদ টেনে দেয়া যেতে পারে!……সরিয়ে ফেলতে হবে কাল সকালেই, যাতে এর পর গোপালের তাগাদায় মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করে ফেললেও এই অমূল্য দ্রব্যগুলির আর ও সন্ধান না পায়। সত্যিই বলেছেন ফুলবৌদি, ও ছিনে জোঁক।

কিন্তু ছিনে জোঁক ইতিমধ্যেই তার সিক্ত সাড়ীখানা পরিবর্ত্তন করে শুকনো সাড়ী ও ব্লাউজ পরে ফেলেছে এবং দেখলাম, নিঃশব্দ হাসিতে সারা মুখখানা প্রদীপ্ত করে তুলে আলগোছে এসে বসে পড়লো আমার সম্মুখে টেবিলের ওপর, ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে ফুলবৌদি যেখানে বসে কিছুক্ষণ জ্বালাতন করে গেছেন।

কী বলে যে সুরু করবো, সেটা আমায় আর ভাবতে হলো না। সুহাসিনী

নিজেই বলে উঠলো : এত রাত অবধি বসে বসে কার কথা ভাবা হচ্ছিলো ? সে সৌভাগ্যবতী কে জানতে পারি কি ?

কাল হলে হয়তো অনায়াসে গদগদ স্বরে বলে দিতাম : সে তুমি গো, তুমি ! আজ অতটার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও বুঝতে পারলাম, একেবারে এখনই সবটা ওলট-পালট করে দেয়া সঙ্গত হবে না। রিভলভার যখন এসে পড়েছে হাতের মুঠোয়, তখন আর তা ফস্‌কে যাবার আশঙ্কা নেই। এবার অনায়াসে এই মেয়েটাকে একেবারে কুইক মার্চ্চ না করালেও এ্যাবাউট টার্ণ তো করিয়ে দিতে পারি। তাই স্বাভাবিক মিষ্টি সুরেই বললাম : কে যে নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করে, তা আমি কি করে জানবো বল ? যেভাবে এসেছ তুমি, তোমার প্রশংসা না করে পারি না সু। কিন্তু কাকীমা যদি জেগে গিয়ে থাকেন, তাহলে ? আর আমাদের বাড়ীতেও তো বৌদিরা বা মা-বাবা জাগতে পারেন, তাহলে ?

দুষ্টু হাসিতে ভরে উঠলো সুহাসিনীর মুখ : তাহলে কী হবে শুনি ?

তাহলে আমাদের দু'জনের ফাঁসী হবে, আর কী হবে। রাত দুপুরে জল সাঁতরে কি জন্যে তুমি আমার ঘরে এসেছ, তার যেমন কোনো কৈফিয়ৎ দিতে পারবে না তুমি, আমার পক্ষেও তেমনি—

কিন্তু আর কিছু বলা হলোনা, একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলো সুহাসিনী। ফুঁ দিয়ে ফস্ করে দিল আলোটি নিভিয়ে, তারপরই কানের কাছে মুখ এনে কী সব প্রেমের ভাষা উচ্চারণ করতে লাগলো আধো-আধো স্বরে, আজ আর তা মনে পড়ে না।

বুঝতে পারলাম, আজ আর নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই। চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছিলাম পুরস্কার আহরণের আশা নিয়ে। তা তো পেয়ে গেছি আজ। কিন্তু এ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ কোথায় ? অভিমন্যুর মতো কি মৃত্যু অনিবার্য্য ?··· ইলেকট্রিক শক্ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য তাই স্মরণ করলাম নাট্যাচার্য্য, নটসূর্য্য ও নটশেখরদের ! বললাম মিহি সুরে দরদ মিশিয়ে : তুমি একটি বোকা মেয়ে। কাকের মতো চোখ বুজেই বুঝি মনে করছো কেউ আর দেখলো না তোমায় ? জানো দেয়ালেরও কান আছে, অন্ধকারেরও আছে চোখ ? ফুলবৌদি যদি একবার টের পেয়ে যান, তাহলে তোমার ঐ কলসীটা গলায় বেঁধে জলে নামতে হবে।

তা না হয় নামবো—দ্বিধাহীনভাবে জবাব দিল সুহাসিনী : তবুও তো মরবার আগে এই একটি রাত একেবারে নিজস্ব করে পাবো। অনেক দুঃখ ভুলে থাকতে পারবো তবু কিছুক্ষণের জন্য।

এবার মরিয়া হয়ে বলতে লাগলাম: জানোই তো ভাই, সারাটি দিন আজ বাড়ীতে ছিলাম না। ভীষণ খাটুনি গেছে। তারপর লিখতে বসেছি জরুরী একখানা চিঠি। লিখতেই হবে আজ। রাত সাড়ে চারটেতে একটি ছেলে এসে নিয়ে যাবে চিঠিখানা। তাই—

সুহাসিনী তৎক্ষণাৎ অসম্মতি প্রকাশ করলো এবং সহজভাবে বুঝিয়ে দিল যে, সুবর্ণ সুযোগ জীবনে অনেক বার আসে না। হাল আমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু নাট্যাচার্য্য ও নটশেখরদের কৃপায় ক্রমেই যেন আবার পানি পেতে লাগলাম। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে অত্যন্ত আদর করে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে এলাম সুহাসিনীকে আগামী রাত্রির গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বললাম: কাল না এলে কিন্তু আড়ি, আড়ি, আড়ি!

কলসীটা উলটে দিয়ে বুকের নীচে চেপে সোলার মতো ভেসে রইলো সুহাসিনী। বললাম: কাল পরবে তুমি সেই গোলাপী সাড়ীখানি, খোঁপায় গুঁজে আসবে ফুলের মালা, সুন্দরতর করে তুলবে তোমার সুন্দর দেহখানি, তারপর চলবে আমাদের অফুরন্ত গল্প সারাটি রজনী···

কিন্তু সেই আরব্যোপন্যাসের সহস্র রজনীর একটিও আর এলো না আমার জীবনে!

তেতাল্লিশ

সে যুগে গুপ্ত সমিতির সদস্য সংগ্রহের প্রথম পন্থা ছিল বই পড়ানো। সিনেমার প্রকোপ সে যুগে তত তীব্র না হলেও উপন্যাসের ভিড় কম ছিল না। চুরি করে, লুকিয়ে উপন্যাস পাঠ, তার প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের ভাষা কণ্ঠস্থ করা এবং প্রেম আদান-প্রদানের রীতি অনুকরণ, সে যুগের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও এই কদভ্যাস এসে গিয়েছিল। তাই সর্ব্বপ্রথম আমরা এই কদভ্যাসটি পাল্টাবার দিকে মনোনিবেশ করতাম। ভালো ভালো বই দেয়া হতো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, বিবেকানন্দ বাণী, বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও অর্জ্জনের লোমহর্ষণ কাহিনী, ভারতবর্ষের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, আনন্দমঠ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, দেশবিদেশের প্রাতঃস্মরণীয় শহীদদের অমর জীবনী—এমনি ধরণের বই পড়তে দেয়া হতো। শুধু পড়া নয়, রীতিমত অধ্যয়ন এবং শুধু অধ্যয়ন নয়, তা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক ও তা ভিত্তি করে প্রবন্ধ রচনা চলতো। গীতার ক্লাস হতো। ফলে, উপন্যাসের পঙ্কিল পরিণামের পাষাণ চত্বরে ফাটল দেখা দিত। পাঠকের মনে জাগতো আলোড়ন ও প্রশ্ন: কোন্‌টা ভালো? পথ কী? কে বড়? কর্ত্তব্য কি?…এই সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো না। জবাব সে নিজেই সংগ্রহ করবে অনুসন্ধান করে।

এই ধরণের গ্রন্থপাঠের ফলে পাঠকের মনে জাগতো আলোড়ন, ক্রমে সে আলোড়ন সেখানে ঝড় তুলতো, ঘূর্ণি ঝড়—নীচের ধূলাবালি, খড়কুটো সব উড়িয়ে নিয়ে যেত আকাশের নীলে, নীচে দেখা দিত ঝকঝকে তকতকে নিষ্পাপ মন। এমনিভাবে পাঠকের মনে জন্মলাভ করতো আর একটি বিপ্লবী। মন আগে তৈরী করা হতো, মজবুত মন। মন তৈরী হয়ে গেলে পাঠানো হতো তাকে হয়তো কোনো কাজে—ডাক লুণ্ঠনে, ডাকাতিতে বা কারুর ওপর চরম শাস্তি হানবার ব্যাপারে। একেবারে আসরে তাকে নামতে দেয়া হতো না প্রথম প্রথম, একটু দূরে রাখা হতো, প্ল্যান করেই অথচ তাকে বুঝতে না দিয়ে। তারপর কাজের দ্বারা সে তার স্থান করে নিত। হয়তো অতি দ্রুত সে পরিচালকের সমকক্ষ হয়ে উঠতো কিংবা হয়তো নেমে যেতো নীচে, আরও নীচে!—এর পর একবার আই. বি বা এস. বি অফিসে দিন পনেরো হাজতবাস করে এলেই সে হয়ে পড়তো একেবারে বয়লার প্রুফ!…

আর একটা পন্থা অবলম্বন করা হতো সে-যুগে সদস্য সংগ্রহের জন্য। দলের চতুর কোনো একটি ছেলেকে স্থানান্তর সার্টিফিকেট নিয়ে বার বার স্কুল পরিবর্তন করানো হতো আর কোনো বৎসরই তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া হতো না। স্কুল থেকে স্কুলে সে বিপ্লবমন্ত্র ছড়িয়ে যেত আর পরীক্ষা না দেবার ফলে প্রতি বৎসরই তার ক্লাসে এসে পড়তো নতুন নতুন ছাত্র!

আমাদের সুবোধ চক্রবর্ত্তীকেও এমনিভাবে বার বার স্কুল পরিবর্ত্তন করানো হয়েছিল এবং বার বারই বাৎসরিক পরীক্ষার সময় তার অসুখ হতো!

কিছুদিন ধরেই আমি অভাব অনুভব করছিলাম বইয়ের, জাতীয়তামূলক বা বা আমাদের প্রয়োজন মত গ্রন্থের। এই বইয়ের অভাবে বহু স্থানে আমাদের কাজে বাধা পড়তে লাগলো। যেগুলো ছিল তাই বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়েও চাহিদা মেটানো সম্ভব হলো না। অনেকগুলো কেন্দ্র থেকেই সংবাদ আসতে লাগলো, বইয়ের অভাবে তাদের কাজে অসুবিধে হচ্ছে। বই পড়তে নেবার ব্যাপারে অনেকগুলো নিয়ম করা হলো, কড়া নিয়ম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। একসময় মনে হতে লাগলো, এই বইয়ের প্রয়োজন অবিলম্বে না মেটাবার ব্যবস্থা করলে সংগঠনের সমগ্র কাঠামোটাই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং—

এক অন্ধকার রজনীতে যাত্রা করলো আমাদের অভিযানকারী ক্ষুদ্র দলটি। রাত তখন অনেক। কারুরই জেগে থাকবার কথা নয়। অন্ধকার রাত্রি গাছপালা ও ঝোপ-ঝাপের দঙ্গলে আরো অন্ধকার মনে হয়। আমাদের গ্রামের মুসলমান চাষীরাও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

পূবপাড়া ছাড়িয়ে আমরা রওনা হলাম ডান দিকে বীরতারা অভিমুখে। সামরিক আদবকায়দা আমি প্রবর্ত্তন করে চলতাম প্রায় প্রতি কাজেই। তাই চলেছি আমরা ফাইলে—একের পশ্চাতে অপরে। পুরোভাগে চলেছে দীর্ঘদেহ খগেন হাতে নিয়ে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ড। তার পশ্চাতেই রঙ্গলাল। সাপের মতো অন্ধকারে সে দেখতে পায়। চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারে তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনভিপ্রেত কিছু দেখতে পেলেই সে স্পর্শ করবে সম্মুখের খগেনকে আর পশ্চাতের অনাথকে। অনাথ স্পর্শ করবে নেপালকে, নেপাল স্পর্শ করবে সুবোধকে। এমনি করে স্পর্শের মধ্য দিয়ে ঐ সঙ্কেত এসে পৌঁছোবে লাইনের একেবারে পশ্চাতে আমার কাছে। ততক্ষণে থেমে গেছে সবাই। অপেক্ষা করছে দলপতির আদেশের। আমি তৎক্ষণাৎ ত্রস্তপদে বেরিয়ে আসবো রঙ্গলালের কাছে। সমস্ত ব্যাপারটা শুনে নেব সংক্ষেপে, তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো নিজের

মনে এবং তারপরই অনুচ্চস্বরে জানিয়ে দেব আমার আদেশ রঙ্গলালকে।…মুহূর্ত্ত পরে দেখা যাবে আমাদের দলটি পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে বা পাটক্ষেতের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের অধিনায়কের মতোই আমার স্থান দলের পুরোভাগে নয়, পশ্চাতে। ওয়ারলেসে সংবাদ আদান-প্রদানের মতোই সহকর্ম্মীরা প্রয়োজনবোধে সংবাদ পাঠাতো আমার কাছে এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যেতো আমার সিদ্ধান্ত। রণক্ষেত্রে সৈন্যদলের অধিনায়কের মতোই বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ করবার রীতি ছিল না।

রাত প্রায় একটার সময় আমরা এসে পৌঁছলাম সিংপাড়া বাজারের পশ্চিম দিকের বড় কাঠের পোলটার নীচে। শ্রীনগর থেকে মুন্সীগঞ্জগামী উঁচু সড়কের ওপর এই পোলটি। নীচে তখন আর জল নেই। তাই নীচের অন্ধকারে আমরা নিশ্চিন্তে জড়ো হলাম।

এইবার আমাদের এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল ব্যক্ত করা হবে। যারা এসেছে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে চুপি চুপি, তাদের মধ্যে একজনও জানে না কোথায় আমাদের যেতে হবে, কী আমাদের করতে হবে, সে কাজের ঝুঁকি কতখানি এবং এ কথাটিও জানে না তারা যে, কাজের শেষে আবার তারা সুস্থদেহে চুপি চুপি বাড়ীতে ফিরে আসতে পারবে কি না! একেবারে অনিশ্চিতভাবে তারা যাত্রা করে। ঠিক যে সময় তাদেরকে কাজের খবরটি জানানো দরকার, ঠিক সেই সময় তা হয়।… এমনিই ছিল গুপ্ত সমিতির গোপনতা।

কাজের হদিস পেলো সবাই। কীভাবে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে, তাও দ্রুত স্থির করা হলো। তারপর সাবধানে এগিয়ে চললাম আমরা পূব দিকে বাজারের পশ্চাতে বেলতলা হাই স্কুলভবনের দিকে।

লাইব্রেরী চিনে নিতে দেরি হলো না। যাকে যেখানে পোষ্ট করা দরকার, তেমনিভাবে ব্যবস্থা করে রঙ্গলাল এসে জানালো আমায়, সব রেডি। সুবোধ পূর্ব্বেই লাইব্রেরী ঘরের নম্বরী তালার চাবিটি সংগ্রহ করে এনেছিল। বেশ মোটা ও মজবুত তালা একেবারে সুবোধ বালকের মতো খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করলাম বিপদভঞ্জন, সুবোধ, খগেন ও আমি। ঠিক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো রঙ্গলাল।

টর্চ্চ জ্বালিয়ে দেখা গেল, অনেকগুলো কাঁচের আলমারী-ভর্ত্তি থরে থরে সাজান গ্রন্থ। এক ঘুষিতেই কাঁচ ভেঙ্গে ফেলা যায়, কিন্তু শব্দ করা সঙ্গত হবে না।

তাই আবার চাবির সাহায্য নিতে হলো এবং এবারও আশ্চর্য্য, প্রত্যেকটি আলমারী অনায়াসে খুলে গেল। প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর বইগুলো ছড়িয়ে ফেলে বাছাই সুরু হলো এবং বাছাই-করা বইগুলো বিভিন্ন থলিতে পুরে ফেলা হলো।

একেবারে যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। নিশ্চিন্তে, কারণ বাইরে সতর্ক প্রহরা আছে। সময়মত সঙ্কেত পাবোই!

ক্যাশবাক্সের মতো কালো টিনের একটা বাক্স দেখা যাচ্ছে একটি আলমারীতে। কোন চাবিতেই কাজ হলো না দেখে যেই আমি বাটালি দিয়ে ওর ডালার নীচে চাড় দিতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়লো: ঠক্ ঠক্ ঠক্!

অর্থাৎ বিপদের সংকেত! টর্চ্চ তৎক্ষণাৎ নিভিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম পরবর্ত্তী সংকেতের।

বাইরের সতর্কতামূলক ব্যবস্থাটি এমনি নিখুঁত যে, কখনও কোনো সময়েই বিন্দুমাত্র আশঙ্কার কারণ দেখা দেবার উপায় নেই। বাজার থেকে এসে যে রাস্তাটি লাইব্রেরী-গৃহের পশ্চিম ও উত্তর ঘুরে দূরে গ্রামের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই রাস্তার পাশে পাশে ঝোপ-ঝাপের আড়ালে কালো রংয়ের চাদর জড়িয়ে একেবারে ঘাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে একজন এখানে আর একজন একটু তফাতে। কালো মজবুত সরু দড়ি তাদের পরস্পরকে সংযোজন করে এসে পৌছেছে লাইব্রেরী-গৃহের কিছুদূরে লুক্কায়িত অনাথের হাতে। আবার তার কাছ থেকে এমনি একটি সরু দড়ি এসে পৌছেছে একেবারে রঙ্গলালের হাতে। এই দড়ির সাহায্যে সেই একশো গজ দূরে পথের বাঁক থেকে সংবাদ এসে পৌছোচ্ছে অনাথের কাছে, অনাথ আবার তা পাঠিয়ে দিচ্ছে রঙ্গলালের কাছে আর রঙ্গলাল দরজায় টোকা দিয়ে বাইরের অবস্থা জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে ঘরের মধ্যে আমাদেরকে।

এমনিভাবে বাজারের দিকেও পাহারায় রত আছে একজন এবং আর একজন আছে দূরে দরওয়ানের ঘরের কাছে। নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আমরা জাল ছড়িয়ে বসেছি নিপুণভাবে। রুই-কাতলা তো দূরের কথা, সামান্য পুঁটি-ট্যাংরারও সাধ্য নেই সে জালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে প্রবেশের।

একটু পরই আবার শব্দ শোনা গেল। এবারের আঘাত দু'বার, খানিকটে নীরব থেকে আবার দু'বার। অর্থাৎ অল্ ক্লিয়ার। আবার কাজ সুরু হয়ে গেল।

কালো বাক্সটা খুলে ফেললাম। পাওয়া গেল ওর মধ্যে কিছু স্বর্ণালঙ্কার, কিছু রূপোর টাকা ও একতাড়া নোট।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ সুসম্পন্ন করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। সতর্ক পদক্ষেপে এসে আবার জমায়েৎ হলাম সেই কাঠের সেতুর নীচে। সামরিক কায়দায় এবার সবাই ফল্ ইন করে দাঁড়ালো। অনেকগুলো বই গোটা কয়েক পুঁটলী করে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। তথাপি—

কমাণ্ডার আদেশ করলেন: ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য কেউ কিছু নিয়ে এসেছ কি ?

মুহূর্ত্ত কাল সবাই নীরব। একটু পর সহসা ফল্ আউট করে বাইরে এসে দাঁড়ালো খগেন।

কি এনেছ ?

অপরাধীর মতো জবাব দিল খগেন: কতকগুলো নিব আর খানকতক পোষ্টকার্ড।

That's dangerous ! আমাদের এই অভিযানের পশ্চাতে আছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য—দেশসেবা। বিপ্লবমন্ত্র প্রচারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, জীবনপণেও তা করতে এগিয়ে যাবো। কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ বা সুবিধার জন্য যদি আমরা লালায়িত হয়ে উঠি, তাহলে সাধারণ চোর ডাকাতের সঙ্গে তফাৎ কোথায় আমাদের ? Why did you steal away those things ? Answer why ?

এগিয়ে এল আমার অর্ডারলি—নেপাল। মাত্র পনেরো বছর বয়সের নেপাল। অত্যন্ত কচি মুখখানি, দেখলে মায়া হয়! আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলো এ্যাটেনশন হয়ে।

হাঁক দিলাম যথাসম্ভব নিম্নস্বরে: Speak out—I give you one minute's time.

সার্টের নীচে আমার যে রিভলভার আছে, এরা সবাই জানে এবং এ-ও জানে যে, যে কোনো সময় তা ব্যবহারে দ্বিধা করবো না আমি এতটুকুও !···আর নিজের হাতে তার প্রয়োজনও হবে না। নেপাল এগিয়ে এসেছে হুকুম তামিল করতে।

খগেনের কণ্ঠ শোনা গেল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীর মতো: আমার অপরাধ হয়ে গেছে, সে জন্য ক্ষমা চাইছি দাদা—

Search his person and search everybody—হুকুম উচ্চারিত হলো। নেপাল প্রত্যেকের দেহ তল্লাসী করলো। দেখা গেল, শুধু খগেনই খানকতক

পোষ্টকার্ড ও কয়েক বাক্স রেড ইংক নিব নিয়ে এসেছিল। ওগুলো এখানেই ফেলে দিলে হতো। কিন্তু যেখানে আমরা এসেছিলাম, দাঁড়িয়েছিলাম, কথা বলেছিলাম, সেখানকার সন্ধান দেবার কী প্রয়োজন আছে?…তাই নেপাল ওগুলো নিয়ে দ্রুত অথচ সতর্ক পদক্ষেপে চলে গেল স্কুলের পশ্চিম দিকের খেলার মাঠে।

সে ফিরে এলে আবার যাত্রা করলো অভিযানকারী আমাদের ক্ষুদ্র দলটি বিজয়ীর গর্ব্ব নিয়ে।

এমনি করে মালখানগর, রুসদী, ষোলোঘর, হাঁসাড়া প্রভৃতি গ্রামের স্কুল-লাইব্রেরীতে হানা দিয়ে অসংখ্য জাতীয়তা-প্রচারক গ্রন্থ সংগ্রহ করা হলো। সাবধানে ভেতরকার রবার ষ্ট্যাম্পগুলো ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলে দিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সেগুলো বণ্টন করে দেয়া হলো। কাজ চলতে লাগলো অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে।……

চুয়াল্লিশ

বইয়ের অভাব মিটে গেলেও যে অভাবটি বার বার কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করে আমার মনে বিঁধতো, সে হচ্ছে টাকার অভাব। যাকে বলা যায় সত্যিকার ধনী, তেমনি একজনও ছিল না আমাদের দলে। শুধু মধ্যবিত্ত নয়, এদের সবাইকে নিম্নমধ্যবিত্ত বলা যায়। দু'একজন ছিল, যাদের অবস্থা স্বচ্ছল হলেও নগদ অর্থের প্রতিটি পাই আগলে রাখতেন যখের মতো তাদের অভিভাবক। ছেলের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের মনোরম ব্যবস্থা করে দিয়ে অভিভাবক শ্যেনদৃষ্টি সর্ব্বদাই খুলে রাখতেন পাছে বাড়ীর তৃণগাছটি সে টেনে নিয়ে যায় গাঙ্গুলী বাড়ীতে দ্বিজেন গাঙ্গুলীর কাছে! নেপাল ছিল এমনি অভিভাবকের অধীনে। অত্যন্ত স্মার্ট যেমন, তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ। কার্য্যোদ্ধার করবার জন্য সে যে-কোনো ঝুঁকি নেবার জন্য এগিয়ে আসতো। সত্যি, এক-এক সময় আমার মনে হয়েছে, অবোধ বালক বুঝি উপলব্ধিই করতে পারে না বিপ্লবী দলের কর্ম্মপন্থা কতখানি ভয়াবহ! মায়া-মমতার সকরুণ আবেদন মাঝে মাঝে অন্তরাকাশে চিন্তার বাষ্প সৃষ্টি করলেও শরতের মেঘের মতোই তা মুহূর্ত্ত পরে কোথায় মিলিয়ে যেত!

কিন্তু টাকা? টাকা কোথায় পাই? সহকর্ম্মীরা যা সংগ্রহ করে এনে দিত ভিক্ষে করে বা ধার করে বা চুরি করে, খুব সামান্য না হলেও সমগ্র বিক্রমপুরের সংগঠনী কাজ চালাবার পক্ষে তা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর! কী করা যায়? কী করা যেতে পারে?

বেশ ভালো করে ভেবে দেখলাম ডাকাতি করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। ছেলেরা একবাক্যে সায় দিয়ে ফেললো। কোনো গৃহে চড়াও হয়ে লুণ্ঠন করবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মী ও প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও সে সময় চারিদিক বিবেচনা করে তা যুক্তিসহ মনে হলো না। হ্যাঁ, ডাকাতি করতে হবে, কিন্তু তার মধ্যেও থাকবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির খেলা। কেউ কিছু টের পাবার পূর্ব্বেই কাজ হাসিল করতে হলে যে কূটবুদ্ধি ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, তাই প্রয়োগ করতে হবে। একটা কিছু করবার অধীর আগ্রহে সহকর্ম্মীরা যেন টগবগ করে ফুটছে! শুধু ঝুঁকি নয়, আত্মবলিদানের প্রতিশ্রুতি দিতেও তারা পশ্চাৎপদ নয়। তা জানি। জানলেও দলপতি হিসেবে আমার নিশ্চয়ই নীতি হবে যথাসম্ভব কম বিপদের পথে এদের এগিয়ে দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করা।

মশাল জালিয়ে তরবারি, বল্লম ও গাদা বন্দুক নিয়ে বা খানকতক রামদা কাঁধে করে 'কালী মাইকি জয়' ধ্বনি করতে করতে দিক প্রতিধ্বনিত করে তুলে গৃহস্থের বাড়ীতে হানা দিয়ে, প্রহার করে, হত্যা করে, গুলী চালিয়ে, বোমা ফাটিয়ে, সিন্দুক ভেঙ্গে ও মহিলাদের অঙ্গ থেকে টাকা ও গহনা সংগ্রহ করে আবার সপদদাপে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ার কাহিনী পাঠ করেছিলাম। শহরে ডাকাতির বিবরণীও অজানা ছিল না। হুস্ করে এসে একখানা জিপ থামলো বাড়ীর সম্মুখে, ষ্টেনগান হাতে ঝপাঝপ্ নেমে পড়লো ক'জন, chemical solution ঢেলে মুহূর্ত্তে খুলে ফেললো প্রকাণ্ড সিন্দুকের তালা, তারপর ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে পুরে ফেললো সব, তারপর যেমন হুস্ করে এসেছিল তেমনি হুস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল জিপ, রাজপথের বাঁকে, যার number plateএ লেখা একটি সংখ্যা, যা ঐ গাড়ীর নয়।

কিন্তু আমার পরিকল্পনা একেবারে অভিনব। সে যুগে একে একেবারে যুগান্তকারী বলা যায়! আয়োজনটি একেবারে শান্ত ও স্বাভাবিক, কোথাও বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করবে না। যেমন নিঃশব্দে সুরু হবে কাজ, তেমনি সহজভাবেই তা শেষ হয়ে যাবে। তথাপি রিজার্ভ ফোর্সের মতো নাগালের মধ্যেই থাকবে একটি সশস্ত্র দল, শুধু জরুরী অবস্থায় যাদের আহ্বান জানানো হবে। ওৎ পেতে থাকবে এরা নেকড়ে বাঘের মতো কিন্তু লম্ফ দেবে তখনই, যখনই আসবে ইঙ্গিত!······শ্রীনগরের কাছাকাছি দেলভোগ নামে একটি গ্রাম আছে, সে গ্রামে আছে একটি গণিকাপাড়া। গণিকাদের সবাইবে পুলিশ চেনে, কারণ থানার খাতায় তাদের নামের তালিকা আছে। এই গণিকাদের মধ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য করে থাকেন ইসাডোরা ডানকান বা বাসবদত্তার মতো যিনি, তাঁর নাম চাঁপা। চাঁপার নামে মরা হাড়েও বিদ্যুৎ চকমকিয়ে ওঠে। নৃত্যে, সঙ্গীতে, আদর-আপ্যায়নে ও অতিথিসেবায় চাঁপা অতুলনীয়। শুধু গ্রামের খড়ো ঘরে বা টিনের চালে তার খ্যাতির দ্যুতি প্রদীপের মতো টিমটিম করে না, শহরের অনেক অট্টালিকার চার-পাঁচ তলাতেই চাঁপার মোহনীয় পোর্ট্রেট কার্ব্বন লাইট জালিয়ে রাখে এবং সে শুধু ঢাকা শহর নয়, কলকাতাতেও।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কৌশলে সংগ্রহ করে আনলো রঙ্গলাল আর তাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করলো বিপদভঞ্জন। দালালের মারফৎ রঙ্গলাল একেবারে গিয়ে হাজির হলো চাঁপার প্রকাণ্ড টিনের ঘরে, মেঝেয় বিছানো পুরু গদির ওপর বসে চাঁপার সঙ্গে দু'চার দিন খোসগল্পও সে করে এল। সঙ্গে চা ও মিষ্টি!

বলে এল যে, চাঁপার নাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতার বনেদী জমিদার হরিপ্রসন্ন দাসের একমাত্র পুত্র হরলালবাবুও শুনেছেন চাঁপার অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা। তিনি একবার পদধূলি দেবেন চাঁপার গৃহে। দিন চারেক থাকবেন। চাঁপার কর্ত্তব্য হবে এই চারটি দিন ও রাত শুধু হরলালবাবুর জন্য রিজার্ভ করে রাখা। পান ও আহারের ব্যবস্থা এবং নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর রাখতে হবে বটে, কিন্তু বেশী রাত পর্য্যন্ত নয়, কারণ হরলালবাবু চাঁপাকে একান্তে চান। বাবু সেই কলকাতা থেকে একা আসবেন গোপনে বাপকে লুকিয়ে, সুতরাং মিস্ চম্পকরাণী—বলতে বলতে রঙ্গলাল একেবারে মোসাহেবের অভিনয় করে এসেছে: স্যারের যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেজন্য আপনি সব ব্যবস্থা করে রাখবেন কিন্তু।

চাঁপা মহা অপরাধিনীর মতো জিজ্ঞেস করেছিল: কিন্তু এখানে যে সব বাংলা—বিলিতি তো এখানে পাওয়া যায় না বিরিঞ্চিবাবু!

বিলক্ষণ!—স্যারের জন্য আপনি কেন ভাবছেন? তাঁর সঙ্গেই আসবে কয়েকটি বাক্স—সব বিলিতি মাল—দেখবেন একবার টেষ্ট করে, আর ভুলতে পারবেন না মিস্—বরং আপনি এক কাজ করবেন, এই কেমিক্যালের গয়নাগুলো যেন স্যারের সামনে পরে বেরুবেন না।

কেমিক্যাল?—বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলো চাঁপা!

বিরিঞ্চি বলে উঠলো: না, না, আমি আপনার গয়নার কথা বলছি না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই অমনি পরে থাকেন কি না। কৃত্রিমতা রাত্রে ধরা কঠিন।

প্রায় ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল চাঁপা: কিন্তু আমার গয়না একেবারে খাঁটি সোনার, তা জানেন? আর এ কী দেখছেন, আমার জড়োয়া গয়না আছে দু' সেট, দেখবেন?

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে একটা কাঁচের আলমারী খুলে ফেলে বার করলো একটি মাঝারি সাইজের টিনের বাক্স। বিরিঞ্চির চোখের সামনে ডালাটা খুলে ফেলে বললো: দেখুন, পছন্দ হবে কি না আপনার স্যারের। আমি মশাই মেকি জিনিসের কারবার করি না। খাঁটি জিনিস পাবেন আমার কাছে।

বিরিঞ্চি অনুরোধ জানালো: এইগুলোই তাহলে সে ক'দিন পরবেন, বুঝলেন? ভালো না লাগাতে পারলে আমারও চাকরি যাবে, মিস্ চম্পকরাণী—সেদিকে একটু যদি লক্ষ্য রাখেন। আপনার রূপগুণের কথা কত করে আমি বলেছি—

চাঁপা কথা দিয়ে দিয়েছে রঙ্গলালকে সে সবগুলো জড়োয়া গহনা পরে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে কলকাতার হরলালবাবুকে।

স্থির হলো, মোসাহেব বিরিঞ্চিকে সঙ্গে করে যাবে হরলাল চাঁপার গৃহে। অকস্মাৎ অসুস্থতার ভাণ করে সেদিনকার নৃত্যগীতের আসর ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তারপর রাত্রে চাঁপার নির্জ্জন কক্ষে হরলাল মদ্যপান করবেন। বিরিঞ্চির হাতসাফাইএর ফলে চাঁপার গ্লাসে পড়বে একেবারে খাঁটি জনিওয়াকার! পুলিশ এসে বাইরে থেকে এদের একবার হাঁক দিয়ে চলে যাবার পর অকস্মাৎ হরলালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবো আমি। গলা টিপেই শেষ করা যাবে চাঁপাকে। ইসারা পেয়ে নির্জ্জন কক্ষে এসে প্রবেশ করবে রঙ্গলাল। জড়োয়া গহনাগুলো নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়া যাবে। উত্তর দিকের বট গাছের ডালে সশস্ত্র যে দলটি আত্মগোপন করে থাকবে, তারা নিঃশব্দে নেমে রঙ্গলাল ও আমার দেহরক্ষীর মতো আমাদের ঘিরে অনুসরণ করবে।......

একেবারে নিখুঁত পরিকল্পনা। শীঘ্রই বাস্তবে রূপান্তরিত করবার সর্ব্ব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। কোনো স্বদেশী দলের ক্রিয়াকলাপ বলে আদৌ সন্দেহ করতে পারবে না পুলিশ। ফাল্গুনের এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি নির্দ্দিষ্ট করা হলো। দেলভোগে সেদিন সাহাদের বাড়ীতে যাত্রাগান। স্বভাবতঃই গ্রামবাসী ও শ্রীনগরের পুলিশ, এমন কি গণিকাপাড়ার সবাই ঐ যাত্রাগান দেখতে যাবে। সেই অবসরে চাঁপার গৃহে আমরা গিয়ে হাজির হব। ওদিকে হবে ঘোষালের যাত্রা আর এদিকে চাঁপার গৃহে নাটকাভিনয়। সেনাপতি বলবন্ত সিং এনামেল-করা তরবারি চালনায় ও মুহুর্মুহুঃ কর্ণপটহবিদারী হুঙ্কারে যখন সহস্র সহস্র দর্শকের কাছ থেকে পারিতোষিকস্বরূপ অর্জ্জন করবেন ঘন ঘন করতালি ও উল্লাসধ্বনি, চাঁপার রুদ্ধদ্বার কক্ষে একান্তে স্তিমিত আলোর নীচে তখন চলবে শিশির ভাদুড়ীর মূক অভিনয়, শনৈঃ শনৈঃ সে অভিনয়ের নায়িকা এগিয়ে চলবে ক্লাইমেক্সের পানে যেমন করে অজ্ঞ নৈশ মেলগাড়ী এগিয়ে যায় ফিসপ্লেট-খোলা লাইনের ওপর দিয়ে।......

দেখে তো ফুলবৌদি হেসেই অস্থির! হাসতে হাসতে বললেন: আজ আবার এ কী কাণ্ড বল তো? তোমার তো গোটাকতক ছদ্মবেশের কথা জানি, কিন্তু এই রূপ তো দেখিনি কোনো দিন! আজ কোন্ দিকে?

হেসে বললাম: অবান্তর প্রশ্ন। তার চাইতে তুমি একটু সজাগ থাকবার

চেষ্টা করো। তিনটের মধ্যে ফিরে আসবোই। আর ভোর হয়ে গেলেও যদি না ফিরি, তাহলে কাল সকালে ফুলদাকে শ্রীনগর থানায় পাঠিয়ো জামিনের ব্যবস্থা করবার জন্য।—বলে আবার হাসলাম।

বৌদি চুপ করে গেলেন। এই নীরবতার অর্থ কী, তা আমি জানি। দুঃখ এঁদের অনেক দিয়েছি, আমাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের ফলে অনেক বিনিদ্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রজনী এঁদের যাপন করতে হয়েছে, তাও আমার অজানা নয়। কিন্তু সমস্ত আবেগ ও আকুলতার ঊর্দ্ধে তুলে ধরেছি আমরা দেশাত্মবোধের ঝাণ্ডা!···জন্ম থেকেই আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত!

রাত তখন বারোটা হবে। মা, বাবা ও অন্যান্য সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তমিজদ্দী চৌকিদার একবার হাঁক দিয়ে সরকারী চাকরি বহাল রেখে চলে গেছে। রঙ্গলাল তো গেছে সেই সন্ধ্যাবেলায়। চাঁপাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফুলপরী তৈরী করে রাখতে হবে সবগুলো জড়োয়া গহনা পরিয়ে। নইলে জমিদার-পুত্র কলকাতার কাপ্তান হরলাল স্যার খুশী হবেন কেন! বিপদভঞ্জন তার সঙ্গে গেছে জল-ভরা গোটাকয়েক বিলিতী মদের বোতল আর কয়েকটি সত্যিকারের নারায়ণগঞ্জী সোডা নিয়ে। অন্যান্য যারা রিভলভার ও ছোরা নিয়ে রিজার্ভ ফোর্সের কাজ করবে, তারাও চলে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করবে তারা। আমার পকেটে থাকবে শুধু একখানা স্কাউট ছুরি, হাতলের বোতাম টিপলেই খচ করে বেরিয়ে আসে একখানি তীক্ষ্ণধার ফলা। অসুবিধা বোধ করলে চাঁপার কণ্ঠনালী সহজেই কেটে ফেলা যাবে।······

বৌদি বললেন: ফিরবে কি না, তাও বুঝি ঠিক নেই আজ?

বললাম: না। তবে যদি অকৃতকার্য্য হই, তাহলে জীবনে এই হবে আমার প্রথম পরাজয়। তোমার কি মনে হয়—

সে কথায় কান দিলেন না বৌদি, বললেন: মা, বাবা—তারপর চুপ করে গেলেন আবার।

আরসীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। প্রতিবিম্বিত হয়েছে কলকাতার কাপ্তান হরলাল দাসের চেহারা। ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখা, মাঝখানে তেড়ি-বাগানো ঘন চুল কপালের দুপাশে দুটি শিং-এর মতো করে ঘোরানো, চোখে ডিমের মতো কাঁচওয়ালা সোনার চশমা। পরনে শান্তিপুরী গিলে-করা ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, গলায় পাতলা ফুরফুরে চাদর আর হাতে কুকুরের মুখওয়ালা সরু ছড়ি।

ফুলবৌদি বললেন : কিন্তু তোমার কাছে এলেই স্পিরিট গামের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃত্রিম গোঁফ ধরা পড়ে যাবে।

হেসে জবাব দিলাম : তা হবে না। কলকাতার কাপ্তানের গা থেকে স্পিরিটের গন্ধ বেরুবে না তো কি ধূপধুনার সুবাস বেরুবে? ওতে কাজ হবে। মনে হবে এইমাত্র ইনি পান করে এসেছেন কোনো রূপসীর স্বাস্থ্য !

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

সাবধানে দক্ষিণের দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখলাম চতুর্দ্দিকে জ্যোৎস্নার বন্যা। পুকুরঘাটের ওখানে নীচে নামতে গিয়ে পেছন ফিরে চাইলাম, ফুলবৌদি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছেন।...দ্রুতপদে চললাম এগিয়ে। ম্যান্দার বাড়ীর হিজল গাছের নীচে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিল অনাথ। আর জমির কারিগরের বাড়ীর ওপাশে গাব গাছের ডালে বসেছিল মণীন্দ্র। তারা একজন চললো পিছনে, আর একজন সম্মুখে।

ঘোলোঘরগামী সড়ক দিয়ে নিঃশব্দে অথচ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চললো কলকাতার বনেদী জমিদার হরিপ্রসন্ন দাসের একমাত্র কাপ্তান পুত্র হরলাল দাস।

দেলভোগের গণিকাসম্রাজ্ঞী চম্পকরাণীর গৃহে তাঁর নৈশ আমন্ত্রণ !...

পঁয়তাল্লিশ

একটু পরই আমরা কেয়টখালী গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে এসে মাঠে পড়লাম। চারিদিকে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না! ক্ষেতে তখনো শস্য বোনা হয়নি বা বীজ ছড়ানো হয়নি, সবে লাঙ্গল চালিয়ে মাটির ডেলাগুলি উলটে ফেলা হয়েছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় ডেলাগুলোকে মনে হচ্ছে যেন অসংখ্য অনড় ক্ষুদ্র তরঙ্গ। এর পর বীজ ছড়ানো হবে, তা থেকে একদিন মুখ বাড়াবে অঙ্কুর, পরিণত হবে চারা গাছে। তারপর একদিন সেই চারা গাছ বড় হয়ে উঠলে শ্যামল সেই শস্যক্ষেত্রের ওপর জ্যোৎস্না আবার সৃষ্টি করবে অসংখ্য দোদুল্যমান তরঙ্গ। সে তরঙ্গ আর মাটির ডেলা নয়, ধানের শীষের দোলন-তরঙ্গ!

নীরবেই পথ অতিক্রম করছিলাম, অকস্মাৎ মণীন্দ্র বলে উঠলো: পুলিশের বাবারও সাধ্যি নেই দাদা যে, আপনাকে চিনতে পারে। আমরা নেহাৎ আপনার গলার স্বরও চিনি, তাই। নইতে যে নিখুঁত মেকআপ্ করেছেন—

একেবারে হরলাল দাস ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না, তাই না?—বলে হেসে উঠলাম।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম: ওদিকে সব রেডি তো?

মণীন্দ্র বললো: হ্যাঁ, দাদা! সন্ধ্যের পরই রঘুদা আর বিপদভঞ্জন মদের বোতল ভর্ত্তি প্যাকিং কেসটা নিয়ে গেছে। খগেন ওদের সঙ্গে গিয়েছিল। এসে বললো, চাঁপা খুব পরিপাটি করে মুরগীর কোর্ম্মা রান্না করছে। বিরিঞ্চিবাবু বলেছেন কিনা, হরলাল স্যার মুরগীর ঠ্যাং খুব ভালোবাসেন। যাত্রা শুনতে যাবে বলে অন্যান্য ঘরেও নাকি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না চলছে। চাঁপা সবাইকে আগেই জানিয়ে রেখেছে যে, সে আজ আর কোথাও যাবে না, কারণ ঘরে নতুন বাবু আসবেন। খগেন থাকতেই সেই কেষ্ট ছোকরা নাকি আবার এসেছিল। ইসারা করতেই চাঁপা তাকে বাজে কথা বলে ভাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু বললো, ও নাকি খুব ছোটবেলার বন্ধু আর এ পথে কেষ্টই নাকি চাঁপাকে প্রথম নিয়ে আসে। সুতরাং একটা কৃতজ্ঞতা—

কৃতজ্ঞতা তো থাকবেই।—বলে মনে মনে হাসলাম। মনে মনে বললাম, ছোটবেলার বন্ধুত্বের আজই হবে সমাধি! কাল সকালে ঘরের মেঝেতে মরা চাঁপাকে দেখে ছোটবেলার বন্ধু যে তাজা কোনো গোলাপের সন্ধানে তৎক্ষণাৎ

বেরিয়ে পড়বে, তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। এরা ভ্রমরের জাত। ফুল থেকে ফুলে আনাগোনা করাই এদের স্বভাবধর্ম্ম।

দূরে ঘোলোঘর গ্রামের গাছপালা দেখা যাচ্ছে। তীব্র জ্যোৎস্নায় যে দু'চারখানা বাড়ীও দেখা যাচ্ছে, মনে হয় সেখানে কেউ আর জেগে নেই। কিন্তু ঘোলোঘরের বাজার অতিক্রম করিবার পরই চাঞ্চল্য আশঙ্কা করছি। কারণ সাহাদের বাড়ীতে আজ আর কোনো দল নয়, একেবারে ঘোষাল অপেরা পার্টির যাত্রাগান। আশেপাশের অন্ততঃ দশখানা গ্রামের নরনারী সেখানে ভেঙ্গে পড়বেই।

অনাথ এক সময় নিরর্থক মন্তব্য করলো : মড়া পোড়ানো হচ্ছে।

দেখলাম, ডান দিকে ঘোলোঘর গ্রামের উত্তরে দূরে মাঠের মাঝখানে সত্যিই পাকা শ্মশানে আগুন জ্বলছে। বর্ষাকালে যে শ্মশান জলে ডুবে যায় না এবং যেখানে শান-বাঁধানো চুল্লী তৈরী করা থাকে, বিক্রমপুরে তাকে বলা হয় পাকা শ্মশান বা পাকা চিতা। গ্রামের কোনো কোনো ধনী এই শ্মশান প্রতিষ্ঠাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করেন।

খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দু'চারজন লোকের উপস্থিতি ও নড়াচড়া দেখা যায়। চিতার লাল আলো আশেপাশের গাছগুলোকে কেমন ভয়াবহ রূপ দিয়েছে। রূপালী জ্যোৎস্নার এই ফ্লোরেসেণ্ট প্লাবনের মধ্যে যেন দেশী কোম্পানীর সস্তা কার্ব্বন-ভর্ত্তি বাল্‌ব জ্বলছে। বিরক্তিকর মনে হয়।

কে একজন মারা গেছে। কার ঘর শূন্য করে বেরিয়ে এসেছে খোকা, অথবা খুকু অথবা মা, বাবা, জানি না। কোন্ নিরবচ্ছিন্ন সুখের নীড়ে এমনি বজ্রাঘাত হয়েছে কে জানে! জ্যোৎস্নাবিধৌত এই অনির্ব্বচনীয় রাত্রি কার অন্তরে সৃষ্টি করছে মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকা, কে তার সংবাদ রাখে! চলিষ্ণু দুনিয়ার ষ্টীম রোলার ধক্ ধক্ করে যখন এগিয়ে চলে, তখন তার নীচে চাপা পড়ে কোন্ অসহায় পিপীলিকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল, তা নিয়ে কোনো দিন কখনো বিন্দুমাত্রও আলোড়ন সৃষ্টি হয় কি?......কেমন অদ্ভুত একটা কথা আমার মনে জাগলো। কে জানে, কাল হয়তো এই পাকা শ্মশানেই আসবে দেলভোগের গণিকাসম্রাজ্ঞী চম্পকরাণীর শবদেহ ময়না তদন্তের পর, রাত্রিকালে এমনি দেশী কোম্পানীর বাল্‌ব জ্বালিয়েই হয়তো তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। কেউ কি স্বপ্নেও একবার ভাবতে পারবে যে, নিজের অজ্ঞাতে দেশজননীর বেদীতলে এই স্বৈরিণী কী ভাবে আত্ম-বলিদান করে গেল?......

অকস্মাৎ যেন ভূত দেখতে পেলাম! যোলোঘর গোয়ালাপাড়া ছাড়িয়ে মাঠের মাঝখানে একটা হিজলবন আছে। সেই বনের মধ্যেই রাস্তাটা একটা মোড় ঘুরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমকোণ সেই মোড়টা যেই ঘুরেছি, অমনি মাত্র ত্রিশ হাত দূরে দেখতে পাওয়া গেল হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে জনকয়েক পুলিশ আর তাদের পুরোভাগে শ্রীনগর থানার দারোগা বা সহকারী দারোগা। ঠিক কে, তা জানা গেল না।

না গেলেও বিপদ যে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তা জানা গেল। কোনো দিকে পলায়নের পথ নেই। দৌড়লেই ওরা ধাওয়া করবে। চতুর্দ্দিকে খোলা মাঠ আর জ্যোৎস্না। সুতরাং ধরে ফেলবেই। ব্যস্, তাহলেই বিরাট মামলা আর এদের প্রচুর পুরস্কার লাভ। দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে 'সি' ক্লাস কয়েদী করে শ্রীঘরে পাঠিয়ে ঢাকার আই বি আহ্লাদে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করবে!

কিন্তু চিন্তা করবার সময় কোথায়?

ছড়িটাতে ভর করে অকস্মাৎ আমার পা খোঁড়া হয়ে গেল। অনাথ তাড়াতাড়ি পেছন থেকে রাস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে মূত্রত্যাগে বসে গেল আর মণীন্দ্র চিরকালই হীরা সিং-এর মতো বিপদকে থোড়াই কেয়ার করে চলে কিনা; তাই সে ডান হাতখানা সার্টের পকেটে পুরে দিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চললো। অসুবিধে বুঝলেই সে আজ এদের একটিকেও যে আর থানায় ফিরে যেতে দেবে না, সে সত্য আমার অজ্ঞাত নয়।

কিন্তু বরাবরের মতো ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন, তাই দারোগাসহ পুলিশের দল যেমন গট্ গট্ করে এগিয়ে আসছিল, তেমনি গট্ গট্ করেই আমাদের ক্রস করে চলে গেল। কিন্তু বিশ পা গিয়েই বোধহয় ওদের মনে সন্দেহ জেগেছে। দেখলাম, ওরা থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দেখছে। তাড়া করতে পারে, আশ্চর্য্য নেই। মণীন্দ্র তো পকেট থেকে রিভলভারটা বার করেই ফেলেছিল আমার সত্যিকারের দেহরক্ষীর মতোই, আমি বাধা দিলাম। ওদের টেনে নিয়ে আবার রওনা হলাম। পেছন ফিরে দেখলাম, ওরাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমার খোঁড়া পা আবার জোড়া লেগে গেল।

দেলভোগ সাহা বাড়ীর পূব দিককার পুকুর ঘিরে যে পথটি চলে গেছে, সে পথে অগ্রসর হবার সময় বুঝতে পারা গেল, যাত্রাগান পুরো দমে চলছে। দু' চার জন দর্শকের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ এরা হরলাল দাসকে চিনতে পারবে কী করে? সাহা বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বিরাট

গেট-এর নীচে দিয়েই পথ। দেখলাম, হুড় হুড় করে তখনো দর্শক গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে হাসি পেল, সাহা বাড়ীর যাত্রা চলছে, একটু পরই চাঁপার বাড়ীতে সুরু হবে নাটক। যাত্রার পরিণতি আনন্দময় হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু নাটকের পরিণতি কী হবে কে বলবে ?···বৌদিকে তো বলেই এসেছি, না ফিরলে সকাল-সকাল ফুলদাকে শ্রীনগর থানায় পাঠাতে জামিনের ব্যবস্থা করার জন্য।

মণীন্দ্রের মনে অস্বস্তি বোধহয় তখনো ধোঁয়া পাকাচ্ছিল। এক সময় বলে উঠলো : ও ব্যাটারা যদি কেয়টখালী যায় দাদা ?

অনাথ স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। সারাটি পথ একটি কথাও বলেনি সে। মণীন্দ্রের প্রশ্নে হঠাৎ যেন একটা বিপদের প্রশ্ন জাগলো তার মনে। তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো : সত্যিই তো, যা বলেছিস্ মণী। কী হবে ওরা যদি গিয়ে থাকে ?

সঙ্গে কাকে দেখলে ? কোন্ দারোগা ?—প্রশ্ন করলাম।

মণীন্দ্র জবাব দিল : নাঃ, কোনো দারোগা নয়। বোধহয় কোনো এ. এস. আই। তাই বোকার মতো পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দারোগা হলে নিশ্চয়ই চ্যালেঞ্জ করতো।

বললাম : তাহলে বোকার মতো সে আর কেয়টখালী গাঙ্গুলী বাড়ী যাবে না। আর শত হলেও এ. এস. আই। যে বাড়ীতে যায় কালিপদ মৈত্রের মতো রুই আর বড় দারোগার মতো কাতলা, সেখানে চুনো পুঁটি হয়ে তার সাহসই হবে না হানা দেবার !

ওরা আর কথা কইলো না, কিন্তু বুঝলাম মনে মনে ওরা দু'জনেই ক্ষুব্ধ হয়েছে। মণীন্দ্র সার্টের পকেটে করে যে বস্তুটি এনেছে, তা ব্যবহার করবার জন্য তার হাত যে নিসপিস করছে, তা আমি জানি। কিন্তু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের প্রয়োজন যেখানে সীমাহীন, সেখানে ক্রোধ দেখাবার অবকাশ কোথায় ?

গণিকা পাড়ায় প্রবেশ-পথের মুখেই রঙ্গলাল দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে বিপদভঞ্জন। যেতেই বললো : সব মাটি হয়ে গেছে দাদা! বেটি আবার কোন্ ব্যাটার পাল্লায় পড়ে গেছে যাত্রাগান শুনতে। অবশ্য ঝি-এর কাছে বলে গেছে যে, পনরো মিনিটের মধ্যেই ফিরবে। সে তো প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল।

আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও চাঁপা যখন ফিরলো না, রঙ্গলাল তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। এতদিনকার পরিকল্পনা সব ভেস্তে যাবে এক অবিমৃষ্যকারিণী গণিকার হঠকারিতায় ? এক বদমায়েস জমিদারপুত্রের মোসাহেব সেজে কী মারাত্মক অভিনয় করে সে সব দিক গুছিয়ে এনেছিল, তা কি

এমনিভাবে চুরমার হয়ে যাবে এক মুহূর্তে? এই ডাকাতি-লব্ধ অর্থে সংগঠনের কাজ কতখানি বাড়িয়ে দেয়া যাবে, তা নিয়ে আমার সঙ্গে সহর্ষ আলোচনায় যে সে একাধিক রাত্রি ভোর করে ফেলেছে! কেষ্ট কি আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে?

সত্যিই রঙ্গলাল মরিয়া হয়ে উঠলো। বললো: এসেই যখন পড়েছি দাদা, তখন চল, শেষ না দেখে যাচ্ছি না আজ। কেষ্টর সঙ্গে যাত্রাগান শুনতে ও গেছে নিশ্চয়ই। সেখানে চল। আমায় সে চেনে আর ছোটকোন্‌কেও তার ভোলবার কথা নয়। ছোটকোন্ আর তুমি দর্শকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াবে আর আমি কৌশলে মহিলাদের দিকটাতে ঘোরাফেরা করবো। ওকে দেখলেই ইসারা করবো কিংবা আমায় দেখতে পেলে ও নিজেই উঠে আসবে, দেখো। নগদ পাঁচশো টাকার লোভ সহজে ছাড়তে পারবে না। তারপর ইসারায় ছোটকোন্‌কে দেখিয়ে দিলেই ও বেটি তোমায় দেখতে পাবে। তারপর আমাদের খপ্পরে না এসে ও যাবে কোথায়!

পরিকল্পনা মন্দ নয়। ঝুঁকির মাত্রা একটু বৃদ্ধি পেলেও দারুণ আশঙ্কার কোনো হেতু নেই। আর হত্যার সিদ্ধান্ত যেখানে গ্রহণ করা হয়েছে, সেখানে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা আমাদের বিমুখ করবে কী করে?

সশস্ত্র যে দলটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিল, তাদের ডেকে আনা হলো। তারপর সবাই রওনা হলাম সাহাদের বাড়ীর দিকে।

কিন্তু বিরাট গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আর এক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম। সাহাদের জনকতক প্রতিনিধি গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিত কোঁচা, ছড়ি ও সোনার চশমা দেখে আমাকে নিশ্চয়ই তাঁদের মনে হলো জনৈক বিশিষ্ট অচেনা অতিথি; সুতরাং ব্যস্তভাবে দু'তিনজন এগিয়ে এসে একেবারে কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন: আসেন, আসেন! আমাগো মত গরীবের বাড়ীতে আপনাগোর মত মহাশয় ব্যক্তিদের পদধূলি—আসেন, আসেন!

এই অভ্যর্থনা এমনিভাবে করা হলো এবং বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সাহা বাড়ীর প্রতিনিধিবৃন্দ এমনিভাবে আমায় সাদর আহ্বান জানালেন যে, কিছুতেই তাঁদের এড়ানো সম্ভব হলো না এবং একই সঙ্গে জনকতক পুলিশ দর্শকসহ আমায় নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হলেন যাত্রা-মণ্ডপের দিকে। এড়াতে চেষ্টা করেও শোচনীয়-ভাবে ব্যর্থ হলাম এবং এঁদের অভ্যর্থনার বন্যায় আমার সমস্ত আপত্তি তৃণের

মতো ভেসে গেল। যখন ধাতস্থ হলাম, তখন দেখি বসে আছি একটি বেঞ্চে ঘেঁসাঘেসি আরও জনকতক পুলিশ দর্শকের সঙ্গে। বিপদভঞ্জন কিন্তু আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। দেহরক্ষীর মতোই সে এসে বসেছে আমার পাশেই।

অত্যন্ত সাবধানে যাত্রার ষ্টেজের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রায় ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম: রঙ্গলাল ওরা কোথায়?

বিপদ বললো: কি জানি, দেখছি না তো তাদের একজনকেও।

এরা আমায় চিনে ফেলেছে নাকি?

ফেলেনি এখনও মনে হচ্ছে। তবে একেবারে একই বেঞ্চে পুলিশের সঙ্গে— ঝুঁকিটা বড্ড বেশী মনে হচ্ছে দাদা! হরলালের খোলসটা ওরা চিনে না ফেলে।

বললাম: সহজে পারবে না। ছদ্মবেশে কোথাও ত্রুটি নেই। আর গোঁফজোড়া থেকে যে স্পিরিট গামের গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে আরও নিঃসন্দেহ হবে ওরা।

কিন্তু পরিস্থিতি আদৌ ভালো নয়। পেছনের বেঞ্চে বসে আছেন স্বয়ং যতীন দারোগা, হামেসাই যিনি আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকেন। তাঁর পাশেই এ. এস. আই রবীন দত্ত। আশেপাশে অন্যান্য অফিসার আর আমাদের বেঞ্চেও জনকতক পুলিশ। এতগুলো শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কতক্ষণ রাখা যেতে পারে? কিন্তু মুশকিল এই যে, বিনা কারণে অকস্মাৎ স্থানত্যাগ করে উঠে গেলেও তো সবার চোখে পড়ে যাবো! কে জানে, হয়তো কাছেই কোথাও অপেক্ষায় আছে অভ্যর্থনাকারী দলের জনৈক সদস্য। উঠে দাঁড়াতেই হয়তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তিনি আবার অজস্র বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে বলে উঠবেন: এ কি, অখনই চললেন যে বাবু? পালাটা কি ভালো লাগতে আছে না নাকি? আর এক অঙ্ক দেইখা যান।

অনুরোধে হয়তো ঢেঁকি না গিলে পারা যাবে না। বসতে হবে।......

বিপদভঞ্জন বললো: রমুদাকেও দেখা যাচ্ছে না। ভিড়ে কোথাও মিশে গেছেন। আমাদেরও হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন না। আমাদের দেরি করাও ঠিক হবে না।

একজন লোক এসে আমাদের সবাইকে প্রোগ্রাম বণ্টন করে গেল, আর একজন এসে দিয়ে গেল মিঠে পান। পান খাই না, কিন্তু খেতে হলো। প্রোগ্রামখানি পরীক্ষা করে বিপদ বললো: এই দৃশ্যেই তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবে। কনসার্ট শুরু হলেই আমাদের সরে পড়তে হবে কিন্তু—

অনুচ্চকণ্ঠে বললাম : অল্ রাইট্।

সাহা বাড়ীর নীচে নেমে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রঙ্গলালদের দেখা নেই। ভেবেছিলাম ভিড়ের মধ্যে ওরা হয়তো গা ঢাকা দিয়ে আছে, আমাদের বেরিয়ে আসতে দেখেই ওরাও বেরিয়ে এসে যোগদান করবে। কিন্তু কোথায় ?···তবে কি চাঁপাকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে রঙ্গলাল ? কার্য্যোদ্ধার করবার জন্য ও যেমন পাগল হয়ে উঠেছিল, কিছুই বলা যায় না। হয়তো দেলভোগে ও আমারই অপেক্ষায় রয়েছে। না দেখে তো চলে যাওয়া যায় না।

সুতরাং আমরা আবার এলাম গণিকাপাড়ায়। বিপদভঞ্জন দেখে এল, চাঁপার ঘরে তখনো তালা ঝুলছে। বেশ্যার আবার কথার মূল্য কী ? হরলালের জন্য সর্ব্ব আয়োজন করে অবশেষে কেষ্টলালকেই সে হয়তো অভ্যর্থনা জানাবে, এতে আর বিস্ময়ের কী আছে ?······

কিন্তু আর বিলম্ব করা সমীচীন নয়। রাত তখন তিনটে বেজে গেছে। যাত্রাগানের আসর ভাঙ্গতে যত দেরিই থাক, কিছু সংখ্যক দর্শক নেমে আসছেন দেখা গেল। গৃহ-গমনেচ্ছুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাবে। যেভাবে ফাঁড়া কাটিয়ে বেরিয়ে আসা গেছে, এর পর আবার অতখানি ঝুঁকি নেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হলো না। তাই বিপদ ও আমি দ্রুত পদক্ষেপে রওনা হলাম গৃহাভিমুখে।

ম্যান্দার বাড়ীর কাছে এসে চমকে উঠে থমকে দাঁড়ালাম। দক্ষিণ দিকের আমার কক্ষে আলোরেখা !

সমস্ত ব্যাপারটাই মুহূর্ত্তে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই এ. এস. আই শ্রীমান এসেছে ধূর্ত্তের মতো স্বগৃহে অন্তরীণ রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দেখে যেতে। এসে দেখে সে নেই। ফুলবৌদি বা ফুলদা বেগতিক দেখে বোধহয় আবোল-তাবোল কিছু বলে ধামাচাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এখন শ্রীমান ওৎ পেতে বসে আছে শিকার ধরবার আশায়।

বিপদ বললো : আমি দেখে আসি দাদা ! আপনি এখানে থাকুন।

বলেই সে এগিয়ে যাচ্ছিল ; আমি হাত ধরে ফেললাম। ওর পকেট থেকে রিভলভারটি বার করে নিয়ে শান্ত স্বরে বললাম : এবার যাও। ধরা পড়লে একটা গান ধরো। এটা পকেটে থাকলে গানের কথা ভুলে যাবে, Gun-এর কথা মনে পড়বে এবং তখন তোমায় সামলানো যাবে না।

মুহূর্ত্ত পরেই বিপদভঞ্জন ফিরে এল ও হাসিতে সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তুলে আমায় একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো : চলুন !

রঙ্গলালের মুখে যা শুনলাম তা হচ্ছে এই যে, দারোগা পুলিশ সহযোগে সাহা বাড়ীতে আমাদের অভ্যর্থনার বহর দেখে ওরা বুঝে নিয়েছিল যে, আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেছে। তাই পেছন থেকে ওরা সবাই সরে পড়ে সোজা ছুটে এসেছে বাড়ীতে। আমায় গ্রেপ্তার করবার পর পুলিশ অনতিবিলম্বেই যে এসে হানা দেবে গ্রামের প্রত্যেক ছেলের বাড়ীতে, সে তো জানা কথাই। তাই ওরা এসে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে আপত্তিজনক জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলে সর্ব্বশেষ এসেছে আমার কক্ষে।

সুতরাং হাসাহাসি সুরু হয়ে গেল। ফুলবৌদি আপত্তিকর দ্রব্যের পোঁটলা-বাঁধা বন্ধ করে চুপটি করে ঘটনাটি শুনছিলেন, এবার বলে উঠলেন : দাও, ক্ষতিপূরণ দাও ! সারাটি রাত যে আমার ঘুম হলো না, তার দাম দেবে কে ?

সবাই হেসে উঠলো।

ছেচল্লিশ

গণিকাশ্রেষ্ঠা চম্পকরাণীর গৃহে হানা দেবার পরিকল্পনা এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ছেলেদের সবার মনেই অসম্ভব জিদ দেখা দিল। একটা কিছু তারা করবেই। কী করবে, কোথায় করবে, কেমন করে করবে, তা নিয়ে নাকি মাথা ঘামাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একার। ওরা শুধু চায় অর্ডার, হুকুম। খিজির খাঁর মতো আমি নাকি শুধু হুকুম করে যাবো আর সানন্দে ওরা সবাই তা তামিল করে যাবে কাফুর খাঁর মতো। Theirs' not to reason why—কেন, এ প্রশ্ন কখনো জাগবে না তাদের মনে। কিসের অভিযান, কোন্ পথে আঘাত হানলে সর্ব্বাধিক সাফল্যের সম্ভাবনা আছে, সে আঘাতের ঝুঁকি কতখানি, কার্য্যান্তে প্রত্যাগমনের কোনো পথ খোলা থাকবে কি না, এই সব মারাত্মক প্রশ্ন তাদের কাছে একেবারে নিশ্প্রয়োজন ঔৎসুক্য, অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক। ফলাফল হৃষীকেশের হাতে তুলে দিয়ে উৎসর্গীকৃত সন্তানের মতো তারা আত্মবিলোপনে উন্মুখ। আধুনিক যুগের অত্যাধুনিক গণতান্ত্রিক ভার্নিশে পালিশ-করা মন নিয়ে সে যুগের সৈনিক মনোবৃত্তির পরিমাপ করা সহজ নয়। এ যুগে ব্যক্তিকে স্থান দেয়া হয়েছে সবার ওপরে, গণতান্ত্রিক বিধানাবলীর জলসিঞ্চনে সমষ্টিগত দুঃসাহসী প্রস্তাবকে একেবারে ঠাণ্ডা করে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে। যুক্তির যাঁতাকলে ফেলে আবেগময় আবেদনকে একেবারে পিষে ফেলা হয়েছে। এ যুগে তাই কোনো একজন নেতার অভাব, সঙ্ঘের প্রাধান্য এখন সীমাহীন প্রবল। এ যুগে তাই গণতান্ত্রিক পথে চলে আলাপ-আলোচনা, শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ, পুষ্প-স্তবক বিনিময়, চলে প্রতিনিধি সভা, চলে পত্রালাপ, সাক্ষাৎকার ও সংবাদপত্রে বিবৃতি। Order of the day জারী করবার মত উত্তপ্ত আবহাওয়া এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না। সৈনিকের সমাধির ওপর তাই উঠেছে যুক্তির মিনার!……

ছেলেরা যখন একটা কিছু করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় হয়ে উঠলো আবেগচঞ্চল, আমি তখন মনে মনে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম আর-একটি নিখুঁত পরিকল্পনা। চাঁপার গৃহে আর যাওয়া যেতে পারে না। কেষ্টলাল তার ছোটবেলাকার বন্ধু। তার মোহ কাটানো সম্ভব নয়। তাই সে বেশ সহাস্যে ও সহজেই রঙ্গলালের ফাঁদে পা বাড়িয়ে আবার ফস্কে গিয়ে ধরা দিল কেষ্টলালের জালে। ওর ঘরে জল-ভরা যে সব বোতল রেখে আসা হয়েছে, এত দিনে নিশ্চয়ই কেষ্ট তার স্বাদ গ্রহণ করে

দেখেছে এবং বুঝতে পেরেছে কলকাতার কাপ্তান সংক্রান্ত ব্যাপারে কোথাও গলদ আছে! কাজেকাজেই দেলভোগ আর যাওয়া চলে না।

একদিন বিকেলে শ্রীনগর থানায় সাপ্তাহিক হাজিরা দিয়ে ফেরবার পথে দেলভোগের হাটের কাছে একটু দাঁড়ালাম। সেদিন ছিল গরুর হাট অর্থাৎ ঐ দিনে শুধু গরু বেচা-কেনা হয়ে থাকে। বিরাট হাট। অসংখ্য গরুর সমাবেশ। অসংখ্য ক্রেতা। বহু হাজার টাকার লেন-দেন হয়। সন্ধ্যার পরও কিছুক্ষণ হাট চলে, তারপর ভিড় ভাঙতে থাকে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এল।···পরের সপ্তাহে আবার শনিবারে ঐ হাটে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দু'একটা গাইয়ের দামও যাচাই করলাম নিরর্থক। অপর ক্রেতার প্রদত্ত টাকার পানে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, দেখলাম সরু দীর্ঘ থলিতে নোটের তাড়া পুরে দিয়ে বিক্রেতা সেটা কোমরে এঁটে জড়িয়ে রাখলো।······ চলে এলাম।

তার পরের সপ্তাহেই সর্ব্ব আয়োজন শেষ হয়ে গেল। রঙ্গলাল ও বিপদভঞ্জনকে পাঠানো হলো দেলভোগ গরুর হাটে দুপুর বেলাতেই। ক্রেতা হিসেবে হাটে প্রবেশ করে তারা ঘুরে ঘুরে নানারকম গরুর দাম যাচাই করতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে রাখলো খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য রাখবার জন্য কোন্ বেপারী বেশ মোটা টাকা কোমরে জড়িয়ে রাখছে। অনাথ আর খগেন অপেক্ষা করতে লাগলো হাটের বাইরে মাঠে আর কালাচাঁদকে নিয়ে আমি নিজে অপেক্ষা করতে লাগলাম আরও দূরে পূব দিকে মাঠের মাঝখানে যে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তারই ধারে। ক'জন লোক মাছ ধরছিল ছোট ছিপ ফেলে। পুঁটি ও ট্যাংরা মাছ। দেখতে ভালো লাগলেও সে দৃশ্য অকস্মাৎ আমাদের কাছে যেন অত্যধিক সুন্দর মনে হলো। তাই আমরা সাগ্রহে দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে। একটি চক্ষু ফাতনার দিকে নিবদ্ধ রেখে অপর চক্ষু প্রসারিত করে রাখলাম হাটের পথে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনো তিথি ছিল, বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। সন্ধ্যে হতে না-হতেই খগেন এসে সংবাদ দিয়ে গেল যে, রঙ্গলাল ও বিপদ হাট থেকে রওনা হয়েছে। একটু পরই দেখা গেল, তারা হাসিমুখে আলাপ করতে করতে আরো দশজন পথিকের মতই হাট থেকে বেরিয়ে এল এবং আমাদের দিকে আড়চোখে একটি অর্থবোধক দৃষ্টি হেনেই এগিয়ে চললো দক্ষিণ দিকের পথ বেয়ে। কিছু দূরে থেকে থেকে আমরাও একে একে তাদের অনুসরণ করলাম।

যে পথটি দেলভোগ হাট থেকে বেরিয়ে খানিকটে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে এসে

আবার পূব দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে দক্ষিণে সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের কাছে মুন্সীগঞ্জগামী বড় সড়কের সঙ্গে মিশে গেছে, আমরা সেই পথে এগিয়ে চললাম। চলতে চলতে পেছনে পড়ে বিপদ এক সময় এসে চুপি চুপি আমায় জানিয়ে গেল যে, সম্মুখে যে লোকটা ছোট একটা বাছুর নিয়ে চলেছে, অনেক টাকা আছে তার কাছে এবং সে-ই হচ্ছে আমাদের শিকার।

এগিয়ে চলতে চলতে সহগামী পথিকের সংখ্যা ক্রমেই কমে এল এবং এক সময় দেখা গেল কিছু দূরে দূরে জনতিনেক লোক অনেকক্ষণ যাবৎ একই পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই একটি করে গরু বা বাছুর আছে। নিশ্চয়ই বেচা-কেনার পর এটি অবশিষ্ট আছে, তাই বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। সবার সম্মুখে চলেছে যে লোকটি, তার মাথায় তেল চপ্‌-চপে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল বেড়িয়ে বাঁধা একটি গাঢ় লাল কাপড়ের টুকরো, সরু গোঁফ, থুঁতনিতে ছোট্ট নূর, হাতে গরু চরাবার পাচন, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। লোকটাকে দেখলেই লাঠিয়াল বলে মনে হয়। তার পশ্চাতে কিছু দূরে যে লোকটি চলেছে, সে একেবারে বৃদ্ধ, দীর্ঘ শ্মশ্রুতে মুখ ঢাকা, ময়লা লুঙ্গি পরিধানে, কাঁধের ওপর ততোধিক ময়লা গামছা। একটি অস্থিচর্ম্মসার বাছুর নিয়ে চলেছে সে। সবার পশ্চাতে যে চলেছে একটি গরুর দড়ি হাতে করে, সে একেবারে অল্পবয়সী, কুড়ি-একুশের বেশী হবে বলে মনে হয় না।

বিপদ আবার পেছনে পড়লো। বললো: দাদা, ঐ বাবরীওয়ালাকে ধরতে হবে। কিন্তু আর দুটো লোকও যে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের কি করা যায়?

বললাম: একজনকে ধরবার কথা ছিল, এবার তিনজনকে ধরতে হবে।

সহজ জবাব পেয়ে সহজ সৈনিক বিপদের মন একেবারে নিসপিস করে উঠলো! বললো: তাহলে আমি ধরবো ঐ ছোকরাকে, আর বাবরীওয়ালাকে আপনি। কেমন দাদা?

পিঠ চাপড়ে বললাম: ছোকরাটাকে ধরবে খগেন আর তুমি, আর তুমিই হচ্ছ তোমাদের গ্রুপে লীডার। খগেন তোমার নির্দ্দেশ মেনে চলবে।

আরও খুশী হয়ে উঠলো সে। অনুরোধ জানালো: তাহলে ওটা আমার কাছে দেবেন না?

হেসে জবাব দিলাম: তাহলে লোকটা অতি সহজেই প্রাণ হারাবে। খুব ঠাণ্ডা মাথা রাখতে হয় এ সব কাজে। পোড়ানো লোহার মতো তুমি যে গরম, ছুঁলেই ও ব্যাটা পুড়ে যাবে। তাই এটা আমার কাছেই থাক।

বিপদ হাসলো।

আরো কিছুক্ষণ হাঁটা গেল। কিন্তু এই তিন জনের জুটি আর ভাঙ্গবার নয়। আমরাই বা আর কত দূর এদের অনুসরণ করবো? গ্রামের পায়ে-চলা পথ অনেক সময় পাড়ার মধ্য দিয়ে, পুকুরপাড় ঘুরে, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে, লাউয়ের মাচার নীচে দিয়ে, অনেক সময় একেবারে উঠানের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলে। এমনিভাবে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হলো অনেক দূর।

আকাশে চাঁদ থাকলেও মেঘও আছে প্রচুর। সঞ্চরমান লঘু মেঘ। তাই চাঁদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলেছে বেশ। কি মাস, তা মনে নেই। তবে হেমন্তের শেষাশেষি হবে। শীত একেবারে এসে না পড়লেও তার আমেজ অনুভব করা যায় সন্ধ্যে হতেই। গ্রামের চতুর্দ্দিকে নীরবতা এসে যায় সন্ধ্যের পরেই।

আর দেরি করা সঙ্গত মনে হলো না। পথঘাট ভাল করে জানা না থাকলেও আমরা যে বীরতারা অভিমুখে চলেছি, তা বোঝা গেল। সুতরাং বিপথে যাবার আশঙ্কা নেই।

আমরা ছয় জন, আর ওরা তিনটি। সুতরাং দু'জনের তিনটি দল তৈরী হয়ে গেল। সবার সম্মুখে চলেছে সে বাবরীওয়ালা লাঠিয়াল, সবার পশ্চাৎ থেকে এগিয়ে এলাম আমি কালাচাঁদকে সঙ্গে করে। বৃদ্ধের পশ্চাতে এসে জুটে গেল রঙ্গলাল ও অনাথ। ছোট ছেলেটার কাছাকাছি এসে পড়লো খগেন ও বিপদভঞ্জন। এমনিভাবে আরও কিছুক্ষণ চলবার পর আমরা একটা মাঠে এসে পড়লাম। এবং—

অকস্মাৎ আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাঠিয়ালের চোখের ওপর তীক্ষ্ণ ধার ছোরা তুলে হুকুম করলাম: এই, কী আছে টাকাকড়ি, বার কর। জলদি—

পশ্চাতের ছেলেরাও তেমনি একসঙ্গে লাফিয়ে পড়লো শিকারের ওপর।

লাঠিয়াল প্রথমটা হকচকিয়ে গেল, তার পর-মুহূর্ত্তেই পলায়নের চেষ্টা করতেই লাফিয়ে তার সম্মুখে এসে পড়লাম এবং প্রাণপণ শক্তিতে ছুরিকাঘাতের অভিনয় করে শুধু ছোরার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটি তার পিঠের ওপর চেপে ধরে কালাচাঁদকে হুকুম করলাম: ছুরি দিয়ে এর পেটের ঝুলি বার করে ফেলতো রহমৎ।

রহমৎ তৎক্ষণাৎ ছোরা বার করতেই লোকটা কম্পিতস্বরে বললো: হুজুর, আমার লগে কিছুই নাই।

সুতরাং ছোরার অগ্রভাগ আরো একটু চেপে গেল মাংসের ভেতর। ধমক দিলাম: চোপরাও বেয়াদপ। কী আছে, বার কর, নইলে টুকরো টুকরো করে ফেলবো তোকে।

লোকটা তবুও ইতস্তত: করতে লাগলো। ছোরার ফলা নিশ্চয়ই ততক্ষণে আধ ইঞ্চি বসে গেছে। প্রয়োজন হলে আধ ইঞ্চি কেন, আধ হাত বসিয়ে দিতেও কসুর করবো না আমি। কিন্তু চরম ব্যবস্থা তখনই গ্রহণ করা হবে, যখন অন্য সব পন্থা ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই ছোরার ফলাটি আরো একটু বসিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগলাম পাখীর পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মতো করে। রক্তে লাঠিয়ালের ফতুয়ার একাংশ সিক্ত হয়ে উঠলো।

এবার হুঁস্ হলো শ্রীমানের। ধীরে ধীরে কোমর থেকে সরু থলিটা খুলতেই কালাচাঁদ সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেটস্থ করে ফেললো। আর যেই আমি ছোরাটি তুলে নিলাম, অমনি সাহসী লাঠিয়াল জমির মধ্য দিয়ে সোজা ছুটে পালাল তাড়া-খাওয়া পাতি শেয়ালের মতো। পড়ে রইলো তার পাচন, পড়ে রইলো তার মাথার লাল বৈজয়ন্তী। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো গরুটি।

এবার ছুটে এলাম বুড়ো বেপারীর দিকে। দেখলাম, বিপদভঞ্জন আর খগেনও ততক্ষণে এসে গেছে সেখানে। বুড়োর সাহস দেখা গেল প্রায় অসহনীয়। রঙ্গলাল বার বার ছোরা ঘোরাচ্ছে তার নাকের ডগায়, আর বার বার ধমক দিচ্ছে, কিন্তু সে মিনমিন করে প্রাণভিক্ষা চেয়ে অনর্থক দেরি করাচ্ছে আমাদের। দেরি করবার সময় কোথায়? লাঠিয়ালকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, পালিয়ে গেছে সেই ছোকরা। কাছেই কোনো পাড়াতে গিয়ে উঠলেই কে জানে, লোকজন ছুটে আসতে পারে লাঠি, সড়কি ও লণ্ঠন নিয়ে। অকস্মাৎ মনে হলো বৃদ্ধ খুব হুঁসিয়ার ব্যক্তি, ইচ্ছে করেই এমনি কাঁদুনি গাইছে কালহরণের অভিসন্ধিতে! সুতরাং—

এগিয়ে এলাম আমি। ছোরা বার করে লোকটার কাঁধের ওপর চেপে ধরলাম আর হুকুম করলাম রঙ্গলালকে: ওর চোখ দুটো উপড়ে ফেল ছমিরদ্দি!

খগেন পশ্চাৎ থেকে দু'হাতে জাপটে ধরলো ওকে আর রঙ্গলাল অদ্ভুত ঝাঁকুনি দিয়ে তীক্ষ্ণধার ছোরাখানি একেবারে তুলে ধরলো ওর চোখের ওপর।···এবার কাজ হলো। লোকটা কেঁদে উঠলো: দিতেছি হুজুর, দিতেছি।—বলে সে কোমর থেকে সরু থলিটা খুলে ফেলে রঙ্গলালের হাতে তুলে দিল। আমরা ছেড়ে দিলাম ওকে।

কিন্তু কার্য্যান্তে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। কোথা দিয়ে কোন্ অজানা বিপদ এসে পড়বে, কে বলতে পারে!···ডবল্ মার্চ্চ করে রওনা হলাম জমির মধ্য দিয়েই সোজা উত্তর দিকে। কিছু দূর আসার পরই অদূরে একজন পথচারীকে দেখা গেল। আমরা তাকে অতিক্রম করে চলে আসতেই লোকটা পশ্চাৎ থেকে হাঁক দিয়ে প্রশ্ন করলো: কারা যায়?

বিপদ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল : Your forefathers !

তৎক্ষণাৎ হুঁসিয়ার করে দিলাম : ভুল করলে। লোকে রেগে গেলেই হিন্দী বা ইংরেজীতে কথা কয়। অন্যত্র তাতে কিছু না এলে-গেলেও এই কাজে নেমে খুব সতর্ক হতে হয়। আমরা সাধারণ ও নিরক্ষর মুসলমান ডাকাত সেজে যদি ইংরেজীতে কথা বলি, তাহলে আমাদের ছদ্মবেশ তো ব্যর্থ হবেই, উপরন্তু আই-বি এর মধ্যে পাবে স্বদেশীর গন্ধ। বুঝলে ?

লজ্জিত বিপদভঞ্জন ত্রুটি স্বীকার করলো।

বিপদভঞ্জনদের বাড়ীতে এসে দেখি আর এক বিপদ ! রঙ্গলাল প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছোরা উদ্যত করবার সময় তা আচমকা লেগে গেছে অনাথের কনুইয়ের নীচে। খানিকটে মাংস উপড়ে কোথায় পড়ে গেছে। প্রবল রক্তপাত হচ্ছে। অনাথের কাপড়-জামা ও গায়ের সাদা চাদরখানা লাল হয়ে উঠেছে। যদিও হাসিমুখে সে বার বার বলছে যে বিশেষ কিছু হয়নি, তথাপি আমি বুঝতে পারলাম, বেশ কিছু হয়েছে। দেরি করা চলে না। খগেন ও বিপদ এক মুঠো কচি ঘাস থেঁতলে নিয়ে এল তাড়াতাড়ি আর রঙ্গলালকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলাম হাঁসাড়া গ্রামে আমার রাজনৈতিক বন্ধু গোপাল সেনের দাদা ডাক্তার বিজয় সেনকে ডেকে আনতে। হোমিওপ্যাথিক হলেও বিজয়বাবুর নামডাক আছে।

ইতিমধ্যে কালাচাঁদ এসে বললো : মোট এক হাজার তিন শো কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে।

অল্ রাইট্।

বিপদদের পুকুরের বাঁধানো ঘাটে এসে বসলাম। আকাশে তখনো চলছে চাঁদ ও মেঘের লুকোচুরি খেলা। সঞ্চরমান মেঘ। ঝিরঝিরে হাওয়া ভারী মিষ্টি লাগছে কপালে বুলিয়ে-দেয়া নরম হাতের মতো।......

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

সাতচল্লিশ

পূর্ব্বে যে কথা বহুবার বলেছি, বড় গলায় আবারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করছি যে, কখনো কোনো অবস্থাতেই যেমন পুলিশের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্র আতঙ্কিত হয়ে কোনো পরিকল্পনার সামান্যতম সংশোধনও আমি করিনি, তেমনি আশ্চর্য্যতম সত্য যে, সহস্র চেষ্টা করেও তারা কোনো দিন হাতে-নাতে ধরতে পারেনি আমায়। সন্দেহ করেছে তারা প্রবলভাবে এবং অনেক সময়ই দেখা গেছে তাদের সন্দেহের পশ্চাতে আছে অকাট্য যুক্তি, কিন্তু সন্দেহের ফলে একজনকে রাজবন্দী করে রাখা চলতে পারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য, ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সাজিয়ে যাবজ্জীবন আন্দামানে পাঠাবার জন্য ষ্টীমার সাজানো যায় না।······

স্কুলগুলি থেকে এই যে জাতীয়তামূলক গ্রন্থরাজি উধাও হয়ে গেল এবং সর্ব্বশেষ পায়ে-চলা পথের ওপর এই যে ডাকাতি হয়ে গেল, পুলিশের সন্দেহ-পঙ্কিল মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগলো না যে, এর মূলে থাকতে পারে কোনো স্বদেশী দলের অদৃশ্য হস্ত! অনাথের হাতের গভীর ক্ষত বিজয় সেনের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সহজেই ও শীঘ্রই সেরে উঠলো। বন্ধু ও সহকর্ম্মী গোপালের দাদা হলেও বিজয় সেনের কণ্ঠের তুলসী মালা ও তাঁর তিরিক্ষি মেজাজকে সর্ব্বদাই সমঝে চলতাম আমি। বৈষ্ণবের কণ্ঠি যখন তাঁর মনে 'মেরেছিস কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না' সঙ্গীতের চন্দন-প্রলেপ বুলিয়ে দিত, তখন সীমাহীন সরল হয়ে উঠে যেমন বিজয় সেন অকাতরে, কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে আমাদের গোপনীয়তম কথাগুলিও একটি একটি করে প্রকাশ করে দিতে পারতেন একেবারে হাটের মাঝখানে, আমি জানি এবং নিশ্চিতভাবে জানি, তেমনিভাবে মেজাজের প্রাইমাস্ ষ্টোভটি একবার দপ্ করে জ্বলে উঠলেই শুধু যে শব্দব্যঞ্জনায় ও উৎপ্রেক্ষায় অগ্নিস্রাব ছড়াবেন তিনি তাই নয়, তখন হাতের কাছে একখানা হাতিয়ার পেলে হয়তো রক্তই দর্শন করে বসবেন বিজয় সেন। এমনি লোককে নিয়ন্ত্রণ বোধহয় আমিই একা করতে পেরেছি যত দিন আমার সংস্পর্শে ছিলেন, তত দিন।

ঢাকা শহরে রঙ্গলালকে পাঠিয়ে কিং কোম্পানী থেকে বিজয় সেনের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কিনে আনা হলো—যত দূর মনে পড়ে, কেলেণ্ডুলা।

প্রতিদিন সকাল বেলা আমাদের বাড়ীতেই চলতো অনাথের ক্ষত ধোওয়া ও ব্যাণ্ডেজ। গ্রামের মধ্যে এই বাড়ীখানাই ছিল পুলিশের কঠিনতম নেক-নজরে এবং বোধহয় সেই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান ছিল এই বাড়ীটি। গ্রামে আমরা রটিয়ে দিলাম যে, মোহনগঞ্জ হাটে রঙ্গলাল ও অনাথ গিয়েছিল বেড়াতে। সেখানে একটি লেমনেডের বোতল খুলতে গিয়ে অকস্মাৎ তা বিস্ফোরিত হয় এবং এক টুকরো কাঁচে অনাথের হাত কেটে গেছে। গ্রামের লোককে স্বকপোলকল্পিত গল্পে ভুলিয়ে দিলেও পুলিশ বা আই-বি এই চুরি ও ডাকাতি সম্পর্কে কেন যে অবিলম্বে আমাদের বাড়ীতে হানা দিল না, তা আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে দুর্ব্বোধ্য রয়ে গেছে। সমগ্র বিক্রমপুরের যেখানে যত রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ডাকাতি বা নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির জন্যই আই-বি সহযোগে পুলিশ প্রতি সন্ধ্যায় মা কালী দর্শনের মতো একবার করে কেয়টখালীর গাঙ্গুলী বাড়ীতে হানা দিতই, অথচ এত কাছে এমনি নিখুঁত ডাকাতির পর একটি বারও তাদের টিকিটিরও দেখা পাওয়া গেল না!

অবশ্য শ্রীনগর থানার দুর্দ্ধর্ষ যতীন দারোগা যে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিয়ে থাকেননি, তা পরে জানতে পারা গেল। ঐ রাত্রেই তাঁরা দেলডোগে চম্পকরাণীর গৃহে সদলবলে হানা দেন। সেখানে একদল বিদেশী গ্রাহক সে রাত্রে চম্পকরাণীর নৃত্যে ও গোলাপী পেয়ালার মধুরসে একেবারে নন্দনকানন সৃষ্টি করছিলেন। যতীন দারোগা সে কমলবনে মত্ত করীর মত প্রবেশ করলেন। মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে তাদেরকে নিয়ে এলেন থানায় এবং পেটেণ্ট দাওয়াই প্রয়োগে পেটের কথা টেনে বার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হায়, সেখানে যে দেশী মালের সমুদ্র—তরঙ্গহীন, অন্তহীন, অতলস্পর্শ! সেখানকার কথা শুধু চম্পকরাণীর ঠুংরী ও গজল।...তাই শেষকালে গলাধাক্কা দিয়ে সে দলকে থানা থেকে বার করে দিয়ে দু'হাত ঝেড়ে ফেললেন যতীন দারোগা।

অতএব বোঝা গেল আমরা পুরোপুরি কৃতকার্য্য হয়েছি। স্কুলের জাতীয়তা-মূলক গ্রন্থরাজি চুরি ও এই ডাকাতি এমনি নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধা করা হয়েছে যে, পুলিশের মগজে এগুলো আদৌ ঘা দেয়নি।...অবশ্য একদিন এঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল, কিন্তু সে বড্ড দেরিতে...সে ইতিহাস যথাস্থানে বিবৃত করবো।

বন্দীশিবিরের রাজবন্দীদের কাছে আই-বি দারোগারা সে সময় সদম্ভে ঘোষণা করতেন যে, বিক্রমপুরের বৈপ্লবিক তৎপরতার কণ্ঠ তাঁরা এমনিভাবে দু'হাতে

চেপে ধরেছেন যে প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। ঠিক সেই সময় আমার গুপ্ত কার্য্যাবলীর ঝলকানি তাঁদেরকে মাঝে মাঝে এমনি বিভ্রান্ত করে তুলতো যে, আমায় তাঁরা মনে করতেন একটি মারাত্মক বিস্ফোটক। সরকারীভাবে কখনো ঢাকা থেকে কোনো আই-বি অফিসারই আসেননি আমাদের বাড়ীতে রঙ্গলাল বা আমার সঙ্গে কথা কইতে এবং কথোপকথনের মাধ্যমে উত্তেজক কিছু নৈবেদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে যোগিনী বসু বা জিতেন ধরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করতে। অথচ পরে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম যে, বে-সরকারীভাবে তাঁদের মধ্যে অনেক ধুরন্ধরই রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেন আমাদেরই বাড়ীতে আশেপাশে নিশাচর প্রেতের মতো। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ব্লেক ও স্মিথের মতো আমার ও রঙ্গলালের মৃত্যু নেই কোনো কালে।

যাঁরা বলেন আই-বি পুলিশ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তাঁদের এক্‌স্‌-রে আইজ ও শারলক হোমি কর্ম্মতৎপরতার প্রচণ্ড তোড়ে সে যুগের বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সর্ব্বপ্রকার সতর্কতার বর্ম্ম একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে ভেঙ্গে পড়েছিল, আমি তাঁদেরকে বলবো এবং সর্ব্ব দায়িত্ব নিয়েই বলবো যে তাঁরা ভ্রান্ত, শোচনীয়ভাবে অন্ধবিশ্বাসী। যেখানে যত ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছে, তার সূচনায় আই-বি পুলিশের তদন্তের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটালে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, লিপিবদ্ধ রয়েছে আমাদেরই সহকর্ম্মী ও বিশ্বস্ত সুহৃদের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ককর কাহিনী। প্রকাশ্যে, স্পেশাল ট্রাইবিউনালের এজলাসে দাঁড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায় সমবেত সহকর্ম্মীদের একটি একটি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সনাক্ত করে দিয়ে তোতা পাখীর মতো শিখিয়ে-দেয়া বুলি উচ্চারণের মর্ম্মান্তিক সত্য কাহিনী কারুর অবিদিত নেই। রাষ্ট্রবিরোধী পাপকার্য্যের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে নাকে খৎ দিয়ে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের করুণাভিক্ষার ঘটনাগুলিও নিশ্চয়ই মন থেকে মুছে যায়নি। সেখানে আই-বি পুলিশের কৃতিত্ব কোথায়? যতগুলি বৈপ্লবিক গুপ্তকার্য্য সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে বুক ঠুকে পুলিশ প্রচার করে বেড়িয়েছে নিজেদের দূরদর্শিতা ও কৃতকার্য্যতার কাহিনী, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে আপনার, আমার, সবার বিশ্বস্ততম সুহৃদের নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা।...পশ্চাৎ থেকে আমরাই ছুরি মেরেছি আমাদের দেশের বিপ্লবীদের জল্লাদ মীরণের মতো, জগৎশেঠ-উমিচাঁদের নীল রক্ত এখনও অবশিষ্ট রয়েছে আমাদের ধমনীতে। তিক্ততম এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।......

*

অকস্মাৎ একদিন পুলিশ এসে হানা দিল আবার আমাদের বাড়ীতে। দেখা

গেল, এবার লাল পাগড়ীর সংখ্যা প্রায় জন কুড়ি, যতীন দারোগা একা নন, সঙ্গে এসেছেন সহকারী দারোগা রবীন দত্ত। বোঝা গেল, এবার সত্যিই তল্লাসী হবে। প্রস্তুত হলাম।

যতীন দারোগাকে যেন একটু গম্ভীর মনে হলো। চা দিতে চাইলাম, আপত্তি জানালেন, বললেন : চা খেতে তো আমি আসিনি। যে কাজে এসেছি, তাই শেষ করে চলে যাবো।

তথাস্তু। যতীনবাবু আবার বললেন : মহিলাদের একটি ঘরে অপেক্ষা করতে বলুন দ্বিজেনবাবু! কেউ যেন এখন এই বাড়ী ছেড়ে না যান, আর নতুন কেউ যেন না আসেন। সব দেখা হয়ে গেলে মহিলাদের দয়া করে একটি বার আমাদের সমুখ দিয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে হেঁটে যেতে হবে, আপনি ওঁদেরকে একটু বুঝিয়ে বলুন দ্বিজেনবাবু! ওঁরা আবার কিছু মনে না করেন—

বাধা দিলাম : না, না, এতে মনে করবার কী আছে। আজ নিয়ে বোধহয় বাইশ বার এই বাড়ী তল্লাসী হচ্ছে, একটি ছুঁচও পাওয়া যায়নি কোনো কালে। কিন্তু যতীনবাবু, আজ মহিলাদের সম্বন্ধেও এতটা সতর্কতার কারণ জানতে পারি কি ? বোধহয় কোনো পলাতক রাজনৈতিক আসামী মহিলা সেজে লুকিয়ে আছে, এই সংবাদই পাঠিয়েছে আই-বি কর্ত্তারা ?

যতীনবাবু হেসে বললেন : হবে হয়তো।

স্বরু হলো তল্লাসী বেশ তোড়জোড় করে। আমি কিন্তু প্রতিবারের মতো নিশ্চিন্তেই ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। একেবারে যে কিছু নেই, তা নয়। একটা রিভলভার, গোটা চারেক ছোরা ও খান দশেক বাজেয়াপ্ত বই আছে। কিন্তু কোথায় ? দক্ষিণের কোঠার দেয়ালে একটি কুলুঙ্গি আছে, তার ওপর চমৎকার করে একখানা বড় ক্যালেণ্ডার-আঁটা। পুলিশের মগজে কুলুঙ্গির কথা আসতেই পারে না, কারণ আর কোনো কোঠায় এমনি কুলুঙ্গি নেই।···আমার নির্লিপ্ততায় যতীন দারোগা যে খুশী নন, তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আমার।

কিন্তু আমার কাঁচের আলমারীর বইগুলো তল্লাসীর সময় অকস্মাৎ যেন সাপ বেরিয়ে পড়লো। যতীন দারোগা মহা উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠলেন : Here it is! here it is! যা চেয়েছিলাম, তাই। স্কুল থেকে চুরি-করা বই! রবীন, ভালো করে খুঁজে দেখ, আর কতখানা এমনি ব্লেড দিয়ে স্কুলের সিল-কাটা বই পাওয়া যায়।

চমকে উঠলাম। তাহলে হেনা পূর্ব্বাহ্নেই সব সরাতে পারেনি দেখা যাচ্ছে।

কোনোখানাতেই সিল নেই সত্য, কিন্তু মালখানগর, রুসদী, হাঁসাড়া প্রভৃতি স্কুল থেকে যেসব বই সম্প্রতি উধাও হয়ে গেছে, এগুলো যে তারই অন্তম, সে সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গেল।···চোরাই মাল পাওয়া গেছে। সোজা চারশো এগারো ধারা। এবার কোথায় যাবে দ্বিজেন গাঙ্গুলী?···স্পষ্ট দেখতে পেলাম, যতীন দারোগার চোখেমুখে খুশীর হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক আলো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। আর তল্লাসী করে কী হবে? প্রয়োজন কী? এবার শুধু প্রয়োজন চমৎকার করে তল্লাসী-তালিকা তৈরী ও নিখুঁতভাবে রিপোর্ট রচনা। বিশেষ বার্তাবহ মারফৎ সেই রিপোর্ট ঢাকাতে পাঠাতে-না-পাঠাতেই আসবে গ্র্যাসবি সাহেবের ফরমান্: Arrest that scoundrel! তার পরের ঘটনাগুলো ঘটবে দ্রুতগতি যন্ত্রের মতো—গ্রেপ্তার, তদন্ত, চার্জ্জসীট দাখিল, মুন্সীগঞ্জে বিচার, উকিলের সওয়াল···তারপর গম্ভীরমুখে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কালিপদ মৈত্রের রায় পাঠ···অতএব, আইন ও শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত এই গভর্ণমেণ্ট ও সম্রাটের অনুগত প্রজাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার খাতিরে আমি আসামী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিতেছি······

একটু চা হবে কি?

আমার প্রশ্নে চমকে উঠলেন যতীন দারোগা। আকাশ-কুসুম রচনায় বোধ হয় বাধা পড়লো! বললেন: চা? না, না, চায়ের প্রয়োজন নেই, এবার তাড়াতাড়ি থানায় যাবার আয়োজন করতে হয়।

উনিশ-শো আটাশ সালের গোবরকে চকিতে চিৎ করে ফেলে দিয়ে অসংখ্য শীল্ড, কাপ ও মেডেল নিয়ে সমবেত জনতার মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনির মাঝে কুস্তিগীর গামা যেভাবে কলকাতার পার্ক-সার্কাসের বিরাট মণ্ডপের বাইরে এসে উঠেছিলেন অপেক্ষমান মোটরে, ঠিক তেমনি আমায় একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে কোলাহলরত পুলিশদের মধ্য দিয়ে যতীন দারোগা আট-দশখানা বই হাতে নিয়ে গট গট করে এসে উঠলেন তাঁর অপেক্ষমান নৌকোয়। সদলবলে রবীনও গিয়ে তার নৌকোয় আরোহণ করলো। দেবেন কাকা ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য জমির কারিগর ছিলেন তল্লাসীর সাক্ষী, সাদা তালিকার নীচে স্বাক্ষর করে তাঁরা সরে পড়লেন। পাড়ার কৌতূহলী দু'চারজন এসেছিলেন দর্শক হয়ে, তাঁরাও নৌকা ভাসালেন।

যতীনবাবুর পশ্চাতে আমিও এসে নৌকোয় উঠলাম এবং পেছনে তাকিয়ে দেখলাম তমিজদ্দী চৌকিদারের লম্বা দাড়ির ফাঁকে হাসির ছুরি চক্চক্ করছে।

এইবার শালা বোধহয় আগুনের প্রতিশোধ নেবে আর পাবে মোটা রকমের বখশিস।······

বেশ ভারিক্কি স্বরে কথা কইলেন যতীন দারোগা: কোথায় পেলেন এই বইগুলো?

উদাস কণ্ঠে জবাব দিলাম: কিনেছি—সে অনেক কাল আগে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাথে। যাই বলুন, ভারী সস্তা কিন্তু দারোগাবাবু, মাত্র চার আনা করে।

ভেতরের ষ্ট্যাম্পগুলো সাবধানে কাটা কেন?

কেন-র যা উত্তর হতে পারে, তাই দিলাম: চোরাই মাল-টাল হবে হয়তো। নইলে জলের দামে দেয় কী করে।—এই দেখুন না, গোর্কির মাদার, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, সঞ্চয়িতা, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা—এর এক-একখানার সত্যিকার দাম কত, একবার ভেবে দেখুন!

আমার হাত থেকে বইগুলো ধীরে ধীরে টেনে নিয়ে নিজের কোলের পাশে গুছিয়ে রাখলেন দারোগাবাবু বিড়ালছানার মতো। তারপর বেশ টেনে উচ্চারণ করলেন: হুঁ—মুস্কিল কি জানেন দ্বিজেনবাবু, কিছু দিন হলো গোটাকয়েক স্কুল থেকে এমনি ধরণের অনেকগুলো বই চুরি গেছে। জানেন না সে সংবাদ?

কই, না তো!

স্কুলগুলির তালিকা দিলেন দারোগাবাবু, তারপর বললেন: বইগুলো আমায় একবার থানায় নিয়ে যেতে হবে, স্কুলের তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে।

প্রমাদ গুণলাম! বেশ বুঝতে পারলাম, থানায় গেলেই সব বেফাঁস হয়ে যাবে এবং এই চুরির মধ্যে স্বদেশীর কটু গন্ধ একবার পেলেই ঝপাঝপ গ্রেপ্তার করে ফেলবে ছেলেদের। মামলাও চালাবে নিশ্চয়ই, সাজা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছুই নয়। অবশেষে কি পরাজয় মানতে হবে পুলিশের কাছে?······

ঘাবড়ে না গেলেও একটু চিন্তিত হলাম। বোধহয় কোনো সূত্র থেকে সংবাদ পৌছেছে শ্রীনগর থানায়। আই-বি'র কান অবধি বোধহয় এখনও পৌছেনি, নইলে এই তল্লাসী অভিযানের পুরোভাগে নিশ্চয়ই দেখা যেত সেই বীরপুঙ্গব দলকে। পুরো কেরামতিটা নিজেই গলাধঃকরণ করবার উদ্দেশ্যে বড় দারোগাকে দিয়ে এই তল্লাসীর হুকুম করিয়ে নিয়ে এসেছেন যতীন দারোগা! তাই আজ এত গম্ভীর তিনি সেই সুরু থেকেই। তাই চা—

অকস্মাৎ আবার বললাম হেসে : সে যা করেন, করবেন'খন মশায়। এখন আসুন তো, একটু চায়ের বাটিতে চুমুক দেয়া যাক্—

না, না, চা খাবো না, পেটটা আজ সকাল থেকে খারাপ যাচ্ছে। বাড়ীতেই খাইনি।—বলে একটু অস্বস্তির ভাণ করলেন তিনি।

বোঝা গেল, আজ আর চা চলবে না। ব্যাটা চালাক হয়ে গেছে।

একথা সেকথা তাই সুরু করলাম ওর মনটা হাল্‌কা করে দেবার জন্য। দেশের বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতি থেকে সুরু করে একেবারে আজকের ইলিশ মাছের দর পর্য্যন্ত আলোচনা হলো। কাটলো অবশ্য ঘণ্টাখানেক, কিন্তু দেখলাম, ইলিশ মাছের ঝোল, ঝাল, ভাজা, তেঁতুল সহযোগে পাতলা টক্, এমন কি, সরষে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাতের মধ্যে ভাপে রান্নার সরস উপাখ্যানেও যতীন দারোগার মুখে হাসি ফোটানো সম্ভব হলো না।······

বইগুলো সে নিয়ে যাবেই।

রবীন এসে জানালো : স্যার, বেলা বারোটা বাজে।

এ্যাঁ,—চমকে উঠলেন দারোগাবাবু : বল কি? তাহলে এক কাজ কর। তোমার নৌকোয় সিপাইদের নিয়ে চলে যাও তুমি। আমি পরে আসছি, বলো বড়বাবুকে।

রবীন স্যালুট করে বেরিয়ে গেল। ওদের নৌকো চলে গেল। রইলো গোটাচারেক মাল্লা আর দুটো পুলিশ আর যতীন দারোগা। তমিজদ্দী একটু আড়ালে গেল বিড়ি খেতে। আমার দলবল নিয়ে এদের সায়েস্তা করা কিন্তু আমার কাছে কঠিন কাজ নয়। বইগুলো ছিনিয়ে নিয়ে একবার জলে ফেলে দিতে পারলেই তো কেল্লা ফতে। বর্ষার স্রোতে কোথায় তলিয়ে যাবে হদিসই তার পাওয়া যাবে না। কিন্তু গায়ের জোর সর্ব্বত্র সমানভাবে নির্ব্বিচারে প্রযোজ্য নয়। কোনো কোনো সময় কব্জির চাইতে মগজের শক্তি বেশী কার্য্যকরী দেখা যায়! এ ক্ষেত্রেও মগজ চালানোই প্রশস্ত মনে হলো। অবশ্য দেখলাম, প্রতিপক্ষও আজ অত্যন্ত সতর্ক ও সজাগ!

তথাপি কালবিলম্ব না করে আসরে নেমে পড়লাম তাই বুদ্ধির ক্ষুরধার তলোয়ার নিয়ে। সে তলোয়ারের তীক্ষ্ণ ফলায় যতীন দারোগার ম্যাজিনো লাইনের কংক্রীট কচু কাটবার মত কেটে ফেলতে লাগলাম। সহস্র রকম যুক্তিপূর্ণ কথার পদাতিক সেনা ছড়িয়ে দিলাম পিপীলিকার মতো। দারোগার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দূরপাল্লার কামানের অবিশ্রাম গোলার আঘাতে তারা দলে দলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও

রক্তবীজের ঝাড় এগিয়ে চললো, যেমন করে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির নেশায় জার্মাণ গুলী-গোলা অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করে এগিয়ে চলেছিল ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল।

আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথার হাল্‌কা অবতারণায় যোগ দোব না বলে শপথ গ্রহণ করে দারোগা মুখ ফিরিয়ে বসে থাকলেও আমার সাঁড়াশী অভিযানের সম্মুখে তাঁর নির্লিপ্ততা কতক্ষণ টিঁকে থাকতে পারবে? তাই ঘণ্টা-খানেক প্রতিরোধের পর যতীন দারোগা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হলেন, ডানকার্কের পুনরাবৃত্তি হলো!......

আমার কম্বুকণ্ঠ যুক্তির অগ্নিদ্রাব ছড়িয়ে তখন ধাওয়া করে চলেছে পলায়মান শত্রুকে: এতে আপনার ব্যক্তিগত লাভ কী হবে, সত্যি করে বলুন তো? ওপরওয়ালার কাছ থেকে দু'এক লাইন প্রশংসা-বাণী ব্যতীত আর কী পাবেন? ওতে পেট ভরবে কি? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আপনিও তো বাস করেন, মিষ্টি কথার চাইতে দুটো টাকার মূল্য আপনার কাছে বেশী নয় কি?...আর এ একেবারে দুটো নয়, পুরো একশো টাকার কথা বলছি। কাল সকালে গিয়ে আমি একটি একটি করে দশখানা নোট গুণে দিয়ে আসবো আপনার বাড়ীতে।...যতীনবাবু, আমরা যে কাজে আত্মোৎসর্গ করেছি, সে কাজ তো সমগ্র দেশের, আপনারও। দেশ স্বাধীন হলে শান্তি পাবেন আপনি নিজেও। প্রকাশ্যভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারেন না সরকারি চাকরি করেন বলে, তা স্বীকার করি। কিন্তু এমনিভাবে যদি কিছু করা যায়, যাতে আমাদের যেমন সাহায্য হয়, তেমনি আপনিও না ধরা পড়ে যান, তাহলে কেন তা করবেন না আপনি? দেশের নামে স্বদেশী দলের পক্ষ থেকে এই অনুরোধটি কি করতে পারিনে আমি আপনাকে?

দুর্য্যোধনের মতো একেবারে উরু ভেঙ্গে পড়বার পূর্ব্বে যতীন দারোগা বিড় বিড় করতে লাগলেন: তবুও তো জানেন, honesty of profession বলে একটা জিনিস আছে তো—

এবারে একেবারে এ্যাটম বোম নিয়ে আকাশে উঠলাম: honesty of profession? কার কাছে? এই অত্যাচারী বৃটিশের কাছে honesty? ভারত অধিকারের কালো ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠায় আছে কি এদের honestyর কথা? কোথাও দেখিয়েছে কি এরা বিন্দুমাত্র সততা? বেইমান প্রভুর কাছে সাধুতার সার্থকতা আছে কি?—

যতীনবাবু বললেন : কিন্তু ব্যাপার কি জানেন দ্বিজেনবাবু, রবীন জেনে গেছে যে, কতকগুলো বই পাওয়া গেছে।

বাধা দিলাম : রবীন! ওর সাধ্য হবে এ-এস-আই হয়ে আপনার মত একজন senior officerএর বিরুদ্ধে যাবার?

জানেন না দ্বিজেনবাবু, আমাদের পুলিশ লাইনটাই এমনি হারামির জাত। Bossএর কানে লাগিয়ে নিজের উপকার কিছু করতে পারুক আর নাই পারুক, পরের অপকার করবার চেষ্টা সব শালাই করে থাকে।

হেসে বললাম : আচ্ছা, তাহলে না হয় ঐ রবীন শালাকেও দোব গোটা পঞ্চাশেক। তাহলে তো আর ভাবনা থাকবে না?

এবারে যতীনবাবুর ভারী ও শক্ত ঠোঁটদুখানি হালকা ও আলগা হয়ে এল, দুপাশে খানিকটে প্রসারিত হয়ে পড়লো, খানিকটে ফাঁকও হয়ে গেল আর তার মধ্য দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারলো গোটাচারেক তাম্বুলচর্চ্চিত কালো রংয়ের দাঁতের অগ্রভাগ। যতীনবাবু হাসছেন, রীতিমত মুচকি মুচকি হাসছেন, অর্থবোধক হাসি তাঁর সারা মুখমণ্ডলে চক্ চক্ করছে। বললেন : তা যা বলেছেন দ্বিজেনবাবু, টাকা পেলে ও শালারা ঢেঁকিও হজম করে ফেলতে দ্বিধা করবে না। এমনি হারামির জাত!

মনে মনে বললাম : আহা, কী আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! পঞ্চাশ নিলে যদি হারামির জাত হয়, তাহলে তার ডবল নিলে কী হয়? কিন্তু, যাকগে—

কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। আমার ফাঁদে গলা বাড়িয়ে দিয়েছেন দারোগাবাবু। হ্যাঁচকা একটি টান মারলেই একেবারে ফাঁসী, ভল্লুক তখন টুমটুমির তালে তালে নাচবে। এবার তাই সিংহাসনত্যাগী ঔরংজেবের অভিনয় সুরু করলাম : না, না, ভেবে দেখুন যতীনবাবু, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, এ ইচ্ছে আমার আদৌ নেই। এ পথে আমরা যখন নেমেছি, তখন সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েই এসেছি। কিন্তু তা বলে আপনার ব্যক্তিগত অকল্যাণ আমাদের কাম্য হতে পারে না। ফিরিয়ে নিয়ে যান না বইগুলো, যদি মনে করেন তাই আপনার কর্ত্তব্য। কী আর হবে এর ফলে? জনকতক ছেলে ধরা পড়বে, রাজবন্দীর সংখ্যা কিছু বেড়ে যাবে আর হয়তো আমার সাজা হয়ে যাবে কয়েক বৎসর!—তা হোক না, এখানে থেকে আমি তো সেই শুভদিনেরই প্রতীক্ষায় আছি, দেশের কাজে আন্দামান, ফাঁসী—

মহা অপরাধীর মতো গল্ গল্ করে উঠলেন যতীন দারোগা : ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন দ্বিজেনবাবু! নিন্, এই নিন্ বইগুলো, আজই সরিয়ে ফেলবেন। রবীনকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নোব। আপনি সকাল নয়টার মধ্যেই সোজা আমার বাসায় গিয়ে উঠবেন। মনে রাখবেন, বাবুদের বাড়ী ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে যাবেন, থানার কেউ যেন না দেখে।

বইগুলো নিয়ে ছইয়ের বাইরে আসতে যতীন দারোগা আবার বললেন : রবীন—তা পনরোখানা নোটই নিয়ে যাবেন দ্বিজেনবাবু, কেমন? সাপের জাতকে বিশ্বাস নেই মশাই! আর আমার ওখানে আপনার চা খাবার নেমন্তন্ন রইলো, বুঝলেন?

বললাম : চা তো আমি খাইনে।

খান না?

না, কারণ আপনি নিজে আজ আমার এখানে চা খেলেন না।

হা হা করে পাগলের মতো হেসে উঠলেন যতীন দারোগা, বললেন : খাবো, খাবো। শুধু চা কেন, একেবারে পেট ভরে খেয়ে যাবো একদিন। আরে মশাই, তাও কি নিশ্চিন্তে পারবার যো আছে? ঐ আই-বি শালাদের কি মশাই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানটুকুও থাকতে নেই? Honesty of professionটুকুও তো রাখতে পারে?

মনে মনে হাসি পেল। চোরাই মাল হাতে পেয়ে দেড়শো টাকার লোভে তা ছেড়ে দিয়ে সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন উনি। আবার বড়াই হচ্ছে Honestyর!

নৌকো ছাড়বার সময় গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতিটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন : আপনার জন্য আমি প্রতীক্ষায় থাকবো কিন্তু দ্বিজেনবাবু! সকাল ন'টার মধ্যেই—

নৌকো ম্যান্দার বাড়ীর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই রঙ্গলাল এসে জানালো : প্রায় দুটো বাজে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। শেখরনগর যেতে হবে মনে আছে তো?

...কিন্তু পর দিন, তার পর দিন, তারও পর দিন এবং তারও পর পর করে করে অনেক দিনই চলে গেল, আমার নৌকো কোনো সকাল বেলাই আর বাবুদের বাড়ী ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে গিয়ে চুপি চুপি যতীন দারোগার ঘাটে ভিড়লো না।

বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার প্রতীক্ষা আর শেষ হলো না।

আটচল্লিশ

এমনিভাবে 'এপ্রিল ফুল' হবার পর যতীন দারোগা আর আসেননি আমাদের বাড়ীতে। তাঁর মনের উত্তাপ আমার গায়ে সোজাসুজি এসে না লাগলেও তা টের পেতে দেরি হলো না আমার। থানায় হাজিরা দিতে গেলে সবাই কলরব করে আমায় সম্বর্দ্ধনা জানালেও যতীনবাবুকে দেখতাম অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর, কাগজপত্র ও ফাইলের প্রতি বেশী রকম মনোযোগী খালের ধারে ধ্যানরত বকের মতো। ক্ষুদ্রতম মাছ দেখলেই যে তিনি তৎক্ষণাৎ লম্বা ঠোঁট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন তার ওপর, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তাই আমাদের সতর্কতা আরো বৃদ্ধি করা হলো। স্কুল থেকে আনা বইগুলো আর প্রকাশ্যে বার করা হতো না, বাজেয়াপ্ত বইয়ের মতো গোপনে চলতো আদানপ্রদান। ওর মধ্যেই বাছাই করে কতকগুলো বাজে বই ফুলদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হলো ইছাপুরায় ফুলবৌদিদের ওখানে। সেখানে সেগুলো একেবারে মাটির নীচে কবর দেয়া হলো। এই গুপ্ত গ্রন্থাগারের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হলো রাজদিয়ার মধুসূদন ভট্টাচার্য্যকে। বিপ্লবী দলে একদিন আমিই তাকে নিয়ে এসেছিলাম সত্যি, কিন্তু উত্তরকালে প্রখর বুদ্ধি চালনায়, কর্ম্মক্ষমতায়, সংগঠনের দক্ষতায় সে আমাকেও স্তম্ভিত করে ফেলেছে! বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্সের বোধহয় একজনও সদস্য নেই, যিনি মধুসূদনকে চেনেন না বা তার নাম শোনেননি। অতি সাধারণ তার চেহারা, কথা কয় সে অত্যন্ত ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে, চলাফেরা একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন, শুধু অদ্ভুত তার হাসি। কঠিনতম সংকটময় মুহূর্ত্তেও তার অধরে দেখেছি অপরিম্লান সেই হাসির ঝিলিক। একেবারেই মাটির মানুষ মনে হয়েছে তাকে। রাজদিয়া গ্রামে তাদের বাড়ীকে বলা হতো পণ্ডিতবাড়ী। দাদা ব্রজেন্দ্রদাস কাব্যতীর্থ রাজদিয়া হাই স্কুলের পণ্ডিত। সম্মানিত ব্যক্তি, স্বল্পভাষী ও যুক্তিবাদী। স্কুলের আয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না বলেই বাড়ীতে তাঁর একটি প্রেস, নাম হরিদাস প্রেস। সাংসারিক ব্যক্তি হলেও ধর্ম্মভীরু এবং স্বভাবতঃই স্নেহশীল।

মধু দাদার এই স্নেহশীলতার সুযোগ নিয়ে কী যে কাণ্ডকারখানা করেছে, বাইরের লোক তার কতটুকু সংবাদ রাখে! ঐ হরিদাস প্রেসে কত যে বিপ্লবী ইস্তাহার ছাপানো হয়েছে, কত যে পলাতক রাজনৈতিক আসামী মধুদের বাড়ীতে রাত্রেই সযত্নে সাজানো এক থালা খাবার পেয়েছেন এবং পেয়েছেন রাত্রিযাপনের

মতো বিছানা ও মশারী, আই-বি ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি তা। অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে আদৌ হাঁকডাক না করে নীরবে সমস্ত কাজ পরিচালনা করতো ঐ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য। তন্তরের সুবোধ চক্রবর্ত্তীর মতোই মধুও বহু ছেলেকে এবং গোটা-কতক মেয়েকেও দীক্ষা দিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের দলে।

অনেক কাল ছাড়াছাড়ির পর ১৯৪৪ সালে সিকিউরিটি বন্দী হিসেবে রাজসাহী জেলে গিয়ে আবার শুনলাম মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের অদ্ভুত গুণপনার ইতিবৃত্ত। শুনলাম, জেলের সিপাইগুলোকে সে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছিল। বাইরে থেকে আসতো জাতীয়তাবাদী নানারকম বই, দলীয় জরুরী পত্র এবং ভেতরের সব সংবাদ বাইরে যথাস্থানে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছে যেত এই মধুরই সুচতুর ব্যবস্থাপনায়। অসংখ্য দল ও উপদল এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য প্রবল থাকলেও অবিসংবাদিত প্রশংসা শুনতে পেলাম আমার বন্ধু মধুর। আমি জলপাইগুড়ি জেল থেকে রাজসাহী জেলে স্থানান্তরিত হয়ে আসবার ক'দিন পূর্ব্বেই মধুকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বক্‌সা দুর্গে। তাই দেখা হলো না।

কিন্তু ভারী আনন্দ পেলাম। বর্ণের সঙ্গে পরিচয় যার একদিন আমিই করিয়ে দিয়েছিলাম, আর একদিন সে যখন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো সহস্রদল মৃণালের মতো, তখন দুনিয়ায় সবার চাইতে বেশী তৃপ্তি পেলাম আমি নিজে। এই শিক্ষকতায় যে কী আনন্দ, তা তাঁরাই শুধু জানেন, যাঁরা এমনি শিক্ষকতা করেছেন।

কূটবুদ্ধি ভীরু গুরু দ্রোণাচার্য্যের মতো শিষ্য একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উপঢৌকন চাইবার শোচনীয়তম মুহূর্ত্ত এতে দেখা দেওয়া দূরে থাক্, এতে আছে সৃষ্টির আনন্দ, ছাত্রের কাছে পরাজয়ের অননুভূত শান্তি, অগ্রবর্ত্তী শিষ্যের উপর্য্যুপরি বিজয়ে রোমাঞ্চকর তৃপ্তি!

কলকাতা এসেও মধু বিপজ্জনক অনেক কাজ করেছে। এক সময় মাসিক পত্রিকা 'বেণু' প্রতাপ চাটার্জ্জী লেনের যে 'যন্ত্রলেখা' প্রেস থেকে ছাপানো হতো, মধুই তার তত্ত্বাবধান করতো দারুণ ঝুঁকি নিয়ে। অনেক গোপনীয় ইস্তাহার সে প্রেস থেকে ছাপানো হয়েছে। অনেক গোপন বৈঠক বসেছে সে প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষের কক্ষে। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের দান অনস্বীকার্য্য!

১৯৩৪ সাল শেষ হয়ে গেল। মনে পড়লো, একটি একটি করে বন্দিজীবনের

দীর্ঘ চারিটি বৎসর যেমন কাটালাম, তেমনি বয়সও এসে পৌছলো পঁচিশের কোঠায়। ধীরেনদা'র উৎকট উৎসাহে বহরমপুর বন্দীশিবিরে থাকাকালীন আই-এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি বটে, কিন্তু তারপর বি. এ-র বইগুলো আর কিছুতেই ছুঁতে পারিনি। বাইরে এলে যে আমাদের পক্ষে আর পড়াশুনার সময় পাওয়া কঠিন, সে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অভিভাবকেরা কিন্তু ভাবলেন, এই অবসরে যদি বিবাহের শৃঙ্খলে আমায় একবার বেঁধে ফেলতে পারেন, তাহলেই তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। পরাক্রান্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আতিথ্যেরও একদিন শেষ আছে, কিন্তু বিবাহের বন্ধন একেবারে অটুট ও অবিনশ্বর!

গোপনে চললো তাঁদের সলা-পরামর্শ, উদ্যোগ-আয়োজন। গুপ্ত সমিতির বিশিষ্ট সদস্য আমি নিজে, বাঘের ঘরে ঘোগের মতো আমাকেই ফাঁকি দিয়ে চললো তাঁদের গোপন অভিযান। ধীরে ধীরে একটি দলই পাকিয়ে ফেললেন তাঁরা। মরণি পিসিমা নিয়ে এলেন কয়েকটি মেয়ের সংবাদ, মাখন দোকানদার এসে জানালো যদু চাটুজ্জের বড় মেয়ে বুড়ীর কথা। বুড়ী আমাদের ছোটকোনের অর্থাৎ বিপদভঞ্জনের দিদি। আরো অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়ে এলেন আরো অনেক মেয়ের সংবাদ অর্থাৎ কেয়টখালী গ্রামের প্রায় সব মেয়ের পক্ষ থেকেই অলিখিত আবেদন-পত্র গোপনে এসে অন্ততঃ একবার করে নিবেদিত হলো বাবা ও মায়ের কাছে।

কিন্তু আমায় জানাবে কে? বিবাহ তো করতে হবে আমাকে। সুতরাং আমার তো মেয়েগুলোর ইতিবৃত্ত জানা দরকার। কিন্তু কার স্কন্ধে দশটা মাথা আছে যে, এই সংবাদ আমার কাছে পৌছে দেয়?···অনেক ইতস্ততঃ, অনেক সঙ্কোচ ও অনেক দ্বিধার পর সাহসে ভর করে স্বয়ং মা-ই এসে একদিন সন্ধ্যায় হাজির হলেন আমার কক্ষে।

মাকে আমি দুঃখ দিয়েছি অনেক, বোধহয় তার সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতাম মা-ই আমায় ভালবাসেন সবার চাইতে বেশী। অপরেও জানতো। বোধহয় সে জন্যই মাকেই পাঠানো হলো আমায় ঘায়েল করবার জন্য। সব খবরই ছিল আমার নখদর্পণে; তাই মা যেই ভূমিকা সুরু করলেন, আমি আসল প্রসঙ্গে এসে পড়লাম: কিন্তু আমায় কে বিয়ে করবে বল! এমনি বোকা মেয়ে এখনো আছে নাকি?

মা বললেন: মেয়ে আছে অনেক, তবে তারা একটিও বোকা নয়। একবার রাজী হয়ে যা দেখি, তার পরের সব ব্যবস্থা আমি করবো'খন।

প্রসঙ্গ হালকা করে ফেলতে চেষ্টা করলাম: নাম দাও তো মেয়েগুলোর, একবার আচ্ছা করে বকুনি দিয়ে আসি। সবাই কি এই কেয়টখালীর, না দূরের মেয়েও আছে?

মা গম্ভীর হলেন: না, শোন্, তুই আর আপত্তি করিস না। বিয়ে করবি, এই কথাটা শুধু আমায় দে বাবা। আমাদের শেষ বয়সের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দে।—বলে মা আমার মাথায় হাত রাখলেন।

বিচলিত বোধ করলাম। হাত ধরে অনুরোধ জানাবার মতো মা আমার মাথা স্পর্শ করেছেন। শেষ বয়সের আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথাটি এমনি ধরা গলায় উচ্চারণ করলেন যে, সহসা তার জবাব খুঁজে পেলাম না।···এ কী, এঁরা সবাই মিলে কি আমায় হত্যা করতে চান? যে একটিমাত্র পথ জীবনে বেছে নিয়েছি, সে পথে চলতে গিয়ে পদে পদে দুঃখ দিয়েছি অনেককে। আমার মেধা ও বুদ্ধির ওপর তৈরী করা অনেকের অনেক রঙীন পরিকল্পনার কুতুবমিনার ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছি। শুধু দীর্ঘশ্বাসের কালো মেঘ নয়, অশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণে পথ পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। তথাপি—তথাপি এগিয়ে চলেছি আমরা দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন বুকে নিয়ে দুর্জ্জয় সাহস আর অন্তরে নিয়ে অপরিম্লান আশা······আমাদের এই সুকঠিন তপশ্চর্য্যা অবশেষে কি গৌরী এসে ভেঙ্গে দেবে?

তাই যুক্তির আশ্রয় নিতে হলো: তুমি বুঝছো না মা, তোমাদেরই শান্তি দিতে পারলাম না কোনো দিন, এর মধ্যে আবার আর একজনকে কেন টেনে আনতে চাও বলতো! বিয়ে করবার সময় কোথায় আমাদের? আর জোর করে জুটিয়ে দিলেও সে ঝামেলা পোহাবে কে? সে দায়িত্ব পালনের অবসর কোথায়? বৃথাই আর একটি পরিবারের শান্তি নষ্ট করা হবে মাত্র।

মা তবু ছাড়তে চাইলেন না: বৌমা তো হবে আমার মেয়ে, আমার হেনার মতো। তোমার আবার ভাবনা কি? দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে না কিছু।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্তও আমার সঙ্কল্পে অটল রইলাম আমি, মা ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেলেন। বাবা হলেন ক্ষুব্ধ। তাই এর পর থেকে দোতলায় বাবার উচ্চ কণ্ঠ মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম: তা আমার কাছে কিছু হবে না। যান না, যান না ঐ দক্ষিণের ঘরে, আগে রাজী করিয়ে আসুন, দেনাপাওনা ও মেয়ে-দেখার কথা তারপর হবে।

আমার কাছে কিন্তু কেউ আর আসতে সাহস করেনি।

বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই একটি করে ড্রামেটিক ক্লাব আছে, যার সদস্যদের

পেশা আদৌ নয়, নেশা হচ্ছে প্রতি বছর একবার বা সম্ভব হলে একাধিকবার নাটকাভিনয় করা। কোনো কোনো গ্রামে হয়তো কোনো বড়লোকের পক্ষপুটচ্ছায়ায় এই ক্লাব গড়ে ওঠে ও টিঁকে থাকে। বড়লোকটিরই চণ্ডীমণ্ডপের বিপরীত দিকে মঞ্চ বাঁধবার উপযোগী করে তোলা একটি টিনের ঘর আছে। সিনগুলো গুটিয়ে ওপরে বাঁধা থাকে আর উইংগুলো থাকে মাথার ওপর তোলা। দু'-তিন বাক্স পোষাক-পরিচ্ছদও আছে, সযত্নে তা রক্ষিত হয় ঐ বড়লোকেরই গৃহে। উনিই ক্লাবের আজীবন সদস্য ও সভাপতি এবং কার্য্যতঃ ডিকটেটার। কারণ অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয় একাই বহন করেন উনি নিজে। আর যে গ্রামের ড্রামেটিক ক্লাব গরীব অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য যাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের চাঁদার ওপর, সেখানে প্রায়ই হানা দেওয়া হয় কারুর চণ্ডীমণ্ডপে অথবা সুবিধেমত কোনো ঘরেই। হয়তো কখনো অস্থায়িভাবে একখানি একচালা খাড়া করা হয়, আবার অভিনয়ের পর তা ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়।

আরো দরিদ্র নাটুকে দল আছে, যাদের সঙ্গতির দৈন্য ঢাকা পড়ে যায় সদস্যদের সীমাহীন উৎসাহ ও উদ্দীপনার প্রাবল্যে। মঞ্চ বাঁধবার জন্য এরা হয়তো কারুর শোবার ঘরেরই বেড়াগুলো খুলে ফেললো, হয়তো গোটা দুই খুঁটিই খুলে ফেলে দিল এবং গোটাকয়েক তক্তপোষ জুড়ে তৈরী করে বসলো বিরাট রঙ্গমঞ্চ। এরা বাঁশ ও দড়ি থেকে সুরু করে সিন, উইংস্, পোষাক-পরিচ্ছদ, গোঁফ, দাড়ী ও মেয়েদের চুল—সবই ধার করে নিয়ে আসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে। মুসলমান মাঝিরা নৌকো চালনার লগি ও পাল দিয়ে সানন্দে সাহায্য করে থাকে আর মেয়েরা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক্—সাহায্য করে থাকেন সাড়ী ও ব্লাউজ দিয়ে।

গ্রামের অভিনয়ের আরো একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ভূমিকালিপি নির্দ্ধারিত হয়ে গেলে পার্টগুলো লিখে ফেলা হয় এবং সেগুলো বণ্টন করা হয় শিল্পীদের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই থাকেন বিভিন্ন শহরে কর্ম্মব্যপদেশে। তাতে কোনই অসুবিধে হয় না ড্রামেটিক ক্লাবের। কারণ বিদেশে অফিসে কলম চালাবার ফাঁকে ফাঁকে নায়ক বা সহকারী নায়ক যখন রামের পার্ট মুখস্থ করতে থাকেন, তখন গ্রামে চলতে থাকে পুরোদমে মহলা। সেখানে প্রক্সি দিয়ে রাম বা লক্ষ্মণ চালানো হয়। এমনিভাবে ঢাকা, কলকাতা, ময়মনসিংহ বা বরিশালে হয়তো প্রস্তুত হতে থাকেন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও সীতা। অবশেষে ক্যাজুয়েল লীভ অথবা তাতে সুবিধে না হলে

প্রিভিলেজ লীভের সুযোগ নিয়ে একদিন ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল থেকে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এসে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হন। অভিনয়ের দু'চারদিন পর আবার এঁরা নিজেদের চাকুরীস্থলে ফিরে যান। এমনি নাটকের নেশা বিক্রমপুরের প্রায় গ্রামেই আছে।

কেয়টখালী গ্রামের এই নাটুকে দলের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন—আজ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি—ডাঃ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিসপেনসারি ছিল বটে একটা বনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়দের বৈঠকখানা ঘরে কিন্তু তার আলমারিগুলো যেমন খালি তেমনি প্রায় সময়ই তার দরজায় ঝুলতে থাকে বড় একটি তালা। ডাক্তারবাবুর জায়গা-জমি যা আছে, তাতেই চলে যায় তাঁর সারা বছর। চিন্তাভাবনা যখন তেমন কিছু নেই এবং অবসর যখন প্রচুর, তখন স্বভাবতঃই গ্রামের নাটুকে দলের সভাপতির আসন পাবার যোগ্যতম ব্যক্তি তিনি। মহলা হতো তাঁরই তত্ত্বাবধানে ও উপস্থিতিতে। একটি হুঁকো হাতে করে একখানা চেয়ার নিয়ে এক কোণে বসে থাকতেন তিনি সজাগ দৃষ্টি মেলে। কারুর ফাঁকি দেবার উপায় ছিল না। মহলায় নিয়মিত উপস্থিতির জন্য ডাক্তারবাবুর বানরসেনার একটি অক্ষৌহিণী ছিল। দশ মিনিট দেরি হলেই এরা এসে একেবারে বাড়ীতে হাজির হতো এবং ঘাড়ে চেপে বসে থাকতো যতক্ষণ না শিল্পী-আসামী এসে হাজির হতো মহলা-কক্ষে।

আরো বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে নিজের নাতিদীর্ঘ ও অপুষ্ট দেহের সুযোগ নিয়ে ডাক্তারবাবু একেবারে ব্যালাড গার্লের ভূমিকায় নেমে পড়তেন এবং রীতিমত যৌন-আবেদনময় লাস্য নৃত্যে আবহাওয়া একেবারে সরগরম করে তুলতেন। মাথার চুল বা গালের দাড়ি একগাছিও কালো ছিল না তাঁর, তথাপি অপাঙ্গ দৃষ্টিক্ষেপ ও চটুল নৃত্যে ঐ অঞ্চলে নর্ত্তকী ডাক্তার উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না বলা চলে। সংলাপ উচ্চারণ করা তাঁর অবশ্য একটু শক্ত কাজ ছিল, কারণ পূর্ব্ববঙ্গীয় বিশেষ একটা টান প্রায় প্রতি শব্দেই এত স্পষ্ট হয়ে ধ্বনিত হতো যে, দিল্লীর দরবারে মতি বাঈয়ের কথা শুনে বার বারই মনে হতো বুঝি ঢাকা থেকে আমদানী করা হয়েছে তাঁকে। নিজে আবার ছিলেন নৃত্যশিক্ষক। ছোট ছোট ছেলেদের রিক্রুট করে মজুমদার বাড়ীর মণ্ডপে এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন করে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। অভিভাবকরা এতে এতটুকুও আপত্তি করতেন না, কারণ ডাক্তার বাবু নাটক-পাগল হলেও নীতিরক্ষায় তিনি ছিলেন একেবারে পাথরের মত কঠিন!……

কেয়টখালী গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় আমাদের বাড়ী। গ্রামের নাটুকে দলের একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়েও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় নাটকাভিনয় করবার অধিকার ছিল আমার। প্রত্যেকটি অভিনয়ের পশ্চাতে আমাদের রাজনৈতিক প্রচ্ছন্ন একটা অভিসন্ধি ছিল বলেই এই অধিকার খুব ঘন ঘন প্রয়োগ করতাম আমি, বিশেষ করে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকা কালে। ১৯৩৫ সাল পড়তেই আমরা মহলা সুরু করলাম মন্মথ রায়ের "কারাগার" নাটকের। ভূমিকাগুলো বণ্টন করা হলো এমনি সব ছেলেদের মধ্যে, এক দিকে যেমন তাদের অভিনয়ের যোগ্যতা আছে, তেমনি দলে টানবারও উপযুক্ত তারা। আমাদের বাড়ীতেই মহলা সুরু হলো নিয়মিতভাবে।

সরস্বতী পূজোর রাত্রে অভিনয় হবে ঠিক করা হলো। রাজদিয়ার হরিদাস প্রেস থেকে বাকিতে ছাপিয়ে নিয়ে আসা হলো নিমন্ত্রণ-পত্র ও প্রোগ্রাম। কংসের ভূমিকায় অবতরণ করবো আমি নিজে। আমাদের বাড়ীর পূব দিকের পরিত্যক্ত গাঙ্গুলীবাড়ীতে মঞ্চ নির্ম্মিত হলো। বছিরদ্দী মুসলমানপাড়া থেকে অসংখ্য বাঁশ, দড়ি ও নৌকোর পাল এনে দিল। হাঁসাড়ার বান্ধবসম্মিলনী ধার দিলেন সিন ও উইংস। পূর্ব্বেই বলেছি, অভিনয়ে আমার খুব সুনাম ছিল। তাই শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, আশেপাশে অনেকগুলো গ্রামের দর্শকেরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সরস্বতী পূজোর রাত্রিটির জন্য।

ঠিক আগের দিন। দক্ষিণের কোঠায় সকাল বেলা নর্ত্তকীদের নৃত্যের মহলা সুরু হয়েছে সঙ্গীত পরিচালক রঙ্গলালের পরিচালনায়। সুরু হয়ে গেছে সঙ্গীত :

ফুলবাড়ীতে ফুটলো যে ফুল
খায় মধু তার ফুলটুকি—

এমন সময় একেবারে এ্যাটম বোমা নিয়ে গট্ গট্ করে এসে হাজির হলেন স্বয়ং যতীন দারোগা। সঙ্গে মাত্র একজন পুলিশ। যেন ক্ষুদ্র স্টেশনে অপেক্ষা করছেন তুফান এক্সপ্রেসের জন্য। থামবে মাত্র এক মিনিট, তারই মধ্যে উঠে পড়তে হবে। এমনি স্মার্ট !

গড় গড় করে বললেন : I am extremely sorry Dwijen Babu—

বাধা দিলাম : কেন ?

There is a transfer order by the Government—আপনাকে আবার Village internment-এ যেতে হবে, একেবারে মেদিনীপুর, কেশিয়াড়ী থানায়।

বলেই তিনি দীর্ঘ চার পৃষ্ঠা সম্বলিত একখানা সরকারী হুকুমনামা বার করলেন। ছাপানো ফরম, মাঝে মাঝে ফাঁকগুলো টাইপ করে পূরণ করা। স্বাক্ষর যাঁর পেয়েছিলাম, তাঁর নাম—যত দূর মনে পড়ে, গদাধর সিংহ রায়। স্যার জন এ্যাণ্ডারসনের অন্যতম সেক্রেটারী।

ভারী খুশী দেখলাম যতীন দারোগাকে। এতদিন পর তাড়াতে পেরেছেন বিক্রমপুর থেকে দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে। এবার সুনিদ্রা হবে তাঁদের। সুখে ঘরকন্না করতে পারবেন। আমি একটু চিন্তিত হলাম বৈ কি! এতগুলো নেমন্তন্ন পত্র ছাড়া হয়ে গেছে, ষ্টেজ বাঁধা হয়ে গেছে, বিশেষ ধরণের দৃশ্যগুলোর জন্য বিশেষ সব জানালা ও দরজা ও কারাগার তৈরি করা হয়েছে মুলি বাঁশের বাতা দিয়ে ফ্রেম করে তাতে রঙ্গীন বা সাদা কাগজ সেঁটে। সহর থেকেও দু-চারজন শিল্পী আসছেন, সঙ্গে আসছেন তাঁদের দু'চারজন বন্ধু কংসরূপী দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দেখতে। সমস্ত আয়োজন শেষ, ঠিক এমনি সময় এসে যতীন দারোগা যেন নিক্ষেপ করলেন হিরোসিমার ওপর এ্যাটম বোমা!···

দুঃসংবাদ বাতাসের আগে রটে গেল। বিক্ষুব্ধ অন্তর নিয়ে সবাই এসে হাজির হলেন। পাড়ার কাকারা, কাকীমারা, ছেলেরা, মেয়েরা, বছিরুদ্দী ও তার সাকরেদের দল, পূব পাড়ার খগেন, অনাথ ও বিপদভঞ্জন—গ্রামের অনেকেই। খোকা কোলে করে দেখলাম রেণুও এসেছে, এসেছে সুহাসিনীও।

সাহসে ভর করে রসিক কবিরাজ জিজ্ঞেস করলো: একদিন পরে গেলে হয় না দারোগাবাবু? আমাদের নাটকের এমনি আয়োজন—

না, হয় না। সরকারী হুকুম অমান্য করবার সাধ্য আমার নেই।—সংক্ষেপে সেরে দিলেন দারোগাবাবু।

রঙ্গলাল বললো: কিন্তু সাধারণ নিয়মে বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখবার পর তো ছেড়ে দেওয়া হয়।

তা হয়, আমিও জানি। কিন্তু আপনার দাদার ক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। কারণ আপনার দাদার ব্যাপার সাধারণ নয়, অসাধারণ।—বলে কাষ্ঠহাসি হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি।

বিপদ যুক্তি দেখালো: কিন্তু সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে যে—

মুরুব্বি চালে বললেন দারোগাবাবু: তা সরকারী আদেশের কথা বলে সবার কাছে মাপ চেয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

বোঝা গেল, কোনো উপায় নেই। দেখলাম বাবা ও মা একেবারে স্তব্ধ হয়ে

দাঁড়িয়ে রয়েছেন সবার সঙ্গে। আমি হেসে বললাম : মা, যাক, কিছুদিনের জন্য বিয়ের অত্যাচার থেকে বাঁচা যাবে।

মা কোনো কথা কইলেন না। কীই-বা আর বলবেন। এত কাল ধরে যেখানে কোনো দিন কোনো কথাই থাকেনি, সেখানে মিছে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি? সন্তানবৎসল মা-বাবার কোনো কথাই শুনিনি কোনো দিন, বরং সারাটি জীবন আমাদের কথাই জোর করে চাপিয়ে দিয়েছি তাঁদের ওপর!......

উপায়ান্তর নেই। তাই প্রস্তুত হয়ে নিলাম। জনসমাবেশ আরো বেড়ে গেছে ততক্ষণে। প্রায় ভিড় বলা চলে। আমার প্রকাণ্ড স্যুটকেসটি সটান মাথায় তুলে নিয়ে বছিরদ্দী বললো : লন, আমি স্যুটক্যাসটা থানায় পোছাইয়া দিয়া আসতে আছি।

বললাম : সে কি রে, সে যে প্রায় চার মাইল।

চল্লিশ মাইলেরেও ডরাই না কর্ত্তা! আমাগো যা কইরা থুইয়া গেলেন, খোদাই তা জানে।—বোধ হয় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো বছিরদ্দী।

বাবাকে প্রণাম করে যখন মায়ের পায়ে হাত রাখলাম, তখন টপ করে এক ফোঁটা জল আমার কাঁধের ওপর পড়লো। তাই মাথা তুলে আর তাঁর মুখের পানে চাইতে সাহস হলো না। মা কাঁদছেন!

তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে বাড়ীর নীচে নেমে এলাম। অকস্মাৎ দেখি ম্যান্দার বাড়ীর নীচে হিজল গাছটার পাশে একান্তে দাঁড়িয়ে রেণু, কোলে খোকা। কথা কইলাম না, বোধহয় কইতে পারলাম না। কিন্তু এগিয়ে গিয়েই মনে হলো পা দু'খানা ভারী হয়ে গেছে, আর চলছে না। থমকে দাঁড়ালাম। পেছন ফিরে চেয়ে দেখি দুটি নিষ্পলক কালো চোখ, চোখের সমুদ্রে উদ্বেলিত অতলস্পর্শ মায়ার তরঙ্গ! দু'পা এসে জিজ্ঞেস করলাম : কিছু বলবে আমায়?

মুহূর্ত্ত কাল চুপ করে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো রেণু পাথরের প্রতিমার মত, তারপর পাথরের ঠোঁট দুটি থেকে উৎসারিত হলো দুটি মাত্র কথা : মনে রেখো।

গট্ গট্ করে এগিয়ে চললাম শ্রীনগর থানার উদ্দেশ্যে। সম্মুখে স্যুটকেস মাথায় নিয়ে বছিরদ্দী; আর পশ্চাতে এ্যাটম বোমা যতীন দারোগা।

পশ্চাতের অপেক্ষমান জনতার পানে আর ফিরে চাইতে পারলাম না।......

সেদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ সাল।

ঊনপঞ্চাশ

নিয়ম হচ্ছে, কোনো রাজবন্দীকে জেলা থেকে স্থানান্তরিত করবার সময় জেলার পুলিশ সুপারের সমক্ষে তাকে একবার উপস্থিত করা হয়। চেহারা নিরীক্ষণ ও ছ'চারটে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে সাহেব বিচার করতে চেষ্টা করেন বন্দিত্বের যাঁতাকলের চাপে বন্দীর পূর্ব্বেকার গোঁ কমেছে কি না এবং কতখানি কমেছে। আবার যে জেলায় তাকে স্থানান্তরিত করা হলো, সেখানেও অমনি জেলার কর্ত্তা অতিথির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার গুরুত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন, কারণ রোগ বুঝে ও তার বিশেষ লক্ষণগুলো দেখে যথাযথ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা যে তাঁকে করতে হবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের মতো।

কিন্তু নিয়ম হলেও হামেসাই এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। হয়তো বন্দীকে জাঁদরেল গোছের জনৈক ইন্‌স্পেক্টারের কক্ষেই আনা হলো, চা ও খাবার দিয়ে আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলগোছে ছ'একটি প্রশ্ন করা হলো। জবাব পাওয়া গেল, ভাল; আর না পাওয়া গেলেও সুপার সাহেবের ডায়েরীতে কিন্তু স্পষ্ট করে লেখা হয়ে রইলো, The detenu was presented before me. I had an hour's talk with him and I was convinced that he had not shaken off that abominable views and practices......সুতরাং আরও কয়েক বছর তাকে আটকে রাখলে ভালো হয়। এমনি সুপারিশ করা সুপারের পক্ষে ভারী সহজ, বিশেষ রাজবন্দীদের বেলায়, যাদের মেয়াদের কোনো নির্দ্দিষ্ট সীমা নেই। বৃটিশের কাগজ—গভর্ণমেণ্ট কাগজে ও কলমে ভারী দুরস্ত—গলদ ধরবার উপায় নেই।···

শ্রীনগর থানার সহকারী দারোগা রবীন দত্ত সহযোগে রমনায় আই-বি অফিসে এসে উঠতেই যোগিনীবাবু বরাবরের মতো একেবারে কলরব করে অভ্যর্থনা জানালেন বিয়েবাড়ীর কনের বাপের মতো: আসুন দ্বিজেনবাবু! পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?—বসুন।

এই মামুলী প্রশ্ন জবাব আশা করে না, তাই যোগিনীবাবু বলে চললেন: ফেব্রুয়ারী হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা, কি বলেন? রবীন, যাও তুমি পোষাক ছেড়ে হাতমুখ ধোও গে, যাও। আর এখনি দ্বিজেনবাবুর হাতমুখ ধোয়ার বন্দোবস্ত করে দাও।—দ্বিজেনবাবু, সাহেব একটু বেরিয়ে গেছেন। এলেন বলে।

আপনাকে যে একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাই!—দাদা আমার যেন মহা অপরাধীর মতো কথা কইলেন।

বললাম: তাতে আর কী হয়েছে।

রবীন, চা ও খাবার জল্‌দি।—বলেই জলদি বেরিয়ে গেলেন যোগিনীবাবু।

এই দ্বিতীয় বার এলাম ঢাকার আই-বি অফিসে। ১৯৩১ সালে প্রথম গ্রেপ্তারের সময় অফিস ছিল আদালতের পেছনে, এবার উঠে এসেছে রমনায়। ছোট দোতলা বাড়ী। পারিবারিক গৃহকে অফিসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সমুখে পিচ-ঢালা রাস্তা, ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ। জেলা আই. বি-দের কাছে আমি 'টেরর' বলেই সর্ব্বদাই ওরা আমার সর্ব্বদায়িত্ব চাপিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় আই. বি-দের ওপর। তাই আমার ওপর কড়া নজর রাখা ব্যতীত জেলা আই. বি অন্যান্য ব্যাপারে আমায় কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের বন্দী হিসেবে গণ্য করে। জেলার বাইরে একবার পাঠাতে পারলেই এদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। এরা বাঁচবে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা ও জলখাবার এসে গেল। সোফায় বসে দিব্যি তার সদ্ব্যবহার করবার সময় লক্ষ্য রাখলাম সম্মুখের বারান্দার দিকে। যারা যাওয়া-আসা করছে, সবগুলোই স্পাই না-ও হতে পারে, কিন্তু যেভাবেই হোক আমাদের আপ্রাণ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেবার জন্যই যে তারা বদ্ধপরিকর, সে কথা মিথ্যে নয়। তাই তাদের মধ্যে যত বেশী সংখ্যককে চিনে রাখতে পারা যায়, কাজের পক্ষে ততই ভাল।

কিছুক্ষণ পরই বাইরে মোটর এসে থামবার শব্দ পাওয়া গেল এবং সর্ব্বত্রই যেন একটু চাঞ্চল্যও লক্ষ্য করলাম। বুঝতে দেরি হলো না যে, ওদের সাহেব এসেছেন।

কয়েক মিনিট পরই শশব্যস্তে ফিরে এলেন যোগিনীবাবু। বললেন: চা খেয়েছেন? আসুন তাহলে দ্বিজেনবাবু! সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করবেন, আসুন।

দোতলায় উঠেই যোগিনীবাবু অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন, হেসে প্রশ্ন করলেন: সঙ্গে আবার কিছু নেই তো?—আসুন, নিয়ম রক্ষা করবার জন্য পকেটগুলো একবার দেখে নিই।

তৎক্ষণাৎ বাধা দিলাম: মাফ করবেন যোগিনীবাবু! আপনাদের সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি লালায়িত হয়ে উঠিনি, ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন আপনারা বা আপনাদের সাহেব নিজে। আপনাদের দেবতার মন্দিরে প্রবেশের

পূর্ব্বে দেহতল্লাসী যদি অপরিহার্য্য বিধি হয়ে থাকে, তাহলে এখান থেকেই প্রণাম জানাচ্ছি তাঁকে।—চলুন, নীচে যাই।

মহা বিপদে পড়লেন যোগিনীবাবু: এই তো, আবার হাঙ্গাম করছেন শুধু শুধু। কী হবে ভাই একটুখানি নামকোওয়াস্তে—

সেটা আপনাদের কাছে হতে পারে দাদা! আমাদের কাছে ওটা অবমাননাকর, নীতির পরিপন্থী। যেখানে নীতির কথা, সেখানে আমরা এক ইঞ্চিও হেলিনে কখনো। হয়তো ভেঙ্গে যাবো, কিন্তু নুয়ে পড়বো না। বুঝলেন ?

কী বুঝলেন, তা যোগিনীবাবুই জানেন। দেহতল্লাসীর জন্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না। গ্র্যাসবি সাহেবের কক্ষের দরজায় পৌছে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন

গ্র্যাসবি সাহেবের সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। বয়স যে খুব বেশী তা নয়। তবে চোখেমুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ দেখলাম বেশ স্পষ্ট। বড় বড় দুটি চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নাকের পাশে ক্ষতের দাগটি এখনও মিলিয়ে যায়নি, যেখানে রিভলভারের গুলী আটকে ছিল। আমি চেয়ারে বসতেই বোধহয় কটিবন্ধ থেকে বা ড্রয়ার থেকে দুটো রিভলভার বার করে শ্রীমান টেবিলের ওপর দু'হাতের সামনে রাখলো। তারপর চোখ দিয়ে আমায় বিঁধতে চেষ্টা করে প্রশ্ন করলো: ভারী গণ্ডগোল সুরু করেছ তুমি।

আকাশ থেকে পড়লাম: কই, না!

ঝুট বাৎ বলছো।—বলে সাহেব মিঠিয়ে মিঠিয়ে বলতে লাগলো: গভর্ণরকে যারা গুলী করলো, তারা সব তোমার দলের লোক আছে, তাই না ? মেদিনীপুরে যারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে খুন করলো, তারাও সব তোমার দলের লোক। I know your party is B. V.—সত্য গুপ্ত, যতীশ গুহ, সুপতি রায়, ভূপেন রক্ষিত সব তোমার দলের লোক। তাই না ?

আমি চুপ করে রইলাম।

মুহূর্ত্ত নীরব থেকে গ্র্যাসবি আবার বললো: All right, we shall find out all your activities—এর মধ্যে সবই জানতে পারবো আমরা but in the meantime you will have to rot in village domicile—আর তোমার ছাড়া পাবার উপায় দেখি না। অন্ততঃ দশ বরষ!

তবুও আমি নীরব।

সাহেব ঘণ্টা বাজালো যোগিনীবাবুর প্রবেশ। ইসারা করতেই আমায় নিয়ে নীচে নামলেন যোগিনীবাবু। আমার escort party এসে গেছে ততক্ষণে। দু'জন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সৈন্য, একজন সহ-দারোগা।

ঢাকা স্টেশনে ট্রেণে আরোহণ করে যাত্রা করলাম নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে। নারায়ণগঞ্জে এসে চেপে বসলাম গোয়ালন্দগামী মেল ষ্টীমারের রিজার্ভ-করা ইণ্টার ক্লাস কামরায়। কিন্তু একটু পরই সঙ্গী সহ-দারোগার সঙ্গে আমার বেশ এক পশলা বচসা হয়ে গেল।

লোকটার বয়স চল্লিশের নীচে নয়। ভারী অলস ও বদমেজাজী। ইণ্টার ক্লাসের লম্বা বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে ব্যাটা আমায় সতর্ক করে দিলেন যেন আমি কোথাও না যাই।

কেন?—প্রশ্ন করলাম।

জবাব দিলেন: সিপাইরা কি আপনার পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে?

বললাম: না ঘুরে বেড়ায়, তারা আপনার মতো লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুক। কিন্তু তাই বলে আমার চলা-ফেরা বন্ধ করে রাখতে হবে আপনাদের আরামের জন্য, এতখানি রাজভক্তি আশা করবেন না।

আপনি যদি নদীতে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালান?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম: তা পালাবার সুযোগ পেলে হয়তো সদ্ব্যবহার করবো। কিন্তু আপনার উর্ব্বর মস্তিষ্কে এই বুদ্ধিটা কি আসছে না যে, home internment-এ থেকে যে পালালে না, village internment-এ বদলির বেলায় সে পালাবে? কেন, সেখানে কি আমায় ফাঁসীতে লটকাতে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

লোকটা মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করলো: আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাইনে, শুধু বলে দিচ্ছি, আপনি অনর্থক ষ্টীমারে ঘোরাঘুরি করবেন না।

রাগ হলো। গ্র্যাসবিকে ঘোল খাইয়ে এলাম, আর এ কোথাকার টুনটুনি! বললাম: সে কৈফিয়ৎ আমি আপনার কাছে দিতে রাজী নই।

তাহলে কিন্তু বাধা দিতে হবে আমায়।

উঠে দাঁড়ালাম, চ্যালেঞ্জ জানালাম: পারেন, বাধা দিন।

বাধা যে ওরা দিতে পারে এবং বেশ ভালভাবেই দিতে পারে ও দেবার সময় তার মাত্রাজ্ঞান ওরা বেশ সহজেই হারিয়ে ফেলতে পারে, এ সত্য আমার অজানা ছিল না। কিন্তু যেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন, সেখানে বিপ্লবীদের কাছে

দুটি মাত্র পথ আছে খোলা—হয় সম্মান অটুট রাখা, নয় তো প্রতিরোধ করা এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বিপক্ষ যদি অমিতবিক্রম হয়, তাহলে রণক্ষেত্রেই শেষশয্যা রচনা করা। মধ্যবর্তী পন্থার কোনো সম্ভাবনা নেই, নেই আলোচনা ও আপোষরফার সুযোগ। আত্মসম্মানের প্রশ্ন উঠলে বিপ্লবীরা ক্ষমাহীন নিক্ষিপ্ত শায়কের মতো হয়। সোজা ভেদ করে বেরিয়ে যায়, নইলে প্রতিপক্ষের ইস্পাতের বর্মে ঠোক্কর খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ভায়া-মিডিয়ার সুযোগ নেই সেখানে। হয়তো একটুখানি পাশ কাটালেই বা একটুখানি পাশ দিলেই একটা বড় রকমের সংঘর্ষ এড়ানো যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানে কোনো ষ্ট্র্যাটেজি নেই, এক পা পেছিয়ে এসে দু'পা এগিয়ে যাবার tactics নেই! আত্মসম্মানবোধ সীমাহীন তীব্র বলেই নিজের দেশমাতার সম্মানরক্ষার জন্য বিপ্লবীরা বিলিয়ে দেয় প্রাণ হেলায় ফেলায় ঝড়ো হাওয়ার মুখে এক মুঠি ধূলির মতো!······

গাড়োয়ালী সেনাদের বন্দুক দুটি যে একেবারে মিলিটারী রাইফেল, বেয়নেটে যে আছে ক্ষুরের ধার এবং সহকারী দারোগার কোটের নীচে যে আঁটা আছে একটি সার্ভিস রিভলভার, এ সত্য আমার অজানা ছিল না। কিন্তু চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার সময় রাইফেল বা রিভলভার বিপ্লবীদের কাছে সমানই তুচ্ছ বস্তু।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম এবং চলন্ত ষ্টীমারে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। সহকারিতায় অন্যতম সহকারীকে পাঠালো আমার পেছনে ফেউয়ের মতো।

ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাণ্ডা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। ষ্টীমারের একেবারে সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগে। হু হু করে এগিয়ে চলেছে ষ্টীমার প্রচণ্ড বেগে দু'পাশে জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করে। বাতাসের বেগে সেই জলরাশির অজস্র ঠাণ্ডা কণা এসে গায়ে লাগে। মাঝে মাঝে দু'এক ঝলক জলও ষ্টীমারের ওপর ওঠে আসে যেন বিক্ষোভ জানাবার জন্যই। কিন্তু পরমুহূর্তেই উদ্যত ফণা তাদের লুটিয়ে পড়ে, নিষ্প্রাণ হয়ে তারা গড়িয়ে পড়ে আবার সেই নদীতে। ট্রেণের মতো তীরের দিকে তাকিয়ে কিন্তু ষ্টীমারের গতি নির্ণয় করা যায় না। প্রথমতঃ, তীর বেশ দূরে, লাইনের ধারে ধারে ঝোপঝাপের মতো নয়। তারপর জলের মধ্যে চাকা চালিয়ে এগিয়ে যেতে হয় ষ্টীমারকে। ট্রেণ ছুটে চলে মসৃণ লাইনের ওপর দিয়ে শুধু বাতাসের বাধা ঠেলে। ষ্টীম থেকে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে ষ্টীমারের প্রপেলার হু হু করে ঘুরিয়ে দেয়, সেই শক্তি রেল লাইনের ওপর চলমান কোনো বাষ্পীয় যানে সংযোজিত করলে তার গতিবেগ কতখানি হতে

পারে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরর্থক তাই কল্পনা করতে লাগলাম। জলকণা মাঝে মাঝে এসে শরীরে তুষারকণার মতো বিঁধলেও বেশ ভালো লাগছিল এমনি গতিবেগ নিরীক্ষণ করতে।

মনে পড়ে গেল আজ সরস্বতী পূজো। সরস্বতী পূজো আমাদের দেশে ঘরে ঘরে হয়ে থাকে। সারাটি বছর একেবারে বই না স্পর্শ করলেও এই দিন ছাত্রছাত্রীরা অকস্মাৎ অতীব ভক্তিভরে বইখাতার ধুলোবালি ঝেড়ে নিয়ে কালির দোয়াতে দুধ পুরে তার মধ্যে কাশদণ্ড দিয়ে তৈরী কলম গুঁজে বাণীদেবীর সম্মুখে পরিপাটি করে সাজিয়ে দেয়। তারপর মুখে অঞ্জলির মন্ত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করলেও মনে মনে বোধহয় নিবেদন করে: হে মা সরস্বতী, সারাটি বছর তো ফাঁকি দিয়ে চলেছি। এবার অন্ততঃ পাস্ মার্কের ব্যবস্থা করে দাও মা! নইলে বাবা যে আর রক্ষে রাখবেন না!···

সরস্বতী পূজোর দিন বাজার থেকে ইলিস মাছ আসবেই। ইলিস সেদিন আর সাধারণ মাছ নয়; সেদিন সে মর্ত্তে আগত স্বর্গের দেবীবিশেষ। একা আসেন না, আসেন জোড়া বেঁধে। বাড়ীতে এসে পৌছবার পূর্ব্বেই এয়োরা স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই তাঁরা এগিয়ে আসেন হুলুধ্বনি করে। পরিষ্কার করে ধোওয়া একটি কুলোর ওপর তাদেরকে শুইয়ে দিয়ে একখানা ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে আলগোছে আঁস ছাড়িয়ে ফেলা হয়। যেন ব্যথা না লাগে! তারপর স্নান করানো হয় তাদেরকে কলসীর তোলা শীতল জলে, তারপর এয়োরা ভক্তিভরে পরিয়ে দেন এঁদের কপালে সিঁদূরের টিপ। ধূপদীপ জ্বালিয়ে শঙ্খধ্বনি করে সারি বেঁধে নিয়ে যান একেবারে বাড়ীর প্রধানতম কক্ষে। সেখানে তাঁদের উৎসর্গ করা হয় তীক্ষ্ণধার বঁটির কাছে। শুধু হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রান্না করা সেদিনকার ইলিস মাছ মনে হয় যেন অমৃত!···এই অমৃত-ইলিস আজ আর জুটলো না আমার ভাগ্যে। সরস্বতী পূজো আর সে উপলক্ষে নাটকাভিনয়ের আনন্দটা এ বছরটা মাঠেই মারা গেল দেখছি।

চলনদার যদি কৃপণ হন, তাহলে রাজবন্দীদের সাধারণ নীতি হচ্ছে একেবারে দিলদরিয়া বনে যাওয়া। বৃথা ও বাজে পয়সা ব্যয়ই তখন নীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাই, দ্বিপ্রহরে আহারের কথা উঠতেই একই সঙ্গে ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের খাদ্যের হুকুম ছেড়ে দিলাম অবলীলাক্রমে। দোতলায় পেছন দিকে খাবার ঘর। লম্বা টেবিলের ওপর বিছানো রঙ্গীন ক্লথ। বাবুর্চ্চির সাদা পোষাক তাড়াতাড়ি

পরে নিয়ে স্বয়ং রাঁধুনী মিঞাই এসে গেলেন পরিবেশন করতে। সাদা ধবধবে ভাত, একটির সঙ্গে অপরটির সান্নিধ্য থাকলেও সংযোগ নেই। কিন্তু দেখা গেল ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন, শাক ও মুগের ডালের পরই এসে গেল একেবারে ইলিস মাছ, ইলিস মাছের ঝাল। চট্টগ্রামী ঝাল মানে সত্যিকার গলা-জ্বালানো ঝাল। তাতে যেমন অজস্র পেঁয়াজ ও রসুন আছে, তেমনি আছে 'অষ্ট গণ্ডা লঙ্কা!'

তবুও ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে খাদ্য বিভাগীয় মিঞাদের উদ্দেশ্যে। কারণ সরস্বতী পূজোর দিনটিতে ইচ্ছেয় হোক বা অজানতেই হোক, ইলিস মাছের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেকেণ্ড ক্লাসের খাদ্য-সূচী শেষ হয়ে গেলে এল ফার্ষ্ট ক্লাসের মেনু—মুরগীর কোর্ম্মা।...আহারটি বেশ পরিতোষসহকারেই শেষ করা গেল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে ট্যাক্সিতে সোজা আমায় নিয়ে যাওয়া হলো হাওড়া স্টেশনে। মেদিনীপুরগামী ট্রেণ অপেক্ষা করছিল, তার একখানি ইণ্টার ক্লাস কামরা জাঁকিয়ে বসলাম আমরা। এতখানি পথ একটিও পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। চেষ্টা করেছিলাম এবং আশাও করছিলাম। রিভলভার দুটি যে কোথায় রেখে এসেছি, সে সংবাদটি অন্ততঃ যথাসম্ভব সত্বর যথাস্থানে পাঠানো একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমার ঘরের কুলুঙ্গিতে যে আর নেই তারা। এই সব নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনো একটি স্থানে বেশী দিন জমা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বৌদিরা এই গুপ্ত স্থানের অস্তিত্ব টের পাওয়ামাত্রই তার আশ্রয়স্থল পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। পুব দিকের ভূতের বাড়ীর বেতঝোপের মধ্য দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে একটি সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে। পরিধি কম, বসে বসে প্রবেশ করতে হয়। প্রায় ত্রিশ গজ সোজা চলে যাবার পর একটি ধুতুরা ফুলের গাছ আছে। তার গোড়াকার মাটি তুলে ফেললেই প্রায় আঠারো ইঞ্চি নীচে থেকে বেরুবে একটি গ্লাক্সোর বড় টিন। সেই টিনের মধ্যে ছোট সাইজের দুটি রিভলভার আছে। কেউ জানে না, একা আমি ব্যতীত!......

মেদিনীপুর শহরে যখন এসে পৌছলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। উঠলাম বোধহয় পুলিশ ক্লাবে। ক্লাব মানে বাইরে থেকে বলা উচিত ডাক-বাংলো। তবে এখানে এসে থাকতে পারেন শুধু মফঃস্বল থেকে শহরে আগত পুলিশ অফিসার ও ঐ বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা। খাবার ব্যবস্থা আছে, চার্জ্জ বাজারের চাইতে কম।

মেদিনীপুরের পুলিশ-সুপার তখন ছিলেন সি. উইলী। সেকালের কথা যাদের মনে পড়ে তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, ইনি অত্যন্ত কড়া মেজাজী ও

মিলিটারী সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন। এই সদ্‌গুণের জন্যই তাঁর ওপরওয়ালা পরবর্ত্তী কালে তাঁকে বোধহয় একেবারে পুলিশের ইন্‌সপেক্টার জেনারেল অথবা কলকাতায় কেন্দ্রীয় আই-বি অফিসে একেবারে ডেপুটি কমিশনার করে পাঠান। ঠিক মনে পড়ছে না। আমায় কিন্তু আর উইলীর কাছে যেতে হলো না। নিশ্চয়ই তাঁর ডায়েরীতে নির্জ্জলা সত্য কথাটি লেখা হয়ে গেল—The Detenu was produced before me. He said he had his full meals in the journey and had no complain ইত্যাদি।

তারপর আবার ট্রেণে চড়লাম। এবার সঙ্গে এলেন মেদিনীপুর জেলা আই. বি-র লোক। নামলাম এসে কাঁথি রোড ষ্টেশনে, সেখান থেকে মাইল আটেক গরুর গাড়ীতে এসে অবশেষে পৌছলাম কেশিয়াড়ী থানায়। তখন বেলা বারোটা হবে। বড়বাবু থানায় নেই, কোন্ মামলার তদন্তে মফঃস্বলে গেছেন। অভ্যর্থনা জানালেন সহকারী দারোগা অবিনাশবাবু। বললেন: আসুন, আসুন। মালপত্রগুলো সব ডেটিনিউবাবুর ঘরে নিয়ে যাও তো, রামভরসা সিং। চাবি দেখ দেয়ালে আছে মালখানার। এই বেলায় আর আপনার পক্ষে রান্না করা সম্ভব হবে না ডেটিনিউবাবু, আমার এখানেই দুটো ডালভাত—

কী যে বলেন!—বলে মৃদু হাস্য করলাম।

পঞ্চাশ

আমার ঘরখানার পরিধি দশ ফুট চওড়া ও দশ ফুট লম্বা হবে। খড়ের ছাউনি, ঝাঁপের দরজা ও জানালা। মাথার ওপর 'সিলিং' বলে কিছু নেই, একবারে চালের নীচে বাঁশের কাঠামো দেখা যায়। ছিটে-বেড়ার ওপর মাটি লাগিয়ে সেটা দেয়ালের মতো তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছে, জানালার শিকগুলো বাঁশের, মাটির মেঝে। সম্মুখে আবার কয়েক ফুট চওড়া বারান্দা। সম্মুখেই একটি টিউব ওয়েল সর্ব্বসাধারণের জন্য। ওপারে আমার রান্নাঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার বাইরেই একটি ফুলের বাগান। শোনা গেল, আমার পূর্ব্বেকার রাজবন্দীর নিজের হাতের তৈরী বাগান। সারাটি দিন বাগান নিয়েই পড়ে থাকতেন তিনি। গাছে জল দেবার ব্যবস্থাটি কিন্তু চমৎকার। টিউবওয়েলের জল সরে যাবার ড্রেনটি টেনে নিয়ে বাগানের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সারাটি বাগান ঘুরে সেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে।

টিউবওয়েলে স্নান সেরে নিয়ে এসে তক্তপোষের ওপর বিছানাটা বিছিয়ে নিয়ে বসলাম। দেখা গেল তক্তপোষের দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুটের বেশী হবে না। কেন সেটা সাত ফুট হলো না, সে ইতিহাস পরে জানতে পারলাম। ঘরে আছে একখানি টেবিল ও একখানা হাতলহীন চেয়ার। একখানা ধুতি ভাঁজ করে পরিপাটি করে বিছিয়ে দিলাম টেবিলের ওপর টেবিল-ক্লথের মতো। 'বি' টাইম-পিস্‌টা বসিয়ে দিলাম তার ওপর।

একটু পরই এল খাবার ডাক। অবিনাশবাবুর ওখানে পাশাপাশি খেতে বসে থানার ইতিবৃত্ত মোটামুটি সংগ্রহ করা গেল।

অবিনাশ বাবুর চাকরি হয়েছে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর। সরাসরি সহকারী দারোগার পদে নিযুক্ত হয়েও কেন তিনি আজও দারোগা পদের জন্য ওপরওয়ালার মনোনয়ন পেলেন না এবং কী করে সেদিনকার ছোকরা এস. সি-গুলো বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতার মতো চড়চড় করে বেড়ে উঠলো দেখতে দেখতে ও সিনিয়রদের টপকে একেবারে দারোগা, এমন কি, অফিসার-ইন-চার্জ্জ হয়ে বসলো, তারই সকরুণ কাহিনী বিবৃত করে তিনি বললেন: মুস্কিল তো ঐখানেই দ্বিজেনবাবু, পুলিশের চাকরি করি বলে ওদের মতো বিবেক জো আর খোয়াতে পারলাম না আর সেটাই হলো আমাদের মস্ত অপরাধ। এই তো ধরুন না, আমাদের এই

ক্ষীরোদবাবুর কথাই। মাত্তর তো আট বছরের নোকরি। লাল পাগড়ী মাথায় বেঁধেছিস্ তো পুরো পাঁচটি বছর। বন্দুক কাঁধে ঘাস-বিচালী করেছিস তো পুরো দুটি বছর! তারপর যেই সুরু হলো সিভিল ডিজওবিডিয়েন্স, তখন কর্ত্তারা চোখে দেখলেন সরষে ফুল আর গরু ভেড়া ছাগল সবাইকে রাতারাতি জমাদার করে থানায় থানায় পাঠালেন ভলান্টিয়ারদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করতে।

বলেই অবিনাশবাবু অকস্মাৎ নেপথ্য পানে তাকিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন: কেন, কী হয়েছে তাতে? সত্যি কথা বলবো, তাতে আবার ভয় কীসের? দ্বিজেনবাবু সবে এলেন, এখানকার ব্যাপার-স্যাপার ওঁর সব জানা থাকা ভাল।

বুঝলাম স্ত্রীর আপত্তি আছে। আমার আপত্তি কিন্তু আদৌ নেই। পশ্চিম-বঙ্গীয় পেটেণ্ট ঝালবিহীন রান্না যতই বিস্বাদ লাগুক না কেন এবং সেই সঙ্গে অবিনাশবাবুর আত্মপ্রচার যতই বিশ্রী ঠেকুক না কেন, থানার পরিস্থিতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করাই যে আমার প্রাথমিক কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য যত শীঘ্র পালন করা যায়, ততই আমার পক্ষে সুবিধে।

হেসে বললাম: বৌদি বুঝি ভয় পাচ্ছেন?

জবাব দিলেন অবিনাশবাবু: ভয়? ভয় কীসের? আমি ক্ষীরোদেরটা খাই, না পরি? বদমাইসকে বদমাইস বলবো না তো কি বলবো রামকৃষ্ণ পরমহংস? শুনুন দ্বিজেনবাবু, বললে হয়তো হাসবেন মনে মনে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে দেখেই আমার ভালো লেগেছে। তাই এখানকার সব কথা জানিয়ে আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

বলে অবিনাশবাবু আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে বোধহয় নেপথ্যের নীরব সমর্থন নিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্ম এই যে, ক্ষীরোদবাবু মহিষাদল থানায় এ-এস-আই থাকাকালীন এক সত্যাগ্রহীদের সভায় গুলী চালিয়ে তেরো জনকে আহত ও দু'জনকে নিহত করে এস-আইয়ের অফিসিয়েটিং পেয়েছে এবং একেবারে থানার কর্ত্তা হয়ে এসেছে এই কেশিয়াড়ীতে। জানা গেল, ক্ষীরোদ অতি বদলোক, মাতাল, ঘুষখোর ও চরিত্রহীন। মফঃস্বলে গেলেই নিত্য নতুন সাঁওতালী মেয়ে তার চাই-ই। আর এখানে থাকতেও—না, না, তুমি যতই বারণ কর, সব আমি বলবোই। সত্য কথা বলবো, তাতে ভয় কীসের শুনি!

নেপথ্যে চুড়ীর আওয়াজ ও শাড়ীর খসখস শোনা গেল এবং একটু পরই অবিনাশবাবুর স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সম্মুখ দিয়ে বড় ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন কণ্ঠস্বর এবার খাটো করে বলতে লাগলেন অবিনাশবাবু: মশাই,

তাকে বৌদি বলে, অর্থাৎ মাতৃস্থানীয়া, আর তাঁকে কিনা আড়ালে পেয়ে বলে, বৌদি, তোমার ফিগারটা কী সুন্দর! বলুন তো দ্বিজেনবাবু, শুনেছেন কোনো দিন এমনি লম্পট দেওরের কথা? শালার সাতপুরুষের ভাগ্যি যে, আমি সদরে গিয়েছিলাম সে রাত্রে, নইলে জুতিয়ে শালার মাথা থেঁতলে দিতাম—না, না, ও কি, মাথাটা খান দ্বিজেনবাবু। এ কিন্তু বরফের মাছ নয়, একেবারে জটাধরবাবুর পুকুরের, পাকা রুই যাকে বলে।

তৃপ্ত মনে মাথাটা টেনে নিলাম। প্রথম দিনেই মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই থানার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো বলা চলে। দারোগার নিন্দে করতে গিয়ে যে সহকারী দারোগা একেবারে প্রথম সাক্ষাতেই সাঁওতালী মেয়ে ও বৌদির ফিগারের গল্প করে বসতে পারে, তার সম্বন্ধেও আমার প্রাথমিক ধারণাটা বিশেষ ভালো হলো বলতে পারিনে। একে অর্বাচীন ব্যতীত সরল মানুষ কিছুতেই বলা যেতে পারে না।......

কিন্তু সে যাই হোক্, দারোগা আর জমাদারের এই কোন্দল খুশী মত কাজে লাগানো যাবে। লিপ্সাকে লেলিয়ে দেয়া, হিংসাকে খাদ্য দেয়া, অত্যাচারকে প্ররোচনা দেয়া, এরই নাম চাণক্যের রাজনীতি!···

পরদিন সকাল বেলাতেই বহুপ্রতীক্ষিত লম্পট দেওর, দারোগা-পুঙ্গব ক্ষীরোদ দত্তের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অনেক রাতে ফিরেছেন মফঃস্বলের কাজ শেষ করে, তাই টের পাইনি। নতুন জায়গা প্রদক্ষিণ করবার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি থানার বারান্দায় টেবিলে বসে নিবিষ্ট মনে ডায়েরী লিখছেন। যেতে হলো এবং কাছে আসতেই বললেন: বসুন। কাজটা সেরে নিই, তারপর কথা বলছি।

সুপুরুষ নিশ্চয়ই বলতে হবে। যেমন ফর্সা রং, তেমনি বলিষ্ঠ দেহ। মাথায় কুঞ্চিত কেশ, পুলিশী ষ্টাইলে ছাঁটা। সরু করে কামানো গোঁফ। আড়চোখে দেখলাম, হাতের লেখাটিও সুন্দর। দু'পৃষ্ঠার মাঝে কার্বন লাগিয়ে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে চেপে লিখছেন। লিখতে লিখতেই সিগারেটের টিনটা ঠেলে এগিয়ে দিলেন। বললাম: আমি খাইনে।

কাজ সেরে প্রথম প্রশ্ন হোল তাঁর: আপনি কদ্দিন ধরে ডেটিনিউ হয়ে আছেন?

জবাব দিলাম: তা—প্রায় সাড়ে তিন বছর হবে।

ঢাকা জেল থেকে আসছেন?

জেল নয়, ঢাকা জেলা। হোম ইন্টার্ণ ছিলাম।

আপনার এরিয়াটা দেখেননি নিশ্চয়ই।—জমাদারবাবু!

শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন জমাদার অবিনাশবাবু ঘর থেকে। নেপথ্যে অজস্র আস্ফালন দেখলেও এখন কিন্তু সাহসী পদক্ষেপ বা নিঃশঙ্ক ভঙ্গিমার আভাস পেলাম না এতটুকুও, বরং দেখলাম স্পষ্ট এম-ও-এস-এর একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র।

ক্ষীরোদবাবু তাঁর দিকে না তাকিয়েই হুকুম দিলেন: ডেটিনিটিবাবুকে তাঁর এরিয়াটা আজই একবার দেখিয়ে দেবেন।

এ এরিয়া নিয়েই প্রথম মতভেদ ও মনোমালিন্য সুরু হলো আমার ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে। কেশিয়াড়ী গ্রামের পূব দিকে যে হাট আছে, সপ্তাহে তা দু'দিন বসে—সোমবার ও শুক্রবার ঐ হাটই আমার পূব দিকের সীমারেখা। হাটবাজারের সুবিধে দিতে হবে বলে ঐ ব্যবস্থা। উত্তর দিকে ঘন জঙ্গল, কাঁটা বাঁশের ঝোপে ভর্ত্তি। সেদিকে দেওয়া হয়েছে একেবারে কেশিয়াড়ী গ্রামের শেষ সীমানা। দক্ষিণেও নলিনী রাউতের মণিহারী দোকানের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু পশ্চিম দিকের সীমানা নিয়েই গোল বেধে গেল। ক্ষীরোদবাবুর মতে ওদিকে জটাধর সেনাপতি মশাইয়ের বাড়ীর উল্লেখ থাকলেও বাড়ীটা সীমানার মধ্যে নয়, বাইরে। অর্থাৎ তাঁর বাড়ীর পূব দিকের সীমানা আমার এরিয়ার পশ্চিম দিকের নিশানা।

বললুম যে, তা হতেই পারে না; পূব দিকে বা দক্ষিণ দিকে কেশিয়াড়ী হাট বা নলিনী রাউতের দোকান লেখা থাকলে যদি সে দুটো স্থান আমার এরিয়ার অন্তর্গত হয়, তাহলে পশ্চিমের সীমানা বলে উল্লিখিত জটাধর সেনাপতির গৃহ বাইরে থাকবে কোন্ যুক্তিতে? হয় সবগুলোই আমার এরিয়ার অন্তর্গত, নইলে সবগুলোই বাইরে। ক্ষীরোদবাবুর খুশীমত কোনোটা বাইরে ও কোনোটা ভেতরে হতে পারে না।

ব্যস্, লেগে গেল দারোগার সঙ্গে। বেদম কথা কাটাকাটি হবার পর কথা বন্ধ। বিকেল পাঁচটায় থানায় গিয়ে তাঁকে দেখেও যেন দেখতে পাইনে আমি। ভেতরে গিয়ে অবিনাশবাবুর টেবিলের পাশে বসি, দু'মিনিট বসে আবার বেরিয়ে যাই।

মনে মনে অবিনাশবাবু ভারী খুশী। যাক্, দারোগা তাহলে পারেনি আমায় হাত করতে। তিনি না থাকলে তো বিকেলের চা ও জলখাবার ওখান থেকে আসবেই, দুপুরেও আসবে ছ্যাঁচড়া, মাছের ঝোল, বৌদির হাতের তৈরী গজা ও অন্য কিছু। ক্ষীরোদবাবু আবার বড্ড বেশী মফঃস্বল-প্রিয় ছিলেন এবং একবার

গেলেই দুচারটে রাত বাইরে কাটিয়েই আসতে ভালবাসতেন। জমাদারবাবুও তাই চাইতেন। কারণ তাহলেই রাত্রে এসে পড়তো আমার নেমন্তন্ন দুটো ডালভাতের। কিন্তু দেখা যেত প্রকাণ্ড থালার ঠিক মাঝখানে দুটো ভাত এভারেষ্টের মতো পরিপাটি করে সাজিয়ে থালাখানা বেষ্টন করে সাজানো একই আকারের বাটি, নানারূপ ব্যঞ্জনে, মাছে ও মাংসতে ভর্ত্তি। খেতে বসে একথা-সেকথার মধ্যে দিয়ে কখন এসে পড়তো ক্ষীরোদ-প্রসঙ্গ : বুঝলেন মশাই, এমনি বাটি সাজিয়ে ঐ শালাকেও অনেক দিন খাইয়েছি। আদর কি কম করেছি মশাই, না আপনার বৌদি পর ভেবেছে কখনো ? কিন্তু কি করা যাবে, শালা আদরের কদর বুঝলো কই ? আরে, বৌদিকে আমরা জানি মাতৃস্বরূপা ; তাঁকে বলিস্ ফিগার সুন্দর—কিন্তু ও কি, তুমি চললে কোথায় ? দ্বিজেনবাবু যে তাহলে না খেয়েই পালাবেন। বসো বসো—

কিন্তু বৌদি বসলেন না। নিজের ফিগারের বিশদ আলোচনায় যোগদানের ভিগার বোধহয় আর ছিল না তাঁর। তাই দরজার আড়ালে গিয়ে স্থান নিলেন।

সংবাদ সংগ্রহ করলাম যে, অবিনাশবাবুর তৃতীয় পক্ষ ইনি এবং কতকটা আধুনিকা। তাই ক্ষীরোদ ঠাকুরপোর তারিফটাকে তিনি খুব সহজভাবে গ্রহণ করে স্বামীর কাছে উল্লেখ করে একটু আমোদ করতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। ব্যস, তাতেই দাদা একেবারে ফায়ার।···আধুনিকা হলেও কিন্তু সূর্য্যের মুখ দেখবার আর উপায় নেই তাঁর। জমাদারবাবু শ্যেনদৃষ্টি মেলে সর্ব্বদা পাহারা দেন। দুমাস কেটে গেলেও আমার সঙ্গে তেমন হালকা সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হলো না। ঘোমটাও দিতেন না, কথাও কইতেন, কিন্তু সে কথা বৌদি ও ঠাকুরপোর নয়, পাঞ্জাব মেইলের সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীর সঙ্গে যাত্রিণীর নীরস ভদ্রতাব্যঞ্জক কথা মাত্র!······

কিন্তু দারোগা-জমাদারের এই বিরোধ সুবিধেমত আমার কাজে লাগাতে কসুর করলাম না। দারোগার সঙ্গে মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে সিনেমার ভিলেইনের মতো এঁর কথা ওঁর কানে এবং ওঁর কথা এঁর কানে লাগিয়ে কৌশলে এঁদের কান বেশ ভারী করে তোলা গেল। ফলে দুজনেই আমায় পরম সুহৃদ্ ও শুভানুধ্যায়ী মনে করতে লাগলেন পৃথক্‌ভাবে। কিন্তু দুজনেই থানায় থাকলে আমি পেছন দিককার গেট্ দিয়ে বেরিয়ে যেতাম, সদরের দিকে ফিরেও চাইতাম না। ক্ষীরোদ দত্তের মুখেই শুনলাম যে, অবিনাশবাবুর স্ত্রীর পরিচয় নাকি রহস্যাবৃত, শ্বশুরবাড়ী থেকে কেউ কোনো দিন আসেনি এখানে, বৌদিও কখনো যাবার নামটি

করেন না। এমন কি, কোথায় তাঁর শ্বশুরবাড়ী, সে প্রশ্নের কোনো যুক্তিসহ জবাব তিনি দিতে পারেন না। এই রহস্যময়ী নারী অকস্মাৎ ক্ষীরোদবাবুকে দেবরাধিক আদরআপ্যায়ন করে তাঁকে এত আপনার করে নেন যে, ক্ষীরোদবাবু সত্যিই তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু একদিন সন্ধ্যেবেলা, জমাদারবাবু যখন সদরে গিয়েছিলেন একটা মামলায় সাক্ষী দিতে, তখন—বলতে বলতে দারোগা কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন : সে ঘটনা আমি কিছুতেই বলতে পারতাম না আপনাকে, দ্বিজেনবাবু! তবে কথাপ্রসঙ্গে এসে গেল বলেই বলছি। আর কাউকে বলবেন না যেন। কেমন আমার ফিগারটি, বল তো ঠাকুরপো—বলে বৌদি আমার মুখের সামনে এগিয়ে এসে এমনি একটা বিশ্রী ভঙ্গী করে দাঁড়ালো যে—

বাধা দিলাম : থাক্, সে ঘটনা আমার আর শুনে কাজ নেই।

এরিয়া নিয়ে যে মতভেদ, তার মীমাংসা করবার জন্য কড়া দরখাস্ত পাঠালাম সদরে। যথারীতি তার কোনো জবাব এল না। আমি এবার লিখলাম, জটাধর বাবুর বাড়ীতে আমি যাবোই। এতে আইনভঙ্গ হয়ে থাকলে মামলা কর আমার নামে। তারও জবাব নেই। এদিকে ক্ষীরোদ দারোগা গোপনে পাঁয়তাড়া কষতে লাগলেন যে, গ্রেপ্তারের হুকুমটা একবার এলেই হয়। এল সি সুধীর সংবাদটা গোপনে জানিয়ে দিল।

থানার বাইরে একটু দূরেই দাতব্য চিকিৎসালয়। সেখানকার ডাক্তার রামমোহন বাবু বেশ ভদ্র ও অমায়িক। ডাক্তারী বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা কতখানি, সে বিচার করবার সুযোগ অবশ্য আমি পাইনি, তথাপি প্রায়ই সকালবেলা সেখানে গিয়ে বসে বসে নানারকম রোগীর সমাগম দেখতাম শুধু সময় কাটাবার জন্যই। ডাক্তারবাবু বাস করেন সপরিবারে, কিন্তু কম্পাউণ্ডার বাস করেন একা। স্ত্রী ও একটি মাত্র কন্যা গেছেন বাপের বাড়ীতে অনেক দিন। এত দিনে অবশ্য ফিরে আসা উচিত ছিল, কিন্তু মাইনে যা পান, তাতে করে চালানো দুষ্কর। আর দেশে বৃদ্ধা মায়ের পরিচর্য্যার জন্য একজনকে অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন। তাই আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধকল্ সইবার মতো শক্তি অর্জ্জন করতেই বিনোদবাবু স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মায়ের কাছে।

ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেলে প্রায়ই বিনোদবাবুর কোয়ার্টারে বসে গল্প করতাম। স্পষ্ট মনে পড়ে, আজও বিনোদবাবুর অমায়িক বন্ধুত্বের কথা। অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক, প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তি। যে সব নিরীহ ও নির্লিপ্ত লোক দেখে সাধারণতঃ করুণার উদ্রেক হয়, বিনোদবাবু তেমনি ক্ষুদ্র নন; এঁকে দেখলেই

কেন জানিনে এঁর সঙ্গে তুদণ্ড কথা কইতে ইচ্ছে করে হাতের কাজ ফেলে রেখে এবং তুচার দিন মেলামেশা করলেই এঁর দরদী অন্তরের কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

দেশের কাজের কথা উঠতেই বিনোদবাবু বলেন: কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে কাজ হবে বলে মনে হয় না আমার। কারণ আৰ্জিতে যতই যুক্তি দেখাই না কেন তার ফলে Boss কখনো চেয়ার ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন না। আর যেতে পারেন না যে! আমার দেশের টাকা দিয়ে যার সংসার চলে, তু'বেলা উনুনে হাঁড়ী চড়ে, সে কি এমনি আত্মঘাতী উদারতা দেখাতে পারে কখনো? তাহলে আমরাই যে তাকে বোকা বলবো।

সুযোগ পেয়ে গেলাম। মেদিনীপুরে বি ভি-র শাখা তো স্থাপিত হয়েছে বহু পূর্ব্বেই, যার ফলে পর পর তিনটি সাদা চাম্ড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হয়েছে। তাই মন্ত্র ছড়িয়ে যেতে ক্ষতি কি? শাখার সঙ্গে পরে সংযোগ স্থাপন করে দিলেই চলবে! প্রশ্ন করলাম: তাহলে কোন্ পথ আপনি সুপারিশ করেন?

বিনোদবাবু উত্তর দিলেন: শুধু সুপারিশ নয় দ্বিজেনবাবু, সে পথ একেবারে অব্যর্থ বলে মনে হয় দ্রোণাচার্য্যের তীরের মতো। কিন্তু তার কথা ভাবতেই যে আমার বুক কেঁপে ওঠে। বার্জ্জকে মারবার সময় আমি ছিলাম শহরে। খেলার মাঠেও গিয়েছিলাম সেদিন বেড়াতে বেড়াতে। সত্যিই, কষ্ট হলো বেচারাকে দেখে। একেবারে কুকুরের মতো গুলী খেয়ে পড়ে আছে রাস্তার ধূলোয়!......তাই ভয় হয় আপনাদের দেখে। জীবনের মায়া একেবারে করেন না।

কিন্তু কার্য্যতঃ ভয় আদৌ আর রইলো না। কেশিয়াড়ীতে কম্পাউণ্ডার বিনোদবাবুই হয়ে উঠলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অবিনাশ জমাদার এতে আপত্তি করলেন না, এল সি সুধীর তো আহ্লাদে আটখানা আর থানার অন্যান্য সিপাইরাও একবাক্যে বললো যে, কম্পাউণ্ডারবাবুর মতো আদমী লোক এ তল্লাটে আর নেই। শুধু গোপনে সংবাদ পেলাম যে, ক্ষীরোদ দারোগার এটা ভালো লাগেনি। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে ডেটিনিউ কেন মিশবে এত? ওরা তো কয়েদী!

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, দারোগা ও জমাদারের মনোমালিন্য আমি কাজে লাগাতে সুরু করলাম। ফলে, মাস চারেক কেটে যেতেই অবস্থা এমনি দাঁড়ালো

যে, ক্ষীরোদবাবু একবার মফঃস্বলে গেলেই ব্যস, সারা থানার মালিক তখন হয়ে বসি আমি। দিব্যি সন্ধ্যের পর থানার বারান্দায় বসিয়ে দিই তাসের আড্ডা কিংবা বিনোদবাবুর কোয়ার্টারেই রাত কাটিয়ে আসি, নইলে কোনো সিপাইয়ের সাইকেল নিয়ে গ্রামের মেঠো পথে খুসী মত ঘুরে বেড়াই। ঘুণাক্ষরেও দারোগার কানে যাবার আশঙ্কা নেই আর।

বিনোদবাবুর নামে এনভেলপে বিক্রমপুর থেকে পত্র আসে। তাতে সেখানকার সংবাদ পাই সবই—কী ভাবে কাজ চলছে, কোন্ গ্রামে বা স্কুলে টোপ ফেলতে পারা গেছে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা—আমিও তার জবাব লিখে পাঠিয়ে দিই একেবারে কলকাতায় মতি সাহার সঙ্গে। সেখানে চিঠিগুলো পোষ্ট হয়ে যায় ছোটকোনের মায়ের নামে। মতি সাহারই একমাত্র ফলের দোকান কেশিয়াড়ীতে। প্রতি সপ্তাহেই তাকে কলকাতায় যেতে হয় নানারকম ফল কিনে আনতে। বিনোদবাবুর মারফৎ তাকেও দলে টেনে নেয়া গেল।

আমার মাসিক ভাতা পঁচিশ টাকা প্রথম সপ্তাহেই আসতো নিয়মিতভাবে মেদিনীপুর আই বি অফিস থেকে মনিঅর্ডারযোগে। ১৯৩৫ সালের অবস্থা এখন কিন্তু কল্পনা করা কঠিন। সে যুগে ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করে কলকাতা শহরে খুব স্বচ্ছন্দে না হলেও বিনা দুঃখেই দিন কাটাতে পারতেন। একশো টাকা মাইনের বর সে যুগে অত্যন্ত মহার্ঘ মনে করা হতো।

আমার কিন্তু কিছুতেই চলতে চাইতো না। কি করে, কোথা দিয়ে সব টাকা শেষ হয়ে যেত তৃতীয় সপ্তাহেই। গিয়েই যে চাকরটা পাওয়া গেল, ব্যাটা একদিন আমার ফাউন্টেন পেন নিয়ে সরে পড়লো। তারপর জমাদার যেটাকে জুটিয়ে দিলেন, সেও একদিন চম্পট! ফলে, খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রায়ই বিভ্রাট লেগে যেত। জমাদারের বাড়ীতে এমনি খাওয়া ভদ্রতাসূচক দেখায় না বলেই হাট থেকে মাছটা, মিষ্টিটা কিনে পাঠিয়ে দিতে হতো। তাই হতো ব্যয়বাহুল্য। কিন্তু উপায় কী? জীবনে মেসে খাইনি, রান্নাও করতে জানিনে।

ক্ষীরোদবাবু মফঃস্বল থেকে প্রায় সাত-আট দিন পর ফিরে এসে আমার দুরবস্থার কথা শুনলেন। আমি দুবেলা অবিনাশবাবুর বাসায় খাই শুনে আমার অব্যবস্থার জন্য তাঁর দরদ যেন অকস্মাৎ একেবারে উত্তাল হয়ে উঠলো। বললেন: বলেন কি, আপনার চাকর পলাতক? তাহলে তো ভারী কষ্ট হচ্ছে আপনার—

বলতে চেষ্টা করলাম : না, না, কষ্ট কীসের ? অবিনাশবাবুর ওখানে বেশ যত্নেই তো থাচ্ছি একেবারে নিজের বাড়ীর মতো।

দারোগা কণ্ঠস্বর খাটো করে বললেন : দেখবেন, গৃহকর্ত্রী আবার আপনাকে বেশী আপনার না ভেবে বসেন। চেহারাখানা তো আপনার ভালো নয়, তাই সে আশঙ্কা—

বাধা দিলাম : না, না, ওকি কথা বলছেন, দারোগাবাবু! তবে হ্যাঁ, আদর-যত্ন খুব করেন বৌদি!

দারোগা হেসে উঠলেন।

তারপর রামভরসা সিংকে কোথায় পাঠিয়ে ডেকে আনালেন একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে। বললেন : দ্বিজেনবাবু, চাকর-বাকর এখানে কিছুতেই পাবেন না। আমরাই পাই না, পাই তো রাখতে পারি না। শালারা কোথাও দুদিন টিঁকে থাকে না। তার চাইতে এক কাজ করুন, এই মেয়েছেলেটিকে রাখুন। ভালো রাঁধতে পারে, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আপনি একা মানুষ, ওই সব কাজ করে দেবে। আর বাড়ী এই কাছেই, আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে কাজকর্ম সেরে রাত্রে বাড়ী চলে যাবে।—কি রে হরিমতী, থাকবি ডেটিনিউবাবুর বাসায় ?

দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। মুখখানা আধখানা ঘোমটায় ঢাকা। দারোগার প্রশ্নের জবাবে কোনো সাড়া না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লো। মনে হলো, ভারী লাজুক। কাজ হয়তো ভালই করবে, অন্ততঃ দারোগার ভয়ে না-ও পালাতে পারে।···কিন্তু মেয়ে রাঁধুনী—

বললাম : চাকর-বাকর কি এদেশে একেবারেই মেলে না দারোগাবাবু ?

হ্যাঁ, মিলবে না কেন,—দারোগা সোৎসাহে জবাব দিলেন : তবে কি জানেন, প্রায়ই দেখবেন গায়ে চক্করওয়ালা। রামমোহন ডাক্তারের ওখানে তো নিশ্চয়ই দেখেছেন এমনি অসংখ্য রোগী। ম্যালেরিয়া আর সিফিলিস, এই হচ্ছে এ দেশের বৈশিষ্ট্য!

আঁৎকে উঠলাম! সিফিলিস!···

দারোগা বলতে লাগলেন : তার চাইতে জানা লোক নেয়া অনেক ভাল। ভাবছেন বুঝি ঝি বলে। তাতে দোষ কী ? মিথ্যে বদনাম অন্ততঃ রাজবন্দীদের কেউ দিতে সাহস করবে না। আর করলেই কি আপনারা তাই কেয়ার করে চলবেন ?

সত্যিই তো, মিথ্যাকে কীসের পরোয়া ?···থানা কক্ষের অভ্যন্তরে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতেই দেখলাম অবিনাশবাবু তাঁর কোটর থেকে বেরিয়ে-আসা বড় বড়

চোখ দুটো মেলে যেন আমায় জালিয়ে দিতে চাইছেন রোদে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মুখে নারকেলের ছিবড়ের মতো।

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। ক্ষীরোদ দারোগার বক্তৃতার তোড়ে আর 'না' করবার সুযোগই পেলাম না। হরিমতী বহাল হয়ে গেল। ঘোমটা কমিয়ে স্মার্ট মেয়ের মতো এগিয়ে গেল সে আমার ঘরের দিকে। বোকার মতো চেয়ে রইলাম সেদিকে।

একান্ন

অদ্ভুত এই কেশিয়াড়ী গ্রামটি। এর ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি করুণ। পরিধি দুই বর্গমাইল হবে। এককালে ঘন বসতি ছিল। জটাধর সেনাপতির বাবা ছিলেন এই গ্রামের ডাকসাইটে জমিদার। তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে নাকি জল পান করতো। প্রকাণ্ড হাট, তখন সপ্তাহে বসতো তিন দিন। হাটের দিকের সুবিশাল দীঘিতে গদাধর জমিদার অসংখ্য পোনা ছাড়তেন। পশ্চিম দিকের বট গাছটার নীচে ছিল হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালার আখড়া। মাছ পাহারা দিত সে রাত্রিকালে সাত ব্যাটারীর টর্চ্চ জ্বালিয়ে। গদাধরের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ চলতো আর সাঁওতাল ও উড়িয়া প্রজাদের অন্ততঃ হাজারখানা পাতা পড়তো। গদাধর নিজে যেমন দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সমাদর করে খাওয়াতেন, তেমনি সালের খাজনা একটি পয়সা বাকি পড়লে বা জমির ধান একটি সের কম হলে খড়ম নিয়ে ধেয়ে আসতেন দোতলা থেকে। রক্তারক্তি কাণ্ড একটা হতোই বকেয়া খাজনা বা ধানের ব্যবস্থা না করলে। অথচ পুলিশ এতে নাক গলাতো না। গদাধরের দপ্তরখানার ফরাসে বসে টিনের পর টিন সিগারেট উড়ে যেত আর সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোও সব হয়ে যেত ধোঁয়া!

তারপর চাকা ঘুরতে লাগলো সেদিন থেকে যেদিন ম্যালেরিয়ার মশা এই অঞ্চলে প্রবেশ করে ডিম ছাড়তে সুরু করলো। পচা ডোবা, নালা, বাঁশঝাড়, ঝোপ-জঙ্গল একেবারে ছেয়ে গেল এ্যানোফিলিস মশার ডিমে। বারো মাস মড়ক লেগে রইলো ম্যালেরিয়ার। বাড়ীতে বাড়ীতে কান্নার রোল আর থামতে চাইলো না। ভয়ে আতঙ্কে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় করে, পুরুষানুক্রমে যারা বাস করে আসছে এই গ্রামে, তারা দলে দলে ভিটেমাটি ছেড়ে হারা-উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো শুধু বাঁচবার প্রত্যাশায়।

গদাধর সেনাপতি শুধু সরকারী ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে সেনাপতির মতোই যুদ্ধ ঘোষণা করলেন কালান্তক যম মশার বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারলেন না, ধরাশায়ী হলেন চিরদিনের মতো। মাত্র সাত দিনের জ্বরে বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

গদাধর বিদায় নেবার পর সুবিশাল দীঘিতে কচুরীপানা দেখা দিল, শেওলা জমতে লাগলো তার বিরাট ঘাটলায়। পাহারাওয়ালার আখড়া মুখ থুবড়ে পড়লো

মাটিতে। হাটে আর বেচাকেনা নেই। তিন দিন থেকে এখন হাট এসে ঠেকেছে দুদিনে। সেনাপতির বাড়ীর নাটমন্দিরে কবুতর আর চামচিকের রাজত্ব, দোলমঞ্চে জঙ্গল, সিংহদরজার পাট খসে পড়ে গেছে।···স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর প্রেমতোষ সেনের কাছ থেকে কেশিয়াড়ী গ্রামের এই মর্ম্মন্তুদ ইতিবৃত্ত শুনতে শুনতে কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময় ট্রের ওপর চায়ের কাপ আর খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো ভৃত্য। বিকেল তখন গোটা চারেক হবে, সুতরাং চা ও খাবারে আপত্তি থাকবার কোনো কারণ নেই। প্রেমতোষ কিন্তু বক্তৃতার সুযোগ পেয়ে তখনো বলে যাচ্ছেন: বর্ত্তমান অবস্থা হচ্ছে এই গ্রামে মৃত্যুর হার জন্মের চেয়ে বেশী অর্থাৎ যে হারে লোক মরছে, বছর দশেক পর এ গাঁয়ে থাকবে শুধু বাঁশঝোপ আর কাঁটা গাছ।

জিজ্ঞেস করলাম: কিন্তু ম্যালেরিয়া তাড়াবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট কী করছেন?

চেষ্টার তো ত্রুটি নেই। আমাদের যথাসাধ্য আমরা করছি।

চা খেতে খেতে নানারকম আলাপআলোচনা হতে লাগলো। আমার দেশ কোথায়, বাড়ীতে কে কে আছেন, কবে গ্রেপ্তার হয়েছি ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে একসময় রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। প্রেমতোষ বললেন: যাই বলুন দ্বিজেনবাবু, দুটো সাহেব মেরে দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা। কংগ্রেসের 'স্বদেশী পর' নির্দ্দেশ আমার খুব পছন্দ হয়। ওদের মালপত্র বয়কট করলেই ব্যাটারা ভাতে মরবে। তখন না পালিয়ে পথ থাকবে না।

কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের মতবাদ নিয়ে এঁর সঙ্গে কী আর তর্ক করবো! ছোরা-ছুরি বা খুন-জখমের কথা শুনলে সাধারণ মানুষ আঁৎকে উঠবেই। কিন্তু কী করে বোঝাবো এদের যে, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়। অস্ত্রোপচার যেখানে অপরিহার্য্য, সেখানে মিকশ্চারের ফাঁকা প্রবোধ কার্য্যকরী হবে কি করে? আর্জ্জির আঘাতে কাউকে কাবু করতে পারা গেছে বলে রাজনৈতিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না।······

অকস্মাৎ প্রেমতোষবাবু জিজ্ঞেস করলেন: রয়েল সার্কাস দেখতে যাননি দ্বিজেনবাবু?

চমকে উঠলাম। এ প্রশ্ন কেন? ক্ষীরোদবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই সার্কাস প্রায় রোজই দেখেছি আমি। স্যানিটারী ইনসপেক্টারকে দেখিনি সেখানে। পাল্টা প্রশ্ন করলাম: কেন আপনি দেখেননি?

না, ভাই। আমি গিয়েছিলাম সদরে। অনেকগুলো Adulteration-এর মামলা ছিল।—বলে মৃদু হেসে বলতে লাগলেন : আর দারোগাবাবুও তো ছিলেন না। কাজে কাজেই থানা তো আপনারই ছিল, কি বলেন ?

কি রকম ?

প্রেমতোষ বললেন : রকম আর কি! দারোগাবাবু না থাকলে কে আর আপনাকে বাধা দেবে বলুন ? কেন বাধা দিতে যাবে ? তা ভালোই করেছেন দ্বিজেনবাবু! এখানে সার্কাস হবে আর আপনি তা দেখতে পাবেন না, এ আমার ভালো লাগে না। কিন্তু কেমন সার্কাস বলুন তো ? দেখবার মত তো ?

বললাম যে, একেবারে গ্রাম্য নয়। তবে প্রায় খেলাই balancing-এর খেলা। টাকা-পয়সা বোধহয় তেমন পায়নি, কারণ দেখা গেল সবই বিনেপয়সায় দেখবার গ্রাহক। সার্কাসের গল্প হতে হতে প্রেমতোষ আরও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বসলো যে, জটাধর সেনাপতির তাসের আড্ডায় আমি যাই কিনা, সেখানকার অপূর্ব্ব পান ও দামী সিগারেট আমার ভাগ্যে জুটেছে কিনা। আফিম ভেণ্ডার গোপাল রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে কিনা, প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় পোষ্ট অফিসের মাষ্টার নীলরতন জানা কেমন লোক, কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী কবে আসছেন ইত্যাদি। এমনিভাবে প্রেমতোষের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে অকস্মাৎ মনে খটকা বেধে গেল, লোকটির ঔৎসুক্য এত বেশী কেন ? কারণ কী ?

সতর্ক হতে যাবো, এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। চেয়ে দেখি মাথার ওপর ঝোলানো রয়েছে পেতলের একটি মাঝারী আকারের ঘণ্টা, যেমনটি থাকে মন্দির-প্রবেশদ্বারে—দর্শনেচ্ছুরা ওটা বাজিয়ে দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন। দেখলাম, দোলকটির সঙ্গে সরু দড়ি বাঁধা, আর তার অপর প্রান্ত বেড়ার ফাঁক দিয়ে অন্দরের দিকে চলে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম : ও কি, ঘণ্টা কিসের প্রেমতোষবাবু ?

সহাস্যে জবাব দিলেন প্রেমতোষ এবং সগর্ব্বে : হার একসেলেন্সি কলিং। অর্থাৎ প্রায় সময়ই এখানে এত লোকজন থাকেন যে, শ্রীমতী প্রয়োজন হলে আমায় আর ডাকতেই পারেন না এখানে এসে। তাই ঘণ্টা করে দিয়েছি, দরকার হলেই দড়িতে টান দেয়—ভালো ব্যবস্থা হয়নি দ্বিজেনবাবু ?

এবার উচ্চৈঃস্বরে না হেসে পারা গেল না। বললাম : আপনি একজন অফিসার। আপনি এমনিভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকবেন বেয়ারাকে। আর তা

নয়, আপনাকেই তলব করবার জন্য এই ব্যবস্থা ? যাঁরা থাকেন, সবাই বেশ উপভোগ করেন না এই ঘণ্টাধ্বনি ?

প্রেমতোষ ছাগলের মতো হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন : কিন্তু কেমন অরিজিন্যালিটি বলুন তো ?—কিন্তু বসুন ভাই, এক মিনিট, আসছি। আমার বড় সাহেব নয়, বড় মেমের আহ্বান কিনা—বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টাটির দিকে আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করতে যেতেই নজরে পড়লো একখানা অক্টো ফটো—প্রেমতোষের আটরকম ভাবের অভিব্যক্তি। নানারকম মুখ-বিকৃতির মধ্য দিয়ে কি ভাব ফুটে বেরুচ্ছে, তা স্বয়ং প্রেমতোষ ব্যতীত আর কারুর পক্ষে বোঝবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হলো না। কিন্তু এই মুখবিকৃতির নিদর্শন এমনিভাবে সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘটা করে একেবারে বাইরের ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখে আত্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে অভিনেতার ক্ষুদ্র মনের যে পরিচয় পেলাম, আদৌ ভালো লাগলো না তা। অথচ, হয়তো এই রকম লোকদের সঙ্গেই এখানে কাটাতে হবে কয়েকটি বছর। ভাবতেই মনটা যেন কতকটা দমে গেল।......

পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। থানায় একবার হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে যে আমি বেঁচে আছি এবং পলায়ন করিনি। ক্ষীরোদবাবু নেই, সুতরাং সময়ানুবর্ত্তিতার কড়াকড়িও নেই।

অবিনাশবাবু দেখেই বললেন : আসুন, আসুন! রামভরসা সিং, ঐ চেয়ারখানা ডেটিনিউবাবুকে এগিয়ে দাও।

বসলাম। ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধু সুধীর এক পাশে বসে কি লিখছে। আর দরওয়াজা রামভরসা বারান্দায় একটু আড়ালে টুলের ওপর বসে পাহারায় রত। কিংবা বিড়ি টানছে। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন : আপনাকে তো মশাই একান্তে আর পাওয়াই যায় না। আর আজকাল হরিমতীর আদরযত্নে আমাদের কথা বোধহয় আর মনেই পড়ে না, তাই না দ্বিজেনবাবু ?

ভালো লাগলো না কথাটা! জিজ্ঞেস করলাম : আদরযত্ন মানে ? ঝি, মাসের শেষে পাঁচ টাকা মাইনে দিই, পেটের দায়ে খাটে, তার আবার আদরই বা কি, যত্নই বা কি ?

হেঁ হেঁ শব্দ করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলেন অবিনাশবাবু। লক্ষ্য করলাম সুধীরের অধরেও হাসির ঝিলিক। ভালো লাগলো না এবং আরও খারাপ লাগতে

লাগলো তখন, যখন অবিনাশবাবু সবিস্তারে, সবিল্লাসে, টীকা ও টিপ্পনী সহযোগে শ্রীমতী হরিমতীর গৌরবোজ্জ্বল অজ্ঞাত ইতিহাস বর্ণনা সুরু করলেন! যৌবনে হরিমতী ছিল এ তল্লাটের ক্লিওপেট্রা। শ্রীক্ষেত্রের মতো প্রসাদ বিতরণে কার্পণ্য ছিল না তার কোনো দিন এবং সেকালে গদাধর সেনাপতি থেকে সুরু করে গোপাল রায় পর্য্যন্ত সবাই একাধিক বার হরিমতীর গৃহে পদার্পণ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেছেন। তারপর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে গ্রাম যেমন ছারখার হয়ে গেল, তেমনি দীর্ঘদিনস্থায়ী রোগে উর্ব্বশী হরিমতীর যৌবনের বিভা অকালে নিষ্প্রভ হয়ে এল। ফলে পসার গেল কমে।···তারপর এলেন দারোগা ক্ষীরোদবাবু। ডুবুরির মতো রত্নটিকে খুঁজে নিতে অবশ্য তাঁর দেরী হলো না। এখন ক্ষীরোদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের সোল এজেন্সী নিয়েছে এই হরিমতী। অবিনাশবাবু বললেন: আপনার এখানে চাকরি হওয়াতে বেশ সুবিধেই হয়েছে দারোগাবাবুর। আর্জেন্ট অর্ডারগুলো বেশ তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় আর মালের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় সহজেই। কি বল সুধীর?

সুধীর টিপ্পনী কাটলো: তা—ডেটিনিউবাবুকেও কোন্ দিন বঁড়শীতে গেঁথে ফেলবে কে জানে!

জিজ্ঞেস করলাম: এ্যাদ্দিন বলেননি কেন?

বলবো কি মশাই! আপনি তো এখন ক্ষীরোদবাবুর কথাই বেদবাক্য মনে করেন। আমাদের মতো চুণোপুঁটি জমাদার আর সুধীরের মত চ্যাংটাকি এল সিকে তো আর চোখেই দেখতে পান না। কি বল সুধীর?—বলে অবিনাশবাবু আবার হাসতে লাগলেন।

দরওয়াজা এসে একখানা আর্জ্জি জমাদারের হাতে দিয়ে জানালো, বাইরে দুটো মরদ আর দুটো মাগী এসেছে দেখা করতে।

উঠে পড়লাম। ঘরে এসে বিছানায় সটান শুয়ে পড়লাম। জানালার ঝাঁপ তোলা ছিল। ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো আকাশ আর সেই টুকরোটুকুর মধ্যে আঁকা একখানি বেশ বড় চাঁদ। চাঁদের আলোয় চারিদিকের বাঁশ ঝোপ ও জঙ্গলের শীর্ষদেশ উদ্ভাসিত। দূরে কোথায় সাঁওতালদের মাদল বাজছে। থানার সীমানার বাইরে গোটাকয়েক ধানের ক্ষেতে চাঁদের আলো ঝিরঝির করে কাঁপছে। আমার বাগানে ফুটেছে অজস্র বেলফুল ও রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ আর যুঁই। চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছে। এমনি চাঁদ যেন অনেককাল দেখিনি আর এমনি ঝিরঝিরে হাওয়াও এত মিষ্টি লাগেনি।··· কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম ও

কখন চোখের পাতা জুড়ে এসেছিল জানি না, অকস্মাৎ হরিমতীর ডাকে চমক্ ভাঙ্গলো।

দাদাবাবু, খাবার দিয়েছি।

রান্নাঘরে বসবার যথেষ্ট জায়গা থাকলেও হরিমতী এ ঘরের মেঝেতেই আমার আসন পাততো। ও ঘরের কালিঝুলির মধ্যে নাকি আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। মাটির মেঝে পরিপাটি করে নিকিয়ে নিয়ে আসন পেতে দিয়েছে। খাবার জলের গ্লাসটি একখানা রেকাবি দিয়ে ঢাকা, তার ওপর নুণ, লেবু ও কাঁচা লঙ্কা। থালার মাঝখানে ভাত, সযত্নে একেবারে নিখুঁত এভারেষ্ট তৈরী করা হয়েছে। আশেপাশে কয়েক রকমের ব্যঞ্জন। আমি বসতেই হরিমতী পাখাখানা হাতে তুলে নিল।

বললাম : হাওয়ার দরকার নেই।

কিন্তু সে শুনলো না। একটু পর বললো বেশ মিষ্টি করে : বাড়ীতে থাকলে মা হয়তো এমনি করে বসে বসে খাওয়াতেন।

চুপ করে রইলাম। কথাটা মিথ্যে নয়। আমার খাবার সময় যেখানেই যে কাজেই থাকুন না কেন, মা ছুটে আসতেনই।···একটু পরে হরিমতী বোধহয় আমার নীরবতায় সাহস সঞ্চয় করে মুচকি হেসে পাখা নাড়তে নাড়তে বললো : আর বিয়ের পর হলে বৌদি এমনি করে—

বাধা দিলাম : যাও, তুমি খেয়ে নাও, রাত দশটা বেজে গেছে। বাড়ী যাবে না?

পাখা রেখে উঠলো হরিমতী, বললো : না বাবু। দারোগাবাবু নেই, মা ঠাকরুণের একা ভয় করে। সেখানে আজ থাকতে হবে।

হরিমতী বেরিয়ে গেল। মনে পড়লো অবিনাশবাবুর কথা, সোল এজেন্সী নিয়েছে হরিমতী!······

আহার শেষ করে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, জলের ঘটি নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি তোয়ালে হাতে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। মুখ মুছে ঘরে এসে দেখি ভাজা মশলার ডিবে নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে হরিমতী। বিছানায় গা এলিয়ে দিতে গিয়ে দেখি সারা শয্যায় ছড়ানো অজস্র বেলফুল ও রজনীগন্ধা!······

খাওয়াদাওয়া সেরে বাসনকোসন মেজে কখন যে সে রান্নাঘরে তালা বন্ধ করে ফেলেছে, টেরও পাইনি। চুপ করে চোখ বুজেই শুয়েছিলাম। কতক্ষণ ছিলাম

জানিনে। অকস্মাৎ মনে হলো কে যেন আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। টেবিলের ওপর স্তিমিত-করা আলোকেও বুঝতে দেরী হলো না যে সে আর কেউ নয়, হরিমতী।

ধমকা দিলাম : কী চাও ?

সে কিন্তু এতটুকুও ভয় পেলো না, বললো : না, দেখছিলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। মশারিটা ফেলে দোব ?

না, আমিই নোব'খন ফেলে, তুমি যাও।

চলে যাবার সময় সে বার বার করে সাবধান করে দিয়ে গেল, মশারি শুধু ফেললেই চলবে না, ভালো করে গুঁজে নিতে হবে। কারণ এখানে সাপের উপদ্রব নাকি ভয়ানক বেশী। ফুলের গন্ধে খাটের পা বেয়ে বিছানায় উঠে পড়াও বিচিত্র নয়। আমার মাথার দিব্যি রইলো, দাদাবাবু!—বলে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু আমার জন্য হরিমতীর আদর ও যত্ন, চিন্তা ও ভাবনা এবং অবশেষে মাথার দিব্যি দিয়ে যাওয়া—একটু বেশী মনে হয় নাকি ? কোনো প্রভুর জন্যই কি কোনো ভৃত্য এতখানি ভেবে থাকে, না এতখানি করে থাকে ? পাঁচ টাকার বিনিময়ে এ যে পাঁচশো টাকার সওদা! সুধীরের টিপ্পনী মনে পড়লো, অবশেষে ডেটিনিউ বাবুকেও না গেঁথে ফেলে বঁড়শীতে!···ঘিন ঘিন করে উঠলো সারা শরীর! তখনই স্থির করে ফেললাম, কালই বিদায় করে দোব বেটীকে। রান্না করবো নিজের হাতেই, নইলে মুড়ি খেয়ে থাকবো। কিন্তু দরজায় খিল আঁটতে গিয়ে দেখি, পাশে দাঁড়িয়ে হরিমতী!

সত্যিই রেগে গেলাম : আবার তুমি! কী চাও ? এই না চলে গেলে দারোগাবাবুর বাড়ীতে ?

সীমাহীন বিনয় প্রকাশ করে জবাব দিল সে : হ্যাঁ বাবু, গিয়েছিলাম। আবার ফিরে আসতে হলো। মা ঠাকরুণ আপনাকে একবার যেতে বলেছেন এখনই।

চমকে উঠলাম : এ্যাঁ, বল কি ? মা ঠাকরুণ, মানে ক্ষীরোদবাবুর স্ত্রী ? দূর্, আমায় ডাকবেন কেন ? তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই। তারপর আজ নেই দারোগাবাবু। আর এখন রাত এগারোটা পার হয়ে গেছে।—যাও এখন।

হরিমতী তবু বললো : কিন্তু তিনি যে বললেন খুব বিশেষ দরকার। একবার চলুন না দাদাবাবু!

কেন ?

তা তো কিছুই বলে দেননি। শুধু বলে দিয়েছেন, বলিস্, খুব জরুরী।

জরুরী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলে হরিমতী আর অপেক্ষা না করে ঘরে ঢুকলো। টেবিলের ওপর ছিল বড় তালাটা আর বালিশের তলায় চাবী। নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। দরজায় তালা লাগাবে।

গুলিয়ে গেল মাথাটা। রাত দুপুরে অপরিচিতা মহিলার জরুরী আহ্বান ? কেন ? কী প্রয়োজন তাঁর থাকতে পারে আমার সঙ্গে ? দারোগার অনুপস্থিতিতে সে বাড়ীতে যাওয়া বিসদৃশ নয় কি ? ঔৎসুক্য জেগেছে আমার মনে, কিন্তু সঙ্কোচেরও কমতি নেই, এমন সময় হরিমতী আমার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে বললো : চলুন।

এক পা এক পা করে তাকে অনুসরণ করতে হলো। অবিনাশের শয়নকক্ষের জানালায় দৃষ্টিক্ষেপ করলাম, অন্ধকার। ইনস্‌পেকশন বাংলোও অন্ধকার, তালা বন্ধ। ক্ষুদ্র মাঠ অতিক্রম করে এসে এ বাড়ীর দরজায় পৌছলাম। হরিমতী আবার বললো : আসুন, দাদাবাবু!

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একেবারে ক্ষীরোদ দারোগার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করলাম কতকটা সম্মোহিতের মতো ! অকস্মাৎ চমক ভাঙ্গলো, যখন দেখলাম উনিশ-কুড়ি বছরের একটি সুন্দরী যুবতী মাথা নুইয়ে আমায় প্রণাম করছেন ! পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে তিনি বলে উঠলেন : আসুন দাদা, বসুন !

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো !

দাদা !……

সত্যি, দাদা সম্বোধন করেই সুরু করলেন ক্ষীরোদ দারোগার স্ত্রী। বলতে লাগলেন তাঁর পারিবারিক ইতিহাস···বৃদ্ধ পিতা বাতব্যাধিগ্রস্ত হলেও যশোহরে কোন্ গ্রাম্য মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে আজও ট্যাঙ্গস ট্যাঙ্গস করে হেডমাষ্টারী চালিয়ে যাচ্ছেন। করুণাপরবশ হয়ে নয়, স্কুল কমিটি অপরিহার্য্য বিবেচনা করেই এই বৃদ্ধকে কিছুতেই বিদায় দেবার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। কারণ এঁর পরিত্যক্ত আসনে বসবার মত যোগ্য ব্যক্তি আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবার। উপচে পড়ে না, চলে যায়। দিদির বিয়েতে ক্ষীরোদবাবু আসেন অন্যতম বরযাত্রী হয়ে। চা ও জলখাবার পরিবেশনের ভার পড়ে বোনের ওপর। ক্ষীরোদবাবু এঁকে পছন্দ করে বসেন। বৃদ্ধ বাতব্যাধিগ্রস্ত অসহায় শিক্ষক আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। দিদির বিয়ের আলপনা শুকোতে না-শুকোতেই সাত দিনের মধ্যেই বোনের বিয়ের শাঁখ বেজে উঠলো। ক্ষীরোদ-বাবু তখন মাত্র এল সি।

পিতৃকুলের পরিচয় দেবার পর এবার মহিলাটি সুরু করলেন স্বামীর ইতিবৃত্ত। বাধা দিতে গেলাম, কারণ এতে আমার লাভ-লোকসান কিছুই নেই, কোনো সম্পর্ক নেই। পারিবারিক কূটনৈতিক ক্লেদাক্ত পরিবেশের অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করি আমরা। কাদায় বাস করি, কিন্তু গায়ে কাদা লাগে না! কিন্তু কোন বাধা মানলেন না তিনি। বেদনাহত কণ্ঠে বলতে লাগলেন: আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার দাদার মতো। হরিমতীর কাছে শুনেছি দাদার মতোই আপনি সাদা ফুল খুব ভালোবাসেন। তাই দাদা বলেই ডেকেছি আপনাকে। হয়তো সেটা হয়েছে আমার স্পর্দ্ধা, আপনাদের মতো দেশের সুসন্তানের বোন হবার যোগ্য আমি নই।

মহিলাটির কণ্ঠ ভেঙ্গে পড়লো। বললাম: না, না, ও কি বলছেন আপনি? আপনার যোগ্যতা আপনি কেন বিচার করবেন? সে ভার থাক্ আমার ওপর। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো?

একটু অপেক্ষা করুন, আসছি।—বলে তিনি হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়। হরিমতী আমায় পৌঁছে দিয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় তার খোঁজেই গেলেন। কিন্তু ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল! বাড়ীর কর্ত্তার অনুপস্থিতিতে গভীর

রাত্রে তাঁর নিভৃত কক্ষে তাঁর যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে যতই বেদ বা উপনিষদ আলোচনা হোক না কেন, কখনও কেউ এর ভালো অর্থ করবে না! ক্ষীরোদ দারোগার কানে যাবেই সোল এজেন্ট হরিমতী মারফৎ, তারপর কে জানে ব্যাটা আমার নামে বিশ্রী একটা বদনাম দিয়ে ডায়েরী করেই ফেলবে কিনা—

উঠতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ফিরে এলেন ক্ষীরোদগৃহিণী। অনুচ্চকণ্ঠে বললেন: দেখে এলাম হরিমতী ঘুমিয়েছে কি না। ঘুমিয়েছে।—দাদা, এই মেয়েলোকটাই নষ্ট করলো আমার স্বামীকে। মফঃস্বলে গিয়ে যা করেন, তা তো আর চোখে দেখতে হয় না। কিন্তু ফিরে এলেও প্রায়ই এই বেটী তাঁকে নিয়ে যায় গভীর রাত্রে সাঁওতাল পাড়ায়।

প্রশ্ন করলাম: কখন?

রাত্রে। আপনার ওখানকার কাজ সেরে আপনি মনে করেন হরিমতী বুঝি লক্ষ্মী মেয়ের মতো তার বাড়ীতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়ী যায় না। এখানে চলে আসে। আমি জেগে থাকলে বেশী কথা হয় না। একটা কাজের অছিলা দেখিয়ে 'অফিসে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসবো' বলে দুজনে বেরিয়ে যান। আর আমি যদি ঘুমিয়ে থাকি, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। নিঃশব্দে দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে চলে যান। রাত শেষ হবার পূর্ব্বক্ষণে যখন ফিরে আসে, তখন ঘুমিয়ে থাকলেও আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় তাঁর মুখের বিশ্রী গন্ধে আর জড়ানো ভাষায় অশ্লীল গালি-গালাজে। দাদা, দেশের ও দশের উপকার করবার ব্রতই আপনারা গ্রহণ করেছেন জানি। আমার মতো নগণ্য বোনের একটা উপকার করবেন?

মহিলাটির কণ্ঠে অশ্রুসজল আবেগ। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে পারা কঠিন, নির্দ্দয়তা মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম: কী উপকার বলুন তো?

তিনি বললেন: আপনি একটু জোর দিয়ে ওঁকে বলবেন এই সব নোংরা স্বভাব ছাড়বার জন্য? আপনাকে ভয় করেন উনি।

ভয়!—জিজ্ঞেস করলাম: ভয় করবেন কেন?

এবার হেসে ফেললেন মহিলাটি: উনি বলেন আপনারা নাকি কথায় কথায় রিভলভার চালান। শুধু উনি কেন, স্বয়ং গভর্ণমেণ্টও আপনাদের ভয় করে আর সেই জন্যই ধরে রেখেছে তারা।

হেসে বললাম: মিথ্যে বদনাম। এতে কান দেবেন না আপনি। আমার রিভলভার থাকলেও চুরি-করা রিভলভার, লুকোনো থাকে আর দারোগাবাবুর

রিভলভার শোভা পায় তাঁর বেল্ট-এ। তারপর ছুটো রাইফেল আছে থানায়।—সে কথা যাক্। কিন্তু ক্ষীরোদবাবুকে আমি কি ভাবে বলবো?

যেভাবে বললে কুপথ উনি ছেড়ে দেন, কুখাদ্য ছেড়ে দেন। আপনাকে বেশী আর কী বলবো? আপনি আমার দাদার মতো, ছুঃখিনী বোনের জীবনটা যদি বাঁচিয়ে দিতে পারেন······

একটু পর চলে এলাম নিজের ঘরে। ভারী লাগছিলো মন!···মশারির মধ্যে এসে গেছে চাঁদের আলো। বালিশের পাশেই অজস্র রজনীগন্ধা আর বেলফুল। সত্যিই, সাদা ফুল ভারী ভালবাসি আমি। হরিমতী ছড়িয়ে রেখে গেছে। ক্লিওপেট্রার রূপের দেয়ালী নিভে গেছে, কিন্তু মনের আগুন এখনো জ্বলছে গন গন করে। তাই শীকার দেখলেই সে আগুনের শিখা লক লক করে ওঠে। কিন্তু এ্যাসবেস্টসের সাক্ষাৎ বোধহয় পায়নি সে! এবার পেল।······বেটীকে কালই বিদায় করে দিতে হবে।

কিন্তু ঘুম এলো না সহজে। ছুঃখিনী বোনের কথা বার বার মনে হতে লাগলো। জীবনে এঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, এখান থেকে চলে যাবার পর সারা জীবনে দ্বিতীয় বার হয়তো দেখা হবে না। কিন্তু কতখানি দুঃখ পেলে যে এমনি নিতান্ত অজানা ও অনাত্মীয় লোককেই এঁরা পরম সুহৃদ বলে মনে করেন এবং তার কাছেই ব্যর্থ জীবনের অশ্রুসজল ইতিহাস নিবেদন করে সকাতর সাহায্য প্রার্থনা করে বসেন, মর্ম্ম দিয়ে তা অনুভব করতে লাগলাম। হয়তো এঁর জীবনের শেষ আশার প্রদীপটুকুও নিবে গেছে মাতাল ও দুশ্চরিত্র স্বামীর নির্দ্দয় অত্যাচারে। নীরবে সইতে হচ্ছে অবমাননার কশাঘাত। তাই মজ্জমানের মতো তৃণখণ্ডকেই জাপটে ধরতে চেষ্টা করছেন বাঁচবার আশায়। কিন্তু আমি জানি, কাঁচের বাসনের মতো ভেঙ্গে পড়বে এঁর সর্ব্বপ্রয়াস অপদার্থ স্বামীর উৎপীড়নে। কোনো পথ নেই রেহাই পাবার! ধুধু-করা দিগন্তপ্রসারী জীবন-মরুতে একটুখানি ওয়েসিসের সন্ধানে বাংলা দেশের এমনি কত ছুঃখিনীই যে দিশেহারার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সর্ব্বহারা কত বোনই যে এমনি নিরুপায় ভাইয়ের পায়ের তলায় একটুখানি সান্ত্বনা খুঁজে মরছে, পারিবারিক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে এমনি কত দীর্ঘশ্বাস ও আকুতিই যে গুমরে গুমরে মরছে, কে তার সংবাদ রাখে! 'পতি পরমগুরু' এই হিটলারী অনুশাসনের যূপকাষ্ঠে কত নিরীহ নারীই যে নীরবে আত্মোৎসর্গ করছে, সমাজের কল্যাণকামীদের তা জানবার আগ্রহ কোথায়?·····

পরদিন ভোরেই হরিমতী এসে সতর্ক করে দিল আমার পরম সুহৃদের মতো: বাবু, কাল রাতের খবর দারোগাবাবু যেন জানতে না পারেন। তাহলে মা ঠাকরুণের আর রক্ষে রাখবেন না। বড্ড বদ্‌রাগী লোক কিনা।

কথার জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। মনে মনে বললাম: কী আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী রে! সতর্ক করে দিতে এসেছেন! অথচ জানি সবার আগে এই বেটীই গিয়ে লাগিয়ে আসবে ওর মালিকের কানে।

সার্ট গায়ে দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, বাধা দিল হরিমতী: সে কি, কোথায় যাচ্ছেন দাদাবাবু, আমি যে চায়ের জল চাপিয়ে এলাম। পরোটা আর হালুয়া করে দিই?

গম্ভীরমুখে জবাব দিলাম: বিনোদবাবুর ওখানে চা খাবার নেমন্তন্ন আছে।

বিনোদবাবুর ওখানে ষ্টোভে চা তৈরী হলো, সঙ্গে তেলমুড়ি। এমনি নিশ্চিন্ত অবসর, তাতে চা, সুতরাং চায়ের বাটিতে ঝড় উঠবেই। গত রাত্রের উপন্যাস বিবৃত করলাম। বিনোদবাবুও বললেন হরিমতীকে তাড়িয়ে দিতে। ষ্টোভে ডিমের ডালনা আর ভাত তাঁর ওখানেই দুবেলা বেশ চলে যেতে পারবে জানিয়ে দিলেন। একটা চাকরও মিলে যেতে পারে। অবিনাশবাবুকে জানাতে বললেন। আলোচনায় স্যানিটারী ইনসপেক্টার প্রেমতোষও এসে পড়লো। বিনোদবাবু অনেক দ্বিধা ও সঙ্কোচ করে বললেন যে, ঐ ব্যাটাই দারোগার একমাত্র পরম নিষ্ঠাবান টিকটিকি। গাঁয়ের প্রত্যেকটি সংবাদ সম্রাট-সমীপে নিবেদন না করলে মোসাহেব ব্যাটার পেটের ভাত হজম হয় না! বললেন: আপনাদের বলতেও ভয় করে দ্বিজেনবাবু, হয়তো বেচারাকে শেষ পর্য্যন্ত মেরেই বসবেন দু ঘা।

ঘণ্টাখানেক পর বাসায় ফিরে দেখি শোবার ঘরে শেকল তোলা, রান্নাঘরেও। রামভরসা বললো যে, এইমাত্র দারোগাবাবু এসেছেন, হরিমতী তাঁর বাসায় গেছে।······নিশ্চয়ই বেটী সব জানিয়ে দিতে গেছে! এদিকে হরিমতী আর ওদিকে প্রেমতোষ। দুটিতে মিলে আমার কেশিয়াড়ীর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে নাকি?······সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না, আসরে নেমে পড়তে হলো। শোবার ঘরে ও রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আবার। উনুনের ওপর তখন ডাল ফুটছিলো। যাক্‌, পুড়ে যাক্‌।

বিকেল পাঁচটায় থানায় ফিরে এসে আর দেখতে পেলাম না হরিমতীকে। দারোগাও কিছুই জানেন না, এমনি ভাব দেখালেন। আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম,

সবই জানেন ক্ষীরোদবাবু, সবই বুঝেছেন। দেখলাম দারোগার মুখখানা বেশ গম্ভীর, বর্ষাকালের গুমোটের মতো। তবুও একটু পরখ করবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম: কাল কদ্দূর গেছলেন?

লিখতে লিখতেই জবাব দিলেন: তা প্রায় কণ্টাইয়ের কাছে।

ওখানে ডাকবাংলো আছে বুঝি?

বললেন: আছে কণ্টাই রোডে। কিন্তু আমি গেছলাম গাঁয়ের মধ্যে।

মহা ভাবনার কথা যেন, এমনি ভাব দেখিয়ে বলতে লাগলাম: তাহলে তো ভারী কষ্ট হয় আপনাদের। রাত্রে ঘুমোবার ভালো জায়গা না পেলে এমনি সারা মাস কী করে মফঃস্বল করে বেড়াবেন? তারপর শত হলেও বাঙালী তো, সারাদিন খাটুনির পর একটু ঝোল-ভাত না হলে কি করে চলে? চৌকিদার আর দফাদার সে সব ব্যবস্থা কোত্থেকে করবে?

চুপ করলাম, কিন্তু ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া এল না। ক্ষীরোদ দারোগার কলম চলতে লাগলো খচ্ খচ্ করে। ভেতরে অবিনাশবাবুকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পেন্সিলটা কিন্তু থেমে গেছে। এদিকে চেয়ে আছেন।

ফোস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম: সত্যি, গ্রাম্য থানার দারোগা-বাবুদের মফঃস্বল ঘোরার কাজটা ভারী বিশ্রী! কি বলেন?

কিন্তু কিছুই বললেন না ক্ষীরোদ দারোগা। মুখ তুলেও একবারটি চেয়ে দেখলেন না। গতরাত্রির দুঃখিনী বোনের কথাটা মনে পড়ে গেল······আপনি একটু জোর দিয়ে ওঁকে বলবেন······কী হয় এখনই যদি বলে বসি? কী করবে ও? টেবিলের ওপর খাপে-আঁটা যে রিভলভারটা পড়ে রয়েছে, সেটা তুলে নেবে? কিন্তু তার পূর্ব্বেই যে আমি ঘুসি মেরে ওর নাকটা থেঁতলে দোব! নাকের রক্তধারা মুছতে যেতেই আমিই তুলে নোব রিভলভারটা। প্রয়োজন হলে ট্রিগার চালাতেও বাধবে না।······রাগ হচ্ছিলো খুবই। সারা রাত বদমাইসি করে এসে কেমন এখন সাধু সেজে ডায়েরী লেখা হচ্ছে!······কিন্তু আবার মনে হলো, রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে গেলে আমার দুঃখিনী বোনের দুঃখ দূর করায় সাহায্য হবে কি?

তাই কথা পাড়লাম: হরিমতী আজ চলে গেছে দারোগাবাবু। দুপুরে বিনোদবাবুর ষ্টোভেই কাজটা সেরে নিয়েছি, কিন্তু রাত্রে কি করবো ভাবছি।

হরিমতীর প্রসঙ্গ উঠতেই মৌনতা ভঙ্গ করলেন দারোগা: আমি তো শুনলাম, হরিমতীকে আপনি তাড়িয়ে দিয়েছেন বদমাইস বলে। আপনার সঙ্গে কি

বদমাইসি করলো, তা অবশ্য আপনিই ভালো জানেন। কিন্তু চাকর-বাকর পাওয়া এখানে ভারী মুস্কিল!

বললাম: মফঃস্বলে তো প্রায়ই যান আপনি। একটা ধরে-টরে আনুন না। তবে হরিমতীর জায়গায় আবার কোনো শ্রীমতীকে এনে বসাবেন না যেন, দেখবেন। —আচ্ছা, হরিমতী কী সব বলে গেছে আপনাকে? আমার নামে বুঝি খুব নিন্দে করে গেছে?

ক্ষীরোদ দারোগার কণ্ঠ একটু রুক্ষ শোনালো: তা করবে না? ঘরে তালাবন্ধ করে চলে গেলেন, অথচ ঐ বেচারী যে কি খাবে, তার ব্যবস্থা করে যাননি। আপনার না হয় বিনোদবাবু আছেন, ওর কে আছে?

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কেন, আপনিই তো আছেন ওর জীবন-যৌবনের সোল প্রোপ্রাইটর!—কিন্তু সামলে নিলাম, বিশেষ করে দেখলাম, অবিনাশবাবু দূর থেকে বার বার ইসারা করছেন চুপ করে যেতে।

ক্ষীরোদ দারোগা কিন্তু চুপ করে থাকলেন না। আমার মৌনতায় আস্কারা পেয়ে বলতে লাগলেন: হরিমতীর মতো ভালো মেয়ে এই তল্লাটে নেই। আর আপনি কিনা তাকে বদমাস বলেছেন। ডেটিনিউবাবুরাও যে সবাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সে কথা জোর করে বলতে পারেন কি? রাত বে-রাতে তারাই বা কি করে বেড়ায় কে জানে!

চট্ করে মাথায় খুন চেপে গেল, কিন্তু অপরিসীম চেষ্টায় টেনে নামিয়ে আনলাম ব্যারোমিটারের পারাটাকে দুঃখিনী বোনের কথা মনে করে। জোর দিয়ে বলতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি, রিভলভার দিয়ে গুলী করতে তো বলেননি।

ক্ষীরোদ এতে যেন আরও আস্কারা পেয়ে গেলেন। এবার তাঁর কথাগুলো যেন আস্পর্দ্ধা মনে হতে লাগলো: গভর্ণমেণ্ট আপনাদের থানায় রেখেছেন আর আমাদের বলেছেন আপনাদের ওপর নজর রাখতে। কিন্তু আমি তো জানি, আমি না থাকলেই আপনি অনেক রাতে বাড়ী ফেরেন, সার্কাস দেখতে যান বা তাস খেলতে যান এবং সবাই ঘুমুলেও আপনার রাত্রির কাজ শেষ হয় না। কে যে কতখানি জিতেন্দ্রিয়, জানা আছে আমার ভালো করেই।

নাঃ, সহ্যেরও একটা সীমা আছে! ভালো করেই ব্যাটাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি দ্বিজেন গাঙ্গুলী, ক্ষীরোদের মতো কুকুরদের ফুসফুস ফুটো করে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করি না! ফস্ করে টেনে নিলাম ক্রসবেল্টসহ রিভলভার,

খুলেই ফেলেছিলাম খাপটা, কিন্তু এমন সময় সিপাইয়ের ব্যারাক থেকে হল্লা করে বেরিয়ে এল একজন সিপাই। গেটের পাশে আতা গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একটা বিরাটাকার হনুমান।—খেলো, খেলো, সবগুলো কাঁচা আতা শেষ করে ফেললো!

সিপাইয়ের চীৎকারে হনুমানজী কিন্তু এতটুকুও বিচলিত নন, একটার পর একটা আতা ছিঁড়ে দাঁতে কেটে ফেলে দিতে লাগলেন পরম তাচ্ছিল্যভরে।

আবহাওয়াটা মুহূর্ত্তে যেন একেবারে জল হয়ে গেল। ক্ষীরোদ দারোগা জিজ্ঞেস করলেন হেসে: কি, হনুমানটাকে মারবেন নাকি?

আমার হাতে তখন খোলা রিভলভার! হেসে জবাব দিলাম: আমার রিভলভারের নিশানা কিন্তু অভ্রান্ত।

বাজী ধরে বসলেন তিনি: এত দূর থেকে কিছুতেই পারবেন না। আর ওটা যা লাফানো স্বরু করেছে ডাল থেকে ডালে।—বেশ, যদি এক গুলীতে পারেন, তাহলে কাল বিকেলে মাংস পোলাও খাওয়াবো, আর যদি না পারেন—

দারোগাবাবুর কথা আর শেষ হলো না, আমার নিক্ষিপ্ত গুলীতে বিদ্ধ হয়ে হনুমানটা হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল এবং একটু নড়েই একেবারে অনড় হয়ে গেল।

এবার হাসলেন ক্ষীরোদ দারোগা, বললেন: আপনি একটি ডাকাত!

হাসাহাসি পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর দারোগাবাবু আবার চলে গেলেন মফঃস্বলে। কোথায় ডাকাতি হয়েছে। বেশ বুঝতে পারলাম, আজ আবার চলবে সারারাত একটানা মদ্যপান ও বদমাইসি। এই ব্যাধি ওর জীবনে সারবে না, সারতে পারে না।······

অবিনাশবাবুকে একটা চাকর সংগ্রহ করে দেবার অনুরোধ জানাতেই তিনি বললেন: নটবর নামে একটা ভালো ছেলেকে কাল থেকে লাগিয়ে দোব আপনার ওখানে। বয়স একটু কম। তাহলে কি হবে, কাজে খুব পাকা। আর চোর নয়। দুপুরটা যা হোক করে তো কেটেছে, এ রাতটা গরীবের বাড়ীতেই না-হয় দুটো ডালভাত—কাল তো মাংস পোলাওএর ব্যবস্থা হয়েই রইলো।

রাত হতে তখনো দেরী আছে। দুটো গেম ব্যাডমিণ্টন খেলে নেয়া যাবে। ডাক্তারখানার মাঠে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়। আমি এসেই এটা প্রবর্ত্তন করেছি। মাসে এক টাকা করে চাঁদা, র‍্যাকেট নিজের। ব্যাডমিণ্টন খেলায় বরাবর আমার

সুনাম ছিল আর কেশিয়াড়ীতে এমনিভাবে জমিয়ে তুলেছিলাম এই খেলার আড্ডা যে, জটাধর সেনাপতিও উৎসাহী হয়ে মাঝে মাঝে খেলতে আসতেন। খেলার পর চলতো এন্‌তার পান ও সিগারেট, তারপর সন্ধ্যে হতেই তাস। ব্রিজ। রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। পান, সিগারেট ও ব্রিজের পেছনে একটু ইতিহাস আছে, তা বলছি পরে।

আজ কিন্তু মাঠে এসেই আমার মাথায় খুন চেপে গেল। প্রেমতোষ এসেছে, খেলছে সিঙ্গলহ্যাণ্ড বিনোদবাবুর সঙ্গে। খেলা ঘুচিয়ে দোব আজ! সার্কাস দেখতে যাবার কথা এই শালাই লাগিয়েছে দারোগার কাছে!······নতুন করে দল গঠন হলো—আমি একা আর ওরা দুজন। কি জানি কেন, আজ আর কেউ এলেন না। না জটাধর সেনাপতি, না গোপাল রায়, না সুধীর। ভালোই হলো, র‍্যাকেট আর ছাড়তে হলো না। দেখলাম, এই হচ্ছে সুযোগ! ক্ষীরোদ দারোগা চলে গেছেন মফঃস্বলে। থানায় রাজত্ব করছেন এখন অবিনাশবাবু, অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা আমার পক্ষে। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ!

নিরীহ বিনোদবাবু প্রথমটা বুঝতেই পারেননি ব্যাপারটা। খেলা শেষ হতেই আমি ডাকলাম প্রেমতোষকে: প্রেমতোষবাবু, পালাবেন না যেন সাইকেলে করে—নামুন। আপনার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে।

সাইকেলখানা ডাক্তারখানার বেড়াতে ঠেস দিয়ে রেখে এগিয়ে এলেন স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টর স্মার্ট বয়ের মতো।

কি, বলুন।

ভূমিকা করে কী হবে আর? তাই সোজাসুজি আসল কথা পাড়লাম। দেখা গেল, ঠিক জায়গায় ঘা পড়েছে। প্রথমটা তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন, বক-ধার্ম্মিকের মতো ভালো ও সুন্দর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা সুরু করলেন, তারপর দ্বিতীয় বার ধমক খেয়ে তাঁর ওজস্বিনী ভাষা যেমন হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে গেল, তেমনি কণ্ঠেও যেন ঘড় ঘড় করে উঠলো নিউমোনিয়ার শ্লেষ্মা। তৃতীয় বার ধমক দেবার পর প্রেমতোষ একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়লো। আমার হাতে ধরে ক্ষমা চাইবার জন্য এগিয়ে আসতেই আমি কসে বসিয়ে দিলাম বাঁ গণ্ডে বেশ ভারী একটি চপেটাঘাত। সামলাতে না পেরে প্রেমতোষ মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো সে এবং ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ইংরেজী ও বাংলা বুকনি ঝেড়ে যা বললো তার সারাংশ হচ্ছে যে, পরদিনই সে যাবে এস ডি ও-র কাছে, তাঁকে সব জানিয়ে গ্রেপ্তার করাবে আমায়, জেলে পাঠাবে আমায়। এমন কি ফাঁসীও

হয়ে যেতে পারে   আমার আর রক্ষে নেই, কারণ এত বড় একজন সরকারী অফিসার—

Shut up, you rascal! সরকারী অফিসার! চামচিকে আবার পাখী! জুতো মেরে তোর মুখ ভেঙ্গে দোব।—বলে স্যাণ্ডেল নিয়ে ধাওয়া করতেই বিনোদবাবু ছুটে এসে তুহাতে জড়িয়ে ধরে ফেললেন আমায়: থামুন, দ্বিজেনবাবু, থামুন। রাগে আত্মহারা হবেন না।

আত্মহারা আদৌ হইনি। সরকারী ময়ূরপুচ্ছ এঁটে দাঁড়কাক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ওজস্বিনী ভাষায়, তোবড়ানো গালে তুঘা পড়লেই ব্যাটার আসল কর্কশ স্বর কা কা বেরিয়ে পড়তো। স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টর, সে নাকি আমায় ফাঁসীতে লটকে দেবে! সত্যিই, স্যাণ্ডেল দিয়ে ওর দাঁত ভেঙ্গে দিতাম, কিন্তু বিনোদবাবুর জন্য হলো না। ভয় হলো তাঁর, পাছে রাগের মাথায় আমি একটা খুন-খারাবীই করে বসি। কারণ আমরা নাকি—

অনুমান তাঁর একটুও মিথ্যে নয়। কিন্তু আত্মহারা হইনে আমরা কোন দিন। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে লোম্যান ও হড্‌সনকে গুলী করবার সময় ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লে বিনয় বোসের গুলী তাঁদের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত আর ধরা পড়তেন তিনি। বন্ধুর মতো কথা বলতে বলতে শত্রুর মতো ছুরি চালিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই খাবার দোকানে বসে অর্ডার দোব: দেখি, তুটো রসোমালাই আর চারটে ফুলকপির সিঙ্গাড়া। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ব অবস্থায় আমাদের এই নৃশংসতা শুধু দেশের জন্য। বন্দিনী মায়ের মুক্তির জন্যই আমরা ডাকাত, আমরা নরঘাতক!······

টিউবওয়েলের ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে সবে বারান্দায় উঠেছি, এমন সময় সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, ধীর পদক্ষেপে আমার বাসার দিকে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং প্রেমতোষ সেন! তাঁর পশ্চাতে আসছেন বিনোদবাবু, অবিনাশবাবু।

বিস্মিত হলাম! মার খেয়ে শ্রীমান বাড়ী যায়নি দেখছি। স্থির করলাম, আবার সরকারী অফিসারের বক্তৃতা সুরু করলে এবার সত্যিই স্যাণ্ডেল ব্যবহার করবো। কিন্তু এসেই প্রেমতোষ একেবারে আমার পায়ে পড়ে আর কি!

দ্বিজেনদা, আমায় ক্ষমা করুন।

ক্ষমা! কিসের জন্য?

কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো প্রেমতোষ: অনেক কটু কথা বলেছি। শপথ

করছি, এস ডি ও-র কাছে যাবোই না, থানাতেও আসবো না আর।—বলুন, ক্ষমা করলেন আমায়?

বুঝতে পারলাম না ব্যাপার কি! মার দিলাম আমি, আর ক্ষমা চাইবে প্রেমতোষ?···অকস্মাৎ চেয়ে দেখি, পেছনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন অবিনাশবাবু, সুতরাং বুঝতে আর দেরী হলো না যে, এ তাঁরই কারসাজি। বললাম: আচ্ছা যান, এবারটা কিছু বললাম না। কিন্তু জানবেন, আবার দারোগার কানে লাগালে আর কিন্তু ছেড়ে দোব না আমি। একটি মহিলা হয়তো বিধবা হবেন, কিন্তু আমাদের পথ পরিষ্কার হবে।

অবিনাশবাবু বললেন: প্রেমতোষবাবু আমায় এসে সব ঘটনা বলতেই আমি ওঁকে সাবধান করে দিলাম। কারণ আপনাদের তো আমরা জানি দ্বিজেনবাবু! স্বয়ং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যাঁদের ভয় করেন এবং ভয় করেন বলেই এমনি মাসোহারা দিয়ে বছরের পর বছর আটকে রাখেন, তাঁদের কি এতটুকু ভরসা করা যায়? কে জানে, আর একদিন অন্ধকারে পেয়ে প্রেমতোষবাবুর পেটের ঝুলিই হয়তো বার করে দেবেন ছোরা চালিয়ে আর লাসটা টেনে ফেলে দিয়ে আসবেন জটাধরের দীঘিতে, তখন?

প্রেমতোষ এবার হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো: আপনার পায়ে ধরি, দ্বিজেনদা!

একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম এখানে আসবার পর থেকেই। যেসব নতুন জিনিষ এখানে আমি প্রবর্ত্তন করেছিলাম, যথা, ব্যাডমিণ্টন ও ফুটবল, যথা, নাট্যাভিনয়, যথা, জটাধরের দীঘিতে মৎস্যশীকার,—সব কাজেই আমার প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে ঠিক তাল রাখতে সব সময় না পারলেও এখানকার সবাই এগিয়ে আসছেন বটে, কিন্তু তারপর যেন আর তাঁদের দেখতে পাইনে। ক্ষীরোদ দারোগা থাকতে অবশ্য তাঁদের আমার বাসায় যাতায়াত শুধু অসুবিধেজনক নয়, বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু ক্ষীরোদ কদিনই বা আর থাকেন থানায়? মফঃস্বলে সখীপরিবৃত হয়ে রাত কাটানোই তো তাঁর নেশা। একটু কিছু ছুতো পেলেই অমনি ছুটে যান মফঃস্বলে। তাই প্রায় রাতেই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা! কিন্তু কই, জটাধর, গোপাল রায় বা অপর কাউকে তো তেমন দেখতে পাইনে সে সব রাতে? থানার মধ্যে বন্দী থাকবার হুকুম মহামান্য সরকার জারী করেছেন আমার বেলায়, এতে ওঁদের এত ভয় কেন?······এখানে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার

প্রবর্তন যতই করিনে কেন, এখানকার সমাজের মধ্যে যদি অনুপ্রবেশ করতে না পারি, তাহলে স্থায়ী কিছু কী করে করবো ? কী করে আমার পরিচয় রেখে যাবো এই গণ্ডগ্রামে ?……

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একদিন বিনোদবাবুকে জানালাম দুঃখের কথা। বিনোদ-বাবু তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞের মত জবাব দিলেন : এজন্য দায়ী আপনি নিজে। আরে মশাই, কেশিয়াড়ী উড়িষ্যার সীমান্তের গায়ে একটি গ্রাম। এখানকার সবাই ভীষণ পানখোর আর সিগারেটখোর। কিন্তু আপনি ও রসে বঞ্চিত। পানও খাবেন না, সিগারেটও খাবেন না। তাই সন্ধ্যের পর যত সুবিধেই থাক না কেন, ওঁরা আপনার ওখানে কেন যাবেন ? তার চাইতে হরিমতীর কোনো চ্যালা-চামুণ্ডার হাতের মিঠে খিলি খেতে খেতে দুটো মনের কথা কইতে পারলে শান্তি পাওয়া যাবে।

জিজ্ঞেস করলাম : এই তাহলে কারণ ?

নিশ্চয়ই।—জবাব দিলেন বিনোদবাবু।

বললাম : অল্ রাইট, দেখা যাক, কে কত পান খেতে পারেন আর সিগারেট। চ্যালেঞ্জ রইলো আপনাদের কেশিয়াড়ী গ্রামকে।

গোল্ডফ্লেকের টিন এলো, প্রায় সব সময়ই আমার অধরের ফাঁকে শোভা পেতে লাগলো জ্বলন্ত গোল্ডফ্লেক। আর পান। নটবর বাচ্চা ছেলে হলে কি হবে, পানের কদর সে বোঝে। তাই চললো পান, পানের পর পান। শুধু নিজে খাওয়া নয়, বিলোতে লাগলাম দুহাতে যেখানে সেখানে, যখন তখন।

ফলে, প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলায় বসতে লাগলো থানার বারান্দায় আমাদের একটানা ব্রিজ। চলতো প্রায় সারারাত। সঙ্গে পান ও সিগারেট। ব্যাডমিণ্টন মাঠে সিগারেট, নাটকের মহলায় পান ও সিগারেট, ফুটবল খেলার ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট, পথে ঘাটে হঠাৎ দেখা হলেই পান ও সিগারেট বিনিময়……একেবারে নরক সৃষ্টি করে ফেললাম দেখতে দেখতে !

বিনোদবাবু একদিন গোপনে ডেকে বললেন : ব্যস, এবার একেবারে খোর হয়ে গেছেন তো। আঙুলের ফাঁকেও দাগ পড়েছে, দাঁতেও লালচে আভা। দেখবেন, এদেরই মতো শেষটায় পান আর সিগারেটেই না আপনাকে খেয়ে বসে।

হাসলাম। বিনোদবাবুর কাঁধে একখানা হাত রাখলাম, যেমন রেখে থাকি আমরা কোনোও ছেলেকে দীক্ষা দেবার বেলায়। তারপর বললাম ধীরে ধীরে :

বিনোদবাবু, যেমন আঁকড়ে ধরেছি, তেমনিই একদিন ছেড়ে দোব এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই। খোর হয়ে যাবার কথা বললেন না? খোর কেন, একেবারে চুর হয়ে আছি আমরা একটি নেশায়, সে হচ্ছে দেশপ্রেমের নেশা, দেশকে ভালোবাসার নেশা। সে নেশা থেকে আমাদের যে রেহাই নেই, তা জানি। সেই নেশাটিকে জমিয়ে তোলবার জন্য যা করতে বলবেন, তাই করবো, যে পথে যেতে বলবেন, তাই যাবো বিনা দ্বিধায়। আমার দেশের কাছে ব্যক্তিগত পান-সিগারেটের নেশা তো তুচ্ছ, সতীত্বও বড় কথা নয়। দেশ সবার ওপরে, তার কাছে তুচ্ছ সব কিছু। যদি প্রয়োজন হয়, এখানকার সমাজে ঢুকে কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেবার জন্য পান-সিগারেট তো দূরের কথা, মদও খেতে দ্বিধা করবো না। হয়তো হরিমতীকেই আবার সাদরে ডেকে আনবো।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম: বিনোদবাবু, কাদামাটি ধুয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করলে কাদামাটিতে নামতে হয়, বাইরে দাঁড়িয়ে জল ছিটোলে হবে কেন? কাদার মধ্যেই তো কমল ফোটে বিনোদবাবু। কমল চাইবেন আপনি, অথচ কাদায় নামবেন না, তা কি হয়?

বিনোদবাবু শুধু বললেন: আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা অসম্ভব।

তৎক্ষণাৎ বললাম: কারণ, যা আমি সারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, তাই বলি আর যা বলি, তা আমি করি। কোনো কারচুপি নেই এতে, কোনো রফা নেই। স্ঁচ হয়ে ঢুকেছি এঁদের মধ্যে একদিন ফাল হয়ে বেরুবার ব্রত নিয়ে। অত দিন আমি হয়তো এখানে থাকবো না, কিন্তু আমার পরিচয় থেকে যাবে আর থাকবে আমার স্বতঃউৎসারিত প্রভাব!······

বিনোদবাবু দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন আমায়, বললেন: দেশের লোক চিনলো না আপনাদের, জানতেও পারলো না, কী আপনারা করে যাচ্ছেন তাদেরই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য, তাদের স্বাধীনতার জন্য!······

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি অকস্মাৎ একদিন সকালবেলা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলেন সার্কেল ইনস্পেক্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। হেসে বললেন: I have brought a very good news for you.

কী সংবাদ?—প্রশ্ন করলাম।

আনন্দোদ্ভাসিত কণ্ঠে জবাব দিলেন ইনস্পেক্টার: Here is a transfer order for you to Dacca Jail—আমার বিশ্বাস, ওখানে পৌছেই পাবেন আর

একখানা সরকারী আদেশ and that will be your release order!—তারপর বিজ্ঞের মতো জিজ্ঞেস করলেন : কত দিন হলো আপনার?

হিসেব করে বললাম : তা চার বছর পুরো হলো।

এবার ছাড়া পাবেন।—ভবিষ্যদ্বক্তা জ্যোতিষীর মতো বললেন যতীনবাবু : যান, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। আর যেন এ পথে আসবেন না।

মনে মনে হাসলাম। এ পথে কি আর কেউ হিসেব করে আসে? না আসবার থাকে কোনো বাস্তবধর্ম্মী প্ল্যান?…এমনি আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। বাপ-মাও সকল বাবা-মায়ের মতোই মনে করেন ছেলে তাঁদের লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, বড় চাকরি করবে, দশজনের মধ্যে একজন হয়ে বংশের মর্য্যাদা বাড়াবে। সেই অনাগত সুদিনের প্রত্যাশায় তাঁরা বিনাদ্বিধায় নিজেদের প্রবঞ্চিত ক'রে, অমানুষিক পরিশ্রমে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন নয়নের নিধিকে। ছেলেরও যে তাতে কম নিষ্ঠা থাকে, তা নয়। শিক্ষাগ্রহণ, অর্থোপার্জ্জন ও সুনামলাভের সহজ পথটাই বেছে নিয়ে ভালো ছেলের মতো সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

কিন্তু মাঝপথে কোথা দিয়ে যে কী বিপর্য্যয় ঘটে যায়, সহজ পথে চলতে চলতে কার প্ররোচনায়, কবে, কোন্ বিশেষ ক্ষণে সে এক বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথে পা বাড়িয়ে দেয়, কোন্ সর্ব্বনাশা পথের নেশা তাকে পেয়ে বসে, অনেক সময় নিজেই সে ভালো করে ঠাওর করতে পারেনা। যখন পারে, যখন প্রাণান্তকর ঝুঁকির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে, তখন সে রীতিমত মাতাল, মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও এই ভয়ঙ্কর পথ-চলা থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই। বাপ-মায়ের রঙ্গীন পরিকল্পনা একখানি কাঁচের পাত্রের মতো চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে এগিয়ে চলে নয়নের নিধি ঘরে ফিরে না যাবার সংকল্প নিয়ে!

পথ ছাড়বারই যার ক্ষমতা নেই, সে পথে ফিরে না আসবার কথা তখন তাকে বলা নিরর্থক নয় কি?……

ভবিষ্যদ্বাণী ও ভালো ছেলে হবার সদুপদেশ দিয়ে ইনস্‌পেক্টার যতীন সেন বেরিয়ে গেলেন আর আমি মিনিটখানেক চুপটি করে বসে রইলাম। মনের মধ্যে বার বারই একটি প্রশ্ন মাথা চাড়া দিতে লাগলো : তাহলে কি সত্যিই আবার বাড়ী যাচ্ছি আমি?……

মেদিনীপুর শহর থেকে চলনদার দুজন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সৈন্য ও একজন সহকারী দারোগা এসে গেছে। বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই।

দারোগাবাবু মফঃস্বলে ছিলেন। দেখা হলো না। রওনা হবার প্রাক্কালে থানার সবাই বাইরে এসে জড়ো হলেন। তাঁদের মধ্য দিয়ে অপেক্ষমান মোটর বাসে আরোহণ করবার সময় অকস্মাৎ দেখি অবিনাশবাবুর চোখে অশ্রু আর বিনোদবাবু কোঁচার খুঁটে চক্ষু মার্জ্জনা করছেন এক পাশে দাঁড়িয়ে। গোপাল রায় এসেছে, এসেছেন ডাক্তার, এসেছেন নীলরতন জানা আর এসেছেন স্বয়ং জটাধর সেনাপতি।

দু খিলি মিঠে পান আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আর দুই অধরের ফাঁকে একটি সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে জটাধর বললেন: সামান্য ক'টা মাস, কিন্তু মনে থাকবে চিরকাল। ঐ তো তোমাদের দোষ! চিনিনে, জানিনে, দেখিনি কোনদিন, হঠাৎ এসে পড়লে এই গাঁয়ে। এসেছ, বেশ ভালো। সরকারী অতিথি, সরকারী সার্কেলেই থাকো।—তা নয়। এসে সবার সঙ্গে মিশে, খেলাধুলো করে, হাসি-গল্পে, বন্ধুত্বে একেবারে দিলে সবাইকে মজিয়ে। তারপর হঠাৎ একদিন বলা নেই, কওয়া নেই হুট্ করে চললে সব ফেলে রেখে দিয়ে।—শেষের দিকে জটাধরের গলা ভারী শোনা গেল। সামলে নেবার জন্যই চট্ করে বললেন: বাড়ী পৌছে চিঠি দিও হে একখানা।

হেসে বললাম: অবশ্য যদি বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারি।

অবিনাশবাবু এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একখানা হাত রাখলেন, বললেন: শুধু-শুধু মায়া বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। জীবনেও হয়তো আর দেখা হবে না, অথচ ভুলতেও পারবো না এ ক'টা মাসের কথা। অন্ততঃ পাঁচটা বাজলেই একবারটি মনে পড়বে আপনার কথা।

বিনোদবাবু বললেন: ব্যাডমিন্টন কোর্টে এবার ঘাস গজাবে। কে আর উৎসাহ নিয়ে শাটল্‌কক্ আনাবে সেই কলকাতা থেকে আর এমনি কমপিটিশনই বা কে চালাবে!

জটাধর হাসবার চেষ্টা করে আবহাওয়াটা হালকা করে দিলেন: আর আমাদের ব্রিজ? সন্ধ্যাবেলার এমনি আসরটা এবার উঠে গেল। আমার পান খরচাও হবে না, ভায়ারও আমার গোল্ডফ্লেকগুলো বেঁচে গেল।

চট্ করে কি মনে পড়তেই জটাধর এগিয়ে এসে জানালা দিয়ে তাঁর গোল্ডফ্লেকের টিনটা আর মিঠে পানের রূপোর ডিবেটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। কোনো মানায় কান দিলেন না।

বাস ছেড়ে দিল। যুক্তকরে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার সেরে আসনে সোজা

হয়ে বসতে যাবো, এমন সময় দেখি দূরে দারোগার বাড়ীর দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই আমার দুঃখিনী বোনটি। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চীৎকার করে বললাম : নমস্কার !

দেখলাম, নীরবে দুখানি হাত যুক্ত হয়ে কপালে গিয়ে ঠেকলো !……

বাস দ্রুতবেগে ছুটে চললো খড়গপুর ষ্টেশনের পথে ধুলো উড়িয়ে।

তিপ্পান্ন

স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৩৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এসে পৌছলাম আবার সেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে! ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই জেল থেকেই গিয়েছিলাম বহরমপুর বন্দীশিবিরে পাকা রাজবন্দীরূপে।

ইনসপেক্টার যতীন সেনগুপ্ত গভীর আশা ব্যক্ত করে যখন কেশিয়াড়ীতে বলে দিয়েছিলেন ঢাকা জেলে পৌছেই পাবো দ্বিতীয় মুক্তির ফরমান, মনে মনে যে তখন একটুখানি খুসীই হয়ে উঠেছিলাম তা অস্বীকার করতে পারিনে। তাই জেল অফিসে পৌছেই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলাম সেই মহার্ঘ্য দ্বিতীয় সরকারী আদেশ-পত্রের জন্য। তখন সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেছে! অফিসের উদ্যত-ফণা কেরাণীকুল চলে গেছেন শম্বুকের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে আট ঘণ্টা কলম পিষে জর্জ্জরিত হয়ে। ডেপুটি জেলারদেরও কাউকে দেখতে পেলাম না। তাঁদেরই পরিত্যক্ত একখানা চেয়ারে উজ্জ্বল আশা নিয়ে বসে রইলাম। তখনো যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তবুও অনায়াসেই যেতে পারবো আমাদের গ্রামে ফিরে, কারণ গয়নার নৌকোর সদর ঘাট ছেড়ে যেতে রাত আটটা হয়ে যায়।

এই গয়নার নৌকায় গয়না কিন্তু থাকে না একখানাও। কোনো স্বর্ণকারের ভাসমান বিপণী নয় এ। বেশ বড় আকারের নৌকো। ব্যায়াম সমিতির প্রধান শিক্ষকের মতো স্বাস্থ্য—যেমন দীর্ঘ, তেমনি তার প্রস্থ। স্থবারবান ট্রেণগুলি যেমন করে নিয়মিতভাবে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, ঠিক তেমনি বর্ষাকালে জলমগ্ন বিক্রমপুরের সঙ্গে ঢাকা শহরের সংযোগ রক্ষা করে চলে এই গয়নার নৌকো। কী করে এর নাম গয়নার নৌকো হলো, হয়তো শ্রদ্ধেয় যোগেন গুপ্ত বা স্থনীতি চাটুজ্জে তা বলতে পারেন। প্রতিদিন সকালবেলা যেমন একখানা আপ্ নৌকো গ্রাম থেকে যাত্রা করে শহরাভিমুখে, ঠিক সেই সময় তেমনি একখানা ডাউন নৌকো বুড়ীগঙ্গার সদর ঘাট ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে আসে, তেমনি সন্ধ্যাবেলা। রেল লাইন নেই কিন্তু এদের যাতায়াতের নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। ট্রেণের মতো এদের নির্দ্দিষ্ট কোনো ষ্টেশন নেই সত্যি, কিন্তু চলার পথে যে-কোনো স্থানে যে-কোন যাত্রীর জন্য এর গতি মন্থর করা হয়। সারা দিন বা সারা রাত এই নৌকো চলে। আপ্ নৌকো রাত তিনটেতে ঢাকা শহরে পৌছে গেলেও ঘাটে

ভিড়তে পারে না। পুলিশের নিষেধাজ্ঞা আছে। তাই সদর ঘাটের বিপরীত দিকে শুভাড্যা গ্রামের প্রান্তে অবশিষ্ট রাতটুকু কাটাতে হয় নোঙর ফেলে। ডাউন যে নৌকোগুলো ঢাকা শহর ত্যাগ করে সন্ধ্যার পর, ট্রেণের মতো তার কোনো টাইম-টেবল নেই বলে এদের ঘাট ছাড়তে রাত আটটা বেজে যায়।

দেয়ালের ঘড়িতে দেখলাম তখন মাত্র সাতটা। আরও আধ ঘণ্টা পর ছেড়ে দিলেও দ্রুতগামী গাড়ী অনায়াসে ঘাটে পৌঁছে দিতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর ডেপুটি জেলার রেজাক সাহেব এলেন বোধহয় সংবাদ পেয়ে। অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের পর অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন: দ্বিজেনবাবু, দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। ডেটিনিউ ইয়ার্ডে আপনাকে রাখা যাবে না, কারণ আই বি বোধহয় আপনাকে বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী দলভুক্ত করে নেবে।

বিস্ময় প্রকাশ করলাম: বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা!

কিছুই খবর পাননি বুঝি?—বলে রেজাক সাহেব সংক্ষেপে যে বিহ্বলকারী সংবাদ প্রকাশ করলেন, তা হচ্ছে এই যে, এই মামলার তোড়জোড় চলছে প্রায় দুমাস ধরে। একটি একটি করে দশ-বারো জনকে গ্রেপ্তার করে এনে বিচারাধীন আসামী করে রাখা হয়েছে, ডাকাতি, নরহত্যা ও সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলতে পারেন রেজাক সাহেব?

জবাব দিলেন রেজাক: সব নাম তো আমার মনে নেই, তবে বিপদভঞ্জন, সুবোধ, নেপাল না গোপাল চক্রবর্ত্তী—এমন আরও জনকতক। বোধহয় অনাথ নামেও কেউ আছে।……

চমকে উঠলাম মনে মনে। কিন্তু বাইরে খুব সহজ ভাব দেখিয়ে আর একটা প্রশ্ন করলাম: এরা সব আছে কোন্ ইয়ার্ডে? আমাকে এদের সঙ্গেই রাখবেন তো?

রেজাক বললেন: ঠিক বুঝতে পারছিনে। এখন পর্য্যন্ত সরকারী কোনো আদেশ আসেনি। শুধু বিভূতি সাহা বলে গেছেন, আপনাকে যেন রাজবন্দীদের সঙ্গে না রাখা হয় আর এইসব আসামীর সঙ্গেও যেন আপনার দেখা না হয়। কিন্তু এই ছেলেদের তো একসঙ্গে রাখা হয়নি। মনে পড়ছে, অন্ততঃ দুজনকে চল্লিশ ডিগ্রিতে দেখেছি।

তাদের নাম মনে আছে?

কালাচাঁদ দাস আর বোধহয়—রঙ্গলাল গাঙ্গুলী। রঙ্গলাল আপনার আত্মীয় নাকি দ্বিজেনবাবু? অনেকটা যেন আপনার মত দেখতে।

বললাম: কোথায় আমায় থাকতে হবে, সেইখানে নিয়ে চলুন রেজাক সাহেব, খুব শ্রান্তি লাগছে। বাস্, ট্রেণ, ষ্টীমার, ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী—সবই তো চেপে এসেছি, শরীরে ব্যথা বোধ হচ্ছে।—চলুন।

এমন সময় একজন জমাদার এসে নিবেদন করলো যে, সিভিল ইয়ার্ড খালি করে, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে খাট, টেবিল ও চেয়ার বিছায়কে দিয়া গিয়া। অব্—

রেজাক উঠলেন: চলুন দ্বিজেনবাবু, আজ তো ওখানেই থাকুন। কাল বিভূতিবাবু এসে যা করবার করবেন।

চলতে চলতে প্রশ্ন করলাম: বিভূতি সাহা কে?

আই বি ইন্‌সপেক্টর, এই মামলা তদ্বির করছেন সরকারের পক্ষ থেকে।

ঢাকা জেলের সিভিল ইয়ার্ড বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ডাকবাংলোর মতো। ছোট বারান্দা, তারপরই মাঝারী আকারের শয়নকক্ষ, সংলগ্ন বাথরুম। চারিদিকে ইয়ার্ডের নিজস্ব কোনো দেয়াল নেই, অন্যান্য ইয়ার্ডের দেয়াল পর্য্যন্ত যাওয়া যেতে পারে। সযত্নে বর্দ্ধিত গোটাকতক পাতাবাহার গাছ পর্য্যন্ত মাথা উঁচু করে রয়েছে বাংলোর সম্মুখভাগে। যারা হাসপাতালে যায়, ছ' নম্বরে যায়, বিশ ডিগ্রিতে যায় এমন কি চল্লিশ ডিগ্রিতে যায়, তাদের সবাইকেই যেতে হয় এই সিভিল ইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে। চল্লিশ ডিগ্রির জন্য নির্দ্দিষ্ট স্নানের নালীগুলি ও পায়খানার সারি এই সিভিল ইয়ার্ডের প্রাঙ্গণমধ্যেই অবস্থিত বলা যায়।

ডাকবাংলোর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এর জানালায় আছে লোহার শিক এবং তাও সুদৃশ্য গ্রিল নয়, মোটা ও মজবুত সৌন্দর্য্যহীন শিক। আর আছে এমনি শিকের দরজা, যা রাত্রিকালে তালাবদ্ধ হয়ে আক্রমণোন্মুখ ব্যাঘ্রের মত যেন তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা প্রদর্শন করে!······

পরিপাটি করে শয্যা বিছিয়ে দিয়ে গেল রাজবন্দী ইয়ার্ডের জনৈক ভৃত্য, কুঁজো ভর্ত্তি করে দিয়ে গেল পানীয় জল এবং সিপাইয়ের সঙ্গে ফিরে যাবার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলো যে, আমি এতখানি পথ এসেছি, চা ও খাবার দেবে, না একবারে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করতে বলবে।

চট্ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল, বলে দিলাম: শোন, ম্যানেজারবাবুকে বলে চা ও গোটা দুই মামলেট যেন এখন পাঠিয়ে দেন, পরে খাবো ভাত। আর

এক কাজ করো, গোটা দুই বাণ্ডিল 'জাহাজ' বিড়ি নিয়ে এসো। আমি আবার সিগারেট খাইনে; বিড়ি ভালো লাগে ও বেশী খাই। দু' বাণ্ডিল এনো, বুঝলে?

সিপাই প্রহরায় ভৃত্য চলে গেলে শয্যায় প্রসারিত করে দিলাম শ্রান্ত দেহ। সরকারী দ্বিতীয় আদেশের মর্ম্ম উপলব্ধি করলাম এতক্ষণে! বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা···প্রধান আসামী দ্বিজেন গাঙ্গুলী।

সত্যিই কি অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে হবে আই বি-র কাছে? বুক ঠুকে এতকাল যাদের চ্যালেঞ্জ করে এসেছি, যাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে চালিয়ে এসেছি এতকাল আমার গুপ্ত বিজয় অভিযান, বুদ্ধির লড়াইতে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত, পর্য্যুদস্ত হয়ে যারা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, এতকাল পর আবার কি তারা গাণ্ডীব তুলে নিল? তাদের অস্ত্রনির্ম্মাণের কামারশালে কি আবার হাপরের তৎপরতা জেগে উঠলো? সুরু হলো হাতুড়ীর ঠুক্‌ঠুক্? মরণ-কামড় হানবার জন্য কি এরা এবার রণনায়ক করে পাঠালো জেনারেল ভন্ রুণ্ডেটকে পতনোন্মুখ জার্ম্মাণীর মতো?······কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলা কী করে সাজালো এরা? কোন্ কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে? কোথায় তার সাক্ষী? কী তার প্রমাণ? বেছে বেছে আমারই অনুগামীদের কেন গ্রেপ্তার করা হলো?—এমনি অসংখ্য প্রশ্ন জাগলো আমার মনে, যার জবাব তখনও কিছুই পেলাম না খুঁজে।

দেখা যাচ্ছে, বছর চারেক রাজবন্দী জীবন কাটাবার পর যদি এই মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হয়ে যায়, তাহলেই এ জন্মের মত প্রত্যক্ষ কাজ শেষ হয়ে যাবে। অপেক্ষা করতে হবে পরজন্মের।···

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সংসারের যাঁরা স্তম্ভ, শুভানুধ্যায়ী, ছোটবেলা থেকেই তো তাঁরা আমায় তেমনি একটি স্ফটিকস্তম্ভই তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের নীরবকুণ্ঠ প্রচেষ্টার কোথাও এতটুকু ফাঁক ছিল না। প্রতিদানে কী দিয়েছি আমি তাঁদের? দিয়েছি দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা ও বিনিদ্র রজনীর শ্রান্তি!······

১৯৩৪ সালে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকাকালীন বাবার মৃত্যুর মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আবার নতুন করে স্মৃতির পর্দ্দায় ভেসে উঠলো।······

স্পষ্ট মনে আছে সাধারণ জ্বরের অষ্টম দিবসে বাবা সংজ্ঞা হারান, আর তাঁর জ্ঞান ফেরেনি। অজ্ঞান হবার পূর্ব্বে আমায় বললেন, সবাইকে তাঁর দেখতে ইচ্ছে করছে। তৎক্ষণাৎ আমি জরুরী টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম বড়দা অবিনাশ

গাঙ্গুলীর কাছে, কাশীতে সুন্দরদার কাছে, কলকাতায় মেজদার কাছে, আরও কয়েকটি স্থানে। মেজদার কাছে প্রেরিত টেলিগ্রামে লিখে দিলাম: Father dying, start immediately!

তৃতীয় দিবসে এর জবাবে পেলাম সেজদার ফুলদাকে সম্বোধন করে কড়া ভাষায় লেখা একখানা পোষ্টকার্ড: টেলিগ্রাম করলেই টাকা পাঠাবো, আমাদের কি টাকার গাছ আছে?

জবাবে আবার পাঠালাম টেলিগ্রাম: Horrified noticing callousness. start—father desires seeing you!

এদিকে মাঝে মাঝেই বাবা জিজ্ঞেস করছেন: কি রে, ওরা সবাই এল? গ্যানা বোধহয় ছুটি পায়নি, ধীরেনেরও নতুন চাকরি—

বাধা দিয়ে বললাম: না, না, তাঁরা টেলিগ্রাম করেছেন—আসছেন।

কিন্তু এই সান্ত্বনা কি ব্যর্থ হবে? আমার জরুরী তারবার্ত্তা কি এমনিভাবে অবহেলা করবেন দাদারা? মৃত্যুর পূর্ব্বে সাত-সাতটি ছেলে, পুত্রবধূ, নাতী-নাতনী সবাইকে দেখে যাবার অন্তিম ইচ্ছা কি বাবার পূর্ণ হবে না?...বিচলিত হয়ে উঠি, ক্ষোভও মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে, কিন্তু মনের সমস্ত বেদনা ও সকল আবেগ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে চেপে রেখে আশার কথা শোনাই মৃত্যুপথযাত্রী অশীতিপর বৃদ্ধকে: আসছেন, তাঁরা আসছেন।...

দলে দলে গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষ এসে বাবাকে দেখে যাচ্ছেন, মুসলমান প্রজারা আসছে দল বেঁধে, আসছেন গ্রামান্তরেরও অনেকে। অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এই বৃদ্ধ। সে যুগের অনগ্রসর, সংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া গ্রামের অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে বাবার আধুনিক মতবাদগুলি বিপ্লবের অগ্নিপুচ্ছ তুলিয়ে দিত! হরিসভা থেকে সুরু করে ফুটবল প্রতিযোগিতার তিনিই ছিলেন স্থায়ী সভাপতি। গ্রাম্য যে সমাজের দাপটে সে যুগে দলাদলি ও রেষারেষি অহর্নিশি উত্তাল হয়ে উঠতো এবং যার ফলে গ্রামের সহজ ও শান্ত জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতো অসহ বিড়ম্বনা আমার বাবা সে সমাজকে আদৌ পরোয়া করতেন না। বরং ঐ সমাজই তাঁকে সমীহ করে, ভয় করে চলতো।......

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বিকেলের দিকে শেষ বারের মতো বাবার জ্ঞান ফিরে আসে। শয্যাপার্শ্বে আমায় দেখেই জিজ্ঞেস করলেন: কি রে, ওরা সব এসেছে?

আবারও মিথ্যে প্রবোধ দিতে হলো: লিখেছে কালই এসে পৌছবে।

আর কাল!—বলে চোখ বুঁজলেন বাবা।

তার পরের ঘটনা বেশ সরল। সারা রাত ধরে চললো যমের সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার। টেনে তাকে ফেলে দিতে না পারলেও সে-ও পারল না জয়লাভ করতে। সারা শরীরে কম্পন জেগেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, ক্ষীণায়মান নাড়ীর গতি, কিন্তু কি গভীর শান্তির দ্যুতি সারা মুখমণ্ডলে!···সারাটি রাত ঠায় বসে রইলেন তিনজন চিকিৎসক—বিলাস সাহা, বিজয় সেন আর রসিক কবিরাজ। বিলাস সাহা দিলেন ইনজেকশন, বিজয় সেন নাকে লাগিয়ে দিলেন আর্সেনিক আর রসিক কবিরাজ জিহ্বায় ঘসে দিলেন কস্তুরীঘটিত ঔষধ। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী যুগপৎ তিনটি শক্তিশালী প্রতিবন্ধককে ঠেলে ফেলে দিতে পারলো না সর্ব্বজয়ী মৃত্যু অন্ততঃ সেই রাত্রির মতো।···কিন্তু পরদিন সকালে সাড়ে ন'টার সময় সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই বাবার ফুসফুসের ক্রিয়া চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল!

মৃত্যুর প্রাক্কালে ছুটে এলেন দেবেন কাকা, অতুল কাকা। বললেন যে, ঘরের মধ্যে মৃত্যু হলে নাকি আত্মা মুক্তি লাভ করতে পারে না। শাস্ত্রে বলে—

বললাম আমিঃ আপনাদের সে শাস্ত্র আমি মেনে নিতে পারিনে। খাটের উপর যেমন শান্তিতে শুয়ে আছেন তিনি, তেমনি শান্তিতেই যাত্রা করুন পথিক মহাপ্রস্থানের পথে। টানাটানি করে তাঁর শান্তিতে ব্যাঘাত দেয়া অন্যায় হবে।······

পরদিন হন্তদন্ত হয়ে এসে সর্ব্বাগ্রে হাজির হলেন সোনাদা। তখন সব শেষ হয়ে গেছে! খানিকক্ষণ কাঁদলেন তিনি হাউমাউ করে ছোট্ট ছেলের মতো মায়ের কোলে মাথা গুঁজে! মা যেন স্বামী হারাননি, তিনিই বাবা হারালেন!······ তারপর চললেন আমায় নিয়ে ম্যান্দার বাড়ীর শ্মশানে বাবার চিতাভস্ম আনতে। সেখান থেকে এসে উঠলেন টিনের ঘরের দোতলায় বাবার শয়নকক্ষে। সব তেমনি সাজানো রয়েছে।—ড্রেসিং টেবিল, তার ওপর হেয়ার ব্রাস, ব্রাসে গুঁজে রাখা চিরুণী। গদী-আঁটা খাট, তার ওপর প্রসারিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা। মোটা মোটা দুটো পাশ-বালিশ। পায়ের নীচে ভাঁজ করা সুদৃশ্য বালাপোষের চাদর। মাথার ওপর তোলা নেটের মশারি। ব্রাকেটে বাবার ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী, চাদর ও তার নীচেই খুঁটির কোণে সেই বহু স্মৃতিজড়িত নিমের লাঠিগাছা।

সোনাদা পরম শ্রদ্ধাভরে ধীরে ধীরে তুলে নিলেন লাঠিখানা। বললেনঃ এটা আমি নিয়ে যাবো রে! এই সব জিনিষের মূল্য অনেক।·········

সোনাদার মুখেই তারপর শুনতে পেলাম কলকাতার মর্ম্মান্তিক অধ্যায়। আমার প্রথম টেলিগ্রাম পেয়েই কাশী থেকে সপরিবারে সুন্দরদা এসে হাজির হন কলকাতায় মেজদার বাসায়। সেখানে তেমন উদ্বেগ না দেখে বিস্মিত হন তিনি।

তারপর প্রকাশ পায় আমার প্রথম টেলিগ্রামকে আমলই দেননি সেজদা! ফুলদা যেভাবে মাঝে মাঝে কেয়টখালী থেকে লোমহর্ষণকারী পত্রাঘাত করে কলকাতার দাদাদের ব্যস্ত করে দিয়ে টাকা চাইতেন অবশ্য সাংসারিক প্রয়োজনেই, সেজদা মনে করেছিলেন আমার নামে প্রেরিত এই টেলিগ্রাম সেই চালাকিরই আর একটি শোচনীয়তর নিদর্শন। তাই এর কথা আর মেজদাকে না জানিয়ে তিনি নিজেই জবাব দেন পোষ্টকার্ডে।

আমার দ্বিতীয় টেলিগ্রাম মেজদার হাতে পড়ে। এবার তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, বাবার এমনি সংবাদের ওপর আস্থা স্থাপনের ফলে যদি বোকা বনতে হয়, তাও ভালো। তথাপি আর চুপ করে থাকা আত্মঘাতী অন্যায় হবে। সুন্দরদা বিশেষ কিছু নয় শুনে তখন ফিরে গেছেন কাশীতে, মেজদারও সরকারী চাকরিতে ছুটি নিতে দু'দিন দেরী হতে পারে। তাই সোনাদাই যাত্রা করলেন সর্ব্বাগ্রে বৌদি ও পুত্রকন্যা সহ।

এই শোচনীয় ভুল বোঝাবুঝির ফলেই মৃত্যুকালের আশা পূরণ হলো না বৃদ্ধের, ছেলেরা, বৌমারা, নাতী ও নাতনীরা অনেকেই এসে পৌঁছোতে পারলো না সময়মতো।......

দ্বিধাহীন চিত্তে শুধু নয়, পরম শ্রদ্ধাভরে আজ স্মরণ করি আমার সোনাদাকে।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁর ছিল একটুখানি ব্যবধান, একটুখানি পার্থক্য, চিরপরিচিত কালিমা-পঙ্কিল স্তরের একটুখানি ঊর্দ্ধে বিচরণ করতেন তিনি। সাংসারিক কূটনীতি ক্ষেত্রে যেমন একেবারে অচল ছিলেন তিনি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সুদুঃসহ সংগ্রামে যেমন ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবশেষে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তেমনি আমি নিজেই দেখেছি দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ণ মার্কেট অঞ্চলে কী জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর! ১৯৪৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পর বহু দিন বহু লোকের মুখে শুনেছি তাঁর অশেষ গুণাবলীর কথা আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে একটি প্রিয়জন-ব্যথাতুর দরদী দীর্ঘনিঃশ্বাস!......আমি জানি এবং নিশ্চিত ভাবে জানি যে, অনাত্মীয়দের এই সহানুভূতি-সজল দীর্ঘশ্বাস অনাহত শান্তি দেবে তাঁকে পরলোকে, বিধবা সোনাবৌদি ও তাঁর পুত্রকন্যার শিরে এই দীর্ঘশ্বাস আশীর্ব্বাদের শুভ্র ফুল হয়ে ঝরে পড়বে। যে প্রচণ্ড দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী, নীলাঞ্জন গাঙ্গুলীর জীবনে সে দুঃখের হবে সমাধি, সেই দীর্ঘ তমসাচ্ছন্ন রজনীর হবে অবসান!......

বাবু!

চমকে উঠলাম: কে?

আমি, বাবু। আপনার চা নিয়ে এসেছি। রাখবো টেবিলের ওপর?

রেখে দাও।

লোকটি বললো: আপনার জাহাজ বিড়ি কাল কিনে দেবেন বলে দিলেন ম্যানেজার বাবু। আজ পাঠিয়েছেন মসজিদ বিড়ি।

আচ্ছা, ওতেই হবে।

চুয়ান্ন

পরদিন সকালেই তলব এল জেল গেট থেকে—আই বি এসেছেন দেখা করতে।

প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এসেছে সংঘর্ষের আহ্বান। এবার আসরে নামতে হবে।

গেট-এ প্রবেশ করেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল স্বয়ং গ্র্যাসবি সাহেবের সঙ্গে। বোধহয় আমার অপেক্ষাই করছিলেন।

Hallo Mr. Ganguly, now you are caught in the trap. There is no way out now, do you understand ?

আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড সবই করতে পারছি, কিন্তু পাল্টা আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড না করাতে পারলে কী আর শিখলাম এতকাল ?···বললাম: I don't know what do you mean by this.

মৃদু হাস্য করলেন গ্র্যাসবি সাহেব। একটু দূরে দণ্ডায়মান এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন যে, তাঁর যা বলবার, তা সবই আমায় বলবেন ইন্‌সপেক্টার বিভূতি সাহা। উত্তরে আমার যা বক্তব্য, তা ওঁকে ব'লে দিলেই তিনি জানতে পারবেন।

দেখলাম, গ্র্যাসবির বেল্ট-এর দু'পাশে কালো ফিতেয় ঝোলানো একটি নয়, দুটি রিভলভার। খাপে ঢাকা নয়, একেবারে খোলা। প্রয়োজন হলে যাতে একটি সেকেণ্ডও দেরী না হয়ে যায়। আর বেশ উল্লসিত মনে হলো ওঁকে। হবারই কথা। ওঁদের আয়োজনের মরা গাঙে এসেছে জোয়ার, পালে লেগেছে হাওয়া, এবার জয়যাত্রা করবে সপ্তডিঙ্গা মধুকর !······

প্রকাণ্ড গেট খুলে গেল, গট গট করে গ্র্যাসবি বেরিয়ে গেলেন। এগিয়ে এলেন বিভূতি সাহা।

চলুন, সুপারের ঘরে গিয়ে বসিগে আমরা। নিরালায় কথা কওয়া যাবে'খন।

তারপর কথা সুরু হলো।

বিভূতি সাহা বললেন: গিয়েছিলাম মশাই, আপনাদের বাড়ীতে সার্চ্চ করতে। দেখলাম আপনার ঘরখানা, আপনার বইয়ের প্রকাণ্ড আলমারীটা। উঃ, কী চমৎকার কলেকশন আপনার। বিশ্বের সেরা সেরা বই সব সংগ্রহ করেছেন। পড়েও ফেলেছেন সব নিশ্চয়ই ?

ঘাড় নাড়লাম। বলতে লাগলেন সাহা: সত্যি, বিদ্যা ও জ্ঞানের জাহাজ আপনারা। আর কী পপুলার আপনি, তাও টের পেলাম আপনাদের গ্রামের অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে। দেখলাম, ওদিকের কোনো কাজই আপনাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। নাটকে আপনিই নায়ক, খেলা ধূলায় আপনিই ক্যাপ্টেন, লেখাপড়ায় আবার আপনিই ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, স্বেচ্ছাসেবকদলের আপনিই জি ও সি। জানতে পারলাম গ্রামের প্রত্যেকটি ব্যাপারে, প্রত্যেকটি কাজে আপনার সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সিদ্ধিলাভ হয় না। কতখানি যে ভালবাসে ও ভক্তি করে আপনাকে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, গ্রামের বুড়োরা, গ্রামের যুবকেরা তারও পরিচয় পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি দ্বিজেনবাবু, আপনাকে না দেখেও সেই থেকে মনে মনে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। গ্রামের, সমাজের, দেশের কল্যাণের জন্য আপনারই মতো নিঃস্বার্থ, কর্ম্মঠ ও জনপ্রিয় কর্ম্মীর আবশ্যক আছে।

এমনি ওজস্বিনী ভাষায় অবতরণিকার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে আদৌ দেরী হলো না আমার। বহুবার শুনেছি এঁদের মুখে। মোসাহেবী চাটুবাক্যের মধ্য দিয়ে এঁরা সহজেই এগিয়ে আসেন কাছে। তারপর সীমাহীন প্রশংসার মবিল অয়েল দিয়ে জাহান্নামে তলিয়ে যাবার পথটি বেশ পিছল করে দেন। তারপর আর কী? একটুখানি ঠেলে দিলেই ব্যস্, একেবারে স্যাওড়া গাছ থেকে সড়াক করে নেমে আসার মতো সড় সড় করে নেবে যেতে হয় অধঃপতনের উৎরাই পথে। তারপরই শোনা যায় ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষীর কথা, মহামান্য ভারতেশ্বরের ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোতা পাখীর মতো সহকর্ম্মীদের তালিকা আওড়ে যান কালাচাঁদ দাস ও রঙ্গলালের মতো।···কিন্তু সবে ঢাকা শহরে এসেছেন বিভূতি সাহা, এখনও সম্যক মোলাকাত হয়নি আমার সঙ্গে, খড়্গো খড়্গো ভীম পরিচয়ের পালা এখনও বাকী রয়েছে। যাঁরা চেনেন আমায়, তাঁরাও বোধহয় এঁকে সমঝে দেননি এখনও।

মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু বিভূতি সাহা তাঁর মামুলী প্রথায় সহস্রমুখে উচ্ছাস দিয়ে, অনুপ্রাস দিয়ে, উপমা দিয়ে, উৎপ্রেক্ষা দিয়ে আমার গুণকীর্ত্তন করে, অবশেষে বুকভাঙ্গা একটি দীর্ঘশ্বাস ফোঁস করে ছেড়ে দিয়ে বললেন যে, আমার মতো এমনি আত্মত্যাগী মহাপ্রাণ যুবক দেশের ও দশের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারতো, যদি না ঐ চপলমতি গুণ্ডার দলে যোগ দিতাম। বললেন তিনি: দেশের স্বাধীনতা কে না চায় দ্বিজেনবাবু? ইংরেজকে কি আমরা ভালবাসি?

এই গোলামী কি আমাদের ভালো লাগে ? কিন্তু ঐ বোমা-রিভলভারের পথে কি স্বাধীনতা আসতে পারে ? স্বদেশী পরুন, তাহলেই এরা ভাতে মারা পড়বে ও দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

বললাম : আপনার নয়া থিওরি সম্বন্ধে একখানা থিসিস লিখুন না বিভূতিবাবু, যথাস্থানে পেশ করব আমি।

থিসিস্ !

তা ছাড়া কি ! আপনাদের মতো চিন্তাশীল দেশহিতৈষী আর নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে দেখছি এবার দেশের আই বির দারোগা আর ইন্‌সপেক্টারদেরই স্থান দিতে হবে। কিন্তু যাক্ সে কথা। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা নাকি স্বরু হচ্ছে শীগ্‌গিরই। কীসের ষড়যন্ত্র জানতে পারি কি ?

বিভূতি সাহা দরদী বন্ধুর মতো বললেন : আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই দ্বিজেনবাবু, কারণ আপনাকে ভাইয়ের মতো ভালবাসি বলেই আপনার জন্য দুঃখ হয়। আপনার মতো জিনিয়াস্—

এমনি জিনিয়াস ক্রাইম কিভাবে করতে পারে, এই তো আপনার বক্তব্য ? কিন্তু কী যে ক্রাইম, তা জানতে পারলে তবে তো বলবো আমার যা বলবার আছে।—বলে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলাম সাহার পানে।

বড় সাহেবের আহ্বানে বড়বাবু যেমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে গিয়ে কাছাটি হারিয়ে ফেলেন, ঠিক তেমনি ক্রাইমের ফিরিস্তি দিতে গিয়ে বিভূতি সাহা আই বি-জনোচিত স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে বলে ফেললেন : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তা তো বলবোই। তাই বলবার জন্যই তো এসেছি আপনার কাছে। সবই জানতে পেরেছি কালাচাঁদ আর রঙ্গলালের কাছে। প্রত্যেকটি ঘটনা, আপনার প্রত্যেকটি কাজ। দেলভোগের হাট থেকে ব্যাপারীদের অনুসরণ করে কীভাবে আপনি ছেলেদের নিয়ে ডাকাতি করেছিলেন, তারপর হাঁসাড়া, মালখানগর প্রভৃতি গ্রামের স্কুল লাইব্রেরী ভেঙ্গে কীভাবে সব ন্যাশন্যাল বই চুরি করেছেন, দীনেশ গুপ্ত আর বিনয় বোস কেয়টখালীতে কতবার এসেছে···সব জানতে পারা গেছে ওদের মুখ থেকে।

জিজ্ঞেস করলাম : আর কিছু ?

আরও অনেক।—বলে সাহা এবার আবেগ ঢেলে দিলেন কথার সুরে : কিন্তু ওদের দু'জনকে তাই রেখেছি আলাদা করে ভালোভাবে। অন্যায় যে স্বীকার করে, তাকে আপনারাও ক্ষমা করে থাকেন। আর আমাদের আইনে

তো আছেই।—কিন্তু আমার বক্তব্য—বক্তব্য নয়, অনুরোধ দ্বিজেনবাবু, আপনিও কেন সব জানিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান না! আপনার মতো ব্রিলিয়্যাণ্ট বয়কে যারা এই মারাত্মক পথে টেনে নিয়ে এসেছে, তাদের নামগুলো শুধু জানিয়ে দিন আমায়, I promise you honourable release. The jail-gate is open for you, my dear brother—আর সুবিধে হচ্ছে এই যে, পার্টির কেউ তো ঘুণাক্ষরেও জানতে পারবে না এ কথা। কিছু লিখে দিতে হবে না আপনাকে, শুধু নামগুলো, শুধু—

ভাবাবেগে সাহা একেবারে গদগদ হয়ে উঠছিলেন, তাই বাধা দিতে হলো: আপনি কতদিন এই আই বিতে আছেন বিভূতিবাবু?

দমে গেলেন তিনি কাঠখোট্টা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে, তবু জবাব দিলেন: তা প্রায় বিশ বছর হবে।

ঢাকা এসেছেন কদ্দিন?

তাও তো প্রায় বছর হতে চললো।

এবারে ক'টি মূল্যবান উপদেশ দিলাম সাহাকে: এক বছর হলেও আমার সঙ্গে এই আপনার প্রথম দেখা। কলকাতা এস বির মণি বোসের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়ে গেছে, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার বনবিহারীর সঙ্গেও। আপনার ঐ তোতা পাখীর বুলিই শুধু সেখানে শুনিনি, সেখানকার বয়লারে রীতিমত রোষ্ট হয়ে এসেছি। অর্থাৎ বয়লার-প্রুফ। বুঝলেন বিভূতিবাবু?

কাষ্ঠহাসি হাসলেন বিভূতিবাবু। পরিষ্কার ঝক্ঝকে দাঁতের পাটি, হাসতে গেলেই সেগুলো বেশ দেখা যায় আর চোখ দুটোও ছোট হয়ে আসে। কিন্তু কী বুঝলেন তিনি জানিনে। দেখা গেল, আর বাক্যজাল বিস্তারের অপচেষ্টা না করে এবার কাজের কথাই পাড়লেন: তাহলে দ্বিজেনবাবু, আপনার সঙ্গে যখন বনলো না, তখন আসল কথাটাই জানিয়ে দিই। আমরা শীগ্গিরই বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু করছি আর আপনিই হবেন সে মামলার প্রধান আসামী। অর্থাৎ বাছা বাছা চোখা চোখা তীর রেডি করে রেখেছি আমরা, এবার ছাড়লেই হয়।

বললাম: ভালো কথা। আপনারা তীর ছাড়তে থাকুন, আমিও দেখি কোনো বর্ম্ম টর্ম্ম পাই কিনা। না পারি, শেষটায় শরশয্যা নোব আর আপনারও একটা প্রমোশন টমোশন—

আবার সেই চোখ-বুজে-আসা কাষ্ঠহাসি।

উপসংহারে জিজ্ঞেস করলেন বিভূতিবাবু: তাহলে কী বলবো আমাদের সাহেবকে দ্বিজেনবাবু?

বলবেন দ্বিজেন গাঙ্গুলী এখনও সেই দ্বিজেন গাঙ্গুলীই আছে—he has not given up that abominable practice—আপনাদের সাহেবের ভাষাই বলে দিলাম বিভূতিবাবু!

সাহা চাকা-ভাঙ্গা ছ্যাকরা গাড়ীর মতো জেল থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি ফিরে এলাম সিভিল ইয়ার্ডে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শয্যায় দেহ প্রসারিত করে দিয়ে মনে হলো, রেজ্জাক ঠিকই বলেছেন রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে অন্যান্যের সঙ্গে না রেখে চল্লিশ ডিগ্রিতে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু দেলভোগ ডাকাতি আর স্কুলের বই চুরি সে তো অনেক দিন আগেকার ঘটনা। এতকাল পর আবার তার খোঁজ কেন? এরা কিছু না বলে দিলে পুলিশের ধারণারই অতীত ছিল যে, কোনো বিপ্লবী দল এ কাজ করতে পারে। কিন্তু কেন স্বীকার করলো এরা? আই বি অত্যাচার করেছে? তা তো করবেই। ফাঁসীর দড়িকে যারা গোখরো সাপ মনে করে না, মনে করে সম্বর্দ্ধনা-সভাকক্ষের দ্বারে প্রতীক্ষারত ভক্তের হাতের বেলফুলের মালা, এই তপশ্চর্য্যার সর্ব্বপ্রকার কষ্টকে স্বীকার করে নিয়েই তো তারা পথে নেমেছে!······

কারতার সিং বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, জিজ্ঞেস করলো পরিষ্কার বাংলায়: বাবুজী, আপনি বিড়ি খান নাকি?

চমকে উঠলাম: কেন বলুন তো?

দেখছি আপনার টেবিলের ওপর বিড়ির দু'-দুটো বাণ্ডিল পড়ে আছে, অথচ ভাত খাবার পরও আপনি বিড়ি খেলেন না?

না, না, এই তো খাবো খাবো ভাবছি।—বলেই একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেললাম এবং কারতার সিংকে অনুরোধ জানালাম: সিপাইজী, খাবেন একটা?

প্রথমতঃ সিপাইজী, দ্বিতীয়তঃ খাবেন সম্বোধন, তারপর আবার ধূমপানের অনুরোধ, সুতরাং কারতার সিং সবিনয়ে হস্ত প্রসারিত করলো।

বিড়ি খেতে খেতে নানা গল্প ফেঁদে বসলাম। একথা সে কথার মধ্য দিয়ে একসময় সুযোগ বুঝে এসে পড়লাম ভাবাবেগ-সিঞ্চিত অধ্যায়ে···দেশকা লিয়ে যেসব মরদ জরু-লেড়কা ছেড়ে কাজে নেমেছে, দেশকা আদমী হিসেবে তাদের প্রতি কি আপকো কোনো কর্ত্তব্যই নেই? হোন না আপনি সিপাই, সরকারের

নিমক খান, লেকেন দিলমে তো ওদের জন্ত জরাসে দরদ থাকা চাই······তারপর হিন্দী-বাংলা সংমিশ্রণে আরও করুণ করে বিবৃত করলাম আমার কথা—ছোট্ট একখানা চিরকুট, সামান্য দু'-চার লাইন লেখা, কোনোক্রমে যদি—

কারতার সিং রাজী হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু কী ভেবে বলে উঠলো: আচ্ছা দাঁড়ান, মৈনুদ্দীন মেট ঐ চল্লিশ ডিগ্রিতেই কাজ করে। ওকে দেখি পাই কিনা—বলে বেরিয়ে গেল সে।

এই অবসরে ফস্ ফস্ করে লিখে ফেললাম দু'লাইন পেন্সিল দিয়ে। একটু পরই ফিরে এল কারতার সিং। বললো: পাঁড়েজীকে বলে এসেছি। হাসপাতালে গেছে। ফিরবে এই পথ দিয়েই।

সিপাইজীকে আবার বিড়ি দিলাম।

যথাসময়ে এসে হাজির হলো মৈনুদ্দীন। ময়মনসিংহের মুসলমান। আকৃতিই তার ডাকাতের মতো। যেমনি দীর্ঘ দেহ, তেমনি প্রত্যেকটি পেশী যেন চর্মের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দশ বছর সাজা হয়েছে প্রতিপক্ষ রেজা খাঁর নাবালিকা কন্যার ওপর পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে। শুধু অত্যাচার নয়, অত্যাচারের ফলে মৃত বালিকাকে একেবারে মাটীর নীচে কবর দিয়ে রেখেছিল সে! সন্ধান আর পাওয়া যেত না যদি না সদু খালাসী এক্‌রারী হতো! বেশ অবলীলাক্রমে বলে গেল নিজের কীর্ত্তিকাহিনী। তারপর মৃদু হেসে হস্ত প্রসারিত করে যেই আমার সেই চিরকুটখানা মুঠোর মধ্যে পুরেছে, এমন সময় অকস্মাৎ অদূরে শোনা গেল: সরকাঠ্—স্লাম। দেখা গেল রেজাক সাহেব সিভিল ইয়ার্ডে প্রবেশ করেছেন সদলবলে। কারতার সিং প্রমাদ গুণলেও মৈনুদ্দীন যেন তাঁদের দেখতেই পায়নি, এমনিভাবে পেছন ফিরে বলে উঠলো: তাহলে এক কাজ করি, কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে বলেকয়ে এখনকার মতো এক দাগ ওষুধ এনে দিই। ডাক্তারবাবু রাউণ্ড দিয়ে ফিরলেই নিয়ে আসবো'খন আপনার কাছে।

রেজাক আমার কক্ষে প্রবেশ করে বলে উঠলেন: অ্যাঁ, সে কি, ডাক্তার কেন? কী হলো আপনার দ্বিজেনবাবু?

অসুবিধে হলো না জবাব দিতে, কারণ মৈনুদ্দীনই তো পথ দেখিয়ে দিয়েছে। বললাম: খুব কনষ্টিপেশন ধরেছে। রাত্রে বোধহয় একটু জ্বরও হয়েছিল। তাই—

রেজাক বলে উঠলেন: মৈনুদ্দীন, যা না, ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয় না। দেখেশুনে ওষুধ দেয়াই তো ভাল!

মৈনুদ্দীন কিছু বলবার পূর্ব্বেই বাধা দিলাম: এখনই আর না ডাকলেও চলবে। রেজাক সাহেব, একটু এ্যাগারয়েল নিয়ে আসুন। দেখি কী ফল হয়। না হলে কাল খবর দোব ডাক্তারবাবুকে।

আশ্বস্ত হয়ে রেজাক বেরিয়ে গেলেন। পেছনে মৈনুদ্দীন। রেজাককে হাসপাতালের দিকে পৌছে দিয়ে মৈনুদ্দীন ভালো মানুষটির মতো কোনো দিকে আর দৃকপাত না করে সোজা গিয়ে ঢুকলো চল্লিশ ডিগ্রিতে।

দুপুরে আহারের পর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় সত্যি সত্যি এক শিশি ওষুধ নিয়ে এসে ঘরে প্রবেশ করলো মৈনুদ্দীন। এবার পাহারা কারতার সিং নয়, আকবর খান। নামজাদা কড়া লোক। ডেটিনু বাবুলোগকা ঘরের ভেতর আসামীলোগ যে ঘুসতে পারে না, এই কানুন তার কণ্ঠস্থ। তাই এসে দাঁড়ালো মৈনুদ্দীনের পাশে।

বিরক্তি বোধ হলো। বললাম: শিশিটা টেবিলের ওপর রেখে যাও।

মৈনুদ্দীন তাতে রাজী নয়। সে বললো: না বাবু, ডাক্তারবাবু এখনই এক দাগ খেয়ে ফেলতে বললেন।

তবু বললাম: খাবো'খন, রেখে দাও।

সে নাছোড়বান্দা: তা হবে না। বাবু ঠিক ঘুমিয়ে পড়বেন। আর খাওয়া হবে না। ডাক্তারবাবু বার বার বলে দিয়েছেন—

আকবর খান ধমক দিল: লে শালা, আর দিক করিসনে। বাবুকো নিদ যানে দে। চল্—

সিপাইজী, আপ কেয়া বল্‌তা হ্যায়—বলে মৈনুদ্দীন বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলো যে, বেমারী খুব খটখটিয়া আছে। দাওয়াই এখনই দরকার।

ওর জিদ দেখে সন্দেহ হলো। তাহলে কি জবাব এনেছে কিছু?…উঠে বসলাম। মৈনুদ্দীন শিশিটি আমার হাতে দেবার সময় কৌশলে আমার হাতের মধ্যে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল। বললো: ওহো, ওষুধের গ্লাসটা তো আনতে ভুলে গেছি। নিয়ে আসছি, দাঁড়ান।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকবর খানও বারান্দায় এসে আবার পায়চারী সুরু করলো। মলত্যাগের ভাণ করে আমি পায়খানায় গিয়ে প্রবেশ করলাম মগভর্ত্তি জল নিয়ে। সেখানে বসে টুকরো কাগজটি খুলে দেখি পেন্সিলে লেখা রঙ্গলালের পত্র:

তোমার চিঠি পেলাম। ছোটকোনদের সঙ্গে আমার রাগারাগি হয়ে যাওয়াতেই আমি ওদের নাম বলে দিয়েছি। দেখা হলে সব বলবো। কিন্তু বিভূতি সাহা তো বলেছিল তোমায় এতে জড়াবে না। কিন্তু এ কি মতলব পুলিশের ?

এখন কী করলে ভালো হয় পত্রপাঠ জানিও। কালাচাঁদকে তোমার চিঠি দেখিয়েছি। সেও তোমার পরামর্শ চায়। ইতি

রনু

সে কি! ছোটকোন অর্থাৎ বিপদভঞ্জনের সঙ্গে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের জন্য পুলিশকে সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ? কেন কেশিয়াড়ীতে আমার কাছে সব লিখে জানানো হয়নি ? ব্যক্তিগত মতভেদের মধ্যে আই বিকে কেন ডাকা হলো ? এমনিভাবে গোখরো সাপের ল্যাজ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মূঢ়তা কেন ? কে সামলাবে এই বিপদের ঝক্কি ? এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবার পথ কোথায় ? কে বলে দেবে পথের সন্ধান ?···এমনি অনেক প্রশ্ন জাগলো মনে, অনেক জিজ্ঞাসা, যার জবাব পেলাম না খুঁজে। শুধু অন্তরে অন্তরে জানলাম যে, ঐক্যতান শেষ হয়ে গেছে, যবনিকা সরে গেছে, সহস্র দর্শকের অপলক চক্ষু উদগ্রীব হয়ে পড়েছে, এবার আসরে নামতে হবে। 'রণং দেহি' হুঙ্কার ছেড়ে আহ্বান জানিয়েছে প্রতিপক্ষ, এবার সুরু হবে ক্ষুরধার বুদ্ধির রক্তহীন সংগ্রাম—বাংলা সরকারের সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ বনাম দ্বিজেন গাঙ্গুলী—one against thousands······

পঞ্চান্ন

আই বি পুলিশের সঙ্গে জেল পুলিশের তফাৎ অনেক। আই বি পুলিশ প্রচ্ছন্ন, রহস্যময়, তাই অনেক সময় দুর্জ্জের্য়, আর জেল পুলিশ যেন সর্ব্বদাই দুপুরের রোদের মতো স্পষ্ট, অত্যন্ত বেশী প্রকট, তাই স্থূল। শত্রুপক্ষের দুর্গজয়ের সংকল্প নিয়ে আই বি এগিয়ে আসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে, পেছনের দেয়ালে গিয়ে গুপ্তদ্বারের বোতাম খুঁজতে থাকে আর জেল পুলিশের লরী আসে ফায়ার বিগ্রেডের গাড়ীর মতো ঘণ্টা বাজিয়ে, পথ কাঁপিয়ে, বুক কাঁপিয়ে, সিংহদ্বারের সমুখে এসে রুখে দাঁড়ায় সিংহের মতো। আই বি অনেক সময় কিল চুরি করে কিল ফিরিয়ে দেবার জন্যই, কিন্তু জেলের ইতিহাসে এক পা পেছিয়ে যাওয়ায় অবমাননা নেই। জলের নীচে নীচে এসে আই বি যখন হাঙ্গরের মতো টুক্ করে পা কেটে নিয়ে সরে পড়ে, মাথার ওপর তখন জেলের পুলিশ বজ্র হুঙ্কার ছাড়তে থাকে। আই বির গুপ্তচরেরা যখন মাটির নীচে নেমে চোরাবালি রচনা করে, জেলের অক্ষৌহিণী তখন পথের বাঁকে বাঁকে কাঁটা তারের বেড়া দেয়। আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখে আই বি সাদা পোষাকের নীচে আর জেল পুলিশের কাঁধে শোভা পায় মিলিটারী রাইফেল। ইঙ্গিতের মতোই আই বি অস্পষ্ট, ভবিষ্যতের মতোই অজানা। আর জেলের পুলিশ নির্লজ্জ বন্য শূকরের মতো, লোহার শিকে শিকে তার পালিশহীন বুদ্ধির স্থূলতা!

অনেক বুদ্ধি ব্যয় করে আই বি যখন পরামর্শ দিয়ে গেল আমায় সহ-আসামীদের থেকে পৃথক রাখতে, জেল পুলিশের ভ্যানিটিতে তখন ঘা লাগলো। জেল সুপার লিওনার্ড সাহেব তখন হোম-এ চলে গেছেন দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে, সুপার হয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিনটেনডেণ্ট এস. এল. পাটনী। আর জেলার সুধীর মুখার্জ্জী। সে যুগে এই পাঞ্জাবী সুপারটি বেশ সুনাম কিনেছিলেন যেমন বৃটিশ প্রভুর কাছে, তেমনি বিপ্লবী কয়েদী ও রাজবন্দীদের কাছেও। জেলের কোনো বিধি লঙ্ঘন যেমন বরদাস্ত করতেন না তিনি, তেমনি নেপালী দারোয়ানের মতোও প্রভুভক্ত ছিলেন না। আমার সুবিধে হলো সেইখানেই।

রঙ্গলালের সঙ্গে তখন বার কয়েক পত্রের আদানপ্রদান হয়ে গেছে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে আদালতে যথাসময়ে ইঙ্গিত করলেই কালাচাঁদ ও সে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেবে। লেবং মামলায় দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুশীল চক্রবর্ত্তীও ছিল

তখন চল্লিশ ডিগ্রিতে। তাকেও সংবাদ পাঠিয়েছি মৈনুদ্দীন মারফৎ; সেও সংবাদ পাঠিয়েছে, আমায় পর্য্যন্ত মামলায় জড়িয়ে ফেলায় আত্মগ্লানিতে রঙ্গলাল ও কালাচাঁদ মর্ম্মাহত। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে উন্মুখ তারা।

এমন সময় একদিন পাটনীকে নিবেদন করলাম যুক্তি দিয়ে যে, আমাদের মামলা যখন একই, তখন সব আসামীকেই এক জায়গায় রাখা উচিত। কারণ মামলা পরিচালনা সম্বন্ধে আমাদের পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দরকার, কোথায় টাকা, কম টাকায় কোথায় পাওয়া যাবে ভালো আইনজীবী, রাজনৈতিক মামলায় কার অভিজ্ঞতা বেশী—এমনি আরও কত প্রশ্নের মীমাংসা করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পাটনী বললেন, যুক্তি তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন বটে, কিন্তু প্রথমতঃ, মামলা এখনও সুরু হয়নি; দ্বিতীয়তঃ, আই বির হুকুম নেই।

চট্ করে প্রশ্ন করলাম: আই বির হুকুম নেই, মানে? জেল সুপার কি আই বির হুকুমে ওঠে বসে? জেলের মধ্যেও কি আই বির রাজত্ব? এখানেও গ্র্যাসবি—

এবার পাঞ্জাবীর পৌরুষে ঘা পড়লো। বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ও প্রভুভক্তিতে যিনি প্রায় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ফেলেছেন, বাংলার কারাসমূহের ইনস্পেক্টার জেনারেলের গদীতে উপবেশনের জন্য যাঁর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে, একটি জেলার আই বিদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করবার কাজ করতে হবে তাঁকে বোবা যন্ত্রের মতো? বিশেষ করে জেলের অভ্যন্তরে, যেখানকার হিটলার তিনি?···ল্যাজে ঘা খেয়ে পৌরুষ তার অকস্মাৎ ফণা বিস্তার করে উঠছিল অজগরের মতো, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, লোকটা যুক্তিবাদী। যুক্তিবাদী মানেই কতকটা মাটির মানুষ, সজ্জন, অথচ দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বাধা দিয়ে বললেন: না, না, জেলের মধ্যে গ্র্যাসবির হুকুম অচল। তোমার কথাও খুব যুক্তিপূর্ণ বটে। Let me see what can be done......

বেরিয়ে গেলেন পাটনী সদলবলে রাজছত্র মাথায় দিয়ে। কিন্তু হুজুরের মনোভাব আন্দাজেই আঁচ করে নিয়ে একদিন আদালতে নিয়ে যাবার সময় জেল অফিসে আমাদের সবাইকেই এক জায়গায় জড়ো করা হলো এবং আশ্চর্য্য যে, একই কয়েদী গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া হলো অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে। এ নিয়ে-যাওয়া ও নিয়ে-আসা কিন্তু একেবারেই নিয়ম পালন ও আইন-রক্ষা। আমাদের গ্রেপ্তারের মূলে রয়েছে আই বি। হুজনের [illegible]

লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীনগর থানায়। এবার আইন মাফিক মামলা সাজানোর ভার থানার ওপর।

কিন্তু আমাদের এই মামলা সাজানো বেশ দুরূহ ব্যাপার। প্রায় দেড় বছর পূর্ব্বেকার ঘটনা। ফরিয়াদী, অর্থাৎ দেলভোগ হাটের গরুর ব্যাপারীরা থানায় ডায়েরী করিয়েছিল যে, জনকতক লুঙ্গি-পরা মুসলমান তাদের আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। কাউকেও চিনতে পারেনি তারা। অকুস্থলে পুলিশ তদন্তে পাওয়া গিয়েছিল একখানা গরু চরাবার পাচনবাড়ি আর একখানা সবুজ রংয়ের পেষ্টবোর্ডে তৈরী ছোরার খাপ। থানার মালখানায় তা-ই যথারীতি জমা হয়ে গেল এবং ছ'মাস পর কোনো কিনারা করতে না পারায় অবশেষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে যথারীতি সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। শ্রীনগর থানার বড়বাবু দেলভোগের গণিকাপাড়ায় সে রাত্রে যে একদল বিদেশী এসে চম্পকরাণীর গৃহ আহারে, পানে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে সরগরম করে তুলেছিল, তাদের হাজতে পুরে ও মাস দুয়েক পর সগর্ব্বে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে কর্ত্তব্য সমাধা করে ফেলে-ছিলেন। দেড় বছর পর শুধু দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে এক হাত দেখিয়ে দেবার জন্যই আই বি কবর খুঁড়ে এই কঙ্কাল বার করেছে। এবার তাতে মাংস দিয়ে, শিরা-উপশিরা, মস্তিষ্ক দিয়ে, তার নিশ্চিহ্ন হৃদপিণ্ডে ধকধকানি জুড়ে দিয়ে মিশরের মমীকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে!······

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন ছিলেন, যত দূর মনে পড়ে, মিঃ জেঙ্কিন্‌স্‌। খাস বিলিতী সাহেব। হোম থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন বাংলা দেশের চপলমতি বালক-বালিকাদের সায়েস্তা করে ইংলণ্ড-মাতার রাজত্ব অটুট রাখবার মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। বালকবালিকারা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অভদ্র বলে এবং যখন তখন গুলী-খাওয়া বাঘের মত শিকারীর স্কন্ধে লাফিয়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কায় শক্ত লোহার জাল দিয়ে ঘেরা তাঁর এজলাস, ঘেরা আসামীর কাঠগড়া এবং সাক্ষীরও।

হুড়হুড় করে আমাদের দশ-বারোজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আসামীর খাঁচায়। আর উলটো দিকে সাক্ষীর জন্য নির্দ্দিষ্ট কাঠগড়ায় এনে হাজির করা হলো রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। মামলা হবে না, তাই কক্ষে উকিল মোক্তারের ভিড় নেই, আমাদের জন্য কোনো উকীলও তখন দেয়া হয়নি। বাংলা দেশে এমনি রাজনৈতিক মামলা হামেসাই হয়ে থাকে, তাই আমাদের জন্য বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও একে একে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু কোথায় আমাদের প্রতিপক্ষ, শ্রীনগর থানার দারোগা খগেন রায়? খাঁচায় আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম এক পাল মেষের মতো, যেন পুরোহিত খগেন্দ্র রায় দেবশর্ম্মা ফুলবেলপাতা নিয়ে এসেই আমাদের স্কন্ধে রেখা এঁকে মন্ত্রোচ্চারণ করে উৎসর্গ করে দেবেন বৃটিশ মা কালীর পায়ে!...

জেঙ্কিন্‌স্ বার বার চাইছেন কোর্ট ইনসপেক্টারের পানে, ইনসপেক্টার চাইছেন অবিনাশ দারোগার পানে আর অবিনাশ বার বার বারান্দায় এসে দৃষ্টিক্ষেপ করছেন পথের পানে—কোথায় শ্রীখগেন রায়?...আমরাও বিরক্ত হয়ে উঠেছি। পূর্ব্ব ব্যবস্থামত রঙ্গলাল আমার পানে চাইলো, আমি ইসারায় বারণ করে দিলাম অর্থাৎ ওদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করবার সময় এখনো আসেনি।

বেশ একটু পর ঝড়ের বেগে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলেন বহু প্রত্যাশিত খগেন রায়। বগলের কাগজপত্র ও ফাইলগুলো ঝপ্ করে টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে ছ'খানা ঝপাৎ করে মেঝেয় পড়ে গেল, কিন্তু সেদিকে চাইবার তাঁর অবসর কোথায়? এবার চাণক্যের সম্মুখে হাজির করা হয়েছে বৃটিশরাজের শ্যালক বাচাল খগেন রায়কে। স্যার স্যার করে তোতলাতে তোতলাতে কম্পিতকলেবরে তিনি যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর যা নিবেদন করলেন, তার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, প্রায় শেষ করে এনেছেন তদন্ত, আর ছ'তিন সপ্তাহ সময় পেলেই তিনি অভিযোগপত্র পেশ করবেন চুরি, ডাকাতি, ষড়যন্ত্র ও নরহত্যা সংক্রান্ত বাছা বাছা ধারা অনুযায়ী। অতএব—

অকস্মাৎ আমি সহাস্যে নিবেদন করলাম ম্যাজিষ্ট্রেটকে: জামিন অবশ্য আমরা চাই না, কারণ জেলের মধ্যে ভালই আছি। আই বি টিকটিকিদের উৎপাত নেই। কিন্তু শ্রীনগরের মত বিখ্যাত থানার ভারপ্রাপ্ত ততোধিক বিখ্যাত দারোগা খগেন রায় কি জানেন না যে, আদালতে আসতে হলে মাথার টুপিটা সোজা করে পরে আসতে নয়, নইলে আদালতের অবমাননা—

খগেন রায় ঝটিতি টুপিটা ঘুরিয়ে প'রে ফেললেন, সহ-আসামীরা সবাই হেসে উঠলো, অবিনাশ দারোগা হাসি চাপতে না পেরে বারান্দায় পালিয়ে গেলেন, স্বয়ং বিচারক জেঙ্কিন্‌সের মুখমণ্ডলের প্রস্তরফলকে হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

কয়েদী গাড়ীতে জেলে ফিরে আসবার সময় হলো আলোচনা। মনোমালিন্য সুরু হয় রঙ্গলালের সঙ্গে ছোটকোনের। আমি মেদিনীপুর চলে যাবার পর সর্ব্বকার্য্যের নেতৃত্ব থাকবে কার হাতে, তাই নিয়ে হলো মতভেদ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিপ্লবী দলে প্রস্তাব পাশ করে লীডার নির্ব্বাচন হয় না। মনোনয়নের

সুযোগ নেই সেখানে। সুকঠিন কাজের মধ্য দিয়ে সেখানে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, নেতা সৃষ্টি হয়। এরা ছেলেমানুষ। তাই ঠোকাঠুকি লেগে গেল। ক্রমে ক্রমে তা এমনি তীব্র হয়ে দাঁড়ালো যে, একে অপরকে যে কোনো প্রকারে জব্দ করবার ফিকির খুঁজতে লাগলো। একদলের নেতা রঙ্গলাল, আর এক দলের মুখপাত্র ছোটকোন অর্থাৎ বিপদভঞ্জন। দলে ভারী বিপদভঞ্জনের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে রঙ্গলাল ঢাকায় এসে দেখা করলো আই বি ইনসপেক্টার বিভূতি সাহার সঙ্গে। পাইথন যেমন করে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ছাগশিশুকে, তেমনি করে বিভূতি সাহা লুফে নিলেন রঙ্গলালকে ও ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে ফেললেন তাকে। কালাচাঁদ এসে রঙ্গলালের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নেহাৎ পুলিশের মারের চোটে আর গ্র্যাসবি সাহেব প্রদত্ত আর্থিক প্রতিশ্রুতির লোভে।

উল্টোপাল্টা অনেক কথাই বলেছে ওরা দু'জন। তাই গ্রেপ্তারও হয়েছে জন দশ-বারো। তার মধ্যে সুবোধ চক্রবর্ত্তীও আছে, নেপালও আছে, মনীন্দ্রও আছে, আর আছে আমাদের গ্রামের ক'জন।

কিন্তু দু'দলের কেউ ভাবতেই পারেনি যে, আই বি আমাকেও ফিরিয়ে এনে এদের দলে ভিড়িয়ে দেবে এবং শুধু ভিড়িয়ে দেবে নয়, পুরোভাগে এগিয়ে দেবে। আমি আসাতেই এদের টনক নড়ে গেছে। আমায় জেল থেকে রক্ষা করবার জন্য এরা এখন যে কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত বলে সবাই একবাক্যে ঘোষণা করলো।

আমাদের প্রত্যেকের পরিবারে সাড়া পড়ে গেছে। জেলে গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে রয়েছি আমরা, আর জেলের বাইরে থেকে তাঁদের নিদ্রা নেই, আহার নেই। দুশ্চিন্তায় তাঁরা যে একেবারে পাগল হয়ে যেতে বসেছেন!......

একদিন ফুলদা এসে দেখা করে জানিয়ে গেলেন যে, উকিল রজনী দাস আমাদের পক্ষে দাঁড়াবেন আর যদি ঢাকাতেই মামলা সুরু হয়, তাহলে স্বয়ং শ্রীশ চাটার্জ্জীকে পাওয়া যাবে। মুন্সীগঞ্জে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। রজনী দাস আমার সঙ্গে একদিন দেখা করে গেলেন। আইনজীবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় আই বি উপস্থিত থাকবার নিয়ম নেই। রাজসাক্ষী দুজনই যে তাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেবে, এই সুসংবাদ শুনে বললেন : আপনি যদি তাই করে দিতে পারেন দ্বিজেনবাবু, তাহলে মামলা আমি তচনচ করে দেবই।

প্রশ্ন করলাম : ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে প্রদত্ত স্বীকারোক্তি কি আইনতঃ প্রত্যাহার করা যায় ?

জবাব দিলেন রজনী দাস : সাধারণ আইনে প্রত্যাহার করলেও অবশ্য তার

ফলাফল থেকে নিষ্কৃতি নেই সত্যি, কিন্তু সে কাজের ভারটা থাক না আমার ওপর। আপনাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি। কালাচাঁদ আর রঙ্গলাল যদি যথাসময়ে তাদের কন্‌ফেশন প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে আপনাদের আটকে রাখতে হলে অনেক তেল-নুন খরচা করতে হবে আই বি-র। এত সহজে চিড়ে ভিজবে না।— তারপর হেসে বললেন : দেশবন্ধুর তামাক বৃথাই সাজিনি দ্বিজেনবাবু!

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্য তামাক অবশ্য উনি সেজে দেননি, তথাপি তাঁর জুনিয়র হিসেবে অনেকগুলো রাজনৈতিক মামলা পরিচালনা করেছেন রজনী দাস। চেহারা একেবারেই বিশ্রী। যেমন কালো রং, তেমনি বেঁটে ও রোগা! কিন্তু চশমার ওপর দিয়ে নয়, মাঝখান দিয়েই সাপের মতো অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকান সাক্ষীর চোখের পানে, গুরুগম্ভীর কণ্ঠের যুক্তিপূর্ণ সওয়াল আদালতকক্ষের দেয়ালে ঘা খেয়ে খেয়ে বিচারকের মনেও প্রতিধ্বনি তোলে। শুনেছি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করবার যাদুই-কা-খেল্ তাঁর আয়ত্তে। প্রতিপক্ষের কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে যে তিনি সরু একটি বিষাক্ত সুঁচ দুই পাঁজরার মধ্য দিয়ে খচ্ করে চালিয়ে দিয়ে তার ফুসফুস ফুটো করে দেবেন, কেউ তার হদিস পায় না। দধীচির মতো মরা হাড়ে ভেলকি খেলে শুনেছি। ঢাকা শহরের নামজাদা উকিল রজনী দাস।

সুবিধে হলো। পাটনীকে আবার একদিন ধরে বসলাম : স্যার, আমাদের মামলা পরিচালনার জন্য উকিল নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু সবাই এক জায়গায় বসে পরামর্শ না করে নিলে সাফাইয়ের যুক্তি খাড়া করা যাবে কীভাবে? আমাদের আইনগত অধিকার—

এবার পাটনী জল হয়ে গেলেন। আইনগত অধিকার খর্ব্ব করতে রাজী নন তিনি। তৎক্ষণাৎ আমাদের সবাইকে পাগলা গারদের একটি বৃহৎ কক্ষে একসঙ্গে রাখবার হুকুম দিয়ে গেলেন।

চল্লিশ ডিগ্রি থেকে দূরে সরে এলাম বটে, কিন্তু পেলাম সবাই একসঙ্গে থাকবার চমৎকার সুযোগ। তখন শীতকাল। বোধহয় ডিসেম্বর মাস। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চমৎকার ওলকপির ক্ষেত, দূরে আলুর। এতে জল দেবার ব্যবস্থাটি ভারী সুন্দর। গাছের সারির পাশ দিয়ে-দিয়ে এমনিভাবে নালি কাটা আছে যে, জল কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে না, ঐ নালি দিয়ে বয়ে চলে। একটি সারি জলসিক্ত হয়ে যাবার পর তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে অপরটির খুলে দেওয়া হয়। বিরাটাকার ওলকপি। অথচ তা কয়েদীদের খাবার জন্য তোলা হয় না, তোলা হয় বাইরের বাজারে বিক্রয়ের জন্য।

ভালোই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ভবিষ্যৎ একেবারে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে ছেলেদের বৈপ্লবিক নীতি শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট জেঙ্কিন্‌সের আদালতে আর একদিনের ঘটনা বলছি।—

সেদিনও তুদিকের খাঁচায় আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। অবিনাশ দারোগা সহাস্যে এগিয়ে এসে মিঠে স্বরে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। যথারীতি খগেন রায় দেরীতে এসে প্রবেশ করলেন হন্তদন্ত হয়ে, সবিনয়ে জানালেন যে, এবার স্যার তদন্ত শেষ করে ফেলেছি। শুধু মামলাটা যাতে মুন্সীগঞ্জে হয়, তার অনুমতির জন্য লেখা হয়েছে সরকারকে। সেটা এসে গেলেই স্যার—নইলে মামলা আমার রেডি স্যার…

জেঙ্কিন্‌স্‌ ভ্রূকুঞ্চিত করে মন্তব্য করলেন: But it is more than three months—

হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, তা স্যার, তা স্যার করে যূপকাষ্ঠের পার্শ্বে ছাগশিশুর মতো চিঁচিঁ করে আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন খগেন রায়: আর স্যার এক উইক, তার মধ্যেই আমি স্যার—

এমন সময় রঙ্গলাল আমার দিকে চাইতেই আমি ইসারায় জানিয়ে দিলাম যে, এখনো প্রত্যাহারের সময় আসেনি। কিন্তু রঙ্গলাল নিশ্চয়ই ভুল বুঝে ফেললো। একটু পর সে অকস্মাৎ জেঙ্কিন্‌স্‌কে বললো যে, তার কিছু বলবার আছে।

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন জেঙ্কিন্‌স্‌: Yes!

রঙ্গলাল বললো: I want to speak in your chamber.

Gladly!—বলে জেঙ্কিন্‌স্‌ উঠে পড়লেন। আমিও প্রাণপণে ইসারা করে জানাতে চেষ্টা করলাম, এখনও নয়, এখনও নয়। দেখলাম, রঙ্গলাল বুঝতে পেরেছে এবং মৃদু হাস্যে অভয় দিচ্ছে। নিশ্চিন্ত হলাম। রঙ্গলালকে পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস কামরায় নিয়ে গেল, আমাদের নিয়ে এল বারান্দায়।

বাইরে এসেই একেবারে মা'র সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল। হ্যাঁ মা, স্বয়ং মা, আমার মা, আমার দুঃখিনী মা! আমাদের সবার মা!

একে একে সবাই দু'হাতে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম। প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরলেন মা জাপটে একেবারে বুকের সঙ্গে, ব্যথা-জর্জ্জর পঞ্জরের সঙ্গে…তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আজও স্পষ্ট, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে পড়ে তাঁর সেই শোকাকুল অন্তরাত্মার আর্ত্তনাদ। একে একে জড়িয়ে ধরছেন সবাইকে আর

ক্রন্দন-ভাঙ্গা স্বরে বলছেন : কতবার বারণ করেছি তোদের, কতবার সাবধান করে দিয়েছি এসব কাজে যাসনি, যাসনি। শুনিসনি আমার কথা, শুনিসনি মা-বাবার কথা। এখন কী করবো বলতে পারিস ? বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো কি ? কিন্তু তবুও তো বাঁচানো যাবে না তোদের !

নেপাল আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট ও পাড়ার সবার চাইতে বড়লোক পিতার কনিষ্ঠ ও আদুরে পুত্র। তাকে বুকে টেনে নিয়ে মা বলে উঠলেন : এতটুকু ছেলে, সেদিনও তোকে প্যাণ্ট পরে থাকতে দেখেছি রে, তুইও এই দলে মিশেছিস্ ?

বিপদভঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন : বল্ তো, কী বলে প্রবোধ দোব তোর মাকে ?, কী বলে বোঝাবো ? আমি ফিরে গেলেই তো সব মায়েরা এসে জিজ্ঞেস করবেন, কেমন দেখলেন ওদের, দিদি ! কী বলবো তাঁদের ? কী জবাব দোব ?—ইস্, কী কালো হয়ে গেছিস্ ! কতখানি শুকিয়ে গেছিস্ !—কেন রে, ছুনিয়ায় আর কি ছেলে ছিল না ?

এগিয়ে এলাম আমি। মা আবার আমায় জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। গালে এক চড় কসিয়ে দিয়ে বললেন : এই হারামজাদাই যত অনিষ্টের গোড়া। তুই-ই নষ্ট করেছিস্ সবাইকে—

প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলাম প্রাণপণে : জানো না মা, জেলের মধ্যে খুব ভালো আছি আমরা। একসঙ্গে খাই, একই ঘরে গদী-আঁটা খাটে শুই। রীতিমত ভালো খাওয়া, রোজ মাছ আর মাঝে মাঝে মাংস। কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, খালি বই পড়ি আর গান করি। সবার মাকেই বলে দিও তুমি যে, আমরা ভালো আছি, বেশ ভালো। ওজন বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। আর মামলার কথা যা বললে না, তাহলে শোন—

কিন্তু আর শোনানো হলো না। ঠিক এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস কামরা থেকে বেরিয়ে এল রঙ্গলাল আর কালাচাঁদ। অভিভূত মা যেন এদের দু'জনকে ভুলেই ছিলেন এতক্ষণ। এবার ছুটে এগিয়ে গেলেন এবং ওদেরকে ধরে প্রথমেই অত্যন্ত বেয়াড়া একটা প্রশ্ন করে বসলেন : তোরা দু'জন আবার আলাদা কেন রে ?

দেখলাম, লজ্জায় ও ঘৃণায় রঙ্গলালের ফর্সা মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে উঠেছে। অসহ্য আবেগে কাঁপছে তার নিশ্চুপ অধর, চোখ তুলে মার পানে চাইতে পারছে না সে।···আবার এগিয়ে গেলাম আমি। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম, বললাম : ওরা দু'জন ভুল করে ফেলেছিল, পুলিশকে বলে দিয়েছিল

কিছু কথা। কিন্তু মা, সেজন্য ভেবো না তুমি, ওরা কথা প্রত্যাহার করবে বলে কথা দিয়েছে—

রাজসাক্ষীদের দু'জনকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল। মাকে ঘিরে ছেলেরা সব দাঁড়িয়েছিলাম, অকস্মাৎ শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখি, এতক্ষণ যাঁকে একেবারেই লক্ষ্য করিনি, লক্ষ্য করবার ফুরসৎই পাওয়া যায়নি, তিনি হচ্ছেন আমার দূর সম্পর্কীয় কাকা মণিমোহন চক্রবর্ত্তী। সেই সুহাসিনীর বাবা মণিমোহন কাকা। ঢাকা শহরের স্বনামধন্য মোক্তার এম. চক্রবর্ত্তী। আইনের অনেকগুলো দুর্ব্বোধ্য ধারা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে ঘড় ঘড় করে তিনি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই যে, আই বি-র দুয়ারে একবার ধর্ণা দিয়ে যখন কিছুতেই কিছু হলো না, তখন তিনি মাকে নিয়ে সোজা এসে হাজির হলেন একেবারে জেঙ্কিন্‌স্‌ সাহেবের আদালতে। এখানে ইণ্টারভিউ এ্যালাউ করার কর্ত্তা আই বি নয়, ম্যাজিষ্ট্রেট। অমুক ধারার অমুক উপধারার খ অধ্যায়ে বর্ণিত আইনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুঝলাম, মণিমোহন কাকা একটা বীরত্বের কাজ করে ফেলেছেন। আইনের জ্ঞান যে তাঁর কত গভীর, সে ধারণা আমার পূর্ব্বেও যেমন ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু তাঁর ছেদ ও যতিহীন অনর্গল বক্তৃতার মধ্য দিয়ে একটি স্বচ্ছ দরদী অন্তরের পরিচয় পেলাম। কৃতজ্ঞতা জানালাম মনে মনে।······

তারপর এলো বিদায়ের পালা। বারান্দার অপর প্রান্তে অবিনাশ দারোগার পুনরাবির্ভাব হওয়ায় বোঝা গেল আমাদের সময় উত্তীর্ণ। অতএব—

অতএব মণিমোহন কাকার পশ্চাতে মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। যন্ত্র-চালিত পুতুলের মতো আমরাও এসে উঠলাম ঢাকা অন্ধকার কয়েদী-গাড়ীতে। পাশাপাশি বসলাম। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালা পড়লো। মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, গাড়ী চলছে।

চলছে তো, চলছেই। পটুয়াটুলী, বাবুর বাজার, ইসলামপুর অতিক্রম করে চক বাজারের কাছাকাছি আসতেই ঝাঁকুনি লাগছে। রাস্তা খারাপ। একটু পরই তো জেলের ফটক। এতখানি পথ অতিক্রম করে এলাম একেবারে নীরবে। অনেক কথা বলেছি অন্য দিন, অনেক হেসেছি। আজ আর কেউ কথা কইলো না। কইতে পারলো না বুঝি। গলা বেয়ে কী যেন একটা ঠেলে ওপরে উঠছিল, বার বার চোখের কোণটা ভিজে-ভিজে উঠছিল······

—জেলের ফটক খুলে গেল। এবার নামতে হবে।

ছাপ্পান্ন

খগেন রায়ের এক উইক শেষ হতেই আবার আমাদের আনা হলো জেলের বাইরে। আদালতে সোজা না নিয়ে রাখা হলো হাজতে। আদালতপ্রাঙ্গনের এক-পাশে এক সারি মাঝারি আকারের হাজতকক্ষ। প্রত্যেকটি কক্ষের সম্মুখেই ছোট একটি বারান্দা, বারান্দাও ছাদহীন কক্ষের মতো, তার সম্মুখে কাঠের দরজা।

আমাদের পাশের কক্ষেই রাখা হয়েছে রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। সেদিন জেঙ্কিন্‌স্‌কে কী বলেছে রঙ্গলাল, জানতে পারা যায়নি। জানা দরকার। স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কথা পূর্ব্বাহ্লেই বেফাঁস হয়ে গেলে আই বি সতর্ক হয়ে পড়বে যে!

মাঝে মাঝে খাঁকি পোষাক-পরা স্মার্ট সহ-দারোগারা এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের। দু'-একটা গালগপ্পও করছেন। প্রবোধ দিচ্ছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সরজমিন তদন্তে কোথায় গেছেন, এলেই আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে। বেশীক্ষণ আর হাজতভোগ করতে হবে না। আর একবার এসে বললেন যে, মণি চাটার্জ্জী নামে এক ভদ্রলোক এসেছেন আপনাদের বিপদভঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ইণ্টারভিউ-এর পারমিশন—

অকস্মাৎ অনুরোধ জানালাম: একটা সিগারেট দেবেন দারোগাবাবু? অনেকক্ষণ খাইনি কিনা, গলাটা—

বিলক্ষণ!—বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি: কিন্তু দ্বিজেনবাবু, সিগারেট তো আমি খাইনে।—আচ্ছা, আপনাকে এনে দিচ্ছি।

বললাম: থাক্, থাক্, আর কিনতে হবে না। তার চাইতে এক কাজ করুন না, ঐ যে মণি চাটার্জ্জীর নাম করলেন না, ওকে বলুন, ও দুটো সিগারেট কিনে দেবে'খন। কেমন?

স্মার্ট সহ-দারোগা বেরিয়ে গেলেন। ছেলেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো, কারণ সবাই নিশ্চিতভাবে জানে, সিগারেট আমি খাইনে। বিপদভঞ্জন জিজ্ঞেস করলো: সে কি দাদা, সিগারেট?

Nothing is unfair in war!—তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম: পঞ্চাশ টাকার এ এস আই-কে সম্বোধন করেছি, দারোগাবাবু! সিগারেট খাবার পয়সা নেই যার, সে যদি বিনে-খরচায় একটা টান মারবার সুযোগ পায়, তাহলে ছাড়বে কেন তা? কিন্তু আমি ওকে দেবো না।

সহ-দারোগা ফিরে এলেন দুটো সিগারেট নিয়ে, সঙ্গে দেশলাই। হাতে দিয়ে বললেন : দেখবেন দ্বিজেনবাবু, আর যেন কেউ টের না পায় আপনাকে সিগারেট দেবার কথা, তাহলে আমার চাকরি—

বাধা দিয়ে বললাম : ছিঃ ছিঃ, বলেন কি ? আমার অনুরোধ রাখলেন আপনি, এর পর আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো, দারোগাবাবু? তা কি হয় ?

কেশিয়াড়ীতে সিগারেট খেতে হয়েছিল বলে সিগারেট ধরাবার ও ধূমপানের কায়দাটা আমার বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ভদ্রতা করে এ এস আই দেশলাই জ্বালালেন, আমি সিগারেট ঠোঁটে চেপে মুখখানা এগিয়ে দিলাম। তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে দিলাম : মণি চাটার্জ্জীর দেশলাইটা দিতে যাচ্ছেন তো, দয়া করে একটা কাজ করবেন ? খবর নিয়ে আসবেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তদন্ত করে ফিরেছেন কিনা ?

নিশ্চয়ই আসবো।—

মূর্খ এ এস আই বেরিয়ে যেতেই আমার প্ল্যান ব্যাখ্যা করলাম। ছোট এক টুকরো কাগজে পেন্সিল দিয়ে খগেন লিখলো :

জেঙ্কিন্‌স্‌কে কী বলেছ জানিও। প্রত্যাহারের কথা আই বি যেন ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। ওদের তাল দিয়ে যাবে আর কালাচাঁদকে সর্ব্বদা রেডি রাখবে। মামলা হবে মুন্সীগঞ্জে। সেখানে ঠিক কোন্ সময় প্রত্যাহার করতে হবে আমি ইসারায় জানিয়ে দেবো।

কাগজখানা সাবধানে মুড়ে ফেলা হলো। তারপর দ্বিতীয় সিগারেটটি থেকে সাবধানে কিছু তামাক পাতা বার করে নিয়ে কাগজটি তার মধ্যে পুরে দিয়ে আবার পাতা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো। খানিকক্ষণ পর স্মার্ট এ এস আই ফিরে আসতেই অনুরোধ জানালাম : দেখুন দারোগাবাবু, একটা অনুরোধ জানাবো, রাগ করবেন না যেন। ওধারে যে দু'জন আছে, জানেনই তো ওরাও একই মামলার আসামী। ওর মধ্যে রঙ্গলালবাবু সিগারেট খান। আমি খাচ্ছি আর ওই ভদ্রলোক পাচ্ছেন না, এটা যেন ভারী খারাপ দেখাচ্ছে। আমায় যখন দিয়েছেন খেতে, তখন ওকেও একটা দিলে আমরা খুশী হই। যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে এই সিগারেটটাই না হয়—কেন আবার মিছে চাইতে যাবেন ?

স্মার্ট এ এস আই খুব স্মার্টভাবে ফাঁদে পা দিয়ে বসলেন। রঙ্গলাল যে আমার ভাই, তা এদের জানবার কোন কারণ নেই। তাই আমার হাত থেকে

সিগারেটটি নিয়ে নির্বিবাদে দিয়ে এলেন রঙ্গলালকে, বলে এলেন যে, ওধারের দ্বিজেনবাবু ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রমাদ গুনলো রঙ্গলাল। দাদা পাঠিয়েছেন সি—গা—রে—ট ?…কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আসল ব্যাপারটি বুঝে ফেলতে দেরী হলো না তার। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে এ এস আই বেরিয়ে যেতেই সে সিগারেটটি ছিঁড়ে ফেললো।

১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে সদলবলে এলাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমা জেলে। জেনানা ফাটকে রাখা হলো রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে। একবার এসেছিলাম আইনভঙ্গের অপরাধে। সে অভিযোগ ছিল সামান্য। এবার এসেছি বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীরূপে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কতার সীমা নেই।

কালীপদ মৈত্র বদলী হয়ে গেছেন কিংবা রিটায়ার করেছেন। তাঁর স্থানে মহকুমা হাকিম হয়ে এসেছেন রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে আমাদের বিচার করবেন ইনি। মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা মাত্র দুই বা বড় জোর তিন বৎসর কারাদণ্ড, আর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ইনি সাত বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ড দিতে পারবেন।

মামলার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে গেছি। বাইরের আত্মীয়-স্বজনেরা একত্র হয়ে পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করেছেন ঢাকার রজনী দাসকে আর তাঁর জুনিয়র-রূপে কাজ করবার জন্য মুন্সীগঞ্জের মোক্তার জিতেন চক্রবর্ত্তীকে। শ্রীশ চাটার্জ্জী ঢাকা ছেড়ে আসতে পারবেন না। শেষ পর্য্যন্ত খগেন রায় অভিযোগপত্র পেশ করতে পেরেছেন মাত্র আমাদের ছ'জনের বিরুদ্ধে—রঙ্গলাল, কালাচাঁদ, খগেন, অনাথ, বিপদভঞ্জন ও আমি। অবশিষ্ট সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আই বির যথাকর্ত্তব্য তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই করছে। তারা রটিয়ে দিয়েছে যে, এরা মারাত্মক আসামী। গভীর রাত্রে জেলের দেয়ালের বাইরে থেকে এদের লোক এসে উচ্চৈঃস্বরে কথা কয় এদের সঙ্গে। সুতরাং বারোজন সশস্ত্র গাড়োয়ালী সেনার একটি স্কোয়াড ঢাকা থেকে এসে পড়লো এখানে। জেলের কাছেই পড়লো তাদের তাঁবু। চব্বিশ ঘণ্টা তারা জেলের দেয়াল পাহারা দিতে লাগলো বন্দুক কাঁধে। শুধু তাই নয়। আমাদের সাকরেদরা কখন এসে ম্যাজিষ্ট্রেটের ওপর গুলী চালিয়ে দেবে কে জানে! তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ভবেশ রায়ের একজন রিভলভারধারী দেহরক্ষী নিযুক্ত হলো। অর্থাৎ

আই বির আবহাওয়া এমনি উত্তপ্ত করে তুললো যে, অবধারিতভাবেই সবাই বুঝে নিলেন, দ্বিজেন গাঙ্গুলী এবার সত্যিই তাহলে পরাজিত হলেন।......

মুন্সীগঞ্জে মামলা আরম্ভের দিনটিতে আদালতে যে নাটকাভিনয় হয় আজও তা বেশ মনে আছে।

অফিসের বাবুর মতো তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলাম আমরা। জেল-গেটের বাইরে এসে দেখি বারোজন গাড়োয়ালী সেনা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। শ্লোপ আর্ম্ করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। অর্ডার দিলাম:

ফল্ ইন

আইজ—ফ্রন্ট

রাইট—টার্ণ

কুইক—মার্চ্চ

এগিয়ে চললো আমার সেনাবাহিনী গাড়োয়ালীদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে। একেবারে নিখুঁত মার্চ্চ! হাই স্কুলের পেছন দিয়ে এসে খালের ওপরকার বৃহৎ কাঠের সেতু পার হয়ে আদালত প্রাঙ্গণে পড়লাম। সেনাবাহিনী থামবার সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দিলাম: হল্ট।

আদালত কক্ষে প্রবেশ করামাত্রই দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো, প্রহরায় দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র একজন সেনা। আই বির অনুমতিপত্র ব্যতীত সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কক্ষ লোকে লোকারণ্য। উকিল-মোক্তারে একেবারে ঠাসা, তাছাড়া কিছু দর্শক আর এসেছেন ফুলদা, অনাথের দাদা, মণি এবং আরো ক'জন। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শক্ত ক্রিজওয়ালা ট্রাউজার পরে এসেছেন, রিভলভারের খাপ ও বেল্ট বার্নিশ করা, পিতলের চাকতিগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। এক পাঁজা ফাইল ও কাগজপত্র নিয়ে এসেছেন খগেন রায় জুনিয়র কাউন্সিলের মতো। আমাদের মোক্তার জিতেন চক্রবর্ত্তী উসখুস করছেন, রজনী দাস ঢাকা থেকে এখনো এসে পৌছোননি। অতি সাধারণ দর্শকের মতো সাদা পোষাকে প্রথম বেঞ্চির এক পার্শ্বে ভালো মানুষটির মতো বসে আছেন অবিনাশ দারোগা—বোধহয় গ্র্যাসবি সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে।

মোটা কাঁচে ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন। ওপারে বসে আছেন গাম্ভীর্য্যের

খোলস পরে রায় বাহাদুর ভবেশ রায়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে প্রত্যেক দিনের শুনানীর জন্য পাবেন ২০০৲ টাকা করে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক।

মামলা সুরু করবার জন্য আদেশ উচ্চারণ করতেই জিতেন চক্রবর্ত্তী আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, আসামী পক্ষের প্রধান উকিল রজনী দাস ঢাকা থেকে এখনো এসে পৌছুতে পারেননি, তাই আধ ঘণ্টা সময় দিতে আজ্ঞা হোক।

আজ্ঞা হলো। রঙ্গলাল কাঁচের ওপার থেকে আমার পানে চাইলো, আমি মৃদু হাস্য করলাম মাত্র। সেও হাসলো। এই হাসি কিন্তু অবিনাশ দারোগা দেখে ফেললো এবং আমার দিকে তাকিয়ে এমনিভাবে মুখবিকৃত করলেন যেন বোঝাতে চাইলেন, তোমার হাসিতে আর ফল হবে না বন্ধু, রোগ হকিমির বাইরে চলে গেছে!……

আধ ঘণ্টা শেষ হয়ে যেতেই ইন্‌স্‌পেক্টার আবার আবেদন জানালেন, জিতেন চক্রবর্ত্তীও পাল্টা আবেদনে আরও আধ ঘণ্টা সময় চাইলেন। কিন্তু এবার হাকিম হুকুম দিলেন: মামলা সুরু হোক।

রঙ্গলাল আর কালাচাঁদকে একেবারে হাকিমের পাশে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। রঙ্গলাল আর একবার চাইলো আমার পানে। এবার ভেল্‌কি দেখাতে আর ভুল করলাম না। ইসারায় জানিয়ে দিলাম: This is the time—

অবিনাশ দারোগা আবারও লক্ষ্য করেছেন আমায়। কিন্তু অবজ্ঞার চাপা হাসিতে মুখমণ্ডল তাঁর বিকৃত মনে হলো।…কিন্তু কতক্ষণ, কতক্ষণ তোমার এই আত্মম্ভরিতা, এই অবজ্ঞা?

যেই ইন্‌স্‌পেক্টার আসামীদের তালিকা পাঠের পর রাজসাক্ষী দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন, অমনি রঙ্গলাল ইংরেজীতে বললো: I have something to say, Sir!

বেশ, বল।—ভবেশ রায় জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন।

আমি যা বলেছি, পুলিসের শিখিয়ে দেওয়া কথা বলেছি। সুতরাং আমার বিবৃতি আমি withdraw করছি।—বলেই সে বার বার চিমটি কাটলো কালাচাঁদের হাতে।

সে কিন্তু রঙ্গলালের কথায় সায় দিল না পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত। কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভবেশ রায় জিজ্ঞেস করলেন: তুমি withdraw করছো কি?

নির্লজ্জ কালাচাঁদ মৃদুস্বরে জবাব দিল: না।

ভবেশ রায় হুকুম দিলেন: Then it is evident that Rangalall Ganguly is not a witness, but an accused. He may be led to the accused box!

বেরিয়ে এল রঙ্গলাল গট্‌গট্‌ করে। আমাদের কাঠগড়ায় উঠে আসতেই সর্ব্বাগ্রে বিপদভঞ্জনই দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো তাকে, পিঠ চাপড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলো: সাবাস্ রঙ্গুদা, সাবাস্।

তাকিয়ে দেখলাম, কালাচাঁদ তেমনি মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে সে দলের সঙ্গে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে, রঙ্গলালের সঙ্গে, ঢাকা জেলের আমাদের শুভানুধ্যায়ী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে। কী শাস্তি এই দেশদ্রোহীদের ?······

তাকিয়ে দেখি, এবার ল্যাজ গুটিয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো অবিনাশ দারোগা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ যে কল্পনাও করতে পারেনি ও ব্যাটা!

কিন্তু এমন সময় ভেজানো দ্বার সটান মেলে দিয়ে উকিল-মোক্তার-দর্শকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গুটি গুটি পা ফেলে এসে হাজির হলেন খর্ব্বকায় স্বয়ং রজনী দাস। একেবারে পোষাক এঁটে এসেছেন রণং দেহি মূর্ত্তিতে। এসেই নাটকীয় ভঙ্গীতে চশমার মধ্য দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন: I see—the principal Approver is already led to the accused box, but still a remnant remains—a weakling as the last ray of hope of the Intelligence Branch. Well, my dear boy—বলে ছুটো প্রশ্ন করলেন কালাচাঁদকে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে: তুমি বুঝি রাজসাক্ষী ?

কালাচাঁদের মুখে কথা ফুটলো না।

লজ্জা কি ? নাচতেই যখন নেমেছ, তখন আর ঘোমটার বালাই কেন ?

তারপরই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা সুরু করলেন রজনী দাস। প্রথমেই দুঃখ প্রকাশ করলেন অনিবার্য্য বিলম্বের জন্য। ষ্টীমার লেট্ ছিল। তারপর জানালেন অভিযোগ, গুরুতর অভিযোগ। এ কাজির বিচার নয় যে, খাসকামরায় বসে খুশীমত কাজি শিরশ্ছেদের হুকুম দেবেন। এ প্রকাশ্য আদালত, জনসাধারণের আইনগত অধিকার আছে to be present and to watch the proceedings! আই বি এখানকার মালিক নন যে, তাঁরা খুশীমত দরজা বন্ধ করে রাখবেন। This is a serious encroachment upon the jurisdiction of the Court and privileges of the public. I appeal to your honour—

কিন্তু এ্যাপিল আর করতে হলো না। এ যে রজনী দাস, ঢাকার বিখ্যাত উকিল রজনী দাস। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রাক্তন সহকারী। রাজনৈতিক মামলা পরিচালনায় ধুরন্ধর রজনী দাস। সুতরাং তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দেবার হুকুম হলো, অনুমতিপত্রের বাধা বাতিল করে দেওয়া হলো। সাধারণ দর্শকেরা দলে দলে এসে প্রবেশ করলেন। মামলা সুরু হয়ে গেল।

একদিন একদিন করে পুরো বাইশটি দিন হলো মামলার শুনানী। বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা। প্রতিদিনকার শুনানীর বিবরণ প্রকাশিত হতে লাগলো 'ষ্টেটসম্যান' প্রমুখ বাংলার দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। বেছে বেছে সাক্ষী জোগাড় করেছেন খগেন রায়। আমাদের গ্রামের গাঁজাখোর বদমায়েস বিশু চক্রবর্ত্তী, তমিজদ্দী চৌকিদার, তারই জনকয়েক সাকরেদ, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার জমির কারিগর আর হাঁসাড়া প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির স্বনামধন্য সম্পাদক সেই মৃণাল সোম। ঠিক তেমনি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা খদ্দরের সার্ট, ময়লা ধুতি আর ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। গ্যাটাপারচার ফ্রেমের ওপর দিয়ে কুৎ কুৎ করে তাকিয়ে সত্য কথা বলবার প্রতিজ্ঞা করে অবলীলাক্রমে ডাহা মিথ্যে বলে গেলেন যে, ঢাকা থেকে বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্ত, বিভূতি চৌধুরী প্রভৃতি বি ভি-র অফিসাররা হাঁসাড়ায় সামরিক ড্রিল শেখাতে এসে রাত্রি যাপন করতো কেয়টখালীতে দ্বিজেন গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। কেয়টখালীর দ্বিজেন গাঙ্গুলী যে এই দলের সভ্য এবং এই সব আসামী তারই রিক্রুট, সবাই জানে তা। কথায় কথায় মারধর করা, ছোরা-ছুরি চালানো এবং রিভলভার নিয়ে ঘোরাফেরা এদেরই কাজ। হাঁসাড়া, কেয়টখালী ও আশে-পাশে গ্রামের সবাই তাই এদের ভয় করে।

কংগ্রেসের কাজে কোনো দিনই আমরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াইনি, কংগ্রেসও কোনো দিন এমনি প্রকাশ্যভাবে শত্রুপক্ষে যোগদান করে বিরুদ্ধাচরণ করেনি আমাদের। কংগ্রেসী কুলকলঙ্ক মৃণাল সোম একটা রেকর্ড সৃষ্টি করলো।

তার চাইতেও বিস্মিত হলাম যখন দেখলাম, সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং বিজয় সেন। আমার আবাল্য সুহৃদ, সহকর্মী, শহীদ বিনয় বোসের প্রাক্তন রুমমেট ও সহপাঠী গোপাল সেনের দাদা বিজয় সেন। সেই বিজয় সেন, গলায় সেই তুলসীর মালা, আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের প্রতীক! বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রইলো না, যখন দেখলাম সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতো বিজয়বাবু গড় গড় করে বলে চললেন: হ্যাঁ, অনাথ চক্রবর্ত্তীর হাতের ক্ষত চিকিৎসা করেছি আমি। ঢাকা শহর

থেকে আনা হয় কেলেগুলা। প্রতিদিন রঙ্গলালদের বাড়ীতে গিয়ে আমি অনাথের ক্ষত ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে আসতাম।

রজনী দাসের প্রশ্ন: কীসের জন্য ক্ষত হয়েছে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

কী বললেন দ্বিজেনবাবু?

দ্বিজেনবাবু নয়, রঙ্গলাল। সে বললো, তা দিয়ে আপনার দরকার কি?

এতে আপনার কোনো সন্দেহ হয়নি?

হ্যাঁ, হয়েছিল। কারণ তার দু'দিন আগেই ডাকাতির ঘটনা শুনেছিলাম।

সন্দেহের কথা বলেছিলেন কাউকে? এরাই যে ডাকাতি করতে পারে, তা মনে হয়েছিল কি?

মনে হলেও বলতে ভয় করেছে, কারণ—

কারণ আমি জানি।—সহাস্যে জুড়ে দিলেন রজনী দাস: কারণ কথায় কথায় ছোরা-ছুরি চালানো আর মারধর এদের কাজ।—The same sentence quoted by His Highness the Secretary of the Hashara Congress Committee—তোতা পাখীর বুলি!

রাজসাক্ষী কালাচাঁদকে জেরা চললো চার দিন। সে বললো যে, সে বি ভি দলের সভ্য। বিপদভঞ্জন তাকে দলে টেনে নিয়েছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যা ও ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহই এই দলের কাজ। দ্বিজেন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পূর্ব্বে বহুবার ডাকাতি ও হত্যার ষড়যন্ত্র চলেছে। নানা কারণে তা কার্য্যকারী হয়ে ওঠেনি। দোলভোগের ডাকাতিতে সে অংশ গ্রহণ করেছিল। দ্বিজেন গাঙ্গুলীর এক হাতে ছিল একটি ছোট লাঠি, আর এক হাতে সবুজ খাপে ভরা একখানা ছোরা। কোমরে ছিল রিভলভার জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য।

রজনী দাসের অবিশ্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে উঠলো কালাচাঁদ। অসতর্ক মুহূর্ত্তে আই বি-র শেখানো অনেক কথাই বেরিয়ে এল, অসংলগ্ন জবাবকে শোধরাতে গিয়ে তা আরও জটিল করে ফেললো, উকিলের প্রত্যেকটি অভিমতকেই সোজা অস্বীকার করতে গিয়ে সহজ সত্যকেও শোচনীয়ভাবে বিকৃত করে ফেললো। কিছুই মনে পড়ছে না বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টাকে রজনী দাস নির্ম্মম হাতে চূর্ণ করে দিলেন, প্রশ্ন করলেন: কী কী দিয়ে দুপুরে আজ খেয়ে এসেছ, মনে পড়ছে তা?

মূর্খ কালাচাঁদ বলে বসলো : না।

কেন, আই বি তা শিখিয়ে দেয়নি ? বলেনি, ভাত খেলে বলবে, খাইনি, মাছ খেলে বলবে, ডাল খেয়েছি, ডাল খেলে বলবে, তরকারি ?—আমি বলছি, তুমি একটি মিথ্যেবাদী—a downright liar……

তারপর সুরু হলো সওয়াল। সাক্ষীদের নিরপেক্ষ বিবৃতি উল্লেখ করে বলতে লাগলেন কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টার : সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা সবাই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামক গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য এবং দ্বিজেন গাঙ্গুলী এদের নেতা। বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্তের সঙ্গে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে হিংসাত্মক উপায়ে উৎখাত করাই এদের লক্ষ্য। গ্রামের লোকরাও এদের জানতো, কিন্তু কথায় কথায় এরা মারধর করে, ছুরি চালায় বলে ভয়ে সে কথা কেউ মুখে উচ্চারণ করতো না। দোলভোগে যে সব বেপারীদের ওপর ডাকাতি হয়েছে, তারা সরল, অনভিজ্ঞ মুসলমান চাষী। টাকা প্রথমটা দিতে না চাওয়ায় এরা ছুরির ফলা ওদের কাঁধে খানিকটে বসিয়ে দেয়। টাকা না দিলে হয়তো হত্যাই করতো ওদের। দ্বিজেন গাঙ্গুলীই হচ্ছে এই ডাকাত দলের প্রধান পাণ্ডা। তারই প্ররোচনায়, ব্যবস্থাপনায় এই ডাকাত দল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের চেষ্টা করে, সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে, ডাকাতির পরিকল্পনা করে। দ্বিজেনই এদের—

রজনী দাসের সওয়াল চললো চার দিন। বহু উকিল-মোক্তার এসে শুনতে লাগলেন স্মরণীয় সেই বক্তৃতা। এমনি যুক্তিপূর্ণ তাঁর ভাষণ যে, তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন আই বি-র ব্যর্থতার কথা। টুকরো কথা কানেও ভেসে এল : এদের আটকাতে পারবেন না হাকিম। আমরাও আশান্বিত হয়ে উঠলাম যে, হয়তো বা তাই হবে।

কিন্তু আমাদের সকল আশা, শ্রোতাদের সকল ধারণা, আত্মীয়জনের সমস্ত কল্পনা চূর্ণ করে দিয়ে রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র রায় স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুযায়ী হত্যার চেষ্টাসহ ডাকাতি এবং ১২০খ ধারা অনুযায়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে যে দীর্ঘ রায় পাঠ করলেন, দেখা গেল, তাতে ব্যবহার করা হয়েছে হুবহু সেই কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টারেরই প্রাঞ্জল ভাষা, তার প্রত্যেকটি বাক্য ও ইডিয়ম!…এ নইলে বৃটিশ আমলে ন্যায়বিচার হবে কেন ?

গম্ভীরমুখে তিনি দণ্ডাদেশ উচ্চারণ করলেন :

দ্বিজেন গাঙ্গুলী—৭ বৎসর

রঙ্গলাল গাঙ্গুলী
খগেন চাটার্জ্জী
অনাথ চক্রবর্ত্তী } প্রত্যেকে ৫ বৎসর

বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জী—২ বৎসর

কালাচাঁদ দাস—সম্রাটের অনুকম্পায় খালাস

স্পেশ্যাল ক্ষমতার একেবারে পূরোটাই যে ব্যবহার করবেন আমার বেলায় এতটা অবিনাশ দারোগাও কল্পনা করতে পারেননি। দণ্ডাদেশ শোনাবার পর পুলিশ অফিসে আনবার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টই বললেন অবিনাশবাবু : জেল হয়ে যাবে, তা জানতাম দ্বিজেনবাবু, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতটা হবে এটা আশাই করতে পারিনি। কোর্টইনস্‌পেক্টারও সায় দিলেন : We could not even dream—

আমি হেসে জবাব দিলাম : There are many things in the world Horatio, which are not dreamt of···ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি স্বপ্নেও না ভাবতে পারলেও ভবেশ রায় স্বপ্ন দেখছেন 'স্যার' হতে পারেন কিনা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে।······

তখনই সবাইকে রওনা করে দেওয়া হলো মুন্সীগঞ্জ থেকে। ঢাকা জেলে যখন এসে পৌছলাম, তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। সংবাদ বোধহয় পূর্ব্বেই পাঠানো হয়েছিল। দেখলাম, রেজাক সাহেব বসে আছেন প্রতীক্ষায়। অকস্মাৎ খুব গম্ভীর মনে হলো। সদালাপী, সদা হাস্যময় রেজাক সাহেব এমনি নীরব কেন? আব-হাওয়া লঘু করে দেবার জন্য দুএক টুকরো হাসির কথাও বললাম। হাসলেন না, এমন কি, সে কথায় যোগদানও করলেন না।

শুধু বললেন : ডিভিশন পেয়েছেন কিনা, কাগজপত্র থেকে তা বুঝতে পারছি না। আজ সিভিল ইয়ার্ডেই থাকুন, কাল যা হয় হবে।

চলেই যাচ্ছিলেন, ডাকলাম : রেজাক সাহেব!

ফিরে দাঁড়ালেন মুখ নীচু করে। বললাম : এবার আর ডেটিনিউ নয়, কয়েদী। সাত বৎসরের মেয়াদী কয়েদী। কিন্তু একেবারে যে চিনতেই পারছেন না আমায়, ব্যাপার কি?

কিছুই বললেন না তিনি। অকস্মাৎ পকেটে হাত দিয়ে রুমাল বার করতে করতে ত্রস্তপদে গেটের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গেট বন্ধ হয়ে গেল।

উদ্‌গত অশ্রু চেপে রাখতে না পেরেই কি রেজাক সাহেব পালিয়ে গেলেন ?……

সিভিল ইয়ার্ডে এসে দেখি সেই কক্ষ, যেখানে ক'মাস পূর্ব্বেও আমি রাজবন্দী হিসেবে রাজত্ব করে গেছি। কিন্তু রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়েছে, এবার জন্মলাভ করেছে কয়েদী দ্বিজেন !

গোটা তিনেক ঘোড়ার কম্বল ফেলে দিয়ে গেল সিপাই। যেমন ময়লা, তেমনি এর দুর্গন্ধ। লোহার খাটে গদী পাতা বটে, কিন্তু চাদরও নেই, বালিশও নেই, মশারিও নেই। তবু শীতকালে পাশাপাশি, ঘেঁসাঘেসি শুতে ভালই লাগলো।……

সবাই চুপ, একেবারে চুপ। যেন কথা সব ফুরিয়ে গেছে। নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি, কেউ ঘুমোয়নি ওরা। চোখের পাতায় আগুনের হল্‌কা !—

বহুক্ষণ পর অকস্মাৎ বলে উঠলো বিপদভঞ্জন : দাদা, তাহলে সত্যিই কি শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হলাম আমরা আই বি-র কাছে ?

কণ্ঠে প্রচুর ভাবাবেগ ঢেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বললাম : বিপ্লবীকে সরিয়ে ফেললেও বিপ্লবকে হত্যা করা যায় না, ভাই ! তা যদি হতো, তাহলে ক্ষুদিরামের ফাঁসীর সঙ্গেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের হতো যবনিকা পতন। তা হয় না, হতে পারে না। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিলাম একদিন, আমার ভূমিকা শেষ হয়ে গেল, তাই প্রস্থান করলাম। কিন্তু নাটক কি তাতে শেষ হয়ে যায় ? এই রক্তের হোলি-খেলা চলবে তত দিন, যত দিন না আমার মায়ের শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়ে !……

বিপদভঞ্জন আর কথা কইলো না, আমিও চুপ করে গেলাম।

জেলের গেটে ঘণ্টা বাজলো—এক, দুই, তিন !

সাতান্ন

সেই গদীহীন খাটে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত ঘোড়ার কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসেই জাঁক-জমকের সঙ্গেই আমরা শেষ করলাম প্রাতরাশ। আত্মস্থ হয়ে উঠেছি আমরা ততক্ষণে। আগামী কয়েকটি বৎসর যে নিশ্চিতভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সম্পর্কহীন অবস্থায় কারাপ্রাচীরের মধ্যেই কাটাতে হবে, সে সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে পড়েছি।

সবার চাইতে গম্ভীর দেখলাম রঙ্গলালকে। মগের চা এক চুমুকে শেষ করে সে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার মনের কথা মন দিয়ে যেন শুনতে পেলাম আমি। এই মর্ম্মান্তিক নাটকের সেই তো রচয়িতা। বিপদভঞ্জনের সঙ্গে নিছক ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের সূত্র ধরে ওকে জেলে পাঠিয়ে জব্দ করবার ফন্দী আঁটতে গিয়ে অবশেষে যে অজানতে আমাকেও জড়িয়ে ফেলবে সে, মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবতে পারেনি তা। অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি ওর, দশটা বিভূতি সাহাকে সে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে, এ সত্য বিভূতি সাহা নিজেও জানতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে রঙ্গলাল বোধহয় এই প্রথম ও আমি জানি, এই শেষ একটি মহাভ্রম করে ফেলেছে। সাহার মিষ্টি কথার হাসনুহানার ঝাড়ের নীচে যে আই বি-র কালসাপ আত্মগোপন করেছিল, রঙ্গলাল প্রথমটা বুঝতে পারেনি তা। বেরিয়ে যাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বিভূতি সাহা যখন অকস্মাৎ ফণা তুলে ধরলেন, তখন আমি ঢাকা জেলে পৌছে গিয়েছি। আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটতে দেবেন না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তারপর যখন দেখা গেল গৈরিক পোষাকের অন্তরালে তাঁর লুকোনো রয়েছে তীক্ষ্ণধার ছুরি, রঙ্গলাল তখন প্রমাদ গুনলো। আমার পত্র পাওয়ামাত্র মনে মনে সে শপথ গ্রহণ করলো যেভাবে হোক্ আমায় সে রক্ষা করবে। কালাচাঁদও তৎক্ষণাৎ তার হাতে হাত মিলাতে দ্বিধা করলো না। রঙ্গলাল বিভূতি সাহাকে যা বলেছিল, তার মধ্যেও ছিল তার শাণিত বুদ্ধির খেলা, নেহাৎ যতটুকু বললে বিপদভঞ্জনকে ও তার দলীয় ক'জনকে ফাঁদে ফেলা যায়, ঠিক ততটুকু ওজন করে তুলে দিয়েছিল সে সাহার হাতে। কিন্তু কালাচাঁদ শেষ পর্য্যন্ত সেজে বসলো পরম বৈষ্ণব। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণের উন্মাদনায় সে একে একে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে অনেক কঙ্কাল তুলে দিল আই বি-র হাতে। শুধু অসঙ্কোচে নয়,

উৎসাহের সঙ্গে। কারণ গ্র্যাসবি ওকে কথা দিয়েছিলেন যে, আমাদের সাজা হয়ে মামলার যবনিকাপাত হয়ে যাবার পরই ওকে পাঠিয়ে দেবেন একেবারে দার্জ্জিলিংএ। সেখানে পুলিশের দপ্তরে তার চাকরি একেবারে স্থির হয়ে আছে। তাই একদিকে সে যেমন সহাস্তে রঙ্গলালকে সমর্থন করলো, অপর দিকে সে সমস্ত গোপন তথ্য ও সর্ব্বশেষ পরিণতি জানিয়ে দিল বিভূতি সাহাকে।

বিভূতি সাহা আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন কৌশলে রঙ্গলালের হৃদয় জয় করতে অবশ্যই কোনো কিছু প্রকাশ না করে। কিন্তু নিরাশ হয়ে যখন দেখলেন রোগ হকিমির বাইরে চলে গেছে, তখন 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' নীতি অনুসরণ করে কালাচাঁদকে আগলে রইলেন যক্ষের মতো!···অবশেষে কালাচাঁদই তাঁদের মুখরক্ষা করেছে!

রঙ্গলাল কিন্তু অটল রইলো তার সংকল্পে। রাজসাক্ষী যেমন সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা ভিক্ষে করলে বৃটিশ সম্রাট অকৃপণ হস্তে করুণা বিতরণ করে থাকেন, তেমনি স্বীকৃতি অকস্মাৎ প্রত্যাহার করে সব দোষ পুলিশের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে উদ্যত হয়ে ওঠে তাদের কঠোর দণ্ড, তাদের ক্রোধ তৃণের মত দহন করবার জন্য বিস্তার করে লোলজিহ্বা!···রঙ্গলাল তা জানতো এবং ভালো করেই জানতো যে, এতেও সে তার দাদাকে রক্ষা করতে পারবে না। তথাপি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় যে ভুল সে করে বসেছে, তারই কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করবার শপথ গ্রহণ করলো সে। ধূপের মতো নিঃশেষে নিজকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবার জন্যই অধীর হয়ে উঠলো সে। তাই জেঙ্কিন্‌স্‌এর এজলাসে প্রতিদিনই সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো আমার সঙ্কেতের প্রত্যাশায়। ভুল বুঝে একদিন সে ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস কামরায় গিয়ে অবশেষে তাঁকে জেলের থাকা ও খাওয়ার কতকগুলো কাল্পনিক অসুবিধের কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকার চেয়েছিল।

তারপর মামলার প্রথম দিনেই নাটকীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে আমাদের কাঠগড়ায় এসে ওঠবার পর বিপদভঞ্জন যখন উল্লাসে চীৎকার করে অভ্যর্থনা জানালো, ভাবাবেগে সে তখন বেশ কয়েক মিনিট রইলো মাথা নীচু করে! আত্মস্থ হতে একটু সময় লেগেছিল তার।

জানালার বাইরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও আমি জানি, মনে তার এতটুকু শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই। কী মারাত্মক পরিণতি হলো ব্যক্তিগত মনকষাকষির! এ যে কল্পনাও করেনি সে। দাদা যে তার শুধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই নয়, গুপ্ত সমিতির অধিনায়ক এবং বিশেষ করে তার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফলে

বিক্রমপুরের কাজের যে অপরিমেয় ক্ষতি হবে, সেই আশঙ্কাতেই একেবারে পাথর হয়ে বসেছিল রঙ্গলাল।......

রায় বাহাদুর ভবেশ রায় আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে গণ্য করবার আদেশ দেবার কথা চিন্তা করে দেখবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁর রায় শোনাবার সময়, কিন্তু দেখা গেল, সেটা একেবারেই ভাঁওতা।

খানিক পরই গেলাম আমরা গুদামে। সেখানে নিজেদের ধুতি, সার্ট, জুতো ত্যাগ করে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীর পোষাক পরলাম। একটি জাঙ্গিয়া, অনেকটা আধুনিক আণ্ডারউইয়ারের মতো, তবে কোমর থেকে যেমন হাঁটুর প্রায় আধ হাত ওপরে এসেই থেমে গেছে, তেমনি পা ঢোকাবার ফাঁকটুকুও বেশ ছোট। গায়ে দিলাম যা, তাকে বলা হয় কুরতি। ধরুন একটি খাটো-ঝুল পাঞ্জাবী, পকেট নেই তার। তারপর হাতা কেটে শর্ট স্লিভ করলেন একেবারে গেঞ্জির মতো। কলার তৈরী হলো এমনি যাকে প্রায় হাই-কলারের অপভ্রংশ আখ্যা দেওয়া যায়। কোনো মাপ নিয়ে তৈরী করা হয় না বলেই বেশ ঢিলেঢালা। মাথায় পরলাম টুপি। অনেকটা মুসলমানদের কিস্তির টুপির মতো। এক টুকরো কাপড় কুরতির ওপর দিয়ে কোমরে জড়ালাম। তারপর তিনটে কম্বল, একখানা এ্যালুমিনিয়ামের ধার-উঁচু মাঝারি আকারের থালা ও বেশ বড় সাইজের একটি এ্যালুমিনিয়ামের বাটি নিয়ে এসে একেবারে সোজা হাজির হলাম চল্লিশ ডিগ্রিতে। সেখানে একা আমায় রেখে ওদের সবাইকে বিভিন্ন খাতায় নিয়ে যাওয়া হলো। আই বি নাকি পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের সবাইকে পৃথক পৃথক রাখতে। Dangerous prisoners...

সম্বর্দ্ধনা জানালেন রাজনৈতিক বন্দীরা কলরব করে। কারণ তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলো এবং তা দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে দিয়ে। লেবং মামলার সুশীল বললো: জানতাম ওরা withdraw করলেও আপনাকে ছাড়বে না, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যে জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়ে গেছে। তা—কদ্দিন ?

হেসে জবাব দিলাম: স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কলমের জোর যতখানি—

অ্যাঁ, বলেন কি, একেবারে সাত বৎসর!—বিস্ময় প্রকাশ করলেন ক'জন। আর এ্যাপ্রুভারদের ?

বললাম। ঘটনা শুনে সুশীল বললো: তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার কালাচাঁদকে। অতটুকু ছেলে, কেমন যেন গম্ভীর, বেশী কথা কয় না—

কোথা থেকে এসে হাজির হলো মৈনুদ্দীন। থমকে দাঁড়ালো : এ কি, আপনি! ডিভিশনও দেয়নি শালারা? আপনি কি পারবেন বাবু এই খাওয়া খেতে?

হাসি পেল।

সশ্রম কারাদণ্ড। সুতরাং পরদিনই সকালবেলা শ্রমের কাজ এসে পড়লো। এক মণ ডাল আর একটা ভারী যাঁতা, কুলো আর একখানা ছোট্ট ঝাঁটা। ঐ এক মণ ডাল ভাঙ্গতে হবে, ঝাড়তে হবে, তারপর আবার বস্তাবন্দী করে জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখতে হবে। এমনি প্রতিদিন। কখনো কখনো একটি চালুনি ও একটা ডালাও দেয় পরিষ্কারভাবে কাজ করবার জন্য।

কিন্তু নিজে হাতে আর ডাল ভাঙ্গতে হলো না আমায়। সুশীল বললো : আপনার কিছু করতে হবে না দ্বিজেনদা।

দেখলাম সে বস্তা থেকে কয়েক সের ডাল ঢেলে নিয়ে ভেঙ্গে, ঝেড়ে আবার তা বস্তায় ভরে দিয়ে বেশ টাইট করে বেঁধে রাখলো। জিজ্ঞেস করলাম : ও কী করলে?

বললো : জানেন না, এটাই আমাদের রীতি। এক মাস এমনি ডাল ভাঙ্গাবার নিয়ম এঁদের। কিন্তু এমনিভাবে গোঁজামিল দিই বলে দিনসাতেক পরই ওরা বদলে দেয় বিরক্ত হয়ে। তখন দেয় চৌকীদার-দফাদারের কোটে টাক দেবার কাজ। তাও-বা কে করে? তারপর আর দেয় না।

গোলমাল করে না এজন্য?

বহু গোলমাল হয়ে গেছে। বহু রাজনৈতিক বন্দীকে সাজাও দিতে কসুর করেনি প্রথম প্রথম। কিন্তু তারপর হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বিকেলের দিকে ডালের বস্তা নিয়ে যাবার সময় মৈনুদ্দীন জিজ্ঞেস করলো : ভালো করে ভেঙ্গেছেন তো বাবু?

জবাব দিল সুশীল : নিশ্চয়ই।—বলে মুচকি হাসলো। মৈনুদ্দীনও হাসলো। অর্থাৎ সেও জানে।

একদিন বিকেলে সারি দিয়ে খেতে বসেছি আমরা। কালো রংয়ের মটর ডাল, কিছু আস্তও আছে তাতে। একদিকে ডাল, আর একদিকে জল। দু'চারটে পেঁয়াজের খোসা ভাসছে আর অকস্মাৎ তাতে কোনো কোনো দিন দেখতে পাওয়া যায় এক-আধটি শুকনো লঙ্কা, ফোঁড়নের ভাজা কালো শুকনো লঙ্কা। জজের

মুখে হাসির মতোই কচিৎ! আর পেয়েছি কালো, মিশমিশে কালো তরকারি। তাতে কি ছিল, কি আছে জানিনে। সব কিছুই সেদ্ধ হয়ে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। অনেকটা ঘাসের ঘণ্টের মতো। আমি আবার ষ্টাইল করে নিয়েছি খানচারেক রুটি, যেমন পাতলা, তেমনি বৃহদাকার, পূর্ণিমার চাঁদের মতো! টুকরো রুটি সেই ডালে ভিজিয়ে নিয়ে সেই ব্যঞ্জনসহযোগে গলাধঃকরণ করছি, এমন সময় অকস্মাৎ শোনা গেল : সরকা—ঠ, শ্লাম।

রেজ্জাক সাহেব পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। চল্লিশ ডিগ্রির বাইরের লন্-এ বসেছিলাম আমরা। রেজাক আমায় দেখতে পেয়েই হাসপাতালের পথ ছেড়ে ফিরে এলেন। একেবারে এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। হেসে বললাম: ভালো আছেন?

জবাব দিলেন না। ভারী ক্ষুণ্ণ হলাম, রাগও হলো। এই সেদিনও সিভিল ইয়ার্ডে রাজবন্দী দ্বিজেনবাবুর অসুখের জন্য ব্যস্ততার সীমা ছিল না যাঁর, আজ তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা বলতেই তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগলো? এতখানি দম্ভ সামান্য এক ডেপুটি জেলারের?···কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ভুল ভাঙ্গলো আমার তার পরক্ষণেই। দীর্ঘ পাঁচটি মিনিট পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তিনি আমার আহার্য্যের পানে, তারপর বোধহয়, বোধহয় কেন নিশ্চয়ই, একটি অবাধ্য দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপবার জন্য তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।······

বিকেল চারটের মধ্যেই শেষ করতে হয় রাতের আহার। তারপর যখন পৃথক পৃথক সেলে তালা পড়ে, তখনো জেলের ওপরকার টুকরো আকাশ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লাল কিরণে আলোকিত মনে হয়। তাই তখন বসে যায় আমাদের দৈনিক নৈশ সভা বা বিচিত্রানুষ্ঠান। কেউ তোলেন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা, কেউ ফাঁদেন হারুন-অল্-রশীদের গল্প, কেউ আবৃত্তি করেন, 'আজি এ প্রভাতে রবির কর—' আবার কেউ একখানা বাগেশ্রী বা বেহাগে টান দেন। হল্লা হয় না আদৌ, পর পর কাজগুলো শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে থাকে, পরিচালনা করেন চট্টগ্রামের মণী সেন। রাজবন্দী ছিলেন সাভারে। একদিন যাত্রা শোনবার জন্য নাকি বেশ কয়েক মাইল দূরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন আর-এক গ্রামে। দারোগার সঙ্গে ছিল মনোমালিন্য। তিনি সে রাতে ছিলেন মফঃস্বলে, তাই এই নৈশ অভিযান। কিন্তু রাত নাকি সেখানেই নামে, যেখানে ওৎ পেতে বসে আছে নেকড়ে বাঘ! দারোগা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে থানায়

ফেরবার পথে সেই যাত্রা দেখতে গিয়ে হাজির।—ব্যস্, তুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল একেবারে রণক্ষেত্রে! মণীবাবুর সাজা মাত্র তিন মাস। ডিভিশন পেয়েছেন। গদী-আঁটা খাটে শয়ন করেন।

আর আমাদের জন্য বিছানো আছে পরিষ্কার মেঝে। পরিপাটি করে বিছিয়ে দিয়েছি একখানা কম্বল, তার ওপর পাতা হয়েছে সেই টুকরো কাপড়টি। একখানা কম্বল গুটিয়ে বালিশের মতো করে নিয়েছি। আর একখানা যেন মুড়ি দেবার ইটালিয়ান রাগ। রাজনৈতিক বন্দীদের একটা সুবিধে আছে, ইচ্ছে করলে তাঁরা বাড়ী থেকে মশারি আনিয়ে নিতে পারেন। রাত্রে মলত্যাগের ব্যবস্থাটি চমৎকার। আমাদের শয্যা থেকে ফুট তিনেক দূরে একটি পাত্র, মোটা করে আলকাতরা লাগানো। তলায় খানিকটে ফিনাইল। ঢাকনি আছে। ঘরে আছে সেই থালা ও বাটিভরা জল, ঘরের এক কোণে একটুখানি মাটি, অথবা মণী সেনের কাছ থেকে আনা ক্ষুদ্র এক টুকরো সাবান। সুতরাং অসুবিধে কোথায়? পাটহীন শিকের দরজায় কেউ কেউ একখানা কম্বল ঝুলিয়ে দেন, কেউ কেউ সেই সঙ্কীর্ণতার স্তর থেকে আরও অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গেছেন। অনেকেই আরও অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গিয়ে প্রায় ত্রৈলঙ্গ স্বামী হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ ঐ পাত্রের ওপর বসে বসেই তাঁরা বারান্দার সিপাইজীর সঙ্গে দু'চারটে বাৎচিৎও চালান বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে।

পাকুড় রাজ এষ্টেটের মামলার বিনয় পাণ্ডে ছিলেন আমার পাশের ঘরে। ছ'ফুট লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মিষ্টভাষী। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী নন, সিলেবাস-বহির্ভূত নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানও প্রচুর। শুধু একেবারে অজ্ঞ রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে সে যুগের বিপ্লবীদের রাজনীতি। একদিন নৈশ সভায় মন্তব্য করলেন তিনি: তাহলে তো মণীবাবু, ভারী সুবিধে রাজনৈতিক ডাকাতিতে। যেমন পাওয়া যায় এক কাঁড়ি টাকা, তেমনি মেলে দেশজোড়া খ্যাতি। টাকাকে টাকা, নামকে নাম—

মণী সেন তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন: কিন্তু একবার ধরা পড়লে একেবারে দড়িকে দড়ি। সেখানে আর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা নেই—

কক্ষে কক্ষে হাসির রোল পড়ে গেল। বিনয় পাণ্ডে বলে উঠলেন: ওরে বাব্বা, আর দড়ির কথা বলবেন না মণীবাবু। এগারো মাস আলীপুরে ফাঁসীর সেল-এ থেকে সে দড়ির খেলা দেখেছি আমি। মনে হয় অন্ততঃ এগারো বার ফাঁসী হয়ে গেছে আমার।

ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল বিনয় পাণ্ডে আর তাঁর সহ-আসামী তারিণীর প্রতি। নামটি আজ আর মনে পড়ছে না, তারিণীও হতে পারে, হরিচরণও হতে পারে। এগারো মাস চলে হাইকোর্টের আপীলের শুনানী। এই এগারোটি মাসের মধ্যে একটি দিন, একটি রাত, একটি নিমেষের জন্যও ঘুমোতে পারেননি বিনয় পাণ্ডে। তারিণী তো পাগলই হয়ে গেল। তারপর বেরুলো হাইকোর্টের রায়—ওদের ফাঁসীর হুকুম রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের মতলব ভাঁজছিলেন বিনয়, আমরাই বুঝিয়ে নিরস্ত করেছি। কে জানে সেখানে যদি আবার উল্‌টে ফাঁসী হয়ে যায়?……

ছয় ডিগ্রিতে মাত্র ছ'জন বন্দী আছেন, লেবং মামলার আসামী রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁদের অন্যতম। ভাওয়াল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার যোগেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। ফাঁসীর হুকুমই হয়েছিল, কিন্তু পাদ্রী নর্থফিল্ড সাহেবের হস্তক্ষেপে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। তাই সুশীলের পরামর্শে আমি নানা অভিযোগ সুরু করলাম সুপারের কাছে। পাটনী তখন ফিরে গেছেন প্রেসিডেন্সী জেলে, কারণ হোম থেকে ফিরে এসেছেন স্বনামধন্য লিওনার্ড। জেলর আছেন সেই সুধীর মুখার্জ্জীই। পর পর অভিযোগ জানাবার ফলে সহসা একদিন আমায় বদলী করা হলো ছয় ডিগ্রিতে নয়, চার নম্বর খাতার নীচের তলার কোণের ঘরে। সেখানে মাত্র পাঁচ জন রাজনৈতিক আসামী থাকেন আর পাঁচ জন সাধারণ কয়েদী। রবির ওখানে যেতে না পারলেও তবু তো এক-সঙ্গেই একই ঘরে থাকতে পারবো দশ জন! তাই উৎসাহের সঙ্গেই চলে এলাম।

কে কে ছিলাম, আজ আর মনে নেই। মনে আছে শুধু একজনের কথা, বরিশালের শান্তিরঞ্জন মুখার্জ্জী। বয়স আমার চাইতে কয়েক বছর কমই হবে। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর চেহারা। সতীন সেনের দলের ছেলে। বরিশালের রাস্তায় একটি মস্তার পিস্তল সহ গ্রেপ্তার হন। পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

চার নম্বর খাতাতেই দোতলায় একেবারে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা হয়েছে ময়মনসিংহের জনকতক রাজনৈতিক বন্দীকে। ১১০ ধারায় সাজা হয়েছে তাঁদের। বিচারাধীন আসামী থাকতে পাগলা গারদে এঁদেরই জনৈক সহ-আসামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ১১০ ধারার আসামী রাজনৈতিক বন্দীর সুবিধে পেতে পারে না। আর কয়েদীর পোষাকটি এমনি যে, ওর অন্তরালে ব্যক্তিগত রূপটি একেবারে চাপা পড়ে যায়!

একদিন অকস্মাৎ শুনতে পাওয়া গেল, ময়মনসিংহের এমনি একজন দশ ধারার বন্দী ভূপেন সরকারকে ত্রিশ ঘা বেত মারা হবে। তাঁর কম্বল তল্লাসী করে নাকি একখানা ক্ষুর পাওয়া গেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি, একটি সামান্য দেয়ালের ব্যবধান থাকলেও জেল একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ জগৎ। এর ভেতরকার কোনো কথা যেমন বাইরে আসতে পারে না, তেমনি বাইরের শোভনতা বা সামান্যতম ভদ্রতার বালাই এর মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় না। কোনো জমাদার, সিপাই বা কোনো কয়েদী মেটের সঙ্গে আপনার মনকষাকষি হলেই জানবেন আপনি হয়ে পড়লেন তাদের টারগেট। কয়েদীদের তামাকপাতা দিয়ে হাত করে একদিন এমনি সন্তর্পণে আপনার কম্বলের নীচে একখানা ক্ষুর ঢুকিয়ে দেয়া হলো যে, টেরই পেলেন না আপনি। অকস্মাৎ সিপাই এসে তল্লাসী করে সেখানা উদ্ধার করে নিয়ে গেল হয়তো আপনার অনুপস্থিতিতে ও অজানতেই। তারপর একদিন কেস্-টেবিলে হাজির করা হলো আপনাকে। সেখানে অভিযোগ পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে গেল বিচার ও দণ্ডাদেশ। পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রয়োজন হয় না, ডাকা হয় না কোনো সাক্ষীকেও। এমন কি, অভিযুক্তের কী বলবার আছে বা আদৌ কিছু আছে কিনা, সে প্রশ্নও করা হয় না তাকে। কাজীর আসনে বসে জেলর তাঁর শ্রীমুখ দিয়ে উচ্চারণ করেন না কিছুই, শুধু দণ্ডের বিবরণ লেখা ও রবার ষ্ট্যাম্পমারা আপনার History Ticketএর নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি কলমের আঁচড় রেখে যান।

তারপরই দেখা গেল, হয়তো আপনার খাদ্যের জন্য এসেছে পেনাল ডায়েট, পরনের জন্য এসেছে চটের পোষাক, অলঙ্কার হিসেবে এসেছে বেড়ি বা ডাণ্ডা-বেড়ি কিংবা এসেছে Night standing handcuffএর হুকুম। চালগুলো চালনিতে চেলে ও কুলোতে ঝেড়ে নেবার পর যে খুদ পড়ে থাকে, ফেনমিশ্রিত সেই খাদ্যকে বলা হয় পেনাল ডায়েট। সঙ্গে আর কিছু নেই, না ডাল, না তরকারি না কিছু। যে জাঙ্গিয়া বা যে জামা পরেছেন, সুতোর তৈরি সে সব জিনিষের পরিবর্ত্তে আপনাকে পরিয়ে দিয়ে যাবে চটের পরিচ্ছদ, চটের টুপি। দু'পায়ের কব্জীতে দুটো লোহার বালা পরিয়ে কোমরের সামনের দিকে সুতো দিয়ে ঝোলানো আর একটি অমনি বালার সঙ্গে তা জুড়ে দেয়া হয় দুটো লোহার ডাণ্ডা দিয়ে, একে বলা হয় বেড়ি। ডাণ্ডা-বেড়ি একটু কঠোরতর সাজা। দেড় ফুট একটি ডাণ্ডা দিয়ে এক পায়ের বালার সঙ্গে আর এক পায়ের বালা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে পা অন্ততঃ দেড় ফুট ফাঁক করে চলতে হয়। Standing handcuff আরও কঠিন

শাস্তি। ছ'ফুট উঁচুতে দেয়ালের একটি হুকের সঙ্গে হাতকড়া লাগানো হাত দু'খানা এঁটে দেয়া হলো। এমনিভাবে থাকবে সারা রাত। অর্থাৎ সারাটি রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনাকে। হয়তো এমনিভাবে সাতটি দীর্ঘ রাত্রি!

প্রতিদিনকার ফলাফল লেখা হয়ে যাবে আপনার History Ticketএ। অর্দ্ধ ফুলস্ক্যাপ সাইজের খুব শক্ত এক-একখানা রুল-করা কার্ড, তাতে লেখা হয় বন্দীর কারাজীবনের খুঁটিনাটি সব ঘটনা—কবে এলেন, কোন্ খাতায় গেলেন, কবে কোন্ শ্রমের কাজ সুরু করলেন, কবে কোন্ অপরাধে কী সাজা পেলেন, কবে অসুখ হয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে গিয়ে পড়লেন, কবে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করলেন, আবার কবে এক বৎসর সুবোধ বালকের মতো থাকার ফলে এক মাসের মেয়াদ কমে গেল—প্রত্যেকটি কথা এতে লেখা থাকে।

ভূপেন সরকারের এমনি টিকেটে এমনিভাবে একদিন লেখা হয়ে গেল যে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের অভ্যন্তরে ন্যায়বিচারে তাঁর প্রতি ত্রিশ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। যে ক্ষুর তাঁর কম্বলের মধ্যে পাওয়া গেছে, তা দিয়ে নাকি মানুষের গলা কাটা যেতে পারে! সুতরাং—

সুতরাং একদিন ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসের এক সকালবেলায় আমাদেরই ব্যারাকের সমুখে একটি 'টিকটিকি' এনে খাড়া করা হলো। একে একখানা মই বলা চলে। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করবার মতো ভূপেন সরকারের দুটি হাত প্রসারিত করে তার ওপর আটকে দেওয়া হলো, তেমনি করে পা দুখানিও। জাঙ্গিয়ার বাঁধন আল্‌গা করে দিয়ে অনাবৃত করে দেওয়া হলো তার নিতম্ব।

এবার বেত্রের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাঘাত সুরু হবে সেই মাংসপিণ্ডের ওপর—একবার নয়, দু'বার নয়, দশবার নয়, গুনে গুনে পুরো ত্রিশ বার!···

বৃটিশ ন্যায়বিচারের শাসন!······

আটাশ

সুরু হলো দংষ্ট্রাঘাত এবং একসময় তা শেষও হয়ে গেল! তালাবন্ধ দরজার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম শান্তি মুখার্জ্জী আর আমি। না, চোখ বুজিনি, কথা কইনি, নিঃশ্বাসও ফেলিনি বুঝি! ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মূর্ত্তির মতো! ······বেত মারবার বিশেষ কায়দা আছে একটি। দু'হাত দীর্ঘ শক্ত বেত, একেবারে নতুন। যে আঘাত করবে, সে ফুটবলের ব্যাকের মতো পেছন দিকে হটে গেল দশ বারো হাত, বেতখানা বাগিয়ে একবারে না এসে দু'পা এগিয়ে এসে আধখানা ঘুরপাক খেল, তারপর ছুটে এসে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে আঘাত হানলো সেই অনাবৃত নিতম্বের ওপর। অমনি বড় জমাদার গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো, এক।

এমনি ত্রিশ বার। আঘাত হানার ভার নেয় সাধারণ কয়েদীরাই, এর জন্য এরা পায় তামাকপাতা, পায় বিড়ি আর মাসখানেকের রেমিশন অর্থাৎ দণ্ডমকুব। কিন্তু প্রত্যেকটি আঘাত কেটে যাওয়া চাই, নইলে আঘাতকারীরই উল্টে সাজা হয়ে যায়। এ জন্যই ব্যবস্থা আছে তিনজন জল্লাদের, প্রত্যেকে দশ ঘা করে মারবে। পরিশ্রান্ত হয়ে যাতে আঘাতের ভীষণতা এতটুকুও না কমে যায়, তাই এই সুষ্ঠু ব্যবস্থা!

প্রথম প্রথম চীৎকার শুনতে পেলাম ভূপেনবাবুর, দেখলাম হাত-পা ছাড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা, দেখলাম সর্ব্বশরীরে প্রবলতম আকুঞ্চন······কিন্তু জমাদারের কণ্ঠে যখন পনেরো ঘোষিত হলো, তখন দেখলাম স্পন্দন থেমে গেছে, মাথা ঝুলে পড়েছে, নিতম্ব বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কালো রক্ত···তারপর একসময় ষ্ট্রেচারে করে আমাদের সম্মুখ দিয়েই নিয়ে গেল ভূপেনবাবুর ক্ষতবিক্ষত দেহ। ঠাওর করতে পারলাম না তাতে প্রাণ আছে কি না।

তেমনি বুঝতেই পারলাম না যে, এই দশ মিনিট আমরাও বেঁচে ছিলাম কি না! কোনো রাজনৈতিক বন্দীকেই সেদিন সকালে ঘরের বাইরে আসতে দেওয়া হয়নি, এমন কি রাজবন্দীদেরও দরজায় তালা ছিল।

কিন্তু ছুটে পালাইনি এই দৃশ্য দেখে, পলক ফেলিনি। দশটি চক্ষু মেলে এর সবখানি বীভৎসতা অন্তরে টেনে নিলাম। প্রত্যেকটি বেতের আঘাত আমাদেরও মনে রক্ত ঝরিয়ে দিল। শুধু আমাদের নয়, যেখানে যত বিপ্লবী আছেন,

তাঁদের শরীরেও কেটে কেটে বসে গেল বিষাক্ত চুম্বন। ক্ষুদিরাম-কানাইলালের চিতাভস্মেও বুঝি চাঞ্চল্য দেখা দিল!……অত্যাচারকে আবাহন জানাই আমরা, অভ্যর্থনা জানাই জার-কে, লুই-কে, মাইকেল ও'ডায়ারকে। এদের নৃশংসতার আঘাতেই তো যুগে যুগে আহত সরীসৃপের মতো উদ্যত হয়ে উঠেছে বিপ্লবের কালফণা! তাই তো জন্মলাভ করেছেন লেনিন, জেগে উঠেছেন রব্‌স্‌পিয়ার, ফাঁসীর মঞ্চে জীবন-তীর্থ সৃষ্টি করে গেছেন ভারতের অগণিত বিপ্লবী।

তাঁদের দু'কস্‌ বেয়ে ঝরে-পড়া রক্তকণিকা দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে মূর্ত্তিমান বিপ্লব—ভারতের নেতাজী!……

সারাদিনে কিছুই কথা খুঁজে পেলাম না আমরা। কিংবা কথা কওয়ার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিলাম! প্রতিদিন দুপুরের গ্র্যাণ্ড হোটেলীয় খাদ্য নিয়ে বেশ রসালো সমালোচনা চালাতাম কিছুক্ষণ। ডালে নেই নুন, তরকারীতে নেই মসলা। ভাতে আছে কাঁকর, মাছের ঝোলে আছে বালি। এমনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার খানা!

আজ কিন্তু গোগ্রাসে গিলে ফেললাম সব। ভেতরটা কি খালি হয়ে গেছে একেবারে? স্বাদবোধ কি শেষ হয়ে গেছে?……

এর দু'দিন পরই আমাদেরই ঘরে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। রিয়াজউদ্দীন ফরিদপুরের মুসলমান, ডাকাতি মামলায় পাঁচ বৎসর সাজা হয়েছে। বেঁটে, কম কথা কয়। মনে হয় নিরীহ, গোবেচারা। কিন্তু তার পেটে পেটে এত কে জানতো!

একদিন সন্ধ্যেবেলা শান্তি মুখার্জ্জী গোপনে আমায় জানালেন যে, তার কম্বলের ভাঁজে একখানা তীক্ষ্ণধার লোহার পাত পেয়েছেন তিনি। কোনো কথা প্রকাশ না করে গোপনে তদন্ত করা হলো এবং অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের জবানবন্দীতে জানা গেল যে, এই অপকর্ম্ম রিয়াজই করেছে। পঞ্চম বাহিনীর লোকের মতো ধরিয়ে দিয়ে কিছু সুবিধে আদায় করাই শালার মতলব! সুতরাং—

পরদিনই রাত্রে ঘর বন্ধ হয়ে যাবার পর সবার সম্মুখেই শান্তি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ক্ষুরের কথা। প্রথমটা বেমালুম অস্বীকার করে বসলো সে। তারপর জেরায় খানিকটে কাবু হয়ে পড়লো, অবশেষে হুমকিতে স্বীকার করলো অপরাধ, বললো সে কোন্‌ মেটের পরামর্শে এই কাজ করেছে। আর যায় কোথা, শান্তি প্রচণ্ড এক ঘুসি মেরে বসলেন তার থুঁতনিতে। ব্যাটা কোনো রকমে টাল সামলে নিতেই শান্তি আরও কয়েকটি ছেড়ে দিলেন পর পর। মেঝেতে

হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল রিয়াজউদ্দীন। হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। আমিও তার অভ্যর্থনা জানালাম প্রচণ্ড এক লাথি মেরে তার মুখে। তারপর সুরু হলো মার। সাধারণ কয়েদীরা দু'চার ঘা মেরে আমাদের দু'জনের মারের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো নিশ্চেষ্ট দর্শক হয়ে। চড়, কিল, ঘুসি ও লাথির চোটে এক সময় রিয়াজ সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো। আমাদের মাথায় তখন খুন চেপে গেলেও একেবারে খুনী হয়ে উঠিনি আমরা! তাই শান্তি ও আমি দু'জনে শালাকে শূন্যে তুলে নিয়ে জলের ট্যাঙ্কটার মধ্যে তার মাথাটা ডুবিয়ে ধরলাম। ওর সংজ্ঞা ফিরে এল। তারপর সুরু হলো আবার।

কিন্তু আশ্চর্য্য যে, লোকটা একটুও চীৎকার করলো না এবং যখন আধমরা করে তাকে ফেলে দিলাম, শান্তি তখন শেষ লাথিটা মেরে বলে উঠলেন: নে শালা, বিশ্বাসঘাতকতার ফল ভোগ কর্। অন্ততঃ ছ'মাস এবার থাকতে হবে হাসপাতালে।

অপরাধী রিয়াজউদ্দীন কোনো নালিশ জানালো না কারুর কাছে! পরদিনই ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল থালা বাটি ও কম্বল নিয়ে সিপাইয়ের পেছনে পেছনে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই গেল হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে। কিন্তু সেদিনই বিকেলে সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদেরই ইয়ার্ডের সম্মুখের প্রাঙ্গণে একদল কয়েদীর দ্বিতীয় সারির শেষে দাঁড়িয়ে আছে সেই বেঁটে ফরিদপুরের মুসলমান রিয়াজউদ্দীন। মুসলমানের হাড় বেড়ালের হাড়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিংবা দধীচির!......

শুধু রিয়াজউদ্দীনই যে চলে গেল, তা নয়, আমাকেও বদলী করা হলো ছ নম্বরে। ভাবলাম, সুবিধেই হলো, এবার রবির কাছে লেবং-এর ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যাবে। কর্ত্তৃপক্ষের ভুলের জন্য মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু স্থায়ী হলো না তা বেশীক্ষণ। একটু পরই আবার এল সিপাইরা। রবিকে যেতে হবে চল্লিশ ডিগ্রিতে। লেবং ঘটনায় রবি যে স্বীকারোক্তি করেছিল, সবাই জানে তা। তাই আই বি-র পরামর্শমত রবিকে অন্যান্য সবার কাছ থেকে যতখানি সম্ভব পৃথক্ করে রাখা হতো। আজ এই প্রথম সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে রবিকে নিয়ে যাওয়া হলো একেবারে চল্লিশ ডিগ্রির রাজনৈতিক বন্দীদের কলোনীতে। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে ওকে মিশতে দেওয়াকে আরও বেশী বিপজ্জনক মনে করা হয়েছে!

মাস তিনেক পর একদিন সকালবেলায় অকস্মাৎ মাণিকগঞ্জের বিভূতিবাবু দৌড়ে আমার কক্ষে এসে বলে গেলেন: দ্বিজেনবাবু, আপনি খালাস।

খালাস!—বলে কী?…বুঝলাম এটা বিভূতিবাবুর কষ্টকল্পনা। লোকটা বছর তিনেক ধরে জেলের ঘাস খাচ্ছে, তাই মুক্তির জন্য হয়ে উঠেছে লালায়িত। মুক্তির কথা উচ্চারণেও আনন্দ পায়।

আমার শরীর তখন ভালো নয়, হাসপাতালের অধীনে আছি। অর্থাৎ সরু লাল ষ্ট্রাইপওয়ালা পায়জামা পরেছি, যার ঝুল নেমেছে ঠিক হাঁটুর নীচে অবধি। আমার খাদ্য আসে হাসপাতাল থেকে, ওষুধও।

জিজ্ঞেস করলাম: কী করে জানলেন?

সোৎসাহে জবাব দিলেন তিনি: বাঃ, খালাসী মেট যে বলে গেল আপনাকে থালা কম্বল নিয়ে রেডি থাকতে। সে ঘুরে আসছে।

রেডি আর কী থাকবো? খান চারেক কম্বল আর থালা ও বাটি, এই তো আমার সংসার। বগলদাবা করেই এই সংসার নিয়ে চলাফেরা করা যায় গন্ধমাদনের মতো! কিন্তু খালাস তো নয়, সুতরাং সংসারের কথা ভেবে কি হবে?

একটু পরই মেট ফিরে এসে হাঁক দিল: কোথায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলী কোথায়? আসেন, আসেন, শীগ্‌গির কইরা আসেন।

বিভূতিবাবু ছোঁ মেরে তার হাতের স্লিপখানা কেড়ে নিলেন, বলে উঠলেন: এই দেখুন, লেখা আছে For release! দেখলাম আমার নীচে লেখা খগেন চাটার্জ্জী আর বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জীর নাম।

অসুস্থ শরীরে বেরিয়ে এলাম। চল্লিশ ডিগ্রির সম্মুখ দিয়ে আসবার সময় বন্দীরা একেবারে ঘিরে ধরলেন। অসংখ্য প্রশ্ন, জবাব দেবার সময় পেলাম না। শেষ পর্য্যন্ত সবাই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলীপুর সেনট্রাল জেলে, সেখান থেকে সোজা আন্দামান। আন্দামান তখন আবার খোলা হয়েছে। পাঁচ বছর বা তার বেশী যাদের মেয়াদ, তাদের আন্দামান প্রেরণের নীতি গ্রহণ করেছেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। তাই কজন এগিয়ে এসে সহাস্যে করমর্দ্দন করে বলে দিলেন: যান্, আমরাও পরে আসছি।

ইয়ার্ডের বাইরে এসে মেট আমায় নিয়ে চললো গুদামের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম: সত্যিই খালাস, না কলকাতা চালান?

মেট জবাব দিল: তা কইতে পারি না। তবে অফিস যাইতে হবে।

গুদামের দিকে যাচ্ছি কেন?

আপনার নিজের জামাজুতা পরতে অবে যে!

গুদামে এসে পৌছতেই বিপদ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো আমায়ঃ দ্বিজেনদা, সত্যিই আমরা খালাস পেয়েছি। খগেন, আপনি আর আমি। হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে, জানেন না? অনাথ আর রণুদাকে ছাড়েনি।

পোষাক পরিবর্ত্তন করে পরলাম নিজেদের ধুতি ও জামা। তিনজন এসে হাজির হলাম অফিসে। দেখি, সেখানে কাগজপত্র নিয়ে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন স্বয়ং বিভূতি সাহা। আমাদের দেখেই নিঃশব্দে হাসলেন একেবারে বত্রিশটি সাদা ধবধবে দন্ত বিকশিত করে। ঠিক তেমনি চোখ দুটি ছোট হয়ে এল। বললেনঃ Congratulations! দ্বিজেনবাবু, Congratulations! সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত আপনিই জয়লাভ করলেন। আমাদের সর্ব্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলামঃ মানে?

মহাবিস্ময়ে বললেন তিনিঃ সে কি, কিছুই জানেন না আপনি? আজ যে সাত দিন হয়ে গেল হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে। কেন, ষ্টেটসম্যান-এ বেরিয়েছে তো বেশ বড় বড় হরফে, দেখেননি?

বললামঃ ষ্টেটসম্যান তো দেওয়া হয় না আমাদের।

আমাদের দেখে ও কথোপকথন শুনে টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এলেন রেজাক সাহেব। জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার দ্বিজেন বাবু?

এইবার মওকা পেলাম বলবারঃ বুঝলেন না রেজাক সাহেব, বিভূতিবাবু মনে করছিলেন মুন্সীগঞ্জের ভবেশ রায়ই হচ্ছেন আমাদের জেলে আটকে রাখবার একমাত্র মালিক। কিন্তু বাবারও তো বাবা আছে, সে কথা ওঁদের মনে ছিল না। বলেছিলেন নাগপাশ আর পাশুপত একেবারে রেডি, ছাড়লেই হয়। আমিও বলেছিলাম, আমার বর্ম্মও খাঁটি ইস্পাতে তৈরী। কুস্তির প্রথম রাউণ্ডে অবশ্য আমায় প্রায় কাবু করে ফেলেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় ও শেষ রাউণ্ডে একেবারে চিৎ হয়ে পড়েছে আই বি-র দল। তাই না বিভূতিবাবু?

সেই চোখ-ঢাকা হাসি! বললেনঃ তবে শুধু খোলস বদলানো হবে।

অর্থাৎ আবার রাজবন্দী, এই ত? তা হোক্।—বলে একটু গম্ভীর হয়ে বললামঃ কিন্তু পরাজিত হলেন তো। পূর্ব্বেই বলেছিলাম, দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে রাজবন্দী করে রাখতে পারেন সারাজীবন; কিন্তু, নির্দ্দিষ্ট কোনো মামলায় ফাঁসিয়ে আটকে রাখতে পারবেন না। আমায় ধরবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। এবার স্বীকার করেন তো?

আবার সেই নিরুত্তর, নিঃশব্দ হাসি!······

বিপদভঞ্জনকে মুক্তি দেওয়া হলো সর্ত্তাধীনে আর খগেন ও আমায় রাজবন্দীর তক্‌মা এঁটে পাঠিয়ে দেওয়া হলো রাজবন্দীদের ইয়ার্ডে। পূর্ব্বে এটা ছিল জেনানা ফাটক, এখন জেনানাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে একে রূপান্তরিত করা হয়েছে রাজবন্দী ইয়ার্ডে। সংখ্যায় খুব বেশী নয়, জন ত্রিশেক। দুটি লম্বা হল-এর মতো ঘর, তার মধ্যেই সারি সারি শয্যা। একসঙ্গে এতগুলো লোক থাকায় সুবিধে ছিল, রাত্রে ঘরে তালাবন্ধ হয়ে যাবার পরও আমাদের নানা রকম আলোচনা, পড়া, ক্লাশ ও খেলা চলতো।

এসেই আমি সিপাই মারফৎ একখানি পত্র পাঠালাম রঙ্গলালের কাছে। বন্দী হলেও আমি এখন আবার রাজবন্দী, সরকারী অফিসের পিতলের চাকতি লাগানো পোষাক-পরা পিওনের মতো। পিওনের মধ্যে এরা কুলীন, হাঁকডাক বেশী। তেমনি বন্দীদের মধ্যে রাজবন্দী। রঙ্গলালকে লিখে পাঠালাম: "আইনের মার-প্যাঁচে আমি মুক্তি পেলাম সত্য, কিন্তু নিজের ভ্রম সংশোধনের জন্য স্বেচ্ছায় দীর্ঘ কারাবাস বরণ করে নিয়ে তুমি যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। দাদাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলে তুমি, তোমার পণ রক্ষা হলো। কিন্তু তোমার দীর্ঘ কারাদণ্ডের বিনিময়ে যে মুক্তি ক্রয় করলাম, তাতে পুরো আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না।"

চিঠির জবাব পেলাম সিপাইয়ের মুখে। হিন্দী ও বাংলা মিশিয়ে সে যা বললো, তার মর্ম্মার্থ এই যে, "আপনার মুক্তিই ছিল তার কাম্য, তাই সে খুব খুশী হয়েছে। নিজের জন্য সে ভাবে না।"

তারপরই একখানা দরখাস্ত করলাম মুন্সীগঞ্জের সেই বিখ্যাত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপী মহকুমা হাকিম ভবেশ রায়ের কাছে। দরখাস্তখানার প্রতিপাদ্য বিষয় ও কিছু ভাষার প্রাখর্য্য আজও আমার মনে পড়ে:

"সবিনয়ে নিবেদন,

যথাবিহিত সম্মানের সহিত জানাইতেছি যে, আশা করি মহামান্য হাইকোর্টের রায় আপনার গোচরীভূত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম আপনার দীর্ঘ রায়ে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য ও আমাদের জবানবন্দী বিবেচনা করিয়া ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আমাদের দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং কোর্ট ইনস্পেক্টার যে আবেগময় ভাষায় সওয়াল করিয়াছিলেন, সেই জ্বালাময়ী ভাষাতেই আমাকে সাধ্যমত সর্ব্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া বৃটিশ সরকারের প্রতি আপনার দাসসুলভ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন একেবারে বেহায়ার মতো!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনারও বাবা আছেন এবং সকল বাবাই আপনার মতো পুলিশের তাঁবেদার নন। তাই আপনার ন্যায়বিচার সেখানে ফাঁসিয়া গিয়াছে।”

জেলর সুধীর মুখাৰ্জ্জী সেলাম পাঠালেন আমায়। বললেন : অবশ্য আমি আপনার পত্র পাঠিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু এতে শেষকালে Contempt of Court হয়ে যাবে না তো?

এখন আমার কদর অত্যন্ত বেশী। যে সুধীর মুখাৰ্জ্জী দু'দিন পূর্ব্বেও কয়েদী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর প্রতি কদাচিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং বহু সাধ্যসাধনার পর নাসিকা উঁচু করে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন চরম তাচ্ছিল্যভরে মেরী এ্যান্টিওনেটের মতো, এখন তিনি যেন আমার শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণ রাজবন্দী দ্বিজেন গাঙ্গুলীর পায়ে যাতে কাঁটাটি না বিঁধতে পারে, সেজন্য যেন সর্ব্বদাই বিছিয়ে রেখেছেন নিজের কোমল বুক!······

বললাম হেসে : ডাকাতি মামলায় হয়েছিল সাত বৎসর, আদালত অবমাননার দায়ে না হয় হবে সাত দিন জেল। তিন মাস তো আপনাদের ফার্ষ্ট ক্লাস গরুর খাদ্য হজম করলাম, না হয় আর সাত দিন গলাধঃকরণ করবো সেই মোগলাই খানা!—পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এর জবাবে ভবেশ রায় লক্ষ্মী ছেলেটির মতো পাঠিয়ে দিলেন তাঁর নিজের দীর্ঘ রায়ের এক খণ্ড ও হাইকোর্টের রায়ের এক খণ্ড অনুলিপি। না চাহিতে দান!···রীতিমত পয়সা ব্যয় করে যা সংগ্রহ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, তাই এসে গেল আপসে। ভালোই হলো।

সবাই মিলে দুটোই মিলিয়ে পড়া গেল। ময়মনসিংহের নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গালপোড়া নামে যিনি খ্যাত) পড়তে লাগলেন আর আমরা তা উপভোগ করতে লাগলাম। দীর্ঘ পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ভবেশ রায়ের রায়। মনে হয় কোর্ট ইনস্পেক্টারের দীর্ঘ সওয়াল পুরোটাই ভদ্রলোক শর্টহ্যাণ্ডে টুকে নিয়েছিলেন!··· আর হাইকোর্টের বিচারপতি কানলিফ ও হেণ্ডারসনের রায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র ফুলসক্যাপের এক-চতুর্থাংশ। অন্যান্য কথার পর লিখেছেন :

The learned Magistrate could not even frame the charges. The Approver's statement is misleading. Hence, the principal accused Dwijen Ganguly should be set at liberty at once along with···ইত্যাদি ইত্যাদি।

পান্নালাল মিত্র বলে উঠলেন : ভবেশ রায় একেবারে His Master's Voice ছেড়েছেন!

ময়মনসিংহের কমিউনিষ্ট মণী সিং বললেন : আসুন, ওঁকে একখানা অভিনন্দন-পত্র পাঠাই আমরা। এমনি সারগর্ভ রায়···

সবাই হেসে উঠলো।

হাইকোর্টে আমাদের মামলা চালিয়েছিলেন ব্যারিষ্টার সন্তোষ বসু ও অ্যাডভোকেট সুধাংশুভূষণ সেন।

১৯৩৬ সালের জুন মাস। বেশ গরম পড়লেও আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে হলো না। রাত্রে বিরাট বিরাট পাটবিহীন জানালাপথে বেশ হাওয়া খেলতো, আর আমরা খেলতাম তাস, পাশা, ক্যারম, মাজাং প্রভৃতি।

হঠাৎ একদিন দেয়ালের বাইরে শহরের রাস্তায় প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল, ঠিক দুপুরবেলায়। মাঝে মাঝে পট্‌কার শব্দ। আশঙ্কা হলো ঢাকা শহরে আবার হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা লেগে গেল বুঝি! সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম, সিপাইদের মধ্যেও বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে, দুএকজন ছুটোছুটিও সুরু করে দিয়েছে।

একটু পরই একজন সিপাই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে সংবাদ দিয়ে গেল : রাজ মিল গিয়া!—বলেই আবার হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পরেই জানাতে পারলাম, ভাওয়াল মামলার রায় বেরিয়েছে। বিচারপতি পান্নালাল বসু বাদীকেই ভাওয়ালের মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলে ঘোষণা করেছেন। তাই এই শোভাযাত্রা, বাজী পোড়ানো, হল্লা ও সিপাইদের মধ্যে অফুরন্ত উল্লাস ও উচ্ছ্বাস!······

পান্নালাল বললেন : আপনার কান্‌লিফ-হেণ্ডারসনের মতোই পান্নালালের যুগান্তকারী রায়। হবে না কেন, ও যে পান্নালাল! শুধু মিত্র নয়, বসু।

সবাই হেসে উঠলাম।

এই জুন মাসেরই মাঝামাঝি একখানা দরখাস্ত পাঠালাম আমার চিরদিনের শত্রু ঢাকা আই বি-র কর্ত্তা গ্র্যাসবি সাহেবের কাছে। লিখলাম : দয়া করে অবিনাশ দারোগাকে পাঠিয়ে দেবেন। গোপনে কিছু কথা আছে আমার। সত্বর।

গোপনতা নিয়ে যাদের কারবার, গোপন কথার সংবাদ পেলেই স্বভাবতঃই

তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে রেস্কোর্স-এ বিজয়ী 'লাকি ডগ্-এর' মতো। কী কোহিনূর যেন কুড়িয়ে পেল এরা! কোন্ আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলেছে!…

সাত দিনের মধ্যেই এসে হাজির অবিনাশ দারোগা।

নমস্কার, নমস্কার দ্বিজেনবাবু! আরে মশাই, ও আমি আগেই জানতাম। সাত বৎসর যে আমারাই কল্পনা করিনি। ভবেশ রায়ের কাণ্ড!

বললাম: There are many things Horatio…

বললেন: বিলক্ষণ! ও আমি আগেই জানতাম। —আসুন সুপারের ঘরেই বসি আমরা। অফিসে লোকজন গিজ্‌গিজ করছে। ওখানে কাজের কথা হয় কখনো?

সুপারের ঘরে এলাম। দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হলো! অবিনাশ বলতে লাগলেন: ও আমি আগেই জানতাম। আপনার মতো জুয়েল কেন শুধোশুধি জেলে পচবেন বলুন তো? দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে সামনে। ছিলাম মশাই ছুটিতে, প্রিভিলেজ লিভ, পাওনা ছুটি। অকস্মাৎ সাহেবের টেলিগ্রাম গিয়ে হাজির, চলে এসো। চলে এলাম। সাহেব বললেন, যাও, দ্বিজেনবাবু তোমায় ডেকেছেন। কী গোপন কথা আছে তোমার সঙ্গে। কী কথা, তা আমিও জানি। বিশ্বাস করুন দ্বিজেনবাবু, I feel for you—

বললাম: আমিও আপনার জন্য ফিল্ করছি অবিনাশবাবু!—

ও আমি আগেই জানতাম।—বলে খুক খুক করে হাসতে লাগলেন অবিনাশ।

বললাম: সবই দেখছি আপনি জানতেন সাজাহান নাটকের জয়সিংহের মতো।

অবিনাশের হাসির শব্দ উচ্চ গ্রামে উঠলো: হা হা হা, শিক্ষিত ব্যক্তি আপনি, সব কথাতেই বেশ উপমা দিতে পারেন! সাজাহান নাটকের জয়সিংহ—বলে আবার সেই গর্দ্দভের হাসি। হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন: কী হবে মশাই, দুটো ভাঙ্গা রিভলভার নাড়াচাড়া করে? ও দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে? তাহলে আর ভাবনা ছিল না। যেন ছেলের হাতের মোয়া আর কি!

আবার সেই উল্লুকের হাসি: এই পাগলামো যে একেবারে নিরর্থক স্রেফ ইয়ারকি, যাক্, অবশেষে আপনিও তা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে যে একদিন পারবেন, ও আমি আগেই জানতাম—

গম্ভীর হয়ে এবার বললাম: জয়সিংহের মতো সবই জানতেন বটে, কিন্তু জুলিয়াস সীজারের মতো একটা কথা জানেন না। জানেন না যে, বিপ্লবীদের যে একখানা ব্ল্যাক বুক আছে, আপনার নাম উঠে গেছে তাতে—

অকস্মাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে দিল! হাসি উবে গেল অবিনাশের, হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে বলির পাঁঠার মতো! বলতে লাগলাম: অবশ্য আই বিদের কাউকেই বিপ্লবীরা দোস্ত মনে করেন না কখনো। তবে তাই বলে সবারই নাম ব্ল্যাক বুকে তোলা হয় না। নিশ্চিত কোনো চার্জ কারুর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে তবেই লাল কালি দিয়ে তার নাম চিহ্নিত হয়ে যায়। আপনার বিচার হয়েছে, আর সে বিচারে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অপরাধী! কেন আমি কী করেছি?—অবিনাশের হাঁ আরও একটু বড় হয়ে উঠলো, দৃষ্টি ভয়ে ও বিস্ময়ে একেবারে নিষ্পলক। তৎক্ষণাৎ বললাম: আপনি অনিল দাসকে টর্চার করে মার্ডার করেছেন! আপনি মার্ডারার!

বলেন কি, আমি!—তারপর তোতলার মতো ঠেকে ঠেকে একই কথা বার বার উচ্চারণ করে, অজস্র অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ ও শৃগালের যুক্তির অবতারণা করে, একেবারে কিছুই জানিনে বলে অবশেষে অবিনাশ যখন তাঁর দীর্ঘ সওয়াল শেষ করে ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন, তখন স্পষ্ট দেখলাম তাঁর কপালে অজস্র স্বেদবিন্দু চক্চক্ করছে।

মৃদু হেসে বললাম: এই মাত্র বলেছিলেন না যে, সবই জানেন আপনি এবং আগেই জানতে পারেন। আর এই দুঃসংবাদটি রাখেন না যে, এবার আপনিই হচ্ছেন বিপ্লবীদের টারগেট? অনিল দাসকে আপনি হত্যা করেছেন নৃশংসের মতো, তাই ব্ল্যাক বুকে আপনার নাম এবার সবার ওপরে উঠেছে by order of merit—এই দুটি সংবাদ প্রত্যেক বন্দিশিবিরে ও জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জেলের বাইরেও যে তা যথাস্থানে যেতে পারেনি, তা মনেও স্থান দেবেন না। সুতরাং—কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অনাবশ্যক খাটো করে বললাম: একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন অবিনাশবাবু! ঢাকা শহরের গলিগুলো বড্ড অপরিসর ও নোঙরা, ধারেই বয়ে চলেছে বুড়ীগঙ্গা নদী। একখানা আঠার ইঞ্চি ছোরা নিঃশব্দে আপনার পেটের মধ্যে চালিয়ে দিলেই গল গল করে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। তারপর একখানা ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে এনে লাসটা নদীতে ছেড়ে দিলেই—ব্যস, কাজ সাফা। মাছগুলোর বেশ কিছুদিনের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারবেন—

অবিনাশ দারোগা বেঁচে আছেন কি না, বোঝা গেল না। পাথরের মতো চেয়ে রয়েছেন তিনি। সে দৃষ্টি শূন্য। মনে হলো সত্যিই তার পেটে আঠারো ইঞ্চি একখানা ছোরা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে!……

মনে মনে হেসে সবিনয়ে নিবেদন করলাম: এই সংবাদটুকু দেবার জন্যই আপনাকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার প্রিভিলেজ লীভটা মাঠে মারা গেল। আহা! সত্যিই আপনাকে আমার বন্ধু মনে করি অবিনাশ বাবু, তাই শুভানুধ্যায়ীর মতো সময় থাকতে সাবধান করে দিলাম। আচ্ছা, এবার চলি?

কিন্তু আই বি পুঙ্গব অবিনাশ তখন মৃত। বোধহয় পচনও সুরু হয়ে গেছে সেই বাসি মড়ায়।......

গট্ গট্ করে বেরিয়ে এলাম নন্দের রাজসভা থেকে চাণক্যের মতো।

উনষাট

রাজবন্দী ইয়ার্ডের ম্যানেজার তখন আমি। ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে কিচেন ম্যানেজ করা। আমাদের বরাদ্দ টাকার মধ্যে যা-যা আমরা চাই, একখানি বিশেষ খাতায় তা লিখে জেলরের কাছে পাঠিয়ে দিতে হয় রোজ। জিনিষগুলো পাওয়া যায় তার পরদিন। সকালবেলা রোজই অফিসে গিয়ে সরবরাহকারীর কাছ থেকে সেগুলো মিলিয়ে ও ওজন করিয়ে নিয়ে আসতে হয়। তার পরের কাজ হচ্ছে বাবুর্চ্চির।

একদিন সকালবেলা অফিসে গিয়ে কাজ শেষ করে চলে আসবো, এমন সময় অকস্মাৎ যতীন দারোগার সঙ্গে দেখা। তিনি একেবারে কলরব করে উঠলেন।

কুশলাদি প্রশ্নের পর নিজের কথাও বললেন যে, তিনি লালবাগ থানায় বদলি হয়ে এসেছেন। সাধারণ ডাকাতি মামলায় চারজনের সাজা হয়ে যাওয়ায় এসেছেন জেলে তাদের হাতের ছাপ নিতে। ছাপ নেওয়া চলতে লাগলো প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রত্যেকটি আঙ্গুলের, তারপর একসঙ্গে চারটি আঙ্গুলের। এমনিভাবে দুহাতের।

বসে বসে খোসগল্প চলছিল, এমন সময় যতীন দারোগা আর-একজন খাঁকি পোষাক-পরা দারোগাকে দেখিয়ে বলে উঠলেন: ওহো, এঁর সঙ্গে তো আপনার পরিচয়ই করিয়ে দিইনি। ইনি হচ্ছেন মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, লালবাগের তৃতীয় দারোগা, আগে ছিলেন আই বি-তে, আর ইনি হচ্ছেন···ইত্যাদি।

চট্ করে যেন ঘা খেলাম মনে! ফস্ করে মনে পড়ে গেল, আই বি-তে ছিলেন মনোরঞ্জন······

নমস্কার ও প্রতি-নমস্কারের পর প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা, আমাদের মামলার কোনও সংবাদ রাখেন আপনি?

সস্মিতমুখে জবাব দিলেন: তা একটু রাখি। বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জী আপনার সহ-আসামী ছিলেন তো? আমাকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হয়। আই বি-তে থাকতে এমনি অনেক অপ্রিয় কাজই করতে হতো দ্বিজেনবাবু। তাইতো ছেড়ে এলাম থানায়। আপনার নামও শুনেছিলাম, কিন্তু দেখা হয়নি। ভারী আনন্দ পেলাম আজ পরিচিত হয়ে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম: আমিও ভারী আনন্দ পেলাম আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমিও আপনার নাম শুনেছিলাম, বিশেষ করে বিপদভঞ্জনের কাছেই। কারণ আই বি অফিসে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার আপনিই করেছিলেন তার ওপর।

কই, না!—বলে সমস্ত অতীতের কালি যেন এক পোঁচেই হোয়াইটওয়াশ্ করে ফেললেন মনোরঞ্জন।

কিন্তু আমি তাতে ভুলবো কেন? বলতে লাগলাম: অবশ্য তার সাক্ষী কেউ নেই। বিপদ ও আপনি ছাড়া ঘরে ছিল একটা সিপাই, যে ব্যাটা আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য বিপদের চুলের মুঠি ধরে ওঠ-বোস্ করিয়েছিল আর তাকে উলঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল আপনারই হাণ্টারের সম্মুখে। ভুলে গেছেন সে সব কথা?

বেগতিক দেখে যতীন দারোগা আঙুলের ছাপ নেবার কাজে একেবারে তনুমনপ্রাণ ঢেলে দিলেন আর আসামী মনোরঞ্জন ছুরি-হাতে ধরা-পড়ে-যাওয়া অপরাধীর মতো তখনো সাফাই গাইতে লাগলেন অসংলগ্ন ভাষায়।

ও সব প্রলাপে কর্ণপাত না করে আমি বলে গেলাম: গ্রেপ্তার তো আমাকেও করা হলো এই জেল গেটে ঘটা করে। কিন্তু বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামীকে অমনি জামাই আদরে রাখা হলো কেন? নিলেই পারতেন আপনি আমারও ভার। কেরামতি একবার আপনার দেখে নিতাম আমি। —লজ্জা করে না আপনার এই ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে হাত তুলতে? চাকরি করতে হবে বলে কি কুকুরের প্রভুভক্তি দেখাতে হবে?—শুনুন মনোরঞ্জনবাবু, চাকা একদিন ঘুরবে। দেশ স্বাধীন হবে। সেদিন আর এমনি করে আপনাদের হাতের ছাপ দিতে আসবো না আমরা। চৌরাস্তার মোড়ে প্রকাশ্য দিনের আলোয় আপনাদের মতো সমাজের কলঙ্কদের সেদিন গিলোটিন করা হবে, যেমন হয়েছিল ফ্রান্সে। আর আপনার বেলায় পাঠিয়ে দোব ঐ বিপদভঞ্জনকেই। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, বুঝলেন?

মনোরঞ্জন তখনো আবোল-তাবোল বলে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতে লাগলেন, আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম: shut up, রাস্কেলের মতো আর বক্ বক্ করতে হবে না। বিপদভঞ্জন ছাড়া পেয়ে চলে গেছে আর আছে এই ঢাকা শহরেই। বিপদভঞ্জনকে মার দেবার কী প্রতিফল, তা সে শীগগিরই ভালো করেই বুঝিয়ে দেবে আপনাকে।

বেরিয়ে চলে এলাম। এবং ইয়ার্ডে এসে বন্দীদের সঙ্গে বসে প্রাণ ভরে হাসলাম অনেকক্ষণ। সে রাত্রিতে মনোরঞ্জন অন্ততঃ দুঃস্বপ্ন দেখবে নিশ্চয়ই !······

এর কিছুদিন পরেই একদিন দুপুরবেলায় অফিসে ডেকে পাঠালেন রেজাক সাহেব। এসেই পেলাম আবার বদলির হুকুম। কিন্তু একি ? ছাপানো ফরমের ফাঁকা অংশে টাইপ করে লেখা, নামতে হবে দিনাজপুর জেলার দারোয়ানী ষ্টেশনে এবং সেখান থেকে যেতে হবে খানসামা গ্রামে !

দারোয়ানী কখনো কোনো রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম হয় ? খানসামা কখনো গ্রামের নাম হয় ? আই বি সহ-দারোগা বললেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁর কিছুই বলবার নেই।

পরিষ্কার বলে দিলাম : কিন্তু মশাই, দারোয়ানী আর খানসামা যদি না হয়, তাহলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবেন, তা আগেই বলে রাখছি। অপর কোথাও আমি যাবো না কিন্তু। সরকার বাহাদুরের হুকুমমত কাজ করতে হবে তো। কী বলেন ?

রেজাক সাহেবও হাসলেন, সঙ্গে সহ-দারোগাও। এবং ইয়ার্ডে ফিরে এসে এই আজগুবী সংবাদ পরিবেশনের পর সবাই একচোট হেসে নিলেন।

দারোয়ানী ! খানসামা !···সে আবার কোন্ দেশ ?······

কিন্তু আমাদের সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে এর দুদিন পর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ১৭ই জুলাই সন্ধ্যার দিকে সত্যিই এসে নামলাম দিনাজপুর জেলার দারোয়ানী ষ্টেশনে। সেখান থেকে আট মাইল যেতে হবে গরুর গাড়ীতে। মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ী থানায় যাবার সময়ও কাঁথি রোড ষ্টেশন থেকে আট মাইল যেতে হয়েছিল গরুর গাড়ীতেই। সে রাস্তা তেমন খারাপ মনে হয়নি। এখানে কিন্তু রেলওয়ের সীমানা পার হয়ে মেঠো রাস্তায় পড়তেই প্রবল ঝাঁকুনি খেতে লাগলাম।

সঙ্গী আই বি-র সহ-দারোগা কে ছিলেন, তাঁর নাম মনে নেই। বললেন : বসে থাকতে পারবেন না দ্বিজেনবাবু, রাস্তা বড্ড খারাপ। কত আর মাথা ঠুকবেন ছইতে ? আর বাইরে কিছুই তো আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, সন্ধ্যে হয়ে গেল। শুয়ে পড়ুন।

সত্যিই সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাইরে কিছুই আর দেখা যায় না। ওপরে কালো মেঘে ছাওয়া আকাশ আর নীচে ঝোপঝাপের আড়ালে এখানে ওখানে কাদের সব

বাড়ীতে স্তিমিত আলোর আভাস। গ্রামের আকা-বাঁকা মেঠো পথে বিশ্রীভাবে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে আমাদের গো-যানখানি। কেমন করে এগিয়ে চলেছি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ভারী সুন্দর লাগে যদি দেখতে পেতাম—ধীরে ধীরে পেছিয়ে পড়ছে চাষীদের কুটিরগুলি, তাদের ধানের মড়াই, কুমড়ো মাচা আর গরু-বাঁধা গোয়ালঘর। এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ী কোন্ চাঁপাডাঙ্গার মধ্য দিয়ে, কোন্ কঙ্কাবতীর ঘাট পেরিয়ে, কোন্ বৌ-মারী খাল ডাইনে রেখে, কোন্ বাবলা বনের নীচে নীচে। ভারী ভালো লাগে দেখতে—দিনের শেষে ক্ষেত থেকে ফিরে আসছে চাষী ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, কাঁধে লাঙ্গল, হাতে গরুর দড়ি। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে তখনো পাট ধুচ্ছে চাষী-বৌ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলরব করে ছুটোছুটি করছে, আর আমরা এগিয়ে চলেছি মাইলের পর মাইল। ঘুরছে আমাদের গাড়ীর চাকা, তাই পেছিয়ে পড়ছে ছায়ায় ঢাকা গ্রাম, ধানে ঢাকা মাঠ, দামে ভরা বিল, পেছিয়ে পড়ছে জেলা বোর্ডের মাইল পোষ্টগুলি একটি পর একটি।······

কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম, অকস্মাৎ বৃষ্টির শব্দে চমকে উঠলাম। হ্যাঁ, সত্যিই বৃষ্টি নেমেছে চড় বড় করে। ছইয়ের ওপর তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি দুপাশে দুটো পরদা এঁটে দিলাম। দিলে কী হবে, ছইয়ের অসংখ্য অদৃশ্য ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগলো। বিছানা গুটিয়ে ফেললাম বটে, কিন্তু গা বাঁচাবার উপায় নেই দেখে ভিজতে লাগলাম চাদর গায়ে জড়িয়ে অনন্যোপায় দাঁড়কাকের মতো। কালি-ধরা লণ্ঠনটা দোল খাচ্ছে, ঝাঁকুনি খাচ্ছি আমরাও, পরদার বাইরে শুনতে পাচ্ছি গাড়োয়ানের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ : আরে হুরুৎ হুরুৎ, ডাইনে কুন্‌ঠে যাছিস্ ? গাড়াৎ পড়বি নাকি রে ? হুরুৎ হুরুৎ···

গতি মন্থর হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই, তবু এগিয়ে চলেছে। রাত যতই হোক, পৌছুতে হবে খানসামাখানায়। নিশ্চয়ই সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই সেখানে পৌছে গেছে। অভ্যর্থনা করবার জন্য হয়তো অপেক্ষায় আছেন দারোগাবাবু। হয়তো ক্ষীরোদ দত্তেরই পরিমার্জ্জিত সংস্করণ। কিংবা হয়তো অবিনাশ জমাদারেরই ভায়রা ভাই।

একসময় বর্ষণ আবার থেমে গেল। গলা বাড়ালাম বাইরে। নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, লণ্ঠনের স্তিমিত আলো তা যেন ভয়াবহ করে তুলেছে। মনে হচ্ছে সম্মুখের জমাট অন্ধকার শিংয়ের ঘায়ে ঘায়ে বিদীর্ণ করে ও খুরের ঘায়ে ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাহনযুগল ল্যাজ নেড়ে নেড়ে।

রাত প্রায় দশটায় এসে প্রবেশ করলাম থানা কম্পাউণ্ডে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোরেখায় স্পষ্ট পড়লাম এ্যালুমিনিয়মের নীল সাইনবোর্ড, খানসামা পোলিস ষ্টেশন। তাহলে শুধু দারোয়ানী নয়, খানসামা নামেও আছে একটি গ্রাম এই বিশ্বে! বারান্দায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন যিনি, তিনিই বোধহয় অফিসার-ইন-চার্জ্জ। তারপর টেবিলের বিপরীত দিকে উপবিষ্ট একজন সুপুরুষ বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন: ইনি হচ্ছেন আমাদের ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব।

বসলাম। চারিদিকেই অন্ধকার। মনে হলো কোন্ সুন্দরবনে আমায় আনা হয়েছে কিংবা খারাবাড়ির গহন অরণ্যে। কে জানে, হয়তো এ গ্রামের সবাই খানসামা, তাই এর নাম খানসামা।······

নীরবতা ভঙ্গ করলেন ইন্‌স্‌পেক্টার সাহেব: কিন্তু এত রাতে ডেটিনিউবাবুর খাবার কী ব্যবস্থা হবে দারোগাবাবু? রঘুর দোকান কি বন্ধ হয়ে গেছে? না হয় একজন সিপাইকে পাঠান কিছু খাবার কিনে আনতে।

বিশ্বেশ্বরবাবু তা আগেই আনিয়ে রেখেছেন স্যার!—বলেই হাঁক দিলেন দারোগা: রবি, রবি, বিশ্বেশ্বরবাবুকে একবার ডাক তো। বল, দ্বিজেনবাবু এসে গেছেন।

থানাঘর থেকে বেরিয়ে রবি পাশের বেড়া-দিয়ে-ঘেরা ছোট্ট বাসাটিতে প্রবেশ করলেন। একটু পরেই সঙ্গে করে নিয়ে এলেন বিশ্বেশ্বরবাবুকে। মালপত্র তোলা হলো আমার ঘরে। বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমি এসে আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় প্রবেশ করলাম।

একখানাই ঘর, মাঝে ছিটে বেড়ার পার্টিশন তুলে দুটি কক্ষে বিভক্ত। মাটির মেঝে, খড়ের চাল, তক্তপোষটা অন্ততঃ কেশিয়াড়ীর মত পাঁচ ফুট নয়, আর প্রস্থেও বেশ।

দোকানের লুচি তরকারী ও মিষ্টি খেতে খেতে বিশ্বেশ্বরবাবু মোটামুটি সবই জানিয়ে দিলেন। এ গ্রামের প্রায় সবই হিন্দু। বেশ কিছু মাড়োয়ারীও আছেন। পাশেই খানসামা বন্দর। পূর্ব্ববঙ্গের বন্দরের সঙ্গে অবশ্যই তুলনীয় নয়। তথাপি খুব ছোট নয়। বড় দোকান গোটাকয়েক আছে। খাবার-দাবার মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। সপ্তাহে দুদিন হাট আর রোজ বিকেলের দিকে দুচার ঝুড়ি মাছ আসে। লোকাল ফিশ্, অদ্ভুত নাম—খড়কি, ভাংনা, কুরসা, দাইরকা ইত্যাদি। ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত যাঁরা, তাঁরা প্রায়ই বিদেশী, এখানে এসে জমিজমা কিনে এ দেশীয় লোক অর্থাৎ বাহেদের ওপর রাজত্ব করছেন। ধোপাও

আছে, নাপিতও আছে এবং তাদের কাজও চলনসই। দুর্গাপুজোও হয় বেশ ঘটা করে এবং কখনো কখনো নাটকাভিনয়। দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, পোষ্টঅফিসও আছে। ছেলেদের আছে এম ই স্কুল আর মেয়েদের ইউ পি। ফুটবল খেলাও হয়ে থাকে। আর এই সব পূজা পার্ব্বণ, খেলাধূলা, অভিনয়, জলসা—বলতে বলতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: গ্রামের প্রত্যেকটি কাজে অগ্রণী ও লীডার হচ্ছেন এখানকার চাটার্জ্জী ফ্যামিলি। সাতটি ভাই, প্রায় সবাই মাষ্টার। এঁদের বাবা এম ই স্কুলের হেডমাষ্টার, এক ভাই ঐ স্কুলেরই হেডপণ্ডিত, একজন এল পি স্কুলের মাষ্টার, আর এক ভাই দূরে আর একটি এম ই স্কুলের হেডমাষ্টার আর এঁদেরই এক বোন এখানকার মেয়েদের স্কুলের হেডমিসট্রেস। আর এক ভাই স্কুলমাষ্টার না হলেও মাইল কয়েক দূরে এক গ্রামে পোষ্টমাষ্টার।

হেসে বললাম: মাষ্টার পরিবার দেখছি।

বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: শুধু তাই নয়। রাজনৈতিক ব্যাপারেও এঁরাই অগ্রগামী। এঁদের এক ভাই নজরবন্দী হয়ে আছে বাড়ীতে, কাজও কিছু করেছে মনে হয়। পলাতক নরেন ঘোষকে এঁরাই আশ্রয় দিয়েছিলেন একবার। পুলিশের ভারী নেকনজর এঁদের ওপর। কালই হাট আছে, দেবো আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে।

থানার পরিচয়ও মোটামুটি পাওয়া গেল। দারোগার দেশ বিক্রমপুরে। ভীষণ বদমাস্। বোকা, অথচ মহাবিজ্ঞের ভাণ করে থাকেন। ব্যবহারে একেবারে চাষার মতো। সেইজন্যই আগেকার রাজবন্দী বীজেশ বোস ব্যাটাকে স্যাণ্ডেল দিয়ে দু ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এক মাস জেল হয় কিংবা জরিমানা। জরিমানা দিয়ে চলে গেছেন তিনি, সেখানেই এলাম আজ আমি। সিংহাসন খালি থাকতে পারে না।

সম্মুখে জমাট অন্ধকার দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম: চারিদিকে সবই তো জঙ্গল দেখছি।

বাধা দিলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: না, না, জঙ্গল আদৌ নয়। সামনেই থানার মাঠ, ওপাশে গোটা দুই কাছারী, সেখানে নায়েবরা বাস করেন সপরিবারে। ঐ কোণের বাসা কিশোরী মোহন ঘোষের, আমাদের নন-অফিসিয়েল ভিজিটর। ডাক্তারী করেন। ওর পরেই বন্দর, বন্দরের ওপারে চাটার্জ্জীদের বাড়ী। আর এদিকে একটু পরেই আত্রাই নদী। নামেই নদী, বর্ষাকালে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর চৈত্রমাসে একেবারে হাঁটুজল।

যা তথ্য সংগৃহীত হলো, তাতে বেশ বুঝতে পারলাম যে, দারোয়ানীর wayside

ষ্টেশন দেখে যতটা মুষড়ে পড়েছিলাম, খানসামা গ্রামের কাহিনী ততটা নিরাশা-ব্যঞ্জক তো নয়ই, বরং আভিজাত্যে ও প্রগতিবাদে একেবারে নবাববাড়ীর খানসামা মনে হতে লাগলো !......

অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প হলো এবং রাজনৈতিক পরিচয় আদানপ্রদানে জানা গেল, বিশ্বেশ্বরবাবু চট্টগ্রামের অনুশীলন দলের সভ্য। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলাম বৈ কি !

পরদিন সকালবেলা অকস্মাৎ বাড়ীর বাইরে কার হাঁকডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেশী রাতে শুয়েছি রেলগাড়ী ও গরুর গাড়ী জার্ণির পর, তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ভোর কাটাতে ভালই লাগছিল। কিন্তু বার বার ডাকে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম এবং বাড়ীর ঝাপের দরজা খুলে দিতেই দেখি একজন জীর্ণবস্ত্র পরিহিত ঘোড়সওয়ার। ঘোড়সওয়ার ?

পর পর প্রশ্ন করলাম : কি চাই ? কাকে চাই ? কেন চাই ? এত সকালে কেন ? কোথা থেকে আসা হয়েছে ? কোথায় যাওয়া হবে ?

আমার এতগুলো চোখা চোখা প্রশ্নের জবাবে অশ্বারোহী শুধু বললেন দুটি কথা : ভিখ্ দেন।

ভিখ্ ? মানে ভিক্ষা ? ঘোড়ায় চড়ে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা ? সে কি ? ঘোড়ার জন্য যে খাবার সংগ্রহ করতে পারে, সে কি আগে নিজের পেটের ব্যবস্থা করে না ? এ কী রকম ভিক্ষুক ? কলকাতায় অবশ্য দেখেছি ভিক্ষুকের সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা। কেউ চলেছে গড়াতে গড়াতে, কেউ কেরোসিন বাক্সের গাড়ীতে, কেউ চলেছে অনাবৃত থকথকে ঘায়ের মাছি তাড়াতে তাড়াতে, ওদেরই সঙ্গে কোনো ঘাগড়া-পরা মেয়ের হাতে হয়তো একটি খঞ্জনীজাতীয় কোনো যন্ত্র, তাই বাজিয়ে অবোধ্য ভাষায় চলেছে কোরাস্ সঙ্গীত, ভিক্ষুকেরা দোতলায় দৃষ্টিপাত করে চাইছে কাপড় বা খাদ্য, পথচারীর কাছে হাত পেতে চাইছে পয়সা......এসব ভিক্ষুককে চিনি। কিন্তু একেবারে ঘোড়সওয়ার ভিক্ষুক তো দেখিনি কোনোদিন। কল্পনারও বাইরে। দেখে মনে হলো, এসেছেন যেন কোন্ মিঃ আউটরাম কিংবা ক্রমওয়েল, এখনই দাবী করবেন খিঁজির খাঁর বজ্রকণ্ঠে হতভাগ্য আলীখাঁর ছিন্ন শির !......

বৃথা কালক্ষেপ না করে বিদায় করে দিলাম অশ্বারোহীকে দুমুঠো চাল দিয়ে। অশ্বের খুরের ঘায়ে কিছু ধুলো উড়িয়ে রাস্তার বাঁকে ভিক্ষুক অদৃশ্য হয়ে যেতেই এবার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। বেশ বড় কম্পাউণ্ড। ইচ্ছে করলে ছোট-খাটো

ফুটবল খেলার মাঠ করা যেতে পারে। দূরে একদিকে দুখানা কোঠাবাড়ী, একখানা সাদা রংয়ের, অপরখানা লাল। আয়তন দেখে বেশ বুঝতে পারলাম সাদাখানি দারোগা পরিতোষের আর লালরংয়েরখানা জমাদার কামাখ্যা মুখার্জ্জীর। সামনেই প্রকাণ্ড একটি আম্রবৃক্ষ, তার নীচে বাঁশের মাচা। বসে হাওয়া খাওয়া যেতে পারে। ওপারে বাঁশের চেগার দিয়ে ঘেরা সারি সারি বাড়ী। বোধহয় কিশোরী-বাবুর ও নায়েববাবুদের। যাক্, ভদ্রলোক আছেন তাহলে খানসামা গ্রামে।

একটু পর যেই বাসার মধ্যে পা দিয়েছি, অমনি আবার বাইরে শোনা গেল হাঁক : উই মাছ নিবেন বাবু ?

উই মাছ ? কই, এ মাছের নাম তো শুনিনি কোথাও। বিশ্বেশ্বরবাবুও এ নামে কোনো লোকাল মাছের নাম তো করেননি কাল। যাক্‌গে, সোজা জবাব দিয়ে দিলাম : না, না, উই মাছ-টাছ চাই না।

বলে আবার ঘরে প্রবেশ করছিলাম, এমন সময় ওঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন বিশ্বেশ্বরবাবু : ও কি মশাই, মাছ তাড়িয়ে দিলে খাবেন কি ?

বললাম : দূর মশাই, উই মাছ কি খাদ্য ?

না, অখাদ্য।—বলে বিশ্বেশ্বরবাবু ডাকলেন মাছওয়ালাকে। তারপর তার ঝাঁকা নামিয়ে ডালাটা সরিয়ে ফেলতেই দেখলাম মাঝারী সাইজের সব রুইয়ের বাচ্চা।

জিজ্ঞেস করলাম : কোথায়, তোমার উই মাছ কোথায় ?

বিরক্তি প্রকাশ করলো মাছওয়ালা : ক্যানে, চৌখং দেখিবার পান না ?

তাহলে কি রুই মাছই এদেশে উই মাছ ? পরে বিশ্বেশ্বরবাবুর মুখে শুনলাম, কথাটা সত্য। এই বাহের দেশে 'র' অক্ষরটি শব্দের প্রথমে থাকলে তার উচ্চারণ হয় 'অ', আবার 'অ' থাকলে হয় 'র'। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমবাবুর রামবাগানে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঃ, চমৎকার দেশে এসে পড়েছি তো! বহরমপুর বন্দীশিবিরে তো উত্তর-বঙ্গের, এমন কি, এই দিনাজপুর জেলারই অনেক বন্দীর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। স্বয়ং করালীকান্ত বিশ্বাস এই দিনাজপুরেরই। কিন্তু তাঁদের মুখে তো এই দুটি অক্ষরের এমনি দুর্দ্দশা শুনিনি !……

বিকেলে হাট। চাকর নেই। সুতরাং বেরিয়ে পড়লাম বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি। এসে আবার রান্না করবেন তিনি। বেশ বড় হাট বলা যায়। তরি-তরকারী, মাছ প্রভৃতি সবই প্রচুর উঠেছে। কতকগুলো মাড়োয়ারীর দোকান দেখলাম। সেগুলো প্রায়ই মণিহারী, কাপড়ের বা পাইকারী ও খুচরা মুদীর

দোকান। বিশ্বেশ্বরবাবু সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। কুঞ্জলাল আগরওয়ালা, বাসুদেব ঘোষ, মতিলাল সমাদ্দার, লাট্টু বিশ্বাস, স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টার অমূল্য গুপ্ত, রঘুপদ হাজরা প্রভৃতির সঙ্গে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার শেষ করে বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন : কিন্তু বড়দাকে তো দেখছি না।

প্রশ্ন করলাম : বড়দা ?

হাঁ বড়দা, চাটার্জ্জী পরিবারের বড় ছেলে। খানসামার সবারই বড়দা। হাটে তাঁর আসা চাইই। তাঁর বাবা তারকবাবুও আসেন বা অন্যান্য ভাইরাও আসেন। কিন্তু যত লোকই আসুক, বড়দা আসবেনই এবং কিছু-না-কিছু সওদা করে ঠকে যাবেন অথচ বাড়ীতে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে দাবী প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করবেন যে, তিনি ঠকেননি। কোনো দোকানীর সাধ্য নেই যে তাঁকে ঠকায়। জীবনে ঠকেননি তিনি।

বিশ্বেশ্বরবাবু হেসে বললেন : ভারী সরল ও সোজা মানুষ !

কিন্তু চাটার্জ্জী পরিবারের কাউকেও দেখা যাচ্ছিল না বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন তিনি। আমাদের কেনবার দ্রব্য সামান্য। আলু পটল ও কিছু মাছ নিলেই চলবে। তাই ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ একসময় বলে উঠলেন বিশ্বেশ্বরবাবু : ঐ যে, পণ্ডিতকে দেখা যাচ্ছে কালুবাবুর দোকানে, চলুন।

কিন্তু যাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম, পণ্ডিত বলে তাঁকে কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বয়স বাইশ-তেইশের বেশী হবে না, ক্লিন শেভ, বড় বড় চুল ব্যাক ব্রাশ করা, কোছা-আঁটা পাতলা ধুতি ও গায়ে সাদা হাফসার্ট, কলারটি তোলা আর পায়ে আধুনিক স্যাণ্ডেল। কীভাবে ইনি স্কুলের হেডপণ্ডিত হবেন ? হেড-পণ্ডিত বলতেই যে মূর্ত্তিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হচ্ছে—অন্ততঃ চল্লিশ বছর বয়েস, স্কন্ধে শুধু তেল চিটচিটে উত্তরীয়, মুণ্ডিত বা কদম-ছাঁট মস্তকের দীর্ঘ শিখাগ্রভাগে জবা ফুল, অন্ততঃ সাতদিন ক্ষৌরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, বেশ সুডৌল একটি ভুঁড়ি, তার ওপর লম্বমান স্বেদসিক্ত ময়লা যজ্ঞোপবীত, পায়ে বিদ্যাসাগরী বা সাধারণ চটি, হয়তো কোনো তর্কচঞ্চু অথবা বিদ্যাদিগ্‌গজ ! কায়দাদুরস্ত অতি আধুনিক ফিটফাট্ বাইশ বছরের ছোকরা কী করে স্কুলের হেড-পণ্ডিত হতে পারে ?......

পরিচয় হলো এবং নানা কথার মাঝখানে চিত্তবাবু যখন পকেট থেকে বার করে একটি বিড়ি অফার করতে চাইলেন, তখন না হেসে পারা গেল না। বললাম : এই একটিমাত্র নিশানা রেখেছেন হেডপণ্ডিতের—বিড়ি, the only indication...

খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেশ জমিয়ে ফেলা গেল। এ-বাসা ও-বাসা করে বেশ কাটিয়ে দিই সকালটা, দুপুরে আহারের পর নিদ্রা আর বিকেলে থানা কম্পাউণ্ডে ভলি খেলা। পূর্ব্বেই বলেছি বহরমপুর বন্দীশিবিরে ভলি খেলায় নাম ছিল আমার। অবশ্য তিন বছর আর অভ্যাস নেই। তথাপি কয়েকদিনের মধ্যেই আবার হাত খুলে গেল। গ্রামের অনেকেই খেলতে আসেন। সেখানেই নতুনদের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং আরও আড্ডা মারবার স্থান পাওয়া যায়।

দারোগা পরিতোষও আসেন। খেলবার ষ্টাইলটি তাঁর একেবারে নিজস্ব। প্রত্যেকটি বল্ ফেরাবার জন্য তিনি প্রায়ই কামান দাগেন দুমুষ্টি একত্র করে এবং ফলে ওভার বাউণ্ডারী চাপ হয় বটে, কিন্তু হেরে যেতে হয়। অমূল্য গুপ্তও আসেন এবং চেষ্টা করেন তাঁর ভুঁড়ি নিয়ে লাফিয়ে চাপ মারতে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে চাটার্জ্জী পরিবারের ছেলেদের নিয়ে। সেজ ভাই নীরদ মাইল ছয়েক দূরে বীরগঞ্জ গ্রামের পোষ্টমাষ্টার। বিকেলে অফিস বন্ধ করে প্রায়ই চলে আসেন সাইকেলে, রবিবার হলে তো আসবেনই। মেজভাই প্রমোদ মাইল বারো দূরে একটি স্কুলের হেডমাষ্টার। রবিবার তিনি আসবেনই এবং ফিরে যাবার সময় প্রায়ই সোম চলে যায়, মঙ্গলও কখনো কখনো। তাই তিনিও আসেন। আর সত্যরঞ্জন অর্থাৎ বিলু তো বাড়ীতেই থাকে, হোম ইনটার্নড্। এবার ম্যাট্রিক দেবে প্রাইভেটে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এঁরা প্রত্যেকেই প্রায় ছ ফুট দীর্ঘ। ফলে নেটের ওপর দিয়ে চাপ মেরে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা এঁদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। এঁরা যেদিকে থাকেন, সেদিকের জয় অবধারিত বলা যায়।

খেলার পর ফিরে এসে আমরা বেশ করে স্নান করি কুয়োর জলে। তারপর রাঁধতে বসেন বিশ্বেশ্বরবাবু। একেবারে পাকা রাঁধুনী। তবে শাকসবজী বা লতা-পাতা-ডাঁটার জাবেদা রান্না নয়, কালিয়া, কোর্ম্মা, দোপেঁয়াজী, তা না হলে ডিমের ডালনা বা পটলের দোলমা রাঁধতে সিদ্ধহস্ত তিনি। জানা গেল, দেশের নেতারা চট্টগ্রাম শহরে গেলে রান্নাঘরের একচ্ছত্র আধিপত্য ছেড়ে দেওয়া হতো তাঁর ওপর। হাতা-খুন্তি নাড়তেন অবশ্য মেয়েরাই, কিন্তু রন্ধনশালার একমাত্র হাইকোর্ট ছিলেন তিনিই। খাবার পর আম গাছের নীচে মাচার ওপর বসে বা শুয়ে চলে আমাদের গল্পগুজব যতক্ষণ খুশী, ততক্ষণ।

দুএক মাসের মধ্যেই বেশ খাপ খাইয়ে নিলাম পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। গাইডের কাজ করতে লাগলেন বিশ্বেশ্বরবাবু এবং তা কৃতিত্বের সঙ্গে।

কিন্তু প্রবাদ আছে যে, যে ডাকাত, সে হাতের কাছে আর কিছু না পেলেও কচুগাছ কেটেও অভ্যেসটা বজায় রেখে যায়। আমারও হলো তাই।

প্রথমেই স্থির করলাম চাটার্জ্জীদের ঐ স্বগৃহে অন্তরীণ ভাই বিলুর সঙ্গেই করতে হবে পরিচয়। প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তারপর ওরই মারফৎ স্‌ঁচ হয়ে প্রবেশ করবো এই গ্রামে। কে জানে, হয়তো এই সুদূর দিনাজপুর জেলার খানসামা গ্রামেই একদা স্থাপিত হবে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের একটি প্রাণবন্ত শাখা।···বিশ্বেশ্বর বাবুকে বললাম সব। অনুশীলনের হলেও আমার কাজে বাধা দেওয়া তো দূরে থাক, বরং কোনো সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া তাঁর করায়ত্ত হলে তাও করে দিতে স্বীকৃত হলেন। সেই দলাদলির যুগে ও সুতীব্র দলীয় চেতনার যুগে এমনি উদারতা ছিল চিন্তার অতীত। স্পষ্ট দুটি বিরোধী দলের সভ্য হয়েও খানসামার অন্তরীণ জীবন আমাদের পারস্পরিক সখ্যতা ও সহযোগিতায় মধুময় হয়ে উঠেছিল।

বিলুর সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় হলো গ্রামের বাইরে ফুটবল খেলার মাঠের ধারে একটি ঝোপের আড়ালে। কোনো উপক্রমণিকার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না কোনো জ্বালাময়ী ভাষার। দেশপ্রেমের আগুন আগে থেকেই যার বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছে তুষের আগুনের মতো, সেখানে প্রয়োজন শুধু তাতে ইন্ধন জোগানো। তাহলেই সেখান থেকে একদিন প্রসারিত হবে সর্ব্বগ্রাসী আগুনের লোল জিহ্বা। আবার জল ফুটে উঠবে, ষ্টীম তৈরী হবে, আবার সংগঠন-ষ্টীমারের প্রপেলর ঘুরবে!······

বিলু বললো যে, খানসামা গ্রামে অনেকগুলো ভালো ভালো মেয়ে আছে, যাদের নিয়ে চমৎকার একটা অর্গানিজেশন গড়ে তোলা যায়। তাদের মধ্যে কেউ প্রাইভেট পড়ে ম্যাট্রিক দেবার জন্য, কেউ তাও পড়ে না। তথাপি ওদের দিয়ে কাজ করানো যাবে।

বললাম : কোথায়, একজনকেও তো এই কমাসে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

দেখেছেন, হয়তো লক্ষ্য করেননি। তারা কিন্তু সবাই দেখেছে আপনাকে ও বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে আপনার সম্বন্ধে। আপনাদের নন-অফিসিয়েল ভিজিটর কিশোরী ঘোষেরই দুটি নাতনী আছে—শান্তি আর ছুটুন।

ছুটুন ?

হ্যাঁ ছুটুন। ভাল নাম লীলাবতী। তারপর চাঁদপুর কাছারীর নায়েব উমাচরণ সেনের দুটি মেয়ে আছে—বীণা ও রেণু। রেণু প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। তারপর আমাদের বাড়ীর উল্টো দিকে ভবেন সান্ন্যালের আছে একটি মেয়ে—বিলু।

বিলু—মেয়ে ?

হেসে জবাব দিল বিলু : হ্যাঁ, বিলু ছেলে আমি আর সে বিলু মেয়ে। এ দেশের নামগুলো এমনি অদ্ভুত দ্বিজেনবাবু। আষাঢ় মাসে জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় আষারু। বৈশাখে হলে বৈশাখু। সোমবার জন্ম হলে সে হয় সোমারু। রাত পোহালে তার নাম রাখা হয় পোহাতু। ছোটবেলা যে কাঁদে, সে হয় কান্দুরা। এমনি সব।

নামাবলী শুনে কিছুক্ষণ হাসা গেল দুজনে। তারপর বিলু বলতে লাগলো : আমার বড়দির মেয়ে আছে, টুকু। তবে সে বড়লোকের কন্যা, সহজে হাত করা যাবে না। আর আছে আমার ছোট বোন খুকু।

বয়েস খুব কম বুঝি ?

না, না, কম নয়।—বলতে লাগলো বিলু : তবে হ্যাঁ, মাষ্টারী করছে একেবারে এগারো বছর বয়স থেকে, তখনো ফ্রক পরতো। আমাদেরই বৈঠকখানায় কজন মেয়ে নিয়ে একটা কোচিং ক্লাসের মতো খুলেছিল। তারপর বৃত্তি পরীক্ষায় তিনটি মেয়ে বৃত্তি পাওয়ায় স্কুলটি এবার গভর্ণমেণ্ট এইড্ পাচ্ছে। এবং সারা দিনাজপুর জেলার সবগুলো মেয়ে এল পি স্কুলের মধ্যে সবার চাইতে বেশী এড্ পায় আমার বোন খুকু। বয়স সতেরো-আঠারো হতে পারে। ভাল নাম শিশিরকণা।

কিন্তু মেয়েদের অর্গানিজেশন ? এই সুদূর পল্লীগ্রামে তা কি সম্ভব হবে ? একটু ইতস্ততঃ করতে দেখে বিলু সোৎসাহে বলে উঠলো : কোনো অসুবিধে হবে না। সব আমি ব্যবস্থা করে দেবো দ্বিজেনবাবু। প্রত্যেকের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একেবারে পরিবারের সঙ্গে আপনাকে মিশিয়ে দেবো। এদের বাবা-মাদের প্রায়ই আমরা মেসো-মাসী বা কাকা-কাকী বলে ডাকি। সুতরাং কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।······

কিন্তু একজন বেশ সন্দেহ করতে লাগলেন। তিনি আর কেউ নন, পরিতোষ দারোগা। গ্রামের মধ্যে আমার জনপ্রিয়তা সহ্য হচ্ছিল না তাঁর। যে বাড়ীতে যাই, সেখানেই সবাই আদর করে অভ্যর্থনা করেন আমায়, সবাই ঘিরে বসেন,

দেশবিদেশের কত গল্প শোনেন, মেয়েরা গান করে, ছোটরা এসে কোলে চেপে বসে, বাড়ীর ভাদ্রবধূরাও আমার সঙ্গে হাসিপরিহাস করেন, প্রায়ই চা পানের বা আহার করবার নেমন্তন্ন আসে···এর প্রত্যেকটি ঘটনা পরিতোষের গায়ে এক-একটি ফোস্কা পরিয়ে দিল যেন উত্তপ্ত লোহার শিক ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে।

কেশিয়াড়ীর ক্ষীরোদ দত্তের মতোই পরিতোষ চরিত্রহীন। তবে ক্ষীরোদের চরিত্রহীনতায় অনেকখানি সাহস আছে, আছে বেপরোয়াভাব। লালসায় মাতাল হয়ে সে যেখানে খুশী হানা দেবে, আবার তার ফলে মার খেয়ে ভ্রেণে পড়ে থাকতেও তার লজ্জা নেই। কোনো মেয়ে প্রকাশ্যে তার গণ্ডে স্যাণ্ডেল প্রহার করলেও ক্ষীরোদ দারোগা তার আঁচলের বর্ণনায় মেতে উঠবে। আর পরিতোষ অনেকটা ঘিয়ে-ভাজা কুকুরের মতো। অস্থিচর্ম্মসার, রোগজর্জ্জর! অথচ লোভ আছে সীমাহীন। ঘেউ ঘেউ করে দাবী জানাবার মতো হিম্মৎ নেই, তাই ঘ্রাণের টানে কেঁউ কেঁউ করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে ব্যাটা ঘুর্ ঘুর্ করে ঘুরে বেড়ায়। কাছে গিয়ে আহ্লাদে ল্যাজ নাড়ে নয়, ল্যাজই তাকে নাড়ায়।······

ভদ্রলোকদের বাড়ীতে টোপ ফেলবার কায়দাটা তাঁর ভারী কৌতুকপ্রদ ও অভিনব বলা যায়। এ কাজে তাঁর সহধর্ম্মিণীই স্বামীর ধর্ম্ম পালন করে থাকেন। এ ক্ষীরোদের গৃহিণী নয়। যে বাড়ী টারগেট ঠিক করা হয়, প্রথমে তাঁর সহধর্ম্মিণী সেখানে যাতায়াত সুরু করে দেন। কোথাও তিনি মাসী, কোথাও কাকী, কোথাও জ্যেঠী, কোথাও আবার মামীও বটে। দশ মহাবিদ্যার মতো। কিন্তু তাহলে কী হবে? বাড়ীর অবিবাহিত বড় মেয়েটির যেন তিনি সমবয়সী, যেন সমপাঠিনী, যেন কতকালের বান্ধবী, একেবারে মাই ডিয়ার মাসীর মতো! জমিয়ে নিতে খুব দেরী হয় না। তারপর একদিন মহা দুঃখ করে বিনিয়ে বিনিয়ে আধা পূর্ব্ব ও আধা পশ্চিম বঙ্গীয় ভাষায় বলেন: তোদের বাড়ীতেই তো খালি আসি, কিন্তু ছুটুন, আমাগো বাসাতেও তো একবার যেতে পারিস্। তবু জ্যেঠা কত দুঃখু করে—ছুটুন আসে না। কাউলকা বিকেলে তরে বুঝি দেখছিল চাঁদপুরের দিকে যেতে। বললো, কী সোন্দর লাল রংয়ের সাড়ী পরছিলি!—যাবি নাকিরে?

অনেকবার অনুরোধ জানাবার পর তারপর একদিন ছুটুন যায় হয়তো। তারপরই আসে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর-জ্যেঠামশায় পায়ের কাছে পদলেহনের অনুরোধ জানাতে। চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু মুখে কথা ফোটে না, তাই একসময় এসে একটুখানি গায়ের গন্ধ নিয়ে যায় কিংবা হয়তো লক্লকে জিভ ঠেকিয়ে দিয়ে যায় পায়ের আঙুলে। হয়তো লাথি মারে ছুটুন,

দুপায়ের ফাঁকে তখন ল্যাজ গুঁজে কেঁউ কেঁউ করতে করতে বেরিয়ে যায় ঘিয়ে-ভাজা কুকুর পরিতোষ সাহা।

এমনি সর্ব্বত্র!······

কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর পরিতোষিণী (পরিতোষের স্ত্রীকে সবাই ডাকতো এই নামে) ব্যবসা আর বিশেষ জমাতে পারলেন না। মন্দা পড়তে লাগলো। মেয়েদের মধ্যে তখন এসে গেছে নতুন ভাবের জোয়ার। তারা ইতিহাস পড়ে, ব্যায়াম চর্চ্চা করে, ভোরবেলা দল বেঁধে বেড়াতে বেরোয় খানসামা বন্দরের বুকের ওপর শত গোঁড়া ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে, তাদের সাপ্তাহিক আলোচনা সভা বসে। চাঁদা তোলে, ভালো ভালো বই কেনে, তারা দৈনন্দিন সংবাদপত্র পাঠ করে। এ কাজে নেমেছে সবাই। আত্রেয়ী, শান্তি, ছুটুন, বীণা, রেণু, ওদের দাদা জ্যোতিষবাবুর স্ত্রী, ওদের বিধবা বড় বৌদি এবং এমন কি, স্বয়ং ভবেন সান্ন্যালের কন্যা বিলু! ······সুতরাং কুকুরের গায়ের ফোস্কা পাকতে সুরু করলো। প্রতিশোধ নেবার হিংস্রতায় সে তার ধারালো দাঁত বার করলো।

শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে পরিতোষিণী বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমাদের নিন্দে ছড়াতে লাগলেন। সংবাদ আমাদের কানে আসতেই ঢিলের বদলে পাটকেলের ব্যবস্থা করে ফেললাম আমরা। বাসার বাইরেই কাটা হলো ব্যাডমিণ্টন কোর্ট। বিকেলে রীতিমত স্যুট পরে খেলি বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি। মাঝখানে ব্রেক দিয়ে ঐ বাইরেই টেবিলে বসে খাই কাঁটা চামচ সহযোগে মামলেট, সঙ্গে চা। খেলার শেষে র‍্যাকেট হাতে ঐ স্যুট পরেই বেরোই দুজনে রাস্তায় বেড়াতে। জানালা-পথে পরিতোষিণী সবই লক্ষ্য করতেন এবং মেয়েদের মায়েদের কাছে গিয়ে বলতেন: জানেন গো দিদি (কিংবা মাসীমা), ঐ দুগাই বদের হাঁড়ি। নইলে মাঠে বইসা, মামলেট খায় কেন গো? আমাদের বড়লোকি দেখানো হয়! পিছা মার্ অমন ফুটানিরে!

কেশিয়াড়ীতে ছিলাম একা আর এখানে দুজন। আর এমনি দুজন, যাদের বন্ধুত্ব অটুট। সুতরাং কূটনীতির সূক্ষ্ম ব্লেডের প্রয়োজন নেই এখানে, সহজভাবে ছুরি দেখিয়েই চলতে লাগলাম আমরা দারোগাকে ও দারোগাণীকে ভ্রূক্ষেপ না করে। এখানকার এল সি রবি মুখার্জ্জীকে দেখলাম বিশ্বেশ্বরবাবু একেবারে হাত করে রেখেছেন। শুনলাম দারোগা নাকি এই রবিকেই অভদ্রের মতো গাল দিয়েছিল বলেই প্রাক্তন রাজবন্দী মাদারীপুরের বিজেশ বোস পরিতোষের গণ্ডে স্তাণ্ডালাঘাত করেছিলেন। সেদিন থেকে রবি [illegible] কেনা হয়ে রয়েছে।

মেয়েদের সঙ্গে আমার দেখা হয় ওদের বাড়ীতেই দিনের বেলায় সবার সামনে। ওখানেই একটু একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুটো কাজের কথা বলে দিই ও শুনে আসি। মাইল দুয়েক দূরে বাগুলী কাছারীর নায়েব হচ্ছেন জ্যোতিষ সেন, চাঁদপুর কাছারীর উমাচরণের পুত্র। কোনো কোনো সময় সেখানেও যায় বীণা বা রেণু আর আমিও গিয়ে হাজির হই অন্যপথে। একদিন গভীর রাত্রে চুপি চুপি বাসা ছেড়ে বেরিয়ে এসে শান্তি ও ছুটুনের সঙ্গেই কথা বলে গেলাম তাদের শয়নকক্ষে তাদের মায়ের সম্মুখে।

একদিন বিলু বললো সে তার বোন খুকুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম। আত্রেয়ীর কাজের সঙ্গে তো পরিচয় হয়েই গেছে। কারণ এই মেয়েদের একমাত্র লীডার সে। এবার হবে তার সঙ্গে পরিচয়। আবার বেরুলাম গভীর রাত্রে। বন্দরের মধ্য দিয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে হলো না। বাতাস্যুর বাড়ীর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়লাম মাঠে, তারপর ঘুঘুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এসে ভালো-মার বাড়ী ডাইনে রেখে বেনেপাড়া ঘেঁসে এলাম বিলুদের বাড়ী। ওদের বৈঠকখানার পাশেই জ্বালানী কাঠ রাখবার একটা ঘর আছে। আমায় সেখানে অপেক্ষা করতে বলে বিলু তার মাষ্টারণী বোনকে নিয়ে এল।

আলাপ হলো ও অনেক কথা হলো। দেখলাম ভারী বুদ্ধিমতী মেয়েটি, প্রশ্ন ও মন্তব্যগুলো বেশ ধারালো। তবুও মাষ্টারীসুলভ নীরসতা তাতে নেই।

পরে বিশ্বেশ্বরবাবু একদিন বললেন আমায়ঃ আপনি জানেন না দ্বিজেনবাবু, she is an accomplished girl। এই গ্রামে যত মেয়ে আছেন, সবার সেরা ঐ মেয়েটি। চেহারা সুন্দর নয় সত্যি, কিন্তু other qualities-এ একেবারে অতুলনীয়।

প্রশ্ন করলামঃ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

জবাব দিলেন তিনিঃ সামান্য। আগে ওদের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম। বৈঠকখানায় দেখা হতো মাঝে মাঝে। আর হবে না কেন?—an examplary family, ওদের বাবা তারকেশ্বরবাবু শুধু এই গ্রামের নয়, আশেপাশে বোধহয় দশখানা গ্রামের মধ্যে the single person who is revered by all alike। শুধু গ্রাম বা পাড়া নয়, পারিবারিক ব্যাপারেও প্রত্যেকটি লোক এঁর পরামর্শ নিয়ে যান। আরও মজা হচ্ছে এই যে, তাঁকে কোথাও যেতে হয় না, সবাই আসে তাঁর কাছে। a god-like gentleman.........

বললাম : ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন।

তখন আবেগ এসে গেছে বিশ্বেশ্বরবাবুর : আর ওদের ভাইগুলো দাদা ও ভাই নয়—একেবারে যেন বন্ধু। দাদা-ভাইয়ের সম্মানজনক ব্যবধান নেই, মনে হয় সবাই সমবয়সী, সহপাঠী। বলেছি তো, ওদের পরিবার গ্রামের নেতৃত্ব পেয়েছে automatically.........

সুতরাং একদিন সকালবেলা যাওয়া গেল বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে চাটার্জ্জীদের বাড়ীতে। সেদিন রবিবার। মেজভাই প্রমোদবাবু সোনাহার থেকে এসে গেছেন আর বীরগঞ্জ থেকে এসে গেছেন সেজভাই নীরদবাবু। বৈঠকখানায় আসর জমিয়ে বসা গেল। নীরদবাবুর কণ্ঠস্বর খুব মিষ্টি না হলেও গাইবার ঢংটি ভালো। সঙ্গীত চর্চ্চা রাজবন্দী কোয়ার্টারে আমরাও যে না করি, তা নয়। বিশ্বেশ্বরবাবুর বেশ দামী হারমোনিয়াম আছে একটি। তবলাও। হারমোনিয়াম আমি নিলে বিশ্বেশ্বরবাবু তবলা টেনে নেন। কিন্তু তিনি যখন গান ধরেন, তখন তব্‌লা পড়ে পড়ে কাঁদে। আমি চড় মারতে জানি, কিন্তু চাঁটি মারতে জানিনে।

পর পর গান গেয়ে চললেন নীরদবাবু, বিলু এবং যতদূর মনে পড়ে, প্রমোদ বাবুও। বড়দাকেও ভাইয়েরা সবাই ধরে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের দক্ষিণ অঙ্গ অবশ না হলেও তাতে কম জোর। ভাইদের পীড়নে বাধ্য হয়ে তাঁকেও গাইতে হলো......দেহি দেবী দরশন ওমা তারা......

অকস্মাৎ হাঁক দিলেন নীরদবাবু : ও মেজবৌদি, waterfood কী হলো? আরে, Ram's shop থেকে কিছু juice ball নিয়ে এসো না! এদিকে গলা যে একেবারে wood হয়ে গেল!

Waterfood! Juice ball !! Wood !!!—এ আবার কী নীরদবাবু?

ব্যাখ্যা শোনা গেল। Waterfood হচ্ছে জলখাবার, juice ball মানে রসগোল্লা আর wood মানে কাঠ, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল! আর Ram's shop হচ্ছে রঘুর দোকান।

বাঃ চমৎকার ভাষা তো! শুনলাম, নীরদবাবুর এটা মৌলিক আবিষ্কার! a patent!

একটু পর চা ও খাবার নিয়ে এলেন নিশ্চয়ই কোনো বৌদি নন, একটি অবিবাহিতা পরমা সুন্দরী মেয়ে। সত্যিই অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। অত্যন্ত গৌরবর্ণ, তন্বী, মাথার চুল যেমন কালো মিশমিশে, তেমনি তা ঘন ও তাতে সুশৃঙ্খল তরঙ্গ। টানা টানা চোখ, পক্ষ্মগুলি ঘন ও খুব কালো। বোধহয় চোখের পাতায়,

ভ্রূযুগলে, গালে ও ঠোঁটে প্রয়োজন না থাকলেও একটুখানি রিটাচ্ করা হয়েছে। কিন্তু রূপ তাতে হয়ে উঠেছে অপরূপ বসরাই গুলাবের মতো! নিশ্চয়ই এই সেই টুকু, বিলুর দিদির মেয়ে। বড়লোকের কন্যা।

কিন্তু তারকবাবু কোথায়? জানা গেল তিনি বাড়ীতেই আছেন কিন্তু ছেলেদের গানের আসরে কমলবনে মত্তকরীর মতো প্রবেশ করে যুবকদের অসুবিধে সৃষ্টি করতে চান না তিনি। অত্যন্ত সচেতন তিনি এসব বিষয়ে। ছেলেদের কাজে উৎসাহ তাঁর প্রবল, কিন্তু সম্মানজনক ব্যবধান নিজেই রক্ষা করে চলেন। ছেলেদের বিব্রত করতে চান না কখনো।

তারপর অবশ্য একদিন তাঁর সঙ্গেও পরিচয় ও আলাপ হলো।

এর প্রত্যেকটি সংবাদ শুধু সবিস্তারে নয়, ডালপালা সহযোগে এসে পরিতোষের কানে উঠলো এবং কানের মধ্য দিয়ে তা মর্ম্মে গিয়ে আঘাত হানলো। দালাল পরিতোষিণী তাতে প্ররোচনা দিলেন। ফলে, প্রতি সপ্তাহেই আমাদের দুজনের বিরুদ্ধে দিনাজপুর আই বি অফিসে যেতে লাগলো কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট।......

গ্রামে দারোগার অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকবার জন্য সাধারণভাবে নিরীহ গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। লাট্টু বিশ্বাস এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। তারপরই তাঁকে সাহায্য করলেন মহেন্দ্র মিত্র, প্রভাত চৌধুরী, নলিনী ঘোষ, মাকু বিশ্বাস, ভবেন সান্ন্যাল, রামলাল গুহ, অপূর্ব্ব সান্ন্যাল ও দুচার জন মাড়োয়ারী। বিশেষ করে নারীঘটিত নিন্দাবাদ প্রচারে গণ্ড গ্রামের অধিবাসীরা স্বভাবতঃই উৎসাহ বোধ করে থাকে। কাজেই এই সব নেতার পশ্চাতে এসে যোগ দিল সুনীতি ও সুরুচির ধ্বজাধারী কিছু পানওয়ালা, মুদী ও হাড়িপাড়ার হাড়ীরা এবং এই দুর্দ্ধর্ষ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন লাট্টু বিশ্বাসের বিধবা মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা সীতা বিগত যুগের দেবী চৌধুরাণীর মতো!

বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি প্রাণভরে হাসলাম এদের কাণ্ড দেখে। অভিভাবকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে এরা গোপনে প্রচার করে বেড়াতে লাগলো যে, রাজবন্দীরা সাধারণতঃ চোর হয়, আর হয় বদমায়েস। আপনার এত বড় আইবুড়ো মেয়ে......ইত্যাদি।

অভিভাবকেরা এতে ঘাবড়ে না গেলেও আমরা একটু সতর্ক হলাম। আমাদের শয়নঘরের পেছনে প্রাঙ্গণের বেড়ার খানকয়েক বাঁশ পাতলা করে চেঁছে

দিলাম। হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না ও কথানার কোন গাঁট নেই, পাতলা, নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলা যায়। ওর বাইরে সামান্য ঝোপঝাপ, বেরিয়ে এলে কারুর টের পাবার আশঙ্কা নেই।

গভীর রাত্রে সিপাইদের ঘরের আলো যখন নিভে যায়, থানার বারান্দায় কমানো লণ্ঠন প্রদীপের মতো মিটমিট করতে থাকে, দরওয়াজা সিপাই বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে পাহারা দেওয়া সুরু করে, সমগ্র গ্রাম সুসুপ্তির ক্রোড়ে ঢলে পড়ে, তখন বেরিয়ে আসি আমি গুপ্তপথে। পোহাতুর বাড়ীর পাশে অন্ধকারে আমগাছটার নীচে বিলু অপেক্ষা করে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই মেয়েদের বাড়ী। ফিরে আসি আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠবার পূর্ব্বেই।

এমনিভাবে কাজ চলতে লাগলো। আর পরিতোষও নিয়মিতভাবে রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন দিনাজপুর আই বি-র কর্ত্তা বাণেশ্বর বর্ম্মণের শ্রীপাদপদ্মে। দোকানদার কালুবাবুর দিদিমার কী নাম মনে নেই, কিন্তু সবাই তাঁকে ডাকেন ভালো-মা বলে। সারা গাঁয়েরই ভালো-মা তিনি। বিলুর মার সঙ্গে এঁর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। হ্যাঁ, সত্যিকার বন্ধুত্ব যাকে বলে। দুজন দুজনকে 'ভালোবাসা' বলে ডাকেন। শুধু সুদিনেই নয়, শোচনীয়তম দুর্দ্দিনেও এই বর্ষিয়সী বিধবা মহিলাকে চাটার্জ্জী পরিবারের পাশে পাশে দেখেছি। শিক্ষা অত্যন্ত কম, কথায় বর্দ্ধমানসুলভ নমনীয়তার টান অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সারা গ্রামের নিন্দুকদের ধারালো মন্তব্যের কাছে তিনি দাঁড়াতে না পারলেও কোথাও, কারুর কাছে, কারুর মুখে তাঁর ভালবাসার নিন্দামূলক একটি বর্ণও সইতে পারতেন না তিনি। যুক্তি থাক বা না থাক, প্রতিবাদ তিনি করবেনই এবং তাতেও কাজ না হলে অবশেষে কটূক্তি করে বেগে প্রস্থান করবেন।

দিনের মধ্যে হাজারো বার এসে ভালবাসাকে জানিয়ে যান বিরোধী দলের খুঁটিনাটি সমস্ত সংবাদ—কিছু নিজের কানে শোনা, কিছু পরের কাছে শোনা, তারপর তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে, যুক্তিহীনভাবে সে সম্বন্ধে মন্তব্য, কোথায় সাবধানতার অবকাশ আছে, কোথায় শত্রুপক্ষ দুর্ব্বলতার আভাস পেয়ে গেছে, কোথা দিয়ে কীভাবে আঘাত হানলে বিরোধী দল সায়েস্তা হতে পারে, অনর্গল বর্দ্ধমানী ভাষায় তা বিবৃত করে ক্লান্ত হয়ে আবার অকস্মাৎ ফিরে যান ভালো-মা তাঁর বাড়ীতে মাছের টক্ চড়িয়ে এসেছেন জানিয়ে।

ভালো-মাই একদিন জানিয়ে গেলেন যে, বিলুদের বাড়ীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সীতা দেবীর বাড়ীর সান্ধ্য-বৈঠক বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। বিলুর মুখেও

আমি সব শুনতে পেলাম। নিন্দাকে কোনদিনই পরোয়া করিনি আমি। কিন্তু বিদেশে আমারই জন্য কোনো নিষ্কলঙ্ক পরিবার, বিশেষ করে, এখানকার চাটার্জ্জী ব্রাদার্স মিথ্যে নিন্দের পশরা মাথায় করুক, এ কথাটাও নিজেরই কানে কেমন বেসুরো ঠেকতে লাগলো। কিন্তু বিলুর উৎসাহ দেখলাম অফুরন্ত। কাজের নেশায় সে তখন পাগল হয়ে উঠেছে। একটা কিছু সে করবেই মেয়েদের দিয়ে, এই তার অন্তরের কামনা। বিশ্বেশ্বরবাবুও দেখলাম এই সব কুকুরের ঘেউ ঘেউ থোড়াই কেয়ার করেন। কাজেকাজেই একদিকে যেমন নিন্দের বিষ ছড়াতে লাগলো পচা ঘায়ের মতো, তেমনি অপর দিকে আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লেগে গেলাম।……

অকস্মাৎ একদিন সকালবেলায় ভৃত্যের অভাবে যথাসময়ে চা ও খাবার না পেয়ে বিশ্বেশ্বরবাবু হাই তুলে মন্তব্য করলেন: দূর মশাই, চাকর ছাড়া আর পারা যায় না। কাঁহাতক এমনি রঘুর দোকানে চা ও খাবার খেতে যাওয়া যায় বলুন তো! কোথায় খাবো নিদ্রালু চোখে বেড টি, তা নয়। এ একেবারে ব্যাড টি, ভেরী ব্যাড!

সায় দিলাম: যা বলেছেন।

টিপ্পনী কাটলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: আপনার আর কি, রান্না করতে হয় না—রান্না জানেনও না। স্বদেশী করে বেড়ান আর তৈরী ভাত খান। বাবুর্চ্চি তো আমিই।

বাধা দিলাম: বাঃ, বেশ তো নিন্দে করছেন। আপনি রাঁধেন বটে, কিন্তু জোগানদারের কাজ করে কে? আপনি রাঁধুনী হলে আমি তো চাকরের ভূমিকায় অভিনয় করি। সে কি কম হলো?

না, না, অনেকখানি। আপনার সাহায্যের তুলনা হয় না।—তারপর একটু থেমে গম্ভীর হয়ে যেন মহাদুঃখে মন্তব্য করলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: একটা বিয়ে যদি করতেন মশাই, তাহলে মিসেসকে আনা যেত ও রোজ মনের সাধে বাছা বাছা খাদ্য খাওয়া যেত। ছোটাহাজরী, ব্রেককাষ্ঠ, লাঞ্চ, ডিনার—

বললাম: তা বিয়েটা করবার দায়িত্ব আপনিই নিন না। কেউ তো আর মাথার দিব্যি দিয়ে রাখেনি। একবার মুখ ফুটলেই তো হয়।

বিশ্বেশ্বরবাবু তথাপি এড়াতে চেষ্টা করলেন: তাহলেও আপনার বয়েস আছে। আমার তো ত্রিশ কবে পার হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছি বলা যায়। এর পর আর বিয়ে করা সাজে?

জবাব দিলাম : না সাজে না। তবে আমারও একদিন ত্রিশ পেরোবে, তখন আমিও বলবো, কী হবে আর বিয়ে করে! পাকা চুলে টোপর মানাবে না, কি বলেন ?

কিন্তু কেমন হয় বিয়ে করলে ?

ভালোই হয়।—বলে দিলাম।

তাহলে করবেন ?

আপনি ?

তৎক্ষণাৎ যেন কুইনাইন খেতে রাজী হলেন বিশ্বেশ্বরবাবু : বেশ, করবো।

করুণ স্বরে বললাম : করুন।

কিন্তু বিশ্বেশ্বরবাবু তখন উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন : ওসব চলবে না মশাই, আমার গলায় ফাঁসী লাগিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখা চলবে না। স্থাড়া হবো তো তুজনে একসঙ্গেই।

ব্যস, আর যায় কোথা। তখনই প্যাডের তুখানা কাগজ খচ্ করে ছিঁড়ে নিয়ে বসে পড়লেন তিনি তুটো কলম নিয়ে। বয়ান বলে গেলেন মোটামুটি, লিখলাম। তিনিও লিখলেন। নিয়মানুসারে আমাদের লেখা চিঠি দিতে হয় দারোগার হাতে। দারোগা তা পড়ে পাঠাবেন আবার আই বি অফিসে। সেখানে আর এক দফা পাঠ হয়, মর্মোদ্ধার করা হয়, এবং হিজ মেজেষ্টিজ গভর্ণমেণ্টের আইন ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে পারে, এমনি কিছুর সন্ধান না পেলে তারপর তা বাক্সে ফেলা হয়।

পরিতোষ তুখানা পত্রই বোধহয় গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেন এবং তার ফলে পরদিন সকালবেলাতেই সীমাহীন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমরা খানসামা গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি লোকের মুখে ঐ কথা শুনে—রাজবন্দীরা বিয়ে করবেন!

অনেক কাল ধরেই বিয়ের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে আসছি। গ্রামের প্রত্যেকটি মেয়ের অভিভাবক হয় নিজে বা দূত মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়েছেন। তখন তো কোনো নিন্দের কথা শুনিনি। আজ আমি নিজেই যখন নেহাৎ পরিহাস করে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে পত্র দিলাম মাকে ও ফুলদাকে, তখন কেন এত আলোচনা ? কেন এত কথা ?······

কিন্তু তার কদিন পরেই যে ঘটনাটি ঘটে গেল, বেশ বুঝতে পারলাম আমার মতো কাঠখোট্টার জীবনেও উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে।

সেদিন কি বার মনে নেই, তারিখও আজ আর ঠিক মনে পড়ে না। মনে আছে, সকালবেলা। বিলুদের বাড়ীতে তার বড় জামাইবাবু এসেছেন এবং আশ্চর্য্য, তাঁর নামও দ্বিজেন গাঙ্গুলী। কৌতূহলী হয়ে গেলাম পরিচিত হতে, গল্প করতে। সেই বড়লোকের কন্যা টুকুর পিতা ইনি, সস্ত্রীক এসেছেন। বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা, বড়লোকের মতোই মাঝারী সাইজের ভুঁড়ি। কিছুক্ষণ আলাপেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক ভারী সরল মানুষ আর রসিকও বটেন। দুজনের একই নাম নিয়ে অনেকক্ষণ হাসাহাসি হলো।

এমন সময় বড়দা যাচ্ছিলেন বাড়ী থেকে বেরিয়ে। দ্বিজেনবাবু তাঁকে ডাকলেন। বড় শ্যালকের সঙ্গে বেশ হাসিঠাট্টা চলতে লাগলো। আমিও যোগদান করতে কসুর করলাম না। খানিকপর দুজনে দুজনকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করলেন যে তাঁরই ভুঁড়ির পরিধি বড়।

দ্বিজেনবাবু বলে উঠলেন : কি, এত বড় কথা! আমি বড় জামাই, আমার ভুঁড়ি শালার ভুঁড়ির চাইতে ছোট? এত বড় অপমান?—আয় দেখি, তবে মেপে দেখা যাক্।—দ্বিজেন, নাও তো ভাই একগাছা দড়ি।

কিন্তু দড়ি পাবো কোথায় হাতের কাছে? দেরী হলে যদি রাগ কমে যায় ও বড়দা রণে ভঙ্গ দেন তাই দ্বিজেনবাবু বললেন : তবে নে, তোর পৈতে দিয়েই মাপ দেখি পেট।—না, না, নিজে নয়। দ্বিজেন, নাও তো মাপটা। দেখো, বড়দা বলে আবার পার্শিয়ালটি করো না যেন।

দ্বিজেনবাবুর ভুঁড়ির পরিধি মাপা হলো তাঁর পৈতে দিয়ে। বললাম : ধরে রাখুন এইখানটা। এবার বড়দার ভুঁড়িটা দেখি।—

মাপতে যাবো, এমন সময় অকস্মাৎ ফ্রক-পরা একটি ফুটফুটে মেয়ে ছুটে এসে আমায় বললো : আপনাকে মা ভেতরে ডাকছেন।

আমাকে!—অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। বিলুদের বাড়ীর ভেতর তো কোনদিন যাইনি। আর এই মেয়েটিই-বা কে? একে তো দেখিনি কোনোদিন!

বললাম : না, না, আমায় ডাকছেন না। তুমি ভুল করছো খুকি!

দ্বিজেনবাবু সংশোধন করে পরিচয় করিয়ে দিলেন : খুকি নয়, খুকুমণি। আমার ছোট মেয়ে। আর ওর মা আমার সহধর্ম্মিনী আর তোমার এই বড়দা হচ্ছেন তাঁরই ভ্রাতা, অতএব ইনি আমার কী হলেন?

সবাই হেসে উঠলাম। আমি হেসে বললাম : আমায় কেউ ডাকছেন না। বোধহয় আপনাকে দ্বিজেনবাবু। একই নাম, গণ্ডগোল হয়ে গেছে বোধহয়।

অ্যাঁ, তাই নাকি? দেখি তাহলে।—বলে দ্বিজেনবাবু অন্দরে প্রবেশ করলেন এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে বললেন: না হে না, ওঁরা এক নম্বর নয়, দুনম্বর দ্বিজেনকেই স্মরণ করেছেন। একটু চা খাওয়াবেন।

চা খেতে দেবেন, তা এখানে পাঠালেই তো আরাম করে খাওয়া যেতে পারে ও দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে চলতে পারে সরস কথোপকথন। বললাম: তা এখানে পাঠালেই ভালো হয় নাকি? যাও তো খুকুমণি, চা এখানেই নিয়ে এসো।—পাঠিয়ে দিলাম খুকুমণিকে।

কিন্তু সেও ফিরে এল। বললো: মা বললেন আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে।

ভারী মুশকিলে পড়া গেল। বিলুকেও তো দেখতে পাচ্ছি না কোনোদিকে। শুনেছিলাম সে বাড়ীতেই আছে, কিন্তু এসময় কোথায়, এখনও দেখা পাচ্ছিনে কেন তার?···ধীরে সসঙ্কোচে খুকুমণির পশ্চাতে এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে হলো। বড় দুখানা ঘরের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়ে একখানা ছোট একচালা ঘরে সে আমায় পৌছে দিল। মাটির মেঝে। তার ওপর সুন্দর একখানা কার্পেটের আসন পাতা, সম্মুখে খাবারের প্লেট। আমি আসনে বসতেই খুকুমণি চলে গেল।

ঘরে আর কেউ নেই। মাথা নীচু করে খেতে সুরু করলাম। অচেনা বাড়ী না হলেও বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে আমি তখনো পরিচিত নই। কিন্তু নিঃশব্দে আহারে প্রবৃত্ত হলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, পাতলা চাটাইয়ের বেড়ার ছিদ্রপথে অনেক জোড়া চোখ আমার আহার নিরীক্ষণ করছেন। তাঁদের ফিসফিসে আলাপের অস্পষ্ট দুএক টুকরোও যে একেবারে কানে ভেসে আসছিল না তা নয়······

এমন সময় আধঘোমটায় মুখ ঢেকে ধীরে ধীরে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন একটি মহিলা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখেই বুঝে নিলাম ইনিই টুকুর মা, বড়লোকের গৃহিনী। একটু ইতস্তত: করে উপক্রমণিকা করলেন: যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে একটা কথা বলি।

তৎক্ষণাৎ বললাম: বলুন না, মনে করবার কি আছে!

আমার ভাই বিলুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা বেশী। সেও বার বার নিষেধ করেছে আমায়। তারপর না পেরে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে। বাড়ীশুদ্ধু সবাই নিষেধ করছে আমায়।

কেন?

সে কথা শুনে যদি আপনি রাগ করেন ?

তৎক্ষণাৎ বললাম : রাগ করবো ? এমন কী কথা যে একেবারে রাগ হয়ে যাবো শুনলে ?—বলুন না আপনি।

ঘোমটার বহর একটু খাটো করে দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন বিলুর বড়দি : দেখুন, আপনি বিয়ে করবেন শুনলাম। বাড়ীতে নাকি সেই মর্ম্মে চিঠি দিয়েছেন। তা—আমার একটি বোন আছে।—দেখেননি বোধহয় তাকে। তেমন সুন্দরী কিছু নয়। তবে গুণ আছে। আপনি যদি তাকে উদ্ধার করেন। তবে সাহস পাই না, কারণ আমার বোন কালো আর আপনি—

ফর্সা, এই তো ?

মৃদু হাস্য করলেন বড়দি, বললেন : কথাটা মিথ্যে বলেননি। তবে আমার বোন এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। আপনাদের বিক্রমপুরের সঙ্গে অবশ্য আমাদের কাজ হয়। আমার মেজো ভাই বিয়ে করেছে আপনাদের কনকসার গ্রামে।—তারপর নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন : এই নিরু, এসো না এখানে। লজ্জা কি, তোমাদের ছ্যাশের লোক !—বলে হাসলেন।

মেজোবৌ প্রবেশ করলেন। ইনিও ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী। নিঃশব্দে দরজার পাশে এসে দাঁড়াতেই বড়দি বললেন : এই হচ্ছে প্রমোদের বৌ, আপনাদের কনকসারে বাপের বাড়ী। নাম নিরুপমা।

বললাম : কনকসার আমি চিনি। দুএকবার গেছিও ওখানকার শীল্ড-এ খেলতে। বেশ বড় গ্রাম ও বর্দ্ধিষ্ণু। ওখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট প্রমথ ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে।

নিরুপমা বললেন : তিনি সম্পর্কে আমার জ্যেঠামশায় হন।

বড়দি আবার হাসলেন : ব্যস্, এবার পরিচয় বেরিয়ে গেছে। ছ্যাশের মানুষের লগে ছ্যাশের মানুষের দেখা হয়ে গেল। এবার এক কাজ কর নিরু, একদিন তোমার রান্না খাবার জন্য এঁকে নেমন্তন্ন করে দাও।—উঃ, যা ঝাল খায় বিক্রমপুরের লোকেরা !

কিন্তু কেরোসিন খায় না—জবাব দিলেন নিরুপমা।

বিস্মিত হলাম : কেরোসিন ?

বড়দির শত বাধা সত্ত্বেও নিরুপমা বলে দিলেন : জানেন না, রোজ সকালবেলা একটুখানি কেরোসিন না খেলে বড়দির মাথা ধরে যায়, কিছুই যেন আর ভালো লাগে না।

বড়দি রীতিমত খাওয়া করলেন নিরুপমাকে। কিন্তু হলো না। সাইকেলে একেবারে ঘরের দরজায় এসে হাজির নীরদবাবু। একেবারে কলরব করে উঠলেন: আরে দ্বিজেনবাবু যে! পড়েছেন Big sister-এর পাল্লায়? সঙ্গে দেখছি আবার এসে যোগ দিয়েছেন golden Ox। তা gold necklace থেকে মেজার পুষ্পক রথ এখনো এসে পৌছোয়নি?—বৌদি, আমাকেও দাও তো এমনি একটা ডিস্, আমি এখানেই sit করছি। আমাকেও কিন্তু দ্বিজেনবাবুর মতো দুটো king-enjoy দিতে হবে, আর দুটো bettle water! বলেই নীরদবাবু হাঁক দিলেন: খুকু, ও খুকু, একখানা wood-seat দিয়ে যা তো!

বেড়ার বাইরে ফিসফিসে হাসি শোনা গেল। মনে মনে ট্র্যানস্লেশন করে নিলাম Big sister মানে বড়দি, golden ox মানে কনকসার, gold necklace মানে সোনাহার। কিন্তু king-enjoy কী? bettle-water-ই বা কাকে বলে?

নীরদবাবু বললেন: রাজভোগ আর পানতোয়া।......

সেদিনই রাত্রে এল সি রবি মুখার্জ্জী আমায় ধরে বসলো: ভাই, বিশ্বাস কর, মেয়েটি ভালো। ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় তো এখানে এসে। কিন্তু ঐ পরিবারের তুলনা হয় না। আমি ওদের মাকে মা বলে ডাকি। আর খুকু মেয়েটি আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সুগৃহিণী হবে। অবশ্য, রূপ যদি চাও তুমি, সে আলাদা কথা—

বাধা দিলাম: চামড়ার চক্‌চকানি আর কদিন রে? আমাদের বিয়ে হবে যাদের সঙ্গে, তারা শুধু বধূ হয়েই আসবে না, তারা হবে আমাদের কাজে সাথিনী। —কিন্তু আমার সঙ্গে কেন ওঁরা বিয়ে দিতে চান? কী আমার ভবিষ্যৎ? হয় দ্বীপান্তর, নয় ফাঁসী। মেয়েটার জীবনটা নষ্ট হবে নাকি?

সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না—ঠাট্টা করলো রবি।

বললাম: না, না, ঠাট্টা নয়। মেয়েটির বয়সও শুনেছি প্রায় আঠারো: ভালমন্দ বোঝবার যথেষ্ট ক্ষমতা হয়েছে। তোমাদের মতো শুভানুধ্যায়ীরা একটা ছেলে হাতে পেলেই ধরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে তো চলবে না। তার কি মত তাও জানা চাই এবং সেটাই সবার আগে।

অবশেষে রবি বললো: আচ্ছা বেশ, আমিই জিজ্ঞেস করে আসবো খুকুকে। তুমি কথা দিচ্ছ তো?

বললাম: কথা দিলে তা আর নড়চড় করি না বলেই সহজে কথা দিইনে আমরা। তুমি সংবাদটি আগে নিয়ে এসো তো। তারপর ভাবা যাবে।

রবি চলে যাবার পর বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন : দেখতে সুন্দর নয় সত্যি, আপনার সঙ্গে নেহাৎই মানাবে না। কিন্তু এই গ্রামের সব-সেরা মেয়ে। বিয়ে যদি সত্যিই করেন, তাহলে ঠকবেন না।

এর কদিন পরই কি একটা কাজে গ্রামে এলেন ঠাকুরগাঁ মহকুমার হাকিম আমীমুল্লা। পরিতোষ নিশ্চয়ই একান্ত ভৃত্যের মতো রাজবন্দীদের কেচ্ছা তাঁর কানেও তুলেছে। তাই পরদিন সকালেই আমায় ডেকে পাঠালেন তিনি ডাক বাংলোয়। খুব বিরক্ত মন নিয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন হলে কড়া কড়া কথা শোনাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম।

কিন্তু আমীমুল্লা আমায় একেবারে অবাক্ করে দিলেন : শুনলাম তারকবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা চলছে ? Really a good proposal ! যেমন তারকবাবু, তেমনি তাঁর ছেলে-মেয়েরা। চমৎকার ! এ সংবাদে আমি খুব আনন্দ লাভ করেছি দ্বিজেনবাবু !

বলতে চেষ্টা করলাম : না, এঁরা এখনও প্রস্তাব নিয়ে আমার মা ও দাদাদের কাছে যাননি। আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করছেন।—

তবে সম্মতি দিয়ে ফেলুন।—বলতে লাগলেন আমীমুল্লা : আরে মশাই, একবার ওর স্কুলে গেলাম পরিদর্শন করতে। এইটুকু সব মেয়ে। প্রশ্ন করলাম : বল তো বাংলার প্রধান মন্ত্রী কে ? তৎক্ষণাৎ জবাব দিল ছোট্ট একটি মেয়ে : জনাব ফজলুল হক। ওদের বইতে তো আর এসব নেই। একেই বলে শিক্ষকতা। শুধু ফজলুল হক নয়, জনাব ফজলুল হক। অর্থাৎ কিভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখানো হয়েছে। না, না, আপনি মত দিয়ে দিন ! She is a prize girl without any doubt…আপনি দেখেছেন মেয়েটিকে ? আলাপ হয়েছে ?

এ প্রশ্ন কেন ? মৌলবী সাহেব কি প্রশংসাচ্ছলে দুএকটা কথাও বার করে নিতে চান নাকি ? সাবধান হতে হলো। বললাম : দেখিনি যে একেবারেই, তা বলতে পারিনে। তবে আলাপ হয়নি। কী করে হবে ?

হেসে বললেন আমীমুল্লা : ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। আপনাদের মধ্যে মেয়ে দেখাটা বেশ ঘটা করে হয়ে থাকে। তা—আপনি একদিন দেখে নিন, তারপর সম্মতি দিয়ে দিন। ওঁরা প্রস্তাব ও আপনার সম্মতি নিয়ে আপনার অভিভাবকদের কাছে যান। আপনার মা কোথায় আছেন, ঢাকাতে ?

না, তিনি এখন আছেন কলকাতায় আমার মেজদার ওখানে।

বেলা অনেক হয়েছিল, তাই উঠে পড়লাম। বেরিয়ে আসবার সময় দেখি বারান্দায় অপেক্ষা করছেন স্বয়ং পরিতোষ দারোগা, সাহেবের খাস কামরার বাইরে তক্‌মা-আঁটা বেয়ারার মতো কলিং বেলের অপেক্ষায়! নিশ্চয়ই ব্যাটা সব শুনতে পেয়েছে। সাহেবের কাছে এসেছিল সাপের মতো ফণা তুলে অভিযোগের হলাহল ছড়াতে। আলাপ শুনে এবার একেবারে শামুক বনে গেল। এবার নিজেরই হাত কামড়াবে নিষ্ফল আক্রোশে। বুলডগ্‌ চাবুক খেয়ে ঘিয়ে-ভাজা কুকুর হয়ে গেছে। এবার চর্ব্বণ করুক্ নিজেরই মড়া-হাড়!……

একষট্টি

পরিতোষের নিয়মিত কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট যে আদৌ কার্য্যকরী হলো না তা নয়। অকস্মাৎ একদিন শুধু আমার ওপরই এল দিনাজপুরের পুলিশ সুপার এস এন চাটার্জ্জীর আদেশ—চাটার্জ্জী পরিবারের ভাইদের সঙ্গে আমার কথা কওয়া নিষেধ। স্বাক্ষর করে আদেশ-পত্র গ্রহণ করবার সময় পরিতোষের পানের রসে কালো পুরু অধরেও স্পষ্ট বিদ্রূপের হাসির ঝিলিক দেখতে পেলাম! গ্রহণ করলাম বটে, কিন্তু মানা না-মানা তো পুরোপুরি আমারই খুশীর ওপর নির্ভর করে। তাই প্রকাশ্যে ওঁদের সঙ্গে ভাসুর ও ভ্রাতৃবধুর সম্পর্ক স্থাপিত হলেও সুরু হয়ে গেল আমার গোপনতরো অভিসার। সিংহদ্বার আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেল বলেই খুলে গেল খিড়কীর দরজা। রঘুপদের মিঠাইয়ের দোকানে বসে চা পান করতে করতে যখন দেখতে পাই দীননাথ পণ্ডিত তাঁর ঘরের বারান্দা ত্যাগ করে ঘরে ঢুকেছেন কোনো কাজে এবং চাটার্জ্জী বাড়ীর উল্টো দিকের হিন্দুস্থানী দোকানের সম্মুখের বাঁশের মাচা আলোকিত করে ভবেন সান্যাল আর বসে নেই, সুড়ুৎ করে তখন রঘুপদের দোকানের পেছন দিকে চলে যাই। সেদিক দিয়ে বিলুদের বাড়ীতে প্রবেশের একটি ক্ষুদ্র দরজা আছে। নিঃশব্দে প্রবেশ করি এবং অন্দরমহলে বসেই বিলুর সঙ্গে নতুন সংগঠনের আলাপ চালাই। কতখানি হয়েছে, আরও কতটা হতে পারে, এই সব। তারপর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় নিরু আমায় ফোঁটা দিয়ে আমার সঙ্গে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। নতুন ভ্রাতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া বাড়ীর অন্যান্য সবার সঙ্গেও বেশ সহজ হয়ে গেছি। চাটার্জ্জী বাড়ীর গাঙ্গুলী ছেলে বলা যায়।……

পরিতোষ দারোগার দ্বিতীয় আণবিক বোমা এল একেবারে অভিনবরূপে। দিনাজপুর আই বি থেকে দুজন এল সি অকস্মাৎ একদিন খানসামা থানায় সাময়িকভাবে বদলি হয়ে এল। তাদের একমাত্র কাজ হলো বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমার পশ্চাতে ফেউয়ের মতো লেগে থাকা। সে যুগে গ্রামে অন্তরীণ কোনো রাজবন্দীকে এমনিভাবে একেবারে প্রকাশ্যে অনুসরণ করা হতো বলে আমার জানা নেই। আই বি-র লোক, অথচ কোনো লুকোচুরি নেই, কোনো চালাকী নেই, প্রকাশ্য দিবালোকে একেবারে সবার চোখের সম্মুখে, যেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আমাদের পশ্চাতে এরা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

এর ফলে সতর্কতা আমাদের আরও বাড়িয়ে দিতে হলো সত্যি, কিন্তু কাজের উদ্যমে আদৌ ভাটা না পড়ে বরং তা উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠলো বাধা-পাওয়া পার্ব্বত্য ঝরণার মতো।

বিরোধী দল পরিতোষিণী ও সীতা দেবীর নেতৃত্বে যে নিন্দা ছড়াচ্ছিল, তা এতদিন চলছিল শুধু আমাদের দুজনকে জড়িয়েই। কিন্তু যেদিন বড়দি তাঁর ছোট বোন শিশিরকণার বিয়ের প্রস্তাব করেন এবং ভালো-মা সীমাহীন গর্ব্ব নিয়ে এই সুসংবাদ গৃহে গৃহে পরিবেশন করে আসেন পূজোর শেষে প্রসাদ বিতরণের মতো, সেইদিন থেকেই এই নিন্দুকের দল বিশ্বেশ্বরবাবুকে রেহাই দিয়ে একেবারে আমায় নিয়েই উঠে-পড়ে লেগে গেল। আমি গোপনে বিলুদের বাড়ী যাই, গেলেই ওরা শিশিরকণাকে পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে, শিশিরের সঙ্গে চলে আমার হাসি-তামাসা ঘণ্টার পর ঘণ্টা—হাহা হিহি, তারপর গান চলে, ক্যারম্ খেলা চলে, আমার সঙ্গে চিঠি লেখালেখি চলে···এমনি সব পাশুপত ছাড়তে লাগলো তারা। এই বিশেষ কাজে গা ঢেলে দিলেন বিশেষ করে বিশ্বাস ও সান্ন্যাল পরিবার। সঙ্গে যোগ দিলেন দীননাথ পণ্ডিত, নলিনী ঘোষ, কজন মাড়োয়ারী আর হাড়ী ও পানুয়া পাড়ার একদল।

এদিকে কলকাতায় আমার মার কাছে বিলুর বাবা সরকারীভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন লাট্টু বিশ্বাসের অন্যতম ভ্রাতা ও স্বয়ং দেবীচৌধুরাণীর অন্যতম পুত্র পটল বিশ্বাস মারফৎ! বিশ্বাস বাড়ীর কর্দ্দমে কেমন করে জানি না, ফুটেছিল দুটি মৃণাল—গোপাল ও পটল। পুরো ব্যবসায়ী হলেও গোপাল বিশ্বাস যেমন ভদ্র, তেমন বিনয়ী। পিপীলিকার পা থেকে গুড় সংগ্রহ করতে দ্বিধা করতেন না সত্য, কিন্তু বারোয়ারী পূজো বা অন্য কোনো সমবেত কাজে গোপাল বিশ্বাসের দানের অঙ্কটাই সর্ব্বাধিক মোটা হয়ে চাঁদার খাতার শোভা বর্দ্ধন করতো!···আর পটল তো বিলুরই বন্ধু, রাজনৈতিক কাজেও বিলুরই সঙ্গে তার হাতেখড়ি হয়েছে। গুপ্ত সমিতির কাজে যারা আত্মনিয়োগ করে, তারা সবাই যে পুরোপুরি সফল হয়, তা দাবী করছি না। কিন্তু চরিত্র তাদের গড়ে ওঠে বলেই সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাকে তারা পরিহার করে চলে বিষের মতো! ঐ দৈত্যবংশে প্রহ্লাদের মতোই এরা দুজন অনেকটা অপাংক্তেয় হয়ে থাকতো।

চিঠিপত্র, শিশিরকণার ছবি ও আমার বক্তব্য নিয়ে পটল যখন কলকাতা রওনা হয়ে গেছে, তখন একদিন এই প্রথম বিলুকে সব খুলে বললাম। বললাম যে, তার বোন যখন শিক্ষয়িত্রী, বয়স প্রায় আঠারো, তখন অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় আমিই তার

সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে নিতে চাই। এবং তাই উচিত। নইলে ছেলে পেলেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে হ্যাঙ্গামা চুকিয়ে দেবার জন্য সব মেয়ের বাপই যে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল, সে সহজ সত্য আমার জানা আছে।

প্রস্তাব পেয়ে তারকবাবু তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন এবং বাড়ীর সবাই তাঁকে সমর্থন জানাতেও দ্বিধা করলেন না।

তারপর একদিন এল সেই স্মরণীয় রাত্রি। জীবনের সুদুর্গম চলার পথে যাকে সাথিনী করে নেবার প্রস্তাব এসেছে, যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। চকোর-চকোরীর মতো নিভৃতে প্রেম-গুঞ্জন নয়, বিপ্লবী-জীবনের ভয়াবহতা স্পষ্ট করে বলতে হবে। মনে পড়ে, সেদিন আকাশে ছিল পূর্ণিমার চাঁদ আর আত্রাই নদীর বালুচরে ছিল জ্যোৎস্নার প্লাবন। শীর্ণকায় নদী এক ফালি সরু জলের স্রোত জিইয়ে রেখে বিরহিনীর মতো প্রিয়-বর্ষার অপেক্ষায় দিন গুনছে। বালুচরে ইতস্ততঃ কাশবনের গুচ্ছ। তার মাথায় সাদা সাদা ফুল! ঝিরঝিরে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে সেই ফুলগুলি। এমনি একটি কাশবনের ঝোপের পাশে বিলু নিয়ে এল তার বোনকে। বসলাম ও বসতে বললাম সেই বালির আসনেই।

বিলু বললো : আপনারা দুজন কথা কন। আমি ঘুরে আসি।

আমি আপত্তি জানাতেই সে বলে উঠলো : না, না, সেজন্য ভাববেন না আপনি। বরং আমি থাকলে হয়তো আপনার কথার জবাব দিতে ওর লজ্জা করবে। আমি কাছেই থাকবো, আধঘণ্টা পরই ঘুরে আসছি।

বিলু চলে গেল। রইলাম শিশিরকণা ও আমি আর আকাশে জেগে রইলো অতন্দ্রনয়নে পূর্ণিমার রূপালী চাঁদ!

ব্যবসায়ীরা যেমন ঐক্যতান বা মুখবন্ধের ধার ধারে না, একবারেই এসে পড়ে আসল কথায়, ঠিক তেমনি আমিও মূল কথাটাই পাড়লাম : নিশ্চয়ই জান, তোমার সঙ্গে কথা না বলে আমার বিয়ের কথা চলছে। তোমাদের দিকের সবাই উৎসুক হয়ে উঠলেও তোমার সঙ্গে কথা না বলে আমার দিক থেকে পাকাপাকি কিছু করা ঠিক হবে না। তাই আমাদের এই সাক্ষাৎ। আমার সঙ্গে বিয়ের যে একটা মারাত্মক ঝুঁকি আছে, জানি না কতখানি তোমায় তা বোঝানো হয়েছে। বিয়ে করলেও রাজনীতি আমি ত্যাগ করতে পারবো না কোনোদিন। আর বিপ্লবীদের রাজনীতি মানেই হচ্ছে আমৃত্যু সংগ্রাম। কারাদণ্ডে তার তোড় সাময়িকভাবে কিছুটা কমে গেলেও একমাত্র ফাঁসীতেই তার পরিসমাপ্তি।

শিশিরকণা বললো : তা জানি।

জানো, অথচ এমনি মারাত্মক পথে পা বাড়াচ্ছ কেন ? বিপ্লবীরা কখনো ideal husband হতে পারে না। তেমনি দুর্দ্দিন যদি তোমার বিবাহিত জীবনেও এসে পড়ে, তাহলে তো বরবাদ হয়ে যাবে তোমার রঙ্গীন ভবিষ্যৎ। জানি না, এই আশঙ্কার কথাটা ভালো করে ভেবে দেখেছ কিনা।—তারপর আরও সিরিয়াস হয়ে বললাম : শোন শিশিরকণা, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার দাদারাও অল্পবিস্তর রাজনীতি করে থাকেন। রবি তোমার সম্মতি আছে সংবাদ নিয়ে এসে আমার কাছে যতই নৃত্য করুক না কেন, irresponsible husband নিয়ে ঘর করা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য হবে কিনা, সেটা খুব সিরিয়াসলি ভেবে দেখো তুমি নিজে। বরং তোমার মতামত দুচার দিন পরে জানিয়ো বিলুর মারফৎ।

শিশিরকণা বললো : আচ্ছা।

তারপর গ্রামের প্রসঙ্গে এসে পড়লাম : নিন্দেগুলো তোমার কানে যাচ্ছে তো ? Siva-leg ও Diamond-red যে গাধাবোটের মতো সর্ব্বদাই তোমাদের পেছনে লেগে আছে, তা জানো তো ?

কে ?—শিশিরকণা প্রশ্ন করলো।

হেসে বললাম : তোমার সেজদার কাছে শিখেছি। মানে, শিবপদ আর হীরালাল। জানতো, ওরা ফেউয়ের মতো লেগে আছে আমাদের পেছনে ?

সব জানি।

হেসে বললাম : কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, সন্ধ্যার পর সুবোধ বালকের মতো আমরা বাড়ীতে অবস্থান করেছি মনে করে ওরা যখন সিপাইদের চৌকায় রান্না চড়ায়, তখন আবার সুরু হয় আমাদের কাজ। পেছনের গুপ্তপথে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের বেড়ার বাইরে দাঁড়াই আর ওদের সারাদিনের কাজ সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়, সব শুনে নিই।

প্রশ্ন করলো শিশিরকণা : আপনারা স্পাইয়ের ওপর স্পাইং করছেন ?

তা করছি।—

ঘণ্টাখানের পর বিলু ও শিশিরকণা বিদায় নিয়ে চলে গেল। একা দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ফেরবার পথে নদীর নির্জ্জন উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে আর একবার দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। আকাশে তেমনি চাঁদ, তেমনি জ্যোৎস্নার বন্যা, শুভ্র কাশফুলের তেমনি দোলন আর সারা শরীরে তেমনি মিঠে হাওয়ার পেলব পরশ !……

কিন্তু চাঁদের ঠোঁটে দুষ্টু হাসির ঝিলিক্ দেখতে পেলাম কি ?……

অকস্মাৎ একদিন কলকাতা থেকে মেজদার পত্র পেলাম, মা দুরারোগ্য সেপটিসিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। বয়েস হয়েছে, কিছুই বলা যায় না। মা আমায় দেখতে চান। তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করে দিলাম এবং আশ্চর্য্য, দিন দশেকের মধ্যেই সাত দিনের ছুটিই শুধু মঞ্জুর হয়ে এল নয়, দিনাজপুর থেকে দুজন সশস্ত্র সিপাই এসে হাজির হলো আমায় নিয়ে যাবার জন্য।

রওনা হলাম তৎক্ষণাৎ আবার গরুর গাড়ীতে। পরে জেনেছিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে নিন্দা এবার অকথ্য বদনাম হয়ে প্রচারিত হচ্ছিলো লোকের মুখে মুখে। সীতা দেবী সরমের লেশমাত্র আর না রেখে একেবারে আসরে নেমে পড়েছিলেন রণরঙ্গিনী তাড়কার বেশে। পশ্চাতে তাঁর ছিল পুরো এক অক্ষৌহিণী মোসাহেব ও গ্রাম্যদেবতা। হাড়ীপাড়ার হাড়ীরা এই শুদ্ধি অভিযানে মদৎ জোগাতে লাগলো। ফলে, সাময়িকভাবে নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় চাটার্জ্জী পরিবার কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।

কিন্তু এই সময় খানসামা গ্রামে ধূমকেতুর মতো এক ভস্মমাখা হিন্দুস্থানী সাধুর আগমন হয়। সাধু এলেই তার আশেপাশে বেশ সহজভাবেই ভক্ত জুটে যায় জল উঁচু ও জল নীচু বলবার জন্য। সীতা দেবী এই ভক্তবৃন্দের নেতৃত্ব যেচে গ্রহণ করলেন। সাধুর আশ্রম তৈরী হয়ে গেল এবং আশ্চর্য্য যে তা ভালো-মারই কাজির বাগানের বিরাটাকার আম, জাম ও কাঁঠাল গাছের নীচে। সহজ মানুষ ভালো-মা সাধু দেখেই ভড়কে গিয়েছিলেন এবং ভক্তবৃন্দের সমবেত আবেদন আর সাহস করে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। কিন্তু খাল কেটে কুমীর আনার মূঢ়তা ভালো-মা উপলব্ধি করেছিলেন অনেক পরে।

সাধুর ওখানে প্রতি সন্ধ্যায় ভিড় জমতে লাগলো এবং করকোষ্ঠী বিচার করে ও ধ্যানে বসে সাধুপ্রবর লোমহর্ষণকারী সব তথ্য ব্যক্ত করতে লাগলেন। সীতা দেবীর লাউডস্পীকারের মতো তিনি বলতে লাগলেন যে, এই খানসামা গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিবার হচ্ছে চাটার্জ্জী বাড়ী। ওরা সবাই চরিত্রহীন। তাদের পাপের জন্যই এই গ্রামের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। কলেরা দেখা দেবে, বসন্ত দেখা দেবে, মড়কে গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে। অতএব…ইউরেকা ইউরেকা বলে চীৎকার করে না উঠলেও কুৎসা প্রচারের সহজ পন্থা আবিষ্কার করে দিয়ে সাধু ভক্তবৃন্দের চাওয়া মেটাতে লাগলেন !……

এদিকে কলকাতা ভবানন্দ রোডে মেজদার বাড়ীতে এসে দেখি, মা শয্যায় একেবারে লীন হয়ে গেছেন! একেবারে কখানা হাড়মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনলাম, বাঁ হাতের কনুইতে সেপটিসিমিয়ার পচনশীল ফোঁড়া যখন দেখা দেয়, ডাঃ প্রিয়তোষ ঘোষাল তখন অনন্যোপায় হয়ে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত করেন। সামান্য একটু ছাড়িয়ে দিলেই চলবে মনে করে প্রিয়তোষ যখন ছুরি চালিয়েছেন, অকস্মাৎ তখন দেখা গেল মাংসের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে খাল অনেকদূর চলে গেছে। কিন্তু তখন আর স্থগিত রাখবার উপায় ছিল না। তাই ক্লোরফর্‌ম্‌ না করেই, কোনো কম্পাউণ্ডারের সাহায্য না নিয়েই প্রিয়তোষ কাঁচি চালিয়ে কচ্‌ কচ্‌ করে কেটে ফেলেন কাঁচা মাংস। তারপর অবশ্য জোরালো ওষুধ দেবার ফলে ঘা শুকিয়ে আসছে।

পটল বিশ্বাস এসে মার কাছে শিশিরকণার ফটো ও তারকবাবুর পত্র দিয়ে গেছে দেখলাম এবং শুনলাম আমার বক্তব্যও জানিয়ে গেছে। কিন্তু আমি বললাম: মুক্তি পাবার আগে বিয়ে করা ভুল হবে মা। কবে মুক্তি পাবো আর কবে চাকরি পাবো, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অথচ বিয়ে করে বসবো, এ যুক্তি আমি মেনে নিতে পারি না। বিয়ে করে খাওয়াবো কি? থাকবো কোথায়?

মা বললেন: সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না। ছাড়া পেলে চাকরি পেতে দেরী হবে না। তুমি বিয়ে কর।

বললাম: কিন্তু আরও একটা কথা আছে, মেয়েটি কালো, দেখতে ভালো না।

বোন হেনা মায়ের মাথায় হাওয়া করছিল, কল্‌কল্‌ করে উঠলো: আচ্ছা, আচ্ছা, আর ব্যাখ্যা করতে হবে না তোমায়। হোক কালো, হোক দেখতে নাই-বা ভালো, সে আমরা বুঝবো।

হেসে বললাম: বাঃ, তুই বুঝবি কিরে! বিয়ে করবো আমি আর বুঝবি তুই? না, না, কালো মেয়ে ফর্সা ছেলের পক্ষে বিয়ে করা ঠিক নয়।

মা বললেন: তোর বৌ দেখে যাবো এই ছিল আমার ইচ্ছা। হেনা তার সংসার ছেলেমেয়ে ফেলে এসেছে। কদ্দিন আর পারবে থাকতে! তোর বৌ এসে আমার শুশ্রূষা করবে, এই তো আশা করেছিলাম! কিন্তু দেখছি তা আর এ জীবনে হলো না।—বলে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এবার আর পারলাম না নিজের জেদ অটুট রাখতে। মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ আকাঙ্ক্ষা যেন আর্তনাদের মতো আমার কানে ধ্বনিত হলো। মনের ইস্পাত-

কাঠামো যেন বিহারী ভূমিকম্পের সংঘাতে একেবারে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়লো!······

সেদিনই আই বি-র কর্ত্তা নলিনী মজুমদারের কাছে দরখাস্ত করলাম। একদিন আই বি দারোগা প্রফুল্ল মণ্ডল এসে আমায় নিয়ে গেলেন লর্ড সিংহ রোডে। দোতলায় নলিনী মজুমদারের কক্ষ। টেবিলের ওপর একখানা মোটা লাল রংয়ের মলাটওয়ালা ফাইল দেখিয়ে বললেন: আপনার ফাইলটা বার করেছি। দেখছেন তো লাল রং, মানে dangerous, তারপর মোটাও কম নয়। সময় লাগবে।

বললাম: পুরোনো কাসুন্দি না ঘেঁটে এই প্রস্তাবটাই বিবেচনা করুন না যে আমি বিয়ে করে সংসারী হবো।

নলিনী বললেন: সেটা অবশ্যই ভালো প্রস্তাব। তারকবাবুদের পরিবার বেশ নামকরা।

কিন্তু তার আগে ছেড়ে দিন, চাকরি-বাকরি খুঁজতে হবে যে! চাকরি না পেয়ে বিয়ে করা কি সঙ্গত হবে? আপনিই বলুন—

আচ্ছা, আপনার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবো।—আশা দিলেন নলিনী মজুমদার।

ফিরে এলাম। মাকে সব বললাম। মা আশান্বিত হয়ে উঠলেন। আমাদের পরিবারে আমার বিবাহ যেন একটা অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, অচিন্তনীয়ও বটে!··· পূর্ব্বেই বলেছি, অজস্র চেষ্টা হয়েছে সর্ব্বদিক থেকে। কিন্তু এতকাল আমার ছিল ধনুক-ভাঙ্গা পণ!

খানসামা ফিরে এসেই সেখানকার সমস্ত ঘটনা জানতে পারলাম বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছে। পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছে। গ্রামে স্পষ্ট দুটি দল হয়ে গেছে। সীতাদেবীর দলের জনসংখ্যা অনেক—অনেক বেশী। আর চাণক্যের মতো সেই দলের কূটবুদ্ধি জোগাচ্ছে সেই ভস্মমাখা সাধু। নিত্য নতুন নিন্দা প্রচারিত হচ্ছে কাজির বাগান থেকে। বারুদখানার মতো মারাত্মক হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। এখন কোনোরকমে একটি দেশলাইয়ের কাঠি পড়লেই বিস্ফোরণ অনিবার্য্য!···

সময় হাতে নেই আর। জানা গেল, পরিতোষ এবার আর সাপ্তাহিক নয়, প্রায় দৈনিক কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। কেউ দুটি ফিরে গেছে দিনাজপুরে এবং নিশ্চয়ই হারুণ-অল-রশীদের কৌতুকপূর্ণ গল্পগুলো বাণেশ্বরের কানে ঢেলে দিয়েছে অষ্ট্রেলিয়ান মধু!

সময় হাতে নেই আর। স্থির করে ফেললাম রাত্রে সিপাইদের ঘরের মধ্যে দিয়ে গোপনে প্রবেশ করে থানা থেকে পরিতোষের Deed Box টা চুরি করে আনতে হবে। কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্টের ডায়েরীখানা ওর মধ্যেই থাকে। সেখানা সরিয়ে ফেলতে পারলে ব্যাটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়ান যাবে বেশ। বুঝতে পারবে সবই, কিন্তু বলতে পারবে না।

সময় হাতে নেই আর। তাই বেরিয়ে পড়লাম নিঃশব্দে সেদিনই গভীর রাত্রে। বিশ্বেশ্বরবাবু ক্ষুদ্র একটা টর্চ্চ নিয়ে থানার বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি প্রবেশ করলাম সন্তর্পণে বিড়ালের মতো সিপাইদের ঘরের জানালাপথে। ছয়জনের মধ্যে চারজন ছিল সে রাত্রে। এল সি রবি নেই, পরিতোষ সাধারণ সিপাইয়ের মতো তাকেও পাঠিয়েছেন টঙ্গুয়া গ্রামে ডিউটিতে।··· সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হলো। ওদের পাশাপাশি বিছানো লোহার খাটে মশারীর নীচে ঘুমোচ্ছে সিপাইরা, তার মাঝখান দিয়ে প্রায় গা ঘেঁসে এগুতে হবে আমাকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সীমাহীন সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে এসে থানার প্রধান কক্ষে প্রবেশ করলাম। বারান্দার দরজা আস্তে আস্তে খুলে দিতেই বিশ্বেশ্বরবাবু প্রবেশ করলেন। কিন্তু টর্চ্চ মাঝে মাঝে জ্বালিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা গেল, ব্যাটা Deed Boxটা সে রাত্রে আর থানায় রেখে যায়নি।···সুতরাং ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে আসতে হলো বাসায়। সেই রাত্রেই সিদ্ধান্ত করে ফেললাম দুজনে পরদিনই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে চরমপত্র দেবো আমাদের খানসামা থেকে বদলি করবার দাবী জানিয়ে। অপেক্ষা করবো মাত্র সাতদিন। তারপরই আমরা আইনভঙ্গ করবো, থানায় হাজিরা দেবো না। কয়েক মাস কারাদণ্ড হয়ে গেলে আর ফিরে আসতে হবে না খানসামায়। হয়তো তাতে এখানকার উত্তাপ প্রশমিত যাবে, হয়ে কিন্তু চাটার্জ্জী পরিবারের মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার হবে। আমাদেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে এমনি নিষ্কলঙ্ক পরিবারের অবমাননা আমাদেরই কর্ত্তব্য রোধ করা। আমরা চলে গেলে তা সম্ভব হবে।

কিন্তু কোনো জবাবই এল না আমাদের চরম পত্রের। সুতরাং চরম পন্থা গ্রহণ করতে হলো। এক হাটের দিনে আমরা আর গেলাম না থানায়, কালুবাবুর দোকানে নতুন স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করেই কাটিয়ে দিলাম নির্দ্ধারিত সময়। তাঁরই মুখে সংবাদ পাঠালাম বিলুর কাছে যে, আমরা খানসামা ত্যাগ না করলে তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারবো না।

সাড়ে ছটায় বাসায় ফিরে চা খাচ্ছি। এমন সময় দারোগার সরকারী পোষাক এঁটে অকস্মাৎ পরিতোষের আবির্ভাব! দ্বিধাজড়িত কণ্ঠেই বললেন: বি সি এল এ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

বিশ্বেশ্বরবাবু টিপ্পনি কাটলেন: গ্রেপ্তার তো আমরা হয়েই আছি। কিন্তু এস পি-র হুকুম কি এরই মধ্যে এসে গেল?

এস পি-র হুকুম লাগবে কিসে?—ললাট কুঞ্চন করে প্রশ্ন করলেন পরিতোষ।

আমি জবাব দিলাম: তাইই তো হচ্ছে নিয়ম। রাজবন্দী আইন ভঙ্গ করলে স্পেশ্যাল বার্তাবহ মারফৎ সংবাদ পাঠাতে হয় এস পি-র কাছে। এস পি বললে তবে গ্রেপ্তার করে চালান দিতে হয়। দারোগা আগেই গ্রেপ্তার করেন না—

পৌরুষে লাগলো ঘা। পরিতোষ বললেন: আইনের ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে না শুনলেও চলবে। আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি বেশ সচেতন।

অবশ্যই, অবশ্যই।—বিশ্বেশ্বরবাবু আবার ঠাট্টা করলেন।

দারোগার সঙ্গে সঙ্গে থানার বারান্দায় এসে বসলাম। খুব ষ্টাইল করে পরিতোষ কয়েক পৃষ্ঠা রিপোর্ট লিখলেন বোধহয় সেদিন যথাসময়ে থানায় হাজিরা না দিয়ে, আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন্ পাকা ধানে মই চালিয়ে দিয়েছি, তারই সালঙ্কার বিবরণী। ইংরেজী ভাষায় তিনি বরাবরই অক্সফোর্ডের এম এ; তাই তোবড়ানো গালে আরও কয়েকটা রেখা ফুটিয়ে ও তাম্বুল রসে কৃষ্ণবর্ণ গোটাকয়েক মুলো-দাঁত বার করে জিজ্ঞেস করলেন: এ্যাবজর্ভ্ বানানটা কি দ্বিজেনবাবু, 'be' না 've'?

বলে দিলাম।

লেখা শেষ করে দারোগাসুলভ গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে বললেন: আপনারা খেয়ে নিন। তারপর কোথায় থাকবেন, ঠিক বুঝতে পারছি না—

আমরা কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি এবং আপনাকেও তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।—বলতে লাগলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: যেই মুহূর্ত্তে আমাদের গ্রেপ্তার করেছেন, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের খাবার ও থাকবার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। রান্না অবশ্য চাকর করে ফেলেছে, কিন্তু তা তো আমরা খাবো না। আমরা যে রাজঅতিথি এখন থেকে।

কত করে পান আপনারা খাবার জন্য? কোন্ ক্লাশ আসামী—

বাধা দিলাম: আপনার ঐ মোটা মোটা কেতাবে কিন্তু তা খুঁজে পাবেন না,

দারোগাবাবু। ওতে আছে সাধারণ আসামীদের খাদ্যের জন্য বরাদ্দ তালিকা। আমরা যে ডেটিনিউ। আমাদের বরাদ্দ অনেক বেশী।

তাচ্ছিল্যভরে বলতে চেষ্টা করলেন পরিতোষ: 'এ' ক্লাশ আসামীর বরাদ্দ যা, তাই পাবেন। আজ ওতেই চালিয়ে নিন, তারপর ঠাকুরগাঁ গিয়ে না-হয়—

মাপ করবেন স্যার—বাধা দিলেন বিশ্বেশ্বরবাবু: আইনকানুন আপনি যেমন জানেন, তেমনি আমরাও জানি। ঐ চালিয়ে নেবার ব্যাপারটা আর চলে না। দু দিস্তে ফুলকো লুচি আর আধসেরটাক মাংস আনাবার ব্যবস্থা করুন। নইলে আমরা খাবো না আর আমাদের যা বলবার, তা বলবো কাল এস ডি ও-র কাছে।

রান্না তো আপনাদের হয়ে গেছে, বিশ্বেশ্বরবাবু—

তা হোক। আমরা ঐ রান্নাকরা খাবার রাস্তায় ফেলে দেবো। বিচারাধীন আসামীর খাবার ব্যবস্থা করতে আপনি বাধ্য।—স্পষ্ট জানালেন বিশ্বেশ্বরবাবু।

মহা হাঙ্গামায় পড়ে গেলেন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দারোগা পরিতোষ। কোথায় পাওয়া যাবে লুচি আর মাংস? রঘুর দোকানে তৈরী নানারকম মিষ্টি, লুচিও হয়তো হতে পারে। কিন্তু মাংস?…পরিতোষের বাংলা পাঁচ মার্কা মুখখানা একেবারে পেঁচার মতো দেখাতে লাগলো।

অবশেষে হেসে বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু: আচ্ছা থাক্, আমরা আমাদের চাকরের রান্নাই খাবো'খন। কিন্তু আজ রাত্রে কোথায় থাকবো আমরা?

আমিই জবাব দিলাম: কেন, থানার হাজতে? আসামী হয়ে কি আবার বাসায় গিয়ে আরাম করে শুতে চান নাকি বিশ্বেশ্বরবাবু?

ইতিমধ্যে সংবাদ রটে গেছে বোঝা গেল। দুচারজন ভদ্রলোক এসে পড়েছেন,—ভবানীবাবু, কিশোরীবাবু, কুঞ্জলাল, ডাক্তার অমর গুপ্ত প্রভৃতি। এল সি রবির মনে কি হচ্ছে জানিনে। কারণ আমাদের চোখের দিকে চাইছে না সে। নীরবে দারোগার হুকুম তামিল করে একবার এনে দিচ্ছে P. R. B. (Police Regulations, Bengal) বইখানা, আবার এগিয়ে দিচ্ছে Deed Boxটা। ঘরের মধ্যে টেবিলে বসে কলম চালাচ্ছেন জমাদার কামাখ্যা মুখুজ্জে আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসির আভায় তাঁর অধর দুখানি প্রসারিত হয়েই আবার সঙ্কুচিত হচ্ছে। রসিক ব্যক্তি, কিন্তু বদরসিক পরিতোষ যে তাঁর বস্!……

কোথায় আমরা রাত্রিযাপন করবো, তা নিয়ে মহা সমস্যায় পড়লেন পরিতোষ। খাবার হাঙ্গাম চুকলো, কিন্তু শোবার?

আমি বললাম: আমাদের বিছানাপত্র সব আনিয়ে হাজতের মধ্যে মশারী টাঙ্গিয়ে ভালো করে বিছানা করে দেবার ব্যবস্থা করুন দারোগাবাবু!

রবি!—হাঁক দিলেন পরিতোষ।

আজ্ঞে!—রবি এসে হাজির।

এঁদের দুজনের বিছানা এনে হাজতের মধ্যে ভালো করে পেতে দাও। একটা সিপাইকে নাও।

রবি নিবেদন করলো: কিন্তু স্যার, হাজতে যে স্তূপীকৃত ডায়েরী ও অন্যান্য পুরানো খাতা রয়েছে—

কেন রয়েছে ওখানে?—পরিতোষ এতগুলো ভদ্রলোকের সামনে যেন দ্বিতীয় চাণক্যের মতো ভয়ে কম্পমান বাচালকে রক্তবর্ণ চক্ষু দেখাতে লাগলেন: হাজত কি গুদাম? কে ওসব রেখেছে ওখানে?

মনে হলো এর পরই বজ্রকণ্ঠে হুকুম হবে: উস্‌কো গর্দ্দান লাও।

কিন্তু ভীতসন্ত্রস্ত বাচাল মিনমিন করলো: আপনিই বলেছিলেন স্যার পুরোনো খাতাপত্র ওখানে সাজিয়ে রাখতে—

বলেছিলাম? বেশ করেছিলাম—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন পরিতোষ: কিন্তু এখন এঁদের শোবার ব্যবস্থা কি করা যেতে পারে?

কথা বললেন ভবানীবাবু: ওঁরা না হয় ওঁদের বাসাতেই—

বলেন কি?—ফিরে দাঁড়ালেন পরিতোষ: গ্রেপ্তারের পর নিজেদের বাসায়?

তারপর বলা যায় না, যদি পালিয়ে যাই?—যোগ করে দিলাম আমি।

কিন্তু পরিতোষের আস্ফালন বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। প্রথমতঃ হাজতে স্তূপীকৃত খাতাপত্র, তারপর সমবেত ভদ্রলোকের অনুরোধ, তাই শেষ পর্য্যন্ত আমরা নিজেদের বিছানাতেই সেই রাতটি কাটাবার হুকুম পেলাম। তবে বিশ্বেশ্বরবাবু যে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, তাই জন দশবারো চৌকিদার ও সেই সঙ্গে রবিসহ জনচারেক কনেষ্টবল সারা রাত আমাদের পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন হলো। মাঝে দুবার এসে পরিতোষ আবার দেখে গেলেন প্রহরীগুলো কুম্ভকর্ণ বনে গেছে কিনা এবং শিকার দুটি খোলাদ্বার খাঁচায় দুশ্চিন্তায় ছট্‌ফট করছে কিনা!……

পরদিন সকালবেলায় রঘুপদর দোকানের ফুলকো লুচি, আলুর দম এবং সত্যসত্যই মাংসের কোর্ম্মা দিয়ে ভুরিভোজন করবার পর শোভাযাত্রা করে রওনা হলাম আমরা গরুর গাড়ীতে চব্বিশ মাইল দূরে ঠাকুরগাঁ মহকুমা শহরের উদ্দেশ্যে।

প্রথম গাড়ীতে আমাদের মালপত্র আর একজন সিপাই, দ্বিতীয় গাড়ীতে বিশ্বেশ্বর বাবু ও আমি, তৃতীয়টিতে আর একজন সিপাই ও জমাদার কামাখ্যাবাবু। তুচারজন ভদ্রলোক এলেন যেন সি-অফ্ করতে। যেন আমরা চলেছি সদলবলে ওয়ালটেয়ারে বা মুসৌরীতে কিংবা হনলুলুতে মধুচন্দ্র যাপন করবার জন্য !······

আমাদের মধুচন্দ্র আইনতুরন্ত পরিতোষকে কী ভাবে অৰ্দ্ধচন্দ্র দিয়েছিল, সেই কাহিনীই বলছি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে।

সন্ধ্যার পর এসে পৌঁছলাম ঠাকুরগাঁয়ে। কোতোয়ালীতে গিয়ে উঠলাম শোভাযাত্রা করে। অফিসার ইন চার্জ্জ বাসায় ছিলেন, সংবাদ পাঠানো হলো।

কিন্তু কাগজপত্র উলটে-পালটে দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রতীশবাবু: এস পি-র অর্ডারটা কোথায়?

আমতা আমতা করলেন কামাখ্যাবাবু: দারোগাবাবু বলেছেন যে, এতে আর এস পি-র হুকুম দরকার হয় না—

না, অফিসিয়েটিং দারোগার হুকুম হলেই চলবে।—ক্ষেপে গেলেন রতীশবাবু: এস পি-র হুকুম ছাড়া ওর বাবাও যে ডেটিনিউদের এ্যারেষ্ট করতে পারে না, সে সংবাদ কি তিনি রাখেন? আপনিও তো এতকালের চাকুরে, আপনি বলে দিতে পারেননি দারোগাকে?

কামাখ্যাবাবু বললেন: জমাদারের কথা শুনবেন কেন দারোগাবাবু? আমরা সব সেকেলে লোক—

বেশ, ভালোই করেছেন। এবার ঠ্যালা সামলাবেন।—বললেন রতীশবাবু: এস পি-র হুকুম ছাড়া ডেটিনিউদের আমি ভার নিতে পারবো না। থানার হাজতে আমি ওঁদের রাখতে পারবো না। ওঁরা থাকবেন সম্পূর্ণ আপনার দায়িত্বে কাল কোর্টে যাওয়া পর্য্যন্ত। তারপর এস ডি ও যা বলেন, তাই হবে।

কামাখ্যার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বললেন: বলেন কি স্যার? ওঁদের ভার আমি নোবো কি করে? ওঁরা খাবেন কি আজ রাত্রে? আমার ওপর দারোগাবাবুর হুকুম ছিল শুধু আপনার হেপাজতে পৌঁছে দেওয়া—

তা তো এনেছেন—জবাব দিলেন রতীশবাবু: কিন্তু আপনার দারোগার হুকুম আমার ওপর চলে না। তাই আমি ওঁদের হেফাজতে নিলাম না, বুঝলেন? আর ওঁদের কাল কোর্টে যাবার আগে পর্য্যন্ত থাবার-দাবার সমস্ত ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে, বুঝলেন?

বুঝতে সবাই পারছিলেন জমাদার এবং আমরাও অবস্থাটা বুঝে বেশ কৌতুক অনুভব করছিলাম। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।......

প্রাণ বাঁচাবার জন্যই কামাখ্যা এসে আমাদের হাতে ধরে পড়লেন ও পরামর্শ ভিক্ষা করলেন। পরিতোষের ওপর আমাদের শত ক্রোধ থাকলেও কামাখ্যা

মুখুজ্জের সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি। পরিতোষিণী মারফৎ আমার নামে যেসব কুৎসা খানসামা গ্রামে রটেছে, তাতে জমাদার-গৃহিণীর কোনো উৎসাহ ছিল না। তাই সুপরামর্শ ই দিলাম আমরা এবং দোকানের পরোটা আর তরকারি খেয়ে শান্ত ও সুবোধ বালকের মতোই কোতোয়ালীর বারান্দায় বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন কোর্টের পুলিশ অফিসে আমাদের নিয়ে যেতেই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন কোর্ট ইন্‌সপেক্টার: অ্যাঃ! এস পি-র অর্ডার নেই। মামলা করবো কি আমি পরিতোষের হুকুমে?

আবার মিনমিন করতে চেষ্টা করলেন কামাখ্যা জমাদার: কি করবো স্যার, দারোগাবাবু বলে দিলেন, রাজবন্দীরা আইন ভঙ্গ করলে তিনিই নাকি গ্রেপ্তার করতে পারেন—

আইন!—কড়া প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ ইন্‌সপেক্টার: আইন তো বি সি এল এ্যাক্ট। সেই আইনের কয়েকটি ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্ণমেণ্ট রাজবন্দীর ওপর যেসব হুকুমজারী করেছেন, দারোগার কাজ হচ্ছে শুধু দেখা যে, রাজবন্দী সেগুলো যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা। যদি না করেন, তাহলে সে শুধু এস পি-কে জানাবে সেই ঘটনা এবং এস পি যদি বলেন এ্যারেষ্ট করে মামলা করতে, তাহলে দারোগা সেই হুকুমমত কাজ করে যাবে। কেন, আপনি জানেন না এসব?

জানি স্যার, কিন্তু আমি জমাদার, আমার কথা দারোগাবাবু—

দারোগাবাবু!—গর্জ্জন করে উঠলেন ইন্‌সপেক্টার: এবার যেন সামলায় ঠ্যালা আপনার দারোগাবাবু।

তারপর আমাদের জিজ্ঞেস করলেন: আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে? রাত্রে কোনো কষ্ট হয়নি তো?

দেখলাম কামাখ্যা জমাদার অত্যন্ত সকরুণভাবে আমাদের দিকে যেভাবে তাকিয়ে রয়েছেন, তার অর্থ হচ্ছে: আমার গর্দ্দানটা দয়া করে এইবারটি বাঁচিয়ে দিন। তাই দয়া করে আমরা তার গর্দ্দানটা বাঁচিয়েই দিলাম তখনকার মতো। বললাম: না, আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধে হয়নি।

তারপর আমাদের যেতে হলো আদালতে। আমীমুল্লা বসে আছেন গম্ভীর মুখে।

ইন্‌সপেক্টারের বক্তব্য শুনে এস পি-র অর্ডার পত্রখানা চাইলেন আমীমুল্লা। প্রত্যুত্তরে ইন্‌সপেক্টার আর একবার পরিতোষ দারোগার শ্রাদ্ধ করলেন। এদিকে

আমরা যে এসে গেছি আমাদের লট-বহর নিয়ে! তাই উপায় না দেখে এস-ডি-ও বললেন : ডি এম-কে (ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে) সংবাদ জানাতে একজন স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার পাঠিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন : কিন্তু থাকবেন কোথায়? জেলে ডেটিনিউদের থাকবার পৃথক ব্যবস্থা কোথায়? আর এঁদের খাবার ব্যবস্থাই বা কি করে হবে?

ইন্‌সপেক্টার নিবেদন করলেন : আমার ঠাকুরটাকে না হয় কদিন দিয়ে দেবো ওঁদের রান্না করে দিয়ে আসবার জন্য। কিন্তু ওঁরা থাকবেন কোথায়? ফিমেল ওয়ার্ডে যে দুটো মেয়ে-আসামী আছে। ও দুটো না থাকলে বরং—

আমীনুল্লা জিজ্ঞেস করলেন : কি কেস্ ওদের?

দুটোই হোটেল থেকে খাবার চুরির মামলা—

ওদের জামিন দিয়ে দিচ্ছি। ঐ ফিমেল ওয়ার্ডে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিন।

হুকুম মতো কাজ হলো। সাব জেলের ফিমেল ওয়ার্ডে এসে আমরা দুজন প্রাণভরে হাসতে লাগলাম। বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন : দাঁড়ান না, ক্লাইমেক্সটা এখনো বাকি আছে। পরিতোষের দুর্দ্দশাটা একবার দেখুন না কি হয়!

বিকেলের দিকে রোজকার মতো জেল পরিদর্শনে এসে আমীনুল্লা সোজা আমাদের ওয়ার্ডে চলে এলেন, আমাদের খাবার ও থাকবার ব্যবস্থার তদারক করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি, আপনারা থানায় হাজিরা দিলেন না কেন?

সুযোগ পাওয়া গেল। বিশ্বেশ্বরবাবু অগ্রণী হয়ে পরিতোষের কীর্ত্তিকলাপ সব বললেন বিস্তৃতভাবে। শেষ দিকে মন্তব্য করলেন : এই ভদ্রলোকের প্রস্তাবিত বিয়ে নিয়ে ওখানকার আবহাওয়া এমনি করে তুলেছেন দারোগাবাবু যে, চাটার্জ্জী পরিবারের মানমর্য্যাদা যাবার জোগাড় হয়ে উঠেছে। নিরপরাধের এমনি অবমাননা আমাদের উপস্থিতিতে বাড়তে পারে বলেই আমরা সরকারী আদেশ অমান্য করেছি জেল খেটে অন্যত্র বদলি হবার উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন করলেন আমীনুল্লা : কিন্তু বিয়ের কথা নিয়ে গোলমাল কেন হবে?

পরিতোষ দারোগাই এর জবাব দিতে পারে।—বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু।

All right, the Officer-in-charge will have to suffer the consequence!—বলে চলে গেলেন এস-ডি-ও।

দিন সাতেক পর একদিন এসে জানালেন আমীনুল্লা : ডি এম-এর চিঠি এসে

গেছে। গভর্ণমেন্ট মামলা করবেন না and you will have to go back to Khansama again, আর আপনাদের অন্যত্র বদলি করার প্রস্তাবও তিনি গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললাম: কিন্তু আমরা যে আর খানসামায় ফিরে যেতে চাইনে।

আমীহুল্লা বললেন: গভর্ণমেন্টের পরবর্ত্তী আদেশ না আসা পর্য্যন্ত দেখছি আপনাদের ওখানেই থাকতে হবে। কিন্তু বিয়েটা আপনি করে ফেলুন না, তাহলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যায়।

জবাব দিলাম: বিয়ে করবো ঠিকই, তবে ছাড়া পাবার পরে। নিন্দার ভয়ে বিয়েটা এখুনি করবো কেন?

That's upto you, gentleman—বলে চলে গেলেন আমীহুল্লা।

সেদিনই রাত্রে আহারের পর আবার রওনা হলো আমাদের কনভয়—এবার তিনখানা গরুর গাড়ীতে আমাদের যাবতীয় মালপত্র আর দুজন সিপাই এবং চতুর্থ খানায় আমরা দুজন। খানসামা থানার কম্পাউণ্ডে এসে প্রবেশ করলাম যখন, তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে।

পরিতোষ বাড়ী থেকে একেবারে ছুটে এসে কলরব করে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন: আসুন, আসুন। দরওয়াজা, দুখানা চেয়ার দাও।—ইস্, দ্বিজেনবাবুর চেহারাটা তো বড্ড খারাপ দেখছি। অসুখ হয়েছিল বুঝি?

আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: কেমন স্যার, এস পি-র হুকুম ছাড়াই বলে আপনি আমাদের চালান দিতে পারেন? আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনি নাকি খুব সচেতন? এবার কী হলো?

মহাদুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন পরিতোষ: আর কি হলো। আপনারা চলে যাবার পরদিনই বাণেশ্বর এসে হাজির আপনাদের জন্য কতকগুলো বাসন-কোসন, হারিকেন ইত্যাদি নিয়ে। আপনাদের না দেখেই তো তেলেবেগুনে চটে গেলেন। বললেন, কার কথায় তুমি ওঁদের চালান দিলে? এতগুলো টাকা যে বৃথা ব্যয় হলো, তার জন্য দায়ী হবে কে? স্পষ্ট বলে গেলেন, সমস্ত ব্যয় আমার মাইনে থেকে instalment-এ কেটে নেওয়া হবে। কীই-বা পাই—

বিশ্বেশ্বরবাবু হেসে উঠলেন। পরিতোষ বলতে লাগলেন: আরে মশায়, আমার ঘোড়াটা আবার কাল মরে গেছে। কী কুক্ষণেই যে আপনাদের পাঠিয়েছিলাম! কতগুলো টাকা দণ্ড গেল।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে রঘুর দোকানে খেতে যাবার কথা বলতেই পরিতোষ

বাধা দিয়ে বললেন: না, না, তা কি হয়?—সে হবে না। আমি রান্না করিয়ে রেখেছি আমার বাড়ীতে। শালী নয়, গিন্নি আজ স্বয়ং রান্না করেছেন। দুটো ডাল-ভাত এ বেলাটা আমার ওখানেই—তারপর আমি আপনাদের পুরোণো চাকর বাচ্চাকে খবর পাঠাচ্ছি।—

বিজয়ীর উল্লাস নিয়ে ফিরে এসেছি আবার খানসামায়। নিন্দুকদের গালে ফিরিয়ে দিয়েছি চপেটাঘাত দ্বিগুণ জোরে। আঙ্গুলগুলো গালে ফুটে উঠলো বুঝি!··· ফিরেই যখন এলাম, তখন আর কালহরণের প্রয়োজন কি? গোপন যোগাযোগ-গুলো আবার স্থাপিত হলো, বাড়ীর পেছন দিককার বেড়া আবার সাবধানে খুলে সন্তর্পণে স্থরু হলো আমার নৈশ অভিযান এবং বিলুর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হলো, একদিন রাত্রে চলে যাবো ছ' মাইল দূরে বীরগঞ্জে, বীরগঞ্জ থানায় অন্তরীণ রাজবন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আসবো।

এই দুঃসাহসিক কার্য্যে যাঁর সক্রিয় সাহায্য পেয়েছিলাম একেবারে দলীয় সহকর্ম্মির মতো সরকারী চাকুরে হয়েও সে যুগে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে যিনি সেই নৈশকালীন অভিযানে আমার মতো মারাত্মক রাজবন্দীকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়েছিলেন নিবিড় সহানুভূতি, তিনি হচ্ছেন বীরগঞ্জের স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যবাবুর নাম বলতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধায় উল্লেখ করতে হয় তাঁর স্ত্রী রাণীবৌদির কথা। আরো দশটা পরিবারের মতোই ছেলেমেয়ে পরিবৃত মধ্যবিত্ত সংসার। এর আগে মাত্র দুএকবার খানসামায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে সত্যবাবুর। কোনো আত্মীয়তা নেই আমার সঙ্গে। কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরে বিপ্লবীর প্রতি স্নেহ ও মমতায় তাঁরা ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য!

অচেনাকে কি করে পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হয়, পরিচিতকে কি করে তুলতে হয় অন্তরঙ্গ বন্ধু, অমলিন প্রীতি ও নীরবকুণ্ঠ সৌহার্দ্দ্যে কি করে বন্ধুকে করে তুলতে হয় আত্মীয়াধিক আপন, এর আর্ট কোনো শ্রম স্বীকার করে শিখতে হয়নি সত্যবাবুকে আর রাণীবৌদিকে। স্বতঃস্ফূর্ত নায়েগ্রার মতো স্বামী-স্ত্রীর মায়াপ্রবণ অন্তর থেকে অফুরন্তভাবে উৎসারিত হয়ে পড়তো বিপ্লবীর প্রতি নিরবচ্ছিন্ন দরদ!······

রাণীবৌদির মতো আত্মত্যাগিনী মহিয়সী নারী ও লক্ষ্মীস্বরূপিনী গৃহিণী আজো কোথাও দেখিনি আমি, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তা স্বীকার করি। তাঁর সেই

ঘর-ফাটানো উচ্চ হাসির রেশ আজো যেন আমার কানে লেগে রয়েছে স্রোতস্বিনীর কলধ্বনির মতো।......

আত্রাই নদী তখন শীর্ণকায়া। হেঁটেই পার হয়ে বিলু ও আমি যখন বীরগঞ্জের রাস্তায় পড়লাম, রাত তখন একটা বেজে গেছে। আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই জানালার কাছে গিয়ে সাংকেতিক শব্দ করতেই সত্যবাবু দরজা খুলে দিলেন। রাণী-বৌদির সঙ্গে নিবিড় করে পরিচয় করিয়ে দিলেন। যেমনি রাজরাণীর মতো চেহারা, তেমনি মিষ্টভাষিণী। সত্যবাবু সতর্ক করে দিলেন, তিনি যেন না হাসেন।

কারণ ?—জিজ্ঞেস করলাম।

সত্যবাবু জবাব দিলেন : কারণ ওঁর হাসি ইন্‌সপেক্টার আজিজুর রহমান পর্য্যন্ত শুনতে পান।

হাসতে গিয়ে নিজেই মুখে হাত চাপা দিলেন রাণী'বৌদি।

কিন্তু সংবাদ যা পাওয়া গেল সত্যবাবুর কাছে, তা খুব আশাপ্রদ নয়। ঐদিনই সন্ধ্যার পর এসেছে এক ডাকাতি ও নরহত্যার সংবাদ। ইন্‌সপেক্টার আজিজুর রহমান বড় দারোগাসহ গেছেন সেখানে। একজন ডাকাতকে নাকি ধরে রেখেছে গ্রামবাসীরা, আর-একজনকে নাকি চিনতে পারা গেছে। সুতরাং থানায় খুব সোরগোল। সিপাইরা সবাই আসামীদের প্রতীক্ষা করছে। দরওয়াজা আর টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে নাক ডাকাবার অবসর পায়নি। টেবিলে বসে এল সি খাতাপত্তর লিখছেন। ডেটিনিউবাবুদের বাড়ীর পেছনেই প্রধান রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়েই আসবেন ইন্‌সপেক্টার আর আসামী। তবুও একবার গিয়েছিলেন সত্যবাবু বেড়াবার অছিলায়। কিন্তু আবহাওয়া খুব অনুকূল মনে হয়নি তাঁর।

কাজেকাজেই নিঃশব্দে ও নিশ্চিন্তে ডেটিনিউবাবুদের কোয়ার্টারে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ফিরেই যেতে হবে খানসামায় ব্যর্থকাম হয়ে।

কথায় কথায় প্রায় তিনটে হয়ে গেল। তাই আর কালবিলম্ব না করে উঠে পড়লাম।

রাণীবৌদি ছাড়লেন না, চা ও দুখানা বিস্কুট খেতে হলো। বিদায় নেবার সময় খোলা দরজায় অন্ধকারে এসে দাঁড়ালেন।

বললাম : চলি রাণীবৌদি।

অকস্মাৎ তাঁর কণ্ঠে ভয়ের আভাস পেলাম : আপনি চলে এসেছেন এতদূর, এর মধ্যে দারোগা যদি আপনার খোঁজে আপনাদের কোয়ার্টারে গিয়ে থাকেন ?

হেসে বললাম : ধরা পড়ে যাবো এবং এবার পরিতোষ গতবারের অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে।

বিলুর পশ্চাতে এগিয়ে চললাম। আবার শোনা গেল রাণীবৌদির কণ্ঠ : আর একদিন তো আর আসতেও বলতে পারিনে। তার চাইতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলুন, গভর্ণমেণ্ট ছেড়ে দেবে আর এখানে আসতে পারবেন দিনের বেলাতেই খুকুকে নিয়ে জামাইয়ের মতো।

দেখা যাক্।—বলে দ্রুত রওনা হলাম।

তবু আর একবার বাধা পেলাম। রাণীবৌদি বললেন : আকাশে খুব মেঘ দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি যদি হয়?

তাহলে ভিজতে হবে। কিন্তু তবুও আপনার এখানে ঘুমোবার উপায় নেই রাণীবৌদি।

তারপর এগিয়ে চললাম আর কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করে। আমি জানি, যদি পেছন ফিরে চাইতাম আর সেই নিবিড় অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যেত, তাহলে মুগ্ধ হয়ে দেখতে পারতাম বাংলার বিপ্লবীদের রোরুদ্যমানা মায়েদের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি, অপরিসীম ব্যথা ও বেদনার একটি সজল প্রতিচ্ছবি!……

মিথ্যে বলেননি রাণীবৌদি। একটু পরই মুষলধারে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল। হাতে আমার বড় টর্চ্চ ছিল, নিবিড় অন্ধকারে প্রবল বর্ষণের মধ্যে তার আলো মনে হতে লাগলো জোনাকির চকমকি। একটু পরে বৃষ্টির জল ঢুকে তাও গেল নিভে। অথচ দেরী করবার উপায় নেই। রাস্তায়ই ভোর হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবো। তাই সেই আকাশ-ভাঙ্গা বর্ষণের মধ্যেই যত দ্রুত সম্ভব পা চালাতে লাগলাম।

সদর পথে আত্রাই নদী পার হবার ঝুঁকি নেওয়া সঙ্গত নয় বলে বিলু অন্য জায়গায় নিয়ে এল। সেখানে নদীতে গলা জল!…এপারে খানসামায় এসে যখন উঠলাম, পূবের আকাশ তখন ধূসর হয়ে উঠেছে!

ওদিকে আমরা আবার বিজয়গর্ব্বে খানসামায় ফিরে আসবার পর থেকেই পদাহত ফণীর মতো নিন্দুকের দল ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠলো। সাধুর কারখানা থেকে খানসামা বন্দরে বেরিয়ে আসতে লাগলো নিত্য নতুন রকমের নিন্দাবাদ ফোর্ড মোটরের মতো। অবস্থা এমনি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো যে, মনে হলো যে কোনো মুহূর্ত্তে একটা দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। পাহুয়া পাড়ার গাজী একদিন রাস্তায় ধরে শাসিয়েই দিল চিত্তবাবুকে। কিসের জন্য তার এই ক্রোধ, চিত্তবাবুর

এই সঙ্গত প্রশ্নের জবাবে পরিষ্কার বললো সে : স্বদেশী না চোর। ক্যামন করি হোই চোরের সাথ বহিনের বিয়া দেও, দেখি নিম্ হামরা !

যেন কত বড় একটা দুর্নীতির কাজ হতে চলেছে ওদের সমাজে, তাই সমাজ-হিতৈষীরা রুখে দাঁড়িয়েছেন শান্তি ও সুনীতির ধ্বজা উঁচু করে। অথচ ঐ ধুরন্ধর সমাজসেবীদের কজন করে সেবাদাসী আছে, সে সত্য আমাদের অজানা ছিল না। কিন্তু কুকুরের চীৎকারকে আমরা গ্রাহ্যই করা প্রয়োজন মনে করলাম না। তাও আবার ঘিয়ে-ভাজা কুকুর !......

কিন্তু ঠিক এমনি সময় কলকাতা থেকে এল মারাত্মক একটি সংবাদ ! মেজদার জরুরী তার পেলাম, Mother's Cholera. Start immediately !......কিন্তু বন্দীর তো স্বাধীনতা নেই। কেমন করে immediately রওনা হবো ? আমার টেলীগ্রাম প্রথমতঃ দেখবে পরিতোষ, তারপর দিনাজপুরে বাণেশ্বর, সেখান থেকে যাবে কলকাতায় আই বি অফিসে, তারপর হবে তদন্ত এবং সেই তদন্তের ওপর ভিত্তি করে যে হুকুম উচ্চারিত হবে, সেই হুকুম এমনি ঘুর-পথেই ফিরে যখন আমার হাতে এসে পৌছবে, হয়তো তখন শ্রাদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমায় ।......তথাপি জরুরী তার পাঠালাম দিনাজপুরে ও কলকাতায়।

স্বগৃহে অন্তরীণ থাকবার সময় হারিয়েছি বাবাকে, এবার গ্রামে অন্তরীণ থাকতে-থাকতেই কে জানে হয়তো মাকেও হারাতে হবে। ইতিমধ্যে দাদারা সব পৃথক হয়ে গেছেন। একদিন মুক্তি আমি পাবোই। কিন্তু মুক্তি পাবার পর কোথায় যাবো, কার বাড়ীতে মাথা গোঁজবার ঠাঁই মিলবে ?......এমনি অনেকগুলো প্রশ্ন মনের আকাশে চিন্তার মেঘ পুঞ্জীভূত করে তুললো।

দিন চারেক পর আবার এল মেজদার চরম টেলীগ্রাম : Mother expired yesterday. Need not come if not already started......না, যাত্রা তো করিনি আমি। আজো যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি সরকারী হুকুমনামার। নির্দ্দয় নৃশংস বৃটিশ শাসনের কলঙ্কময় ইতিহাসে মানবীয় দুর্ব্বলতার দুর্ঘটনা কোথাও নেই। ইস্পাতে তৈরী তার কাঠামো, টাটা স্ক্রবের বাঁধুনি ! অশ্রুজলের উত্তাল তরঙ্গ তাতে ঘা খেয়ে কিছু জলকণা শূন্যে বিকিরণ করে মাত্র, ইস্পাত তাতে ক্ষয়ে যায় না কখনো !......মানুষের অপেক্ষা আইনই তাদের চক্ষে বড়। আইনের দাড়ি, কমা, সেমিকোলনের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে তারা মানুষকে বলী দেয় হুকুমের যূপকাষ্ঠে নিরুপায় ছাগ-শিশুর মতো !

শান্ত চিত্তেই শ্রাদ্ধ করলাম এবং স্বয়ং তারকবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার

পুরোহিতের কাজ করে দিলেন। অনেকেই এসে জানিয়ে গেলেন সহানুভূতি এবং এই প্রথম মেয়েরা তাঁদের মা ও মাসী প্রভৃতি অভিভাবিকাদের সঙ্গে করে একেবারে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় [illegible] বাসায় এসে আমায় সান্ত্বনা জানিয়ে গেলেন। পরিতোষকে গ্রাহ্য করলেন না তাঁরা।

কী যে হারালাম, তা শুধু আমিই জানি এবং মর্ম্ম দিয়ে জানি যে, পরোক্ষভাবে হলেও বাবা ও মায়ের মৃত্যুর অন্যতম কারণ আমিও বটে! অবাধ্য হয়েছি চিরকাল, কোনোদিন কোনো ব্যক্তিগত অনুরোধ রেখেছি বলে মনে পড়ে না, বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে পা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে তুলেছি তাঁদের চিন্তা ও দুর্ভাবনা, কেড়ে নিয়েছি তাঁদের বিশ্রাম, তাঁদের চোখের নিদ্রা! আমারই দৌরাত্ম্যে ঘুমুতে না পেরেই বুঝি তাঁরা অবশেষে ঘুমের দেশে চলে গেলেন আমায় চিরদিনের জন্য জাগিয়ে রেখে।......

আজও, এতকাল পরেও, মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে অকস্মাৎ মনে হয় কে যেন খাটের পাশে দাঁড়িয়ে অতন্দ্রনয়নে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে, কে যেন বসে আছেন শিয়রে চিরকালের সতর্ক প্রহরিণীর মতো, কার স্নেহসিঞ্চিত কোমল কর-পরশ আমার দুর্ভাবনায় উত্তপ্ত ললাটে বুলিয়ে দিচ্ছে সান্ত্বনার তুহিন-শীতল পেলবতা। মনে হয় আমার দীর্ঘ জীবনের বন্ধুর চলার পথের পাশে পাশে আজো দেখতে পাই তাঁদেরই অদৃশ্য নিশানা, সম্মুখে নেমে-আসা জমাট অন্ধকারময় নিরাশার আকাশে আজো ধ্রুবতারার মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে তাঁদেরই অমর্ত্ত্যলোকের আশার প্রদীপ, মনে হয় আজো জীবন-সংগ্রামে পর্য্যুদস্ত সৈনিকের মতো রক্তাক্ত কলেবরে যখন ভূমি-শয্যা গ্রহণ করি, দূরাগত সাগরগর্জ্জনের মতো কানে ভেসে আসে তাঁদেরই বজ্রকণ্ঠ : ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থঃ!

ঘুমের দেশে চলে গেলেও আজও বুঝি তাঁদের চোখে নেই মুহূর্ত্তের নিদ্রা, তিলেকের বিশ্রাম! ঘরছাড়া দুরন্ত ছেলের জন্য বুঝি তাঁদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সীমা-পরিসীমা নেই!......

তেষট্টি

মাসখানেক পর একদিন সকালবেলা কুঞ্জলাল আগরওয়ালার ওখানে এসেছি ধুতি কিনতে, দেখি প্রমোদবাবু সেখানে বসে আছেন। কুঞ্জলাল বয়সে বড় হলেও চাটার্জ্জী ব্রাদার্সের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও পরম হিতৈষী। আর মাড়োয়ারী হলেও কুঞ্জলাল চালচলনে একেবারে বাঙ্গালী বন্ গিয়া বলা যায়।

হাসিপরিহাস অনেক হলো এবং পরে শ্রান্ত হয়ে কুঞ্জলাল হুকুম করলো: প্রমোদ, রসগোল্লা খাওয়াও। আমি দেখে এসেছি রঘু সবে এই একটু আগে গোল্লাগুলো রসে ছেড়েছে। গরম গরম রসগোল্লা ভারী উপাদেয়!

তৎক্ষণাৎ সায় দিলাম: আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

প্রমোদবাবু বললেন: তুমি মাড়োয়ারী, টাকার কুমীর। কথায় কথায় রসগোল্লা খাও, ছানা দিয়ে দাঁত মাজো। তোমার সঙ্গে কার তুলনা? আর আমরা হচ্ছি চুয়ান্ন টাকার হেডমাষ্টার। তাও লিখি চুয়ান্ন, পাই বত্রিশ টাকা আট আনা। রসগোল্লা খাওয়ানো কি আমাদের সাজে?

বেশ, তাহলে দ্বিজেনবাবু খাওয়ান। —বলে কুঞ্জলাল আমার পানে চাইলো।

বিপদে পড়ে বললাম: উনি পান সাড়ে বত্রিশ ভাজা আর আমি পাই তারও কম, ত্রিশ টাকা। রস আমাদের থাকবে কোত্থেকে?

বেশ, তাহলে আমিই আনছি।—বলে হাঁক দিল কুঞ্জলাল পুত্রের উদ্দেশ্যে: ভানিয়া, ভানিয়া, যা তো রঘুর দোকানে, গরম গরম রসগোল্লা নিয়ে আয় তো সেরখানেক। কিন্তু প্রমোদ, ঐ হাতেই খেতে হবে তোমায়।

প্রশ্ন করলাম: কেন, কোন্ হাতে আবার খাবেন?

প্রমোদবাবু বলে উঠলেন: হ্যাঁ, এই হাতে খাই আর যক্ষ্মা হয়ে মরি আর কি!

বিস্মিত হলাম: মানে?

মানে অতি সহজ। এই মাত্র এলাম সোনাহার থেকে। যে নেপালী দরওয়ানটা আমার সাইকেলখানা বার করে দিল, অনেকদিন থেকেই ব্যাটা খাঁশী রোগে ভুগছে। ওদের খাঁশী মানে আমাদের যক্ষ্মা। ব্যাটা হ্যাণ্ডেলের যেখানটায় ধরে বার করলো, আমিও সেখানটাতে ধরেই চালিয়ে এলাম। বলা তো যায় না ব্যাটার খাঁশীর germ—

বিস্ময় বেড়ে গেল: অ্যাঁ, বলেন কি?

এবারে বললো কুঞ্জলাল : ও—জানেন না বুঝি ? প্রমোদ কোনো রেষ্টুরেণ্টে খায় না, রসগোল্লা ভালো করে ধুয়ে খায়, কারুর সিগারেট থেকে নিজের সিগারেট ধরায় না, ট্রেণে পাশে বসে কেউ একবার কাসলেই প্রমোদ বাড়ী এসে জামাকাপড় ধুয়ে চান করে ফেলে, আর—বলে হেসে উঠলো কুঞ্জলাল।

আমার বিস্ময়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে : আরও আছে নাকি ?

কুঞ্জলাল বললো : হ্যাঁ, আরও আছে। বৌ-এর পাশে শুয়ে ও মশারীর বাইরে মুখ রেখে দেয় সারাটি রাত আর মশারা মজাসে ফলার চালায়।

বিশ্বাস হলোনা। বললাম : যান, চাল মারবেন না।

চাল ?—বেশ, প্রমোদকেই জিজ্ঞেস করুন না।

তা রাখিই তো।—গর্ব্বভরে বললেন প্রমোদবাবু : প্রশ্বাসগুলো হচ্ছে স্রেফ নাইট্রোজেন, স্বাস্থ্যের পক্ষে যা অনুকূল নয়। দুজনের নাকের নাইট্রোজেন মশারীর মধ্যে জমতে থাকে সারাটি রাত। সারা রাত তাই টেনে টেনে স্বাস্থ্যটা নষ্ট করি আর কি! তার চাইতে দুচারটে মশার কামড়—

অনেক মিঠে।—বললো কুঞ্জলাল : ঐ যে কথায় বলে না, সাত বছর মাষ্টারী করবার পর মাষ্টারদের প্রয়োজন হয় ধোপাদের কাজে—

হাসাহাসি পড়ে গেল। এমন সময় ভানিয়ার হাতে এল গরম গরম রসগোল্লা। প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হলো। প্রমোদবাবু ভালো করে ডান হাতের কনুই পর্য্যন্ত বার বার ধুয়ে এবং মুখে জল দিয়ে বারকয়েক গার্গল করবার পর একখানা প্লেট তুলে নিলেন সাবধানে। পরমানন্দে রসগোল্লা দিয়ে ছোটাহাজরী শেষ করে বেঁরিয়ে যাবো, এমন সময় এল হাড়ীপাড়ার অন্যতম সর্দ্দার মংলা হাড়ী। জেল-সিপাইদের মতো একখানা কাঠের রোলার হাতে। সে এসে হেসে হেসে কুঞ্জলালের সঙ্গে লুঙ্গির দর নিয়ে আলোচনা স্বরু করলো, আমি বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম একবার ডাক্তার অমর গুপ্তের ওখানে যাই কারমিনেটিভ মিকশ্চার আনতে।

পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ীর গলি পার হয়ে রঘুপদর দোকান ডাইনে রেখে যেই ভবেন সান্ন্যালের বাড়ীর দিকে মাত্র দু পা বাড়িয়েছি, অমনি বন্দরে অকস্মাৎ ভারী হল্লা শোনা গেল। সন্দেহমনে ফিরে দাঁড়ালাম। মংলার হাতে কাঠের রোলারটা তখন ভালো লাগেনি।......

অকস্মাৎ দেখলাম গলির মুখে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন প্রমোদবাবু। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখলাম তাঁর কপালে রক্ত আর সেই রক্তের ধারা নেমেছে সাদা পাঞ্জাবি

বেয়ে। নিশ্চয়ই মংলা তার রোলার চালিয়েছে। কি করবো, কি করা উচিত, ভাবছিলাম এক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে, এরই মধ্যে দেখি পান্নুয়া পাড়ার দিক থেকে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছেন চিত্তবাবু, তাঁরও কপালে আঘাতের চিহ্ন! প্রমোদবাবুর পশ্চাতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে করতে চীৎকার করে বলে গেলেন: শীগগির থানায় চলে যান দ্বিজেনবাবু, পান্নুয়ারা নইলে আপনাকেও রেহাই দেবে না।

দেখলাম, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একদিক থেকে মংলা হাড়ীর নেতৃত্বে একদল হাড়ী আর অপর দিক থেকে একদল যুবক পান্নুয়া লাঠিসোটা নিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে এসে চাটার্জ্জী বাড়ীর বন্ধ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চাটার্জ্জী পরিবারের উদ্দেশ্যে বর্ষণ করতে লাগলো অশ্রাব্য গালিগালাজ আর শূন্যে আস্ফালন করতে লাগলো হাতের বিভিন্ন আকারের লাঠি ও মুগুর!

একটি মিনিট! তারপরই আমার শিরায় শিরায় টগবগ করে ফুটে উঠলো বেপরোয়া তাজা রক্ত, মাংসপেশীর মধ্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো হারকিউলেসের মত্ত শক্তি, বিনয়ী ও নম্র দ্বিজেন গাঙ্গুলীর মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এক হিংস্র তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা জানোয়ার!···তাহলে বারুদখানায় এবার কাঠি পড়েছে, বিস্ফোরণ তাহলে সুরু হলো, রক্তহোলীর মাহেন্দ্রক্ষণ তাহলে সমাগত! কী হবে তাহলে আর লোক-দেখানো ভদ্রতার আবরণে? কেন তাহলে আর সঙ্কোচ? বে-আব্রুর মতো এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই তো হয় পলাশীর আম্রকুঞ্জে!

অনেক সয়েছি কিন্তু আর নয়।

রঘুপদর দোকানের মধ্য দিয়ে সোজা এসে প্রবেশ করলাম বিলুদের বাড়ীর মধ্যে। বিরোধী দলের অপূর্ব্ব সান্ন্যাল তখন চা খাচ্ছিলেন দোকানে, ভ্রূক্ষেপ করলাম না তাঁকে। পড়ে রইলো পুলিশ সুপারের আদেশ, ছিঁড়ে ফেলে দিলাম সর্ব্ব গোপনতার আবরণ! প্রমোদবাবুর মা ছেলের ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছিলেন আর কাঁদছিলেন করুণ সুরে আর চিত্তবাবুর কপালে জলপটি লাগাচ্ছিল নিরুপমা। চিরগম্ভীর তারকবাবু উঠোনে একখানা জলচৌকিতে নীরবে বসে আছেন একেবারে পাথর হয়ে। ছুটোছুটি করছে ছোট ছেলেমেয়েরা। সারা বাড়ীতে প্রত্যাসন্ন মহাবিপদের কালো ছায়া পড়েছে! ভালো-মার মন্তব্য কানে এল: তুমি কেন বাবা এই বিপদের মধ্যে এলে?

জবাব দিলাম না এই প্রশ্নের। কেন এলাম, তাই এবার ভালো করে টের পাইয়ে দিচ্ছি ঐ হাড়ীদের আর পান্নুয়াদের। বিলুকে ইসারা করতেই সে ঘর থেকে একখানা প্রকাণ্ড রামদা এনে আমার হাতে তুলে দিল আর

নিজেও তুলে নিল একখানা লোহার রড্। তারপর সোজা এগিয়ে এলাম ত্রুজন বৈঠকখানার দিকে।

চেগারের বড় গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে জনতা হল্লা করছে আর মাঝে মাঝে ঐ দরজার ওপর লাঠির আঘাত করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে।

বললাম বিলুকে : আমি এই গেটের সামনে অপেক্ষা করছি। দরজা ভেঙ্গে ওরা ঢুকে পড়লে আমার মনে হয় না একটি প্রাণীও বাড়ীর অন্দর পর্য্যন্ত পৌছুতে পারবে। তবুও তুমি বৈঠকখানার কোণে দাঁড়িয়ে থাক। যদি রামদা'য়ের ফলা থেকে কেউ ছিটকে যায়, তাহলে তোমার হাতে রড্ রইলো।

বিলু নীরবে এসে দাঁড়িয়ে গেল যথাস্থানে আর আমি সেই বিরাট রামদা'খানা নিয়ে গেটের সম্মুখে পায়চারী করতে লাগলাম।

ছুটে এলেন চিত্তবাবু, ছুটে এলেন প্রমোদবাবু, তাঁদের পশ্চাতে এলেন মা, ভালো-মা, নিরুপমা, বড় বৌ এবং স্পষ্ট দেখতে পেলাম বৈঠকখানায় শিশিরকণাও এসে পড়েছে নীরব আবেদন নিয়ে। সবারই মুখে এক কথা : আমাদের জন্য কেন আপনি এমনি বিপদ ঘাড়ে করছেন ? আপনাকে দেখতে পেলে ওরা আরো ক্ষেপে যাবে, হয়তো আপনার ওপরেও হাত তুলে বসবে। তার চাইতে থানায় খবর পাঠাচ্ছি—

বাধা দিয়ে বললাম : আপনারা সবাই বাড়ীর ভেতরে যান। আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে। তবে আমার মাথায় লাঠি চালাবার আগে ওদের ওপর রামদা চালাতে কসুর হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, বিশেষ কিছুই আর করতে হলো না। চেগারের ফাঁক দিয়ে নিশ্চয়ই ওরা দেখতে পেয়েছে আমায়। আমার হাতের অস্ত্রখানার তীক্ষ্ণতা মনে মনে কল্পনা করে বোধহয় ভালো লাগেনি। কুকুরের দল তাই কেঁউ কেঁউ করতে করতে একে একে সরে পড়লো।

কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র আমি নই। ওরা কিছুদূর চলে যেতেই সটান সদর গেট খুলে দিলাম। প্রমোদবাবু ছুটে এসে আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরলেন : বাইরে যাবেন না দ্বিজেনবাবু, আমার কথা শুনুন—

আমার মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। সাধুর ভক্তবৃন্দ চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেছে, তার জবাব দিতে হবে in their own coins ! রামদা'খানা প্রমোদবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম :' আপনার কপাল কেটে গেছে, জলপটি লাগান। আমি শুধু একবার দেখে আসি শালারা সত্যিই চলে যাচ্ছে কিনা।

বেরিয়ে পড়লাম একেবারে খালি হাতে। অকস্মাৎ দেখতে পেলাম ছুটতে ছুটতে আসছেন বিশ্বেশ্বরবাবু: এই মাত্র খবর পেলাম দ্বিজেনবাবু স্যানিটারী ভবানীবাবুর মারফৎ। কোন্‌দিকে গেল শালারা?

ব্যস, পেয়ে গেছি এবার সহযোগীকে। দুনিয়াকে আর থোড়াই কেয়ার করি! বললাম: চলুন এই দিকে।

তারপর একেবারে খালি হাতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় আমরা দুজন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলাম পাহুয়া পাড়ার মধ্য দিয়ে, হাড়ী পাড়ার অপরিসর গলিতে গলিতে। গাজী ও গাঠিয়ার বাড়ীর পাশ দিয়ে গেলাম, মংলা ও সীতা হাড়ীর বাড়ী ডাইনে রেখে এগিয়ে এলাম মহেন্দ্র মিত্রের বাসার কাছে। তারপর সোজা চললাম ভবেন সান্ন্যালের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে এবং প্রভাত চৌধুরীর গেট পার হয়ে এসে উপস্থিত হলাম সাধুর ভক্তবৃন্দের নেত্রী স্বয়ং শ্রীযুক্তা সীতা দেবীর দরজায়। তারপর সেখান থেকে এখানে-ওখানে ঘুরে অবশেষে এসে হাজির হলাম চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্সারিতে। ডাক্তার অমর গুপ্ত বললেন: আমি ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে এসেছি প্রমোদকে। খুব বেশী গভীর হয়নি। কিন্তু দ্বিজেনবাবু, ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে এই বদমায়েসদের আর এদের পরামর্শদাতা সেই সাধুকে। নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে আপনারা—

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।—বললেন বিশ্বেশ্বরবাবু: ওরা লাঠি চালাবে লাঠি চালাবার জন্যই, but we are out to murder! তাই চাই আমাদের গায়ে ওরা হাত তুলুক and they will feel the consequence! কিন্তু কোথায় একজনেরও দেখা পেলাম না সারা বন্দরে!

সারাটি দিন অনেক ঘোরাঘুরি করলাম আমরা। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, আমাদেরও আসরে নামতে দেখে ভয় পেয়ে গেছে সীতা দেবীর দল। এতটা ওরা আশা করেনি। ভেবেছিল বিদেশে গ্রাম্য রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের কোনো উৎসাহ থাকবে না। কিন্তু সত্যিই যে বেরিয়ে পড়েছি আমরা দুটি সাঁজোয়া গাড়ীর মতো, আর ভয়ে ও আতঙ্কে লাঠিয়ালরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে!...

কিন্তু সাধু! That scoundrel! বদনাম নির্ম্মাণ কারখানার সেই ভস্মমাখা মালিক? সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেরী হলো না, তাই একদিন গভীর রাত্রে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বিশ্বেশ্বরবাবু ও আমি।

প্ল্যান আমাদের অত্যন্ত সহজ। সাধুর আশ্রমের বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে নিঃশব্দে আমরা প্রাঙ্গণে নামবো। আশ্রমের দ্বার তার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ভক্তজনের

জন্য, আর তিনি মনে করেন খানসামা গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রখর; তাঁকে বিরক্ত করতে কেউ সাহস করবে না। তাই উন্মুক্ত দ্বারপথে প্রবেশ করে রামদা'য়ের একটি আঘাতে ওকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো। কোনো সাড়াশব্দ হবে না। তারপর আবার বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে কাজির বাগানের জঙ্গলে আমরা অদৃশ্য হয়ে যাবো। মহেন্দ্র মিত্রের বাড়ীর কোণে বিলুর হাতে অস্ত্রখানা দিয়ে আমরা ঘরে ফিরে এসে সুবোধ বালকের মতো নিদ্রা দেবো।

কিন্তু সাধুর ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের ভাগ্য, সে রাতে কোন্ গ্রাম থেকে এসেছে একদল কীর্ত্তনীয়া। এখানে-ওখানে জ্বলছে হারিকেন লণ্ঠন, চলছে বিচিত্র সুরে কীর্ত্তন আর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে পদ্মাসনে নিমীলিত নয়নে উপবিষ্ট ভস্মমাখা সাধু।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম ঝোপের অন্তরালে কীর্ত্তন সমাপ্তির আশায়। কিন্তু ভক্তবৃন্দের ভাবাবেগের যেন আর শেষ নেই। তাই ফিরে আসতে হলো ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে। বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন: ছাড়া হবে না, আর একদিন আসতে হবে।

বললাম: অবশ্য।

কিন্তু তাও সম্ভব হলো না। একদিন সকালবেলা এল দিনাজপুর জেলারই হরিপুর থানায় আমার স্থানান্তরের আদেশ। কে জানে, হয়তো এস-ডি-ও আমীনুল্লার চেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে হয়তো বিবাদ-বিসম্বাদের উত্তাপ কমে যাবে, চাটার্জ্জী পরিবারের মর্য্যাদা হবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত।

ঘটনাবহুল খানসামা গ্রামের চাঞ্চল্যকর ইতিহাসের ঘটলো পরিসমাপ্তি। যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরবাবুকে বললাম: তারকবাবুর কাছে সংবাদ পাঠাবেন বিশ্বেশ্বরবাবু, তাঁর মেয়েকে আমি বিয়ে করবো। I give my word and I shall keep it inspite of everything......

বিশ্বেশ্বরবাবু আমায় জড়িয়ে ধরলেন আনন্দাতিশয্যে।

সেদিন ১৯৩৭ সালের ২৬শে জুন।

রায়গঞ্জ রেলষ্টেশন থেকে হরিপুর আঠারো মাইল। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ী।

হরিপুরেও দেখলাম একই সঙ্গে দুজন রাজবন্দীর থাকবার ব্যবস্থা। খানসামায় মাঝখানে ছিল ছিটে বেড়ার পার্টিশন, এখানে ওসবের বালাই নেই। মেসের মতো একটি বৃহৎ কক্ষে সীট আমার আর অনিল সেনগুপ্তের। অনিলবাবুর বাড়ী

বরিশালের গৈলা গ্রামে। নিরীহ, গোবেচারা ও নেহাৎ ভালো মানুষ। বছর দুই রাজবন্দী করে রেখে বৃটিশ সরকার রাজস্বের অপব্যয় করছে মনে হলো।

এখানকার দারোগা আলাউদ্দীন এবং পরিতোষের মতো ইনিও অফিসিয়েটিং। যেমনি দীর্ঘকায়, তেমনি মেদবহুল শরীর। মধ্যাঙ্গে আবার তার প্রাচুর্য্য বিশ্রি-ভাবে প্রকট। ভোজনবিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তবে পরিতোষের মতো এঁর পরিতোষিণী-দালাল নেই আর গ্রামের কোথাও ইনি হস্ত প্রসারিত করেন না। মাঝে মাঝে থানার কাজে দিনাজপুর শহরে গেলে ইনি হয়তো সেই ফাঁকে এক রাত্রে লখনৌয়ের সুন্দরী বাঈজীর একখানা ঠুংরী শুনে আসেন ও প্রেম নিবেদন করে আসেন তার অলক্তকরঞ্জিত শ্রীচরণকমলে। বাদশাহী চালে মাঝে মাঝেই তাঁর ওখানে খানাপিনা হয়ে থাকে বিরাণী ও মোরগমশল্লম দিয়ে। স্যানিটারী মোজাহার আলীসহ আরও ক'জন আলী ও উদ্দীন টেবিল আলো করে বসেন। রাজবন্দীদেরও নিমন্ত্রণ করতে ভুল হয় না তাঁর। কারণ তাঁর ধারণা নবাবী খানার নমুনা দেখিয়েই তিনি রাজবন্দীদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারলে ওরা সমঝে চলবে তাঁকে।

এখানকার জমাদারের নাম অখিল চক্রবর্ত্তী। খুব ভালো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে জানেন। কেন যে এই ভদ্রলোক স্বাধীন ব্যবসা সুরু না করে পুলিশের মতো ঘৃণ্য বিভাগে প্রবেশ করেছেন, তা তিনিই জানেন। গ্রামের অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি, যা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মনোজ দত্ত সাধ্যাতীত বলে ছেড়ে চলে আসতেন, দেখতাম এবং দেখে বিস্মিত হতাম অখিলবাবু তা নিরাময় করে তুলতেন তাঁর ঐ হোমিওপ্যাথিক স্বাদহীন, বর্ণহীন জলজলে ওষুধ দিয়ে। খুব অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি এবং তাঁর গৃহিণীও। খানসামার উত্তেজনাকর রণক্ষেত্র থেকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম একটি নিরালা শান্তিনীড় দূরবর্ত্তী শিবিরে এসে! অন্ততঃ প্রথমটা তাই মনে হলো।

হরিপুরের কমলালয় ষ্টোর্স হচ্ছে মন্মথ জোয়ারদারের দোকান। মনিহারী দ্রব্য প্রায় সবই কিছু কিছু পাওয়া যায়, যদিও যাচাই করে পছন্দ করে নেবার মতো ষ্টক্ নেই জোয়ারদারের। এই ভদ্রলোকটিও খুব নিরীহ ও সৎ। রাজবন্দীদের আড্ডা দেবার স্থান হচ্ছে জোয়ারদার এ্যাণ্ড কোম্পানীর এই দোকানটি। কোম্পানী নামেই। দোকানে তিনিই একমেবোদ্বিতীয়ম্ আর বাড়ীর মধ্যেও তিনি আর ইকমিক কুকার। কুকার গৃহিণীর কাজ করে থাকে।

এখানে দুজন জমিদার—রবীন্দ্রলাল রায়চৌধুরী আর গিরিজাভূষণ রায়

চৌধুরী। দুজন দুতরফ কিনা, তা আজ আর মনে নেই। তবে দুজনের জমিদারীই কি কারণে জানিনে, গেছে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর অধীনে। তাই হরিপুরে খোলা হয়েছে ওয়ার্ডস্-এর বিরাট অফিস, অফিসে অনেক কর্ম্মচারী, চারিদিকে তাঁদের বাসা ও মেস। জোয়ারদারের দোকানেই পরিচয় হয়ে গেল গিরিজাবাবুর সঙ্গে আর ওয়ার্ডস অফিসে পরিচয় হলো কেরাণী সতীশ গুপ্তের সঙ্গে। দিনাজপুর শহরের ছেলে, নাট্যাভিনয়ে অদ্ভুত দক্ষতা। খানসামার চাটার্জ্জী পরিবারের সবাইকে ভালো চেনে। নীরদবাবুকে তার বন্ধুই বলা যায়।

দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো আমার সতীশের ওখানে। অফিসে গল্প আর তার মেসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা। সতীশের সঙ্গে বন্ধুত্বটা অকস্মাৎ, যেন কতকটা অজানতেই, একেবারে নিবিড় হয়ে উঠলো। ওর কি কি আমার ভালো লেগেছিল আর আমার মধ্যেই ভালো লাগার মতো কি কি পেয়েছিল সতীশ, তা আজও মনে করতে পারিনে! কিন্তু মনে আছে অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলতে যা বোঝায়, হরিপুরে একমাত্র সতীশই ছিল তাই। জমাদার অখিলবাবুকে শ্রদ্ধা করতাম বড় ভাইয়ের মতো, আর সতীশ ছিল একেবারে ইয়ার!……

সতীশ একদিন নিয়ে গেল আর একজন সহকর্ম্মী সতীশ দাশের বাড়ীতে। তাঁর বারো বছরের কন্যা রুবিকে সতীশ ডাকতো মা বলে, তাই সে আমারও মা হয়ে গেল। রুবি মা। রুবি মায়ের চেহারাটা আজো মনে পড়ে। চমৎকার স্বাস্থ্য আর মিষ্টি তার মুখখানি। একটু বাড়ন্ত বলে সাড়ী পরতে হতো তাকে। কিন্তু স্বভাবটি সাড়ীর আংরাখায় আদৌ ঢাকা পড়েনি। ঝাকড়া চুল দুলিয়ে প্রায়ই সে ছুটোছুটি করতো পোষা খরগোসটির সঙ্গে। আর মায়েরই মতো কথায় কথায় শাসন চালাতো সতীশ ও আমার ওপর।

ভেবেছিলাম হরিপুরের দিনগুলি ভালোই কাটবে। কিন্তু কিছুদিন পরই দেখা গেল আলাউদ্দীন পরিতোষের উলটো পিঠ। নবাবী থানার নমুনাতে যখন রাজবন্দীদের ওপর মোড়লীটা কায়েম হলো না, তখন হাতে তুলে নিলেন আলাউদ্দীন তাঁর লেখনীর অস্ত্র! সাপ্তাহিক কনফিডেন্টিয়াল রিপোর্টে উত্তাল হয়ে উঠলো রাজবন্দীদের নয়, শুধু আমারই অকথ্য নিন্দা। জোয়ারদার, সতীশ গুপ্ত, সতীশ দাশ এবং জমিদার গিরিজাবাবুরও নাম প্রেরিত হলো বাণেশ্বরের কাছে। এখানেও রিপোর্টের রিপোর্ট পেতে আমার বেগ পেতে হলো না অখিলবাবু মারফৎ। আসতেন তিনি গভীর রাত্রে। বিরাট থানা কম্পাউণ্ডের এক প্রান্ত থেকে থানার পেছন দিয়ে অপর প্রান্তে আমাদের বাড়ীতে এসে প্রবেশ করতেন নিঃশব্দে।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, খানসামার মতো এখানেও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করতে হবে। পরিতোষের মতো মূর্খ নন আলাউদ্দীন, তাই মুখে তাঁর সর্ব্বদাই লেগে থাকতো অমায়িক হাসি। বাইরের খোলসটা তাঁর ভদ্রতা ও সহৃদয়তার চুমকিতে চক্‌চক করতো। কিন্তু রিপোর্ট পাঠাবার সময় ঐ মেদবহুল গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে ঝিকিমিকি করে উঠতো ক্রুর বীভৎসতার রক্তাক্ত দ্যুতি!......

অখিলবাবুর মুখে শুনে আমিও সুরু করলাম লিখতে দিনাজপুরের পুলিশ সুপারের কাছে যে, থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জের অভদ্র ব্যবহার সহ্যের সীমারেখা পেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং হয় আমাকে স্থানান্তরিত করা হোক, নইলে আমার পথ আমিই বেছে নেবো। মজা হচ্ছে আমার দরখাস্তগুলো নিয়ম অনুযায়ী খোলা অবস্থাতেই দিতে হতো দারোগা সাহেবের হাতে এবং দারোগা সাহেবকে নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিয়ম অনুযায়ী আবার তা পাঠাতে হতো যথাস্থানে। তাই সুরু হয়ে গেল লেখার লড়াই। কিন্তু আলাউদ্দীন যেবার রুবি মার সঙ্গে আমার ও সতীশের একটা অবৈধ সম্পর্কের কথা লিখে পাঠালেন দিনাজপুরে, সেবারই ওখান থেকে এসে পড়লেন ইন্‌সপেক্টার অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ সরজমিন তদন্তের জন্য।

আমায় এসে জিজ্ঞেস করলেন: দারোগার সঙ্গে আপনার ঝগড়ার কারণ কি বলে মনে হয় আপনার?

বললাম।

সতীশ গুপ্ত আপনার বন্ধু?

বললাম।

রুবি নামে মেয়েটিকে আপনারা মা বলে ডাকেন? ওর বয়স কত?

বললাম: হ্যাঁ ডাকি। বয়স ওর বছর বারো হতে পারে।

খানসামার তারকবাবুর মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেছে?

বললাম: হ্যাঁ।

অন্নদাবাবু বললেন: খুব ভালো। বিয়ে করে ফেলুন। বীরগঞ্জে আমি ছিলাম। ঐ পরিবারের সবাইকেই আমি চিনি। তারকবাবুর মতো সাধু ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। খুকুকেও জানি, চমৎকার মেয়ে। বিয়ে করে ফেলুন, তাহলেই স্ত্রী নিয়ে বাস করবার জন্য আপনাকে যেখানে ফ্যামিলি কোয়ার্টার আছে, সেখানে transfer করবে।

জিজ্ঞেস করলাম: কিন্তু আলাউদ্দীন সাহেব কী সব অভিযোগ করেছেন, তা তো কিছুই বললেন না আমায়?

হেসে জবাব দিলেন অন্নদাবাবু: ওটা স্কাউণ্ড্রেল। রাজবন্দীদের চেনে না। কলমে যা এসেছে, তাই লিখে পাঠিয়েছে। আমি যাই, ওকে সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অন্নদাবাবু চলে গেলেন এবং হরিপুর থেকে যাবার পূর্ব্বে আলাউদ্দীনকে যা বলে সতর্ক করে দিয়ে গেলেন, তা সেদিনই গভীর রাত্রে জানতে পারা গেল অখিলবাবুর মুখে। একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেলেন অন্নদাবাবু: দারোগা সাহেব, মাসে মাসে এতগুলো টাকা খরচা করে গভর্ণমেণ্ট এই রাজবন্দীদের আটকে রেখেছেন বোকার মতো মনে করবেন না। মারাত্মক লোক ওঁরা। বেশী ঘাটালে একদিন আপনার ঐ ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে কবর দিয়ে দেবে আপনাকে, বুঝলেন ?

কি বুঝলেন আলাউদ্দীন জানিনে, তবে জানতে পারলাম তিনি হলাহল সিঞ্চন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছেন !……

চৌষট্টি

শীত পড়ে গেছে। কার্ত্তিকের শেষাশেষি। অনিলবাবু অনেকগুলো গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন বাড়ীর মধ্যে, তাতে অনেক ফুল ফুটেছে। অফিসের তাড়া নেই, নেই কোনো কাজের তাড়া; তাই ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় চাদরখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে ভারী ভালো লাগে। চাকর নেই। তাই জানিই তো, উঠে আবার দৌড়ুতে হবে সতীশ গুপ্তের ওখানে প্রাতরাশ সেরে নেবার জন্য। অনিলবাবু পেটরোগা মানুষ, তাই আখের গুড় ও কাগজী লেবুর রসমিশ্রিত চিড়ের সরবৎ-ই হচ্ছে তাঁর পোচ, টোষ্ট ও কফি!

অকস্মাৎ কানে ভেসে এল হালকা গানের একটি কলি, তাও আবার নারীকণ্ঠে। আধেক শোনা গেল, আধেক শোনা গেল না—শুধু গুনগুন। মৌমাছির মতো। স্বপ্ন দেখছি না তো?—না, রীতিমত জেগে আছি। অনিলবাবুর নাসিকা অবশ্য সেই রাত এগারোটা থেকেই একটানা স্বরে গর্জ্জন করে চলেছে। কিন্তু গুনগুনের সঙ্গে আবার টকটক শব্দও শুনতে পাচ্ছি! নিশ্চয়ই কেউ অনধিকার প্রবেশ করেছে আমাদের বাড়ীতে এবং অনিলবাবুর সাধের গাঁদা ফুলগুলি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। গানের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে ফুলের বোঁটা ছেঁড়ার শব্দ।

সুতরাং এক লাফে উঠে পড়লাম শয্যা ছেড়ে এবং দ্বিতীয় লাফে বারান্দায় এসে দেখি—কি দেখলাম আজও মনে আছে তা। বলছি।

হলুদ রংয়ের গাঁদা ফুলের বনে টকটকে লাল রংয়ের সাড়ী-পরা একটি মেয়ে। চিনি না, জানি না, কোথাও দেখেছি বলেও মনে করতে পারলাম না। কিন্তু এখন দেখলাম, ভালো করে দেখলাম। হ্যাংলাপানা গড়ন, মুখখানা লম্বাটে ধরণের, পিঠের ওপর দোদুল্যমান দীর্ঘ বেণী, তার মাথায় গোটাকয়েক গাঁদা ফুল বাঁধা। বয়স পনেরোর বেশী হতেই পারে না। ফ্রক পরলেও চলতো।—না, চলতো না। কারণ শরীর পুষ্ট, অতিরিক্ত রকম বাড়ন্ত। রেখাগুলো লজ্জাহীনভাবে তীক্ষ্ণ, শাড়ীর আবরণ সে তীক্ষ্ণতাকে চেপে রাখতে পারেনি। ঐ শরীরে ফ্রক বড্ড বেমানান হবে।

আমার দিকে একটি চকিত দৃষ্টি ও মুচকি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটি দিব্যি ফুল তুলতে লাগলো নির্ভয়ে। যেন তার নিজের বাগান আর আমিই ওখানে অবাঞ্ছিত। কিন্তু ওমনি বে-আইনী উদাসীনতায় আমি ভুলবো কেন? জিজ্ঞেস করলাম: ফুল তুলছো যে?

বললো : দরকার আছে। আজ বেস্পতিবার, তাই।

বললাম : লক্ষ্মীপুজা বলে আমাদের ফুলগুলো নিয়ে যাবে ?

জবাব দিল : পুজো হয়ে গেলে পেসাদ দিয়ে যাবো'খন।

সত্যিই রাগ হলো : পেসাদ আমরা খেতে চাই না, সুতরাং ফুলও তুলো না। অনেক কষ্ট করে লাগিয়েছেন অনিলবাবু, তোমার নিয়ে যাবার জন্য নয়। কিন্তু তুমি বাড়ীর মধ্যে এলে কি করে ? সদর দরজা বন্ধ ছিল, বন্ধই তো রয়েছে দেখছি।

এইবার মেয়েটি তাকালো, হেসে বললো : বেড়া ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে এসেছি।

বিরক্ত হলাম। ভারী ডেঁপো মেয়ে তো! বললাম : অন্যায় করেছ। তোমায় আমরা চিনিনে, জানিনে—

বাধা দিল মেয়েটি : আমি কিন্তু আপনাকে চিনি, জানি। মন্মথ কাকার দোকানে সর্ব্বদাই যান আপনি আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে। সতীশদা আপনার বন্ধু। আপনার বিয়ে হবে—

অ্যাঁ! বলে কি মেয়েটা! এত খবর ও কোথায় পেল ? জিজ্ঞেস করলাম : কোন্‌টা তোমাদের বাড়ী ? কোথায় পেলে আমার বিয়ের খবর ? সতীশ তোমাদের বাড়ীতে যায় নাকি ? তার মুখেই শুনেছ কি ?

হাতের ফুলের সাজি দুলিয়ে ও মাথার বেণী দুলিয়ে এগিয়ে এল মেয়েটি। বললো : ঠিকই বলেছেন সতীশদা, জানিস চামেলী, দ্বিজেনকে বলিস ওর বিয়ের কথা, দেখিস ও ক্ষেপে যাবে।

বিস্ময় আমার উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। যেন এক অলিখিত উপন্যাসের নায়ক হয়ে পড়ছি আমি নিজের অজ্ঞাতে। আর নায়িকা ?…

বললাম : তুমি দেখছি আমার নামও জেনে নিয়েছ। কোন্ বাড়ী তোমাদের ?

তারপর জানা গেল সব। হরিদাস সেনগুপ্তের কন্যা চামেলী সেনগুপ্তা। গিরিজাবাবুর বাড়ীর রাস্তায় মোড়ের ওপর প্রকাণ্ড বটগাছটার নীচে হরিদাস বাবুর বাড়ী। হরিদাসবাবু মারা গেছেন অনেক কাল, বিধবা স্ত্রী যুথিকা ও চামেলীকে বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হন।

জোয়ারদার এই কথাটাই একদিন সাহস করে পাড়লেন আমার কাছে। অনিলবাবু নাকি ওঁদের পালটি ঘর, তাঁকে পছন্দও হয়েছে সবার। যুথিকারও এতে অমত নেই। আমারই মতো যদি অনিলবাবু—

ব্যস, আমি একটা নজীর সৃষ্টি করে ফেললাম দেখছি। খানসামায় আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, হরিপুরে অনিলবাবুর বিবাহও স্থির করে ফেলবো? ক্ষতি কিছুই দেখলাম না। আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যদি একটি বিধবার একটি কন্যা উদ্ধার হয়ে যায়, যাক না! অনিলবাবুর কাছে কথাটা পাড়তেই সহসা রাজী হয়ে গেলেন তিনি। ফলে, আমাদের বাড়ীতে চামেলীর ফুলতোলার কাজটা আর বৃহস্পতিবারের জন্য আটকে থাকলো না। প্রথম দিনেই সে আমায় কেয়ার করেনি, এবার সে রীতিমত ঠাট্টা করা সুরু করলো জামাইবাবুর বন্ধু হিসেবে। পনেরো বছরের শরীরে যেমন বিশ বছরের বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল বেমানানভাবে, তেমনি তার হাসিঠাট্টার ভাষা ও ভঙ্গী একেবারে পঁচিশ বছরের মহিলাকেও মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে যেতে লাগলো।......

হক মন্ত্রিসভা তখন অন্যতম মন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলীর বিশেষ উদ্যোগে বাংলার রাজবন্দীদের ধীরে ধীরে মুক্তি দেবার নীতি গ্রহণ করেছেন। দু একদিন পরপরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় একশো জন মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত রাজবন্দীর নাম। সরকারী হুকুমনামা এসে পড়ে দিন সাতেকের মধ্যেই।

উগ্র উৎসাহ নিয়ে অনিলবাবু প্রত্যহই যান ডাঃ মনোজ দত্তের ওখানে এবং প্রত্যহই ফিরে আসেন হতাশ হয়ে, তারপর ফোস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন: নাঃ দ্বিজেনবাবু, আপনারও নাম নেই, আমারও নেই।

আমি তৎক্ষণাৎ প্রবোধ দিই; ঘাবড়াবেন না, এগারো শো ছাড়া হবে। চান্স এখনো যায়নি।

তারপরই আবার স্মরণ করিয়ে দিই: কিন্তু সাবধান, বিয়ে করবেন বলে যে কথা দিয়েছেন, তা কিন্তু রাখবেন। আমিও কথা দিয়েছি, আমিও তা রাখবো। রাজবন্দীদের কথা যেন নড়চড় না হয়।

নিশ্চয়ই হবে না।—জোর দিয়ে বলেন অনিলবাবু।

অকস্মাৎ একদিন কলকাতা থেকে মেজদার চিঠি পেলাম ২৬শে অগ্রহায়ণ আমার বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। তারকবাবু ও মেজদা দুজনেই সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছেন আমায় ছুটি দেবার জন্য।

ক্ষেপে গেলেন অনিলবাবু। এই আনন্দের সন্দেশ বিতরণের জন্য ছুটোছুটি করলেন সারা হরিপুর গ্রামে। ২৬শে অগ্রহায়ণ মানে ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭ সাল।

২৪শে ডিসেম্বর দুপুরবেলা বারান্দায় দুজন খেতে বসেছি, এমন সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল দূরে দুজন সশস্ত্র সিপাই আসছে থানার দিকে। আর যায় কোথা! খাওয়া ফেলেই উঠে পড়লেন অনিলবাবু, ছুটে গেলেন থানায় এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে একেবারে কলরব করে উঠলেন: এসে গেছে দ্বিজেনবাবু, সরকারী হুকুম এসে গেছে।—Your transfer order to the house of Mr. Tarakeswar Chatterjee of Khansama…এখনই রওনা হতে হবে। ফজলুল হকের বিবেচনা আছে, কি বলেন?

হেসে জবাব দিলাম: হবে না কেন, বরিশালের যে! তবে গৈলা নয় কিন্তু, চাখার। সেটা ভুলবেন না।

বিকেলবেলাই রওনা হলাম মালপত্র সব নিয়ে। বিয়ের পরে এখানে নাও ফিরে আসতে পারি, তাই। গিরিজাবাবু, জোয়ারদার, সতীশ গুপ্ত, সতীশ দাশ, অখিলবাবু সবাই জানালেন অভিনন্দন। রুবি মা অভিমান করে বললো: এবার মাকে আর মনে পড়বে না।

বললাম: শুধু ছেলে নয়, এবার ছেলের বৌ-ও আসবে তোমার কাছে।

যদি তোমায় এখানে আর না পাঠায়?—জিজ্ঞেস করলো রুবি মা।

বললাম: একদিন তো ছাড়া পাবো। তোমার সাথে দেখা করবোই রুবি মা।

চামেলী বললো: এবার আপনার বাড়ীর সব ফুল তুলে নিয়ে আসবো।

সেই সঙ্গে জামাইবাবুকেও।—বলে হাসলাম।

সত্যি, একবার বেড়িয়ে যাবেন হরিপুরে ছাড়া পাবার পর, কেমন?

কথা দিলাম: আসবো।

কথা দিচ্ছেন তো?—চামেলীর কণ্ঠে বিপুল আগ্রহ।

দিচ্ছি।

২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এসে নামলাম আবার সেই দারোয়ানী ষ্টেশনে। চেপে বসলাম আবার সেই গরুর গাড়ীতে। আবার চললো গরুর গাড়ী শম্বুকের মতো।

এবার চলেছি বর বেশে। রাজবন্দী বর, তাই বরযাত্রী দুজন সশস্ত্র সিপাই আর আই বি-র জনৈক সহ-দারোগা। বর বেশে নয়, মনে হলো চলেছি বিজয়ীর বেশে। খানসামার নিন্দুকের দলের মুখে এবার ছাই পড়লো, গালে লেপিত হলো চুণ আর কালি! মাষ্টার মশাইয়ের কন্যার সঙ্গে চোরের বিবাহ ভেঙ্গে দিয়ে যারা

সমাজসেবার জলন্ত আদর্শ স্থাপন করবার জন্য নিসপিস করছিলো, সেই সীতা দেবীর সাকরেদদের এবার মাথা কাটা গেল। চোর আজ চলেছে বিজয়ী বরের বেশে! একবার কথা দিলে রাজবন্দী যে সে কথার আর খেলাপ করে না, এবার আর একবার তার পরিচয় পাবে হিংসুটের দল। আনন্দে রোমাঞ্চ জাগছিল শরীরে এই ভেবে যে, অবশেষে ওয়াটারলু-তে একেবারে ভূপাতিত করে ফেলতে পেরেছি দিগ্বিজয়ী ভস্মমাখা সাধুকে!······

দুঃখও যে হয়নি, তাও নয়। বড় আশা ছিল আমার মায়ের, আমি বিয়ে করবো, আমার স্ত্রী এসে করবেন তাঁর সেবা, রোগজর্জ্জর ললাটের উত্তাপে বুলিয়ে দেবেন সান্ত্বনার শীতল পরশ, সুখী হবেন মা ছায়ার মতো তাঁর পাশে একটি সেবিকাকে পেয়ে। আজ চলেছি আমি সেই সেবিকাকে আনতে, কিন্তু মা কোথায়? আমার মুখের কথা আদায় করে নিয়ে কোথায় তিনি পালিয়ে গেলেন চিরদিনের তরে?······

সংবাদ আগেই পাঠানো হয়েছিল মন্মথ জোয়ারদারকে দিয়ে একখানা টেলীগ্রাম করিয়ে। ডাকবাংলোর কাছাকাছি আসতেই তাই দূরে তারকবাবুর বাড়ীর সম্মুখে প্রচুর ডে লাইটের আলো দেখতে পাওয়া গেল। একখানা গাড়ীতে আমার যাবতীয় মালপত্র, সহ-দারোগা ও দুজন সিপাই, আর একখানায় আমি একা।

ডাক্তারখানা এসে পড়তেই আমি নেমে পড়লাম। আই বি-র বাবু ও সিপাইরা যাবে থানায়। বলে দিলাম ওদের যেতে। আমার গাড়ীখানাকেও বলে দিলাম সোজা তারকবাবুর বাড়ী নিয়ে যেতে। আমি এটুকু রাস্তা পায়ে হেঁটেই যাবো। বিজিত দেশের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটেই যাবো বিজয়ী হিটলারের মতো!

ডাক্তার অমর গুপ্তের বাসায় উঠলাম। ডাক্তারবাবু আমায় একেবারে দুহাতে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন: হ্যাঁ, একেই বলে বীর! সমস্ত নিন্দা, কুৎসা, শত্রুতা, বিরোধ—সব কিছু দলে পিষে আপনি এসেছেন বিজয়ীর বেশে। এই তো চাই! —যান, গিয়ে দেখবেন আজ সব হাঙ্গামা চুকে গেছে। বিরোধীরা সব আজ তারকবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন: বার বার বলেছি আমি খুকুর মাকে, রাজবন্দী কখনও কথার নড়চড় করে না। আজ আমার কথাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

ওঁদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাংলা মদের দোকানের সম্মুখে আসতেই স্বয়ং অপূর্ব্ব সান্ন্যালের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

আরে মশাই, আপনি তো সাংঘাতিক লোক! খুঁজেই পাচ্ছি না আপনাকে। ওদিকে জামাইকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাড়ীর মেয়েরা বরণ ডালা নিয়ে এসে দেখে একটা গাড়ী তো একেবারেই খালি, আর একখানায় দুটো সিপাই বসে কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছে।—চলুন, শীগগির চলুন।

আমায় একেবারে টেনেই নিয়ে রওনা হলেন অপূর্ব্ব সান্যাল। এককালে সীতা দেবীর অন্যতম সাকরেদ ছিলেন। আজ মাথা মুড়িয়ে গোময় ভক্ষণ করেছেন দেখছি!

বাড়ীর কাছে এসে দেখি, এক বিরাট কাণ্ড করে বসেছেন চাটার্জ্জী ব্রাদার্স। প্রকাণ্ড তোরণদ্বার তৈরী করা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অনুকরণে। তার মাথার ওপর শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা। বিজয়ী চাটার্জ্জী বাড়ীর অপরিম্লান গৌরবের নিশানা! চতুর্দ্দিকে জাতীয় পতাকার মালা, পাতাবাহার ও দেবদারু পাতায় ছাওয়া রাস্তার দিকের সম্পূর্ণ বেড়াটি। তোরণের মাথায় ঝুলছে একটি বড় ডে-লাইট আর জমায়েত জনতার অনেকের হাতেই ছোট ছোট ডে-লাইট লণ্ঠন। আলোকে উদ্ভাসিত চতুর্দ্দিক। চেয়ে দেখি, লোকে লোকারণ্য। প্রচণ্ড অগ্রহায়ণের শীতকেও কেউ পরোয়া করেনি। তাদের মধ্যে হাড়ী আছে, পানুয়া আছে, হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, হিন্দুস্থানী আছে, মাড়োয়ারী আছে, সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মাষ্টারমশাইয়ের রাজবন্দী জামাইয়ের।

প্রথমেই যে লোকটি এসে আমার পায়ের ধূলি নিয়ে মস্তকে ও জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করালো পরম ভক্তিভরে, চেয়ে দেখি সে আর কেউ নয়, স্বয়ং মংলা হাড়ী। হাড়ী পাড়ার সর্দ্দার, প্রমোদবাবুর মাথায় একদা যে কাঠের রোলার চালিয়েছিল। বাচালকে সম্বোধন করে চাণক্যের সেই কথাটি চট্ করে আমার মনে ঘা দিল: এখন যে ভারী ভক্তি দেখছি। একদিন আমার শিখা ধরে টেনেছিলে মনে আছে? মুখেও প্রায় বলে ফেলেছিলাম, কিন্তু আত্মসংবরণ করে নিলাম।

এগিয়ে এসে তারকবাবুর পদধূলি গ্রহণ করলাম সর্ব্বাগ্রে। জিজ্ঞেস করলেন: শরীর ভালো আছে তো?

ভালোই আছি।—

কিন্তু তারপর আর কথা কওয়া সম্ভব হলো না। মহিলাদের মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হলো বরণের কাজটা সংক্ষেপে সারবার জন্য। তারপরই সমবেত জনতা উল্লাসধ্বনিতে একেবারে আকাশ বাতাস কম্পিত করে তুললো, সবাই

আমায় প্রায় শূন্যে তুলে নিয়ে হাজির করলো পাশের বাড়ীতে। সেখানেই সুন্দর করে ফরাস পেতে একটি বৈঠকখানা সাজানো হয়েছিল। রঘুর দোকানের পাশেই। পেছনের দরজা দিয়ে বিলুদের বাড়ী যাওয়া যায়। তারপর সেখানে প্রায় সারা রাত চললো আলাপ-আলোচনা, গান-বাজনা, হাসি-পরিহাস, খেলাধূলা……

পরদিন সন্ধ্যার পর সরকারীভাবে বিবাহ সভায় প্রবেশ করেই দেখি, সেই নামজাদা সুনীতি ও সুরুচির ধ্বজাধারীরা সবাই এসে গেছেন। পুরুষ ও মহিলা সবাই। লাট্টু বিশ্বাস এসেছেন, এসেছেন তাঁর ভাই মাক্কু বিশ্বাস, এসেছেন প্রভাত চৌধুরী, এসেছেন রামলাল গুহ, এসেছেন মহেন্দ্র মিত্র, এসেছেন সীতা ও মংলা হাড়ী, সবাই গুটিগুটি করে এসে বিবাহ সভা আলোকিত করে বসেছেন। অপূর্ব্ব সান্ন্যাল তো প্রধান সংগঠক বলে মনে হলো।

একান্তে প্রমোদবাবুকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: নির্লজ্জের মতো সবাই এসে গেছেন দেখছি?

তা—এসে গেছেন।—বললেন প্রমোদবাবু।

কিন্তু নরসুন্দর পরিতোষ ও তদীয় সহধর্ম্মিনী পরিতোষিণীকে দেখছি না যে? তাঁদের নেমন্তন্ন করেছিলেন?

নিশ্চয়ই।—বললেন প্রমোদবাবু: এমন কি, লাট্টু বিশ্বাসের মাকে পর্য্যন্ত নেমন্তন্ন করে এসেছি। আজ এই শুভদিনে অতীতের রেষারেষি সব ভুলে যাওয়াই উচিত।

কিন্তু কোথায় সীতা দেবী?—জিজ্ঞেস করলাম।

এখনো আসেননি দেখছি।—জবাব দিলেন তিনি।

বিবাহে বরপক্ষের একজন কর্ত্তার প্রয়োজন আছে। কারণ কন্যা সম্প্রদান করবার প্রাক্কালে সম্প্রদানকারী বরপক্ষীয় কর্ত্তার অনুমতি চেয়ে নেন। আমার পক্ষে যারা এসেছিল, ব্যাকরণের নিয়মে তারা বরযাত্রী বটে, কিন্তু লজ্জায় তারা আর বিবাহ বাড়ীতেই নামেনি। একেবারে সোজা থানায় চলে গেছে। আর তারা তো পুলিশ। পুলিশ হবে রাজবন্দীর বিয়ের কর্ত্তা?

এগিয়ে এলেন বীরগঞ্জের স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়: দাও, ঐ অনাহারী চাকরিটা আমাকেই দাও প্রমোদ। তবে সত্যিই অনাহারী রেখো না। যে দারুণ শীত পড়েছে আজ, চায়ের সঙ্গে খানকতক গরম লুচি খুব ভালো মানাবে

সবাই হেসে উঠলেও আমি হাসলাম না। প্রমোদবাবুকে একান্তে ডেকে

নিয়ে বললাম: আমি এই বিবাহসভায় একটা বক্তৃতা দিতে চাই। কি বিষয়ে, তা তো বুঝতেই পারছেন। নির্লজ্জ কাপুরুষদের একবার সমঝে দেওয়া দরকার যে রাজবন্দী keeps his word of honour!—যান, আপনার বাবাকে একটু জিজ্ঞেস করে আসুন।

কিন্তু তারকবাবু বলে পাঠালেন, বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা যদিও তিনি সম্পূর্ণ অনুধাবন করছেন, তথাপি এঁরা তার মর্ম্ম উপলব্ধিই করতে পারবেন না। ফলে, এই আনন্দের দিনে সামাজিক ব্যাপারে আবারও একটা অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

নিরস্ত হতে হলো।

বরকর্ত্তা সত্যবাবু দিলেন অনুমতি আর সম্প্রদান করলেন আধুনিক পণ্ডিতমশাই চিত্তবাবু অর্থাৎ সুবলবাবু। কিন্তু বিশ্বেশ্বরবাবুকে এই আনন্দের দিনে পাওয়া গেল না, তিনি এর আগেই বদলি হয়ে গেছেন তপন থানায়।

শিশিরকণা নামটি বড্ড সেকেলে বলে একদিন তাঁরই প্রস্তাবমত শিশিরকণার নামকরণ হয়েছিল আত্রেয়ী। আত্রাই নদীর তীরবর্ত্তী খানসামা গ্রামের আত্রেয়ী। নামের মধ্যে আছে কবিত্ব আর নামের পেছনে আছে চাঞ্চল্যকর ইতিহাস! বিশ্বেশ্বরবাবু বলতেন, স্থান ও পাত্রী বিবেচনায় একেবারে নিখুঁত নাম আত্রেয়ী!······

বিয়েতে কাউকে নেমন্তন্ন করতে পারিনি আমার পক্ষ থেকে। তাই বিয়ের পর অনেকগুলো ছাপানো কার্ড ছেড়ে দিলাম বন্ধু ও আত্মীয়দের নামে। তাতে যা লিখেছিলাম, আজও মনে আছে:

আত্রাই নদীর তীরে কুড়িয়ে পেয়েছি আত্রেয়ীকে। তারই সঙ্গে হয়েছে আমার নিবিড় করে পরিচয় কুয়াসাচ্ছন্ন অগ্রহায়ণের ছাব্বিশে। আমাদের অনির্দ্দেশ চলার পথে কামনা করি আপনার শুভকামনা ও শুভাশীষ!

বিয়েতে শেষ পর্য্যন্ত আসেননি পরিতোষ ও পরিতোষিণী আর আসেননি স্বনামধন্যা সীতা বিশ্বাস। চাকা ঘুরে গেছে, এঁরা এবার পড়ে গেছেন চাকার তলায়। ঘূর্ণায়মান চাকার নিষ্পেষণে এঁদের বুঝি জিভ বেরিয়ে পড়েছে!······

অকস্মাৎ বিয়ের ঠিক পরদিন বিকেলে আমার নামে একখানা এনভেলপে পত্র এসে হাজির। বিস্মিত হলাম। কে লিখলো? ঠিকানা পেল কি করে?

মাত্র দু সপ্তাহের জন্য এসেছি খানসামায়, এরই মধ্যে কী এত জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল?…খুললাম সবার সমক্ষেই এবং দেখে বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রইলো না যে, ওখানা আর কারুর পত্র নয়, একেবারে স্বয়ং রেবার। ফুলবৌদির সেই দূর সম্পর্কীয় বোন রেবা। প্রায় চার বৎসর পূর্ব্বে একদিন কেয়টখালীতে আমাদের বাড়ীতে এই রেবাই আমায় বিবাহ করবার কামনা জানিয়েছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সে উত্তাপ তো শান্ত হয়ে যাবার কথা। এই কবছরে কোনো যোগাযোগই নেই তার সঙ্গে আমার! কিন্তু আশ্চর্য্য, সে আমায় আজও ভোলেনি এবং আকাবাঁকা অক্ষরে দীর্ঘপত্রে যা লিখে পাঠিয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমি যেন তার বিষণ্ণ মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

খানিকটে তুলে দিচ্ছি সেই স্মরণীয় পত্র থেকে:

তুমি ভেবেছ আমি তোমায় ভুলে গেছি, তাই না? মনে করেছ, আমি তোমায় একদিন চেয়েছিলাম খেয়ালবশে বা সাময়িক উত্তেজনায়? —তা নয়, আমি তোমায় সত্যিই ভালবেসেছিলাম। ছিলাম নয়, এখনও বাসি। তোমার মনের মতো হয়ে ওঠবার জন্য এই দীর্ঘ চারটি বৎসর আমি অনেক পরিশ্রম করেছি, লেখাপড়া করেছি, সেলাই শিখেছি, তোমার বিপজ্জনক কাজে সাথিনী হবার মতো করে নিজেকে গড়ে তুলেছি! কিন্তু এ কি করলে তুমি? আমায় কথা না দিলেও আমি তো কথা দিয়েছিলাম নিজকে যে, তোমার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবো!……

যাকে পেয়েছ, সে হয়তো আমার চাইতে অনেক সুন্দরী, অনেক গুণবতী। তবু আমি এখন কী করবো বলতে পারো? আমার সমস্ত তপস্যা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ কী?……

পড়লাম বারকয়েক। একা নয়, সবাই মিলে। মানুষের জীবনই দেখছি একটি হাসিকান্নার উপন্যাস। আগুন নিয়ে খেলা করবার সময় কার প্রাণে তরঙ্গ সৃষ্টি করে বসেছি, কোন্ বেপথুমানা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, অতনুর ফুলশরে কে মূর্চ্ছা গেল, সে সংবাদ রাখবার সময়ও পাইনি কখনো!

দু সপ্তাহ পর একা ফিরে এলাম হরিপুরে। এসেই দেখি, অনিলবাবু নেই, জানতে পারলাম, পরে একশোর একটি তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল। মুক্তি পেয়ে বাড়ী চলে গেছেন। কিন্তু দিনসাতেক পরই বিয়ের দিন স্থির করে তবে বিদায় নিয়েছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে এলেন তিনি তাঁর দাদা ও জনকয়েক বরযাত্রীসহ। আলিঙ্গন জানিয়ে বললাম: অনিলবাবু, রাজবন্দীরা যে কথা দিলে তার নড়চড় করে না, তা আমি দেখিয়ে এসেছি খানসামায়, আপনি দেখালেন হরিপুরে।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বৌ নিয়ে অনিলবাবু বরিশাল চলে গেলেন আর দিনদশেক পর আমায়ও আবার স্থানান্তরিত করা হলো এই দিনাজপুর জেলারই ফুলবাড়ী থানায়। অখিলবাবু গোপনে বলে গেলেন যে, ওখানে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে পাঠানো হচ্ছে আমাকে আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে থাকতে দেবার

পয়ষট্টি

বন্দী জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে পড়েছি। পেছনে রেখে এসেছি দীর্ঘ ছয়টি বৎসর। কোথাও কাটাতে পারিনি নিরুপদ্রব জীবন, কোথাও পাইনি অনাহত শান্তি, কোথাও মেলেনি একটানা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। বন্দী জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এমনি সব শয়তান কর্ম্মচারীর যে, সারাক্ষণই চালাতে হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধির সংগ্রাম। ক্ষতবিক্ষত হলেও গর্ব্বভরে ঘোষণা করবো যে, বিজয়ীর মর্য্যাদা নিয়েই চলে এসেছি এতদিন। বিপ্লবীর জীবনে হাজার-দুয়ারী হাওয়া-ঘর কোথায়? কোথায় বোটানিক্যাল গার্ডেনের ছায়াশীতল অর্কিড ?......

তাই যখন ফুলবাড়ী থানায় বদলির হুকুম এলো, প্রস্তুত হয়ে নিলাম মুষ্টিযুদ্ধের দশম রাউণ্ডের জন্য। ওখানকার থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ পূর্ণ বড়ালের নাম দিনাজপুর জেলায় জানে না, এমনি একটিও লোক নেই। লোকে বলে, তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। অত্যন্ত কটুভাষী ও মামলাবাজ পূর্ণ দারোগা, এই সংবাদই পেয়েছিলাম।

আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়টাও তেমন মধুর হলো না। থানার বারান্দায় খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর মেজাজটা যখন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই দেখা গেল পূর্ণ বড়ালের টিকি। পশ্চাতে বোধহয় জমাদারবাবু।

আমার ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেস দেখিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন: ওসবের মধ্যে রিভলভার-টার নেই তো? আপনাদের মশাই দেখলেই ভয় করে। সার্চ্চ না করে বাসায় ঢুকতে দেওয়া যেতে পারে না।

বিস্মিত হলাম: সার্চ্চ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিরক্তিভরে বললাম: এই ছ'টি বছর তো কাটিয়ে দিলাম রাজবন্দীর জীবন। কোথাও তো রাজবন্দীর বাক্স তল্লাসী হতে দেখিনি। আপনার এখানে নতুন নিয়ম নাকি ?

জবাব দিলেন বড়াল: তা হয়তো হবে। তবে আমি নয়, সার্চ্চ করবেন উনি, আমার সতীশ দাদা। জমাদার হলেও আসলে দারোগা উনিই। ইচ্ছে করলে উনি ছেড়েও দিতে পারেন। কী বলেন দাদা, সার্চ্চ করবেন?—থাক, না হয়

পরেই করা যাবে। এখন ভদ্রলোক স্নান-টান করে আগে চা-খাবারের জোগাড় করে নিন। তাই ভালো নয় কি ?

সতীশবাবু বললেন : আমার ওখানেই চা হবে।

বড়াল বললেন : তা বেশ। রাজবন্দীকে চা খাইয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চান, আনুন। আমার তাতে কী হবে ? তবে এক কাপ চা আমাকেও দেবেন, বলে দিন পরী-মাকে।

সত্যিই লোকটির কথাবার্ত্তা এতো স্পষ্ট যে, অনেক সময় অভদ্রতা বলে মনে হয়। কিন্তু দুচার দিনেই আমার কাছে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। আজ তাই পরম শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করি এমনি উদার, শুভানুধ্যায়ী ও ধর্ম্মভীরু দারোগা আমার প্রায় সাত বৎসরের বন্দী জীবনে কোথাও পাইনি। অল্পদিনেই তিনি অত্যন্ত সহজে আমার পরম হিতৈষী হয়ে উঠলেন।

একদিন বললেন : শুনুন দ্বিজেনবাবু, এখানে আপনাদের এরিয়াটা ভারী বিশ্রী, বাজারটাই বাইরে পড়ে গেছে। তা হোক, আপনি যাবেন বাজারে, তবে Command certificate কেটে আমি আমার সিপাইকে পাঠাবো আপনার পেছন-পেছন। দেখবেন, পালিয়ে যাবেন না যেন। তাহলে আমার চাকরি যাবে।

আর-একদিন বললেন : আপনার শোবার খাটটা ভাঙ্গা। ললিত বর্ম্মণ মশায় এই খাটেই চালিয়ে গেছেন কোনরকমে। আপনি বরং খাট তৈরীর জন্য ত্রিশ টাকা চেয়ে পাঠান। কিন্তু ত্রিশ টাকাই পাবেন না। আমি লিখবো, রাজবন্দীর estimate ভুল, পঁচিশ টাকার বেশী লাগতে পারে না। আই বি আবার আরও কলম চালিয়ে ওটা কুড়ি টাকা করে দেবে। তাতেই ঠিক ঠিক দাম পাবেন আর হয়ে যাবে আপনার খাট। একখানা টি-পয়ও হতে পারে। আর সত্যবাদিতা দেখিয়ে যদি কুড়ি টাকা চান, তাহলে শেষ পর্যন্ত স্যাংশন হয়ে আসবে দশ টাকা। আধখানা খাট তাতে হতে পারে।

আবার একদিন বললেন : স্বদেশী করেন, অথচ সংবাদপত্র পাঠ করেন না, কেমন স্বদেশী গো আপনি ? এক কাজ করুন। আমি অমৃতবাজার পত্রিকা আনাচ্ছি আমার নামে। পড়েই কাগজখানা ফেরৎ দেবেন, ভুলবেন না। আর মাসের শেষে দামটি কিন্তু ঠিক ঠিক হিসেব করে আমার হাতে তুলে দেবেন। দেখবেন ফাঁকি দেবেন না যেন। গরীব দারোগাকে আবার ফাঁসিয়ে দেবেন না যেন।

সাপ্তাহিক কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্টটি আমায় বড়াল সাহেব না দেখিয়েই ছাড়বেন না: নিন মশায়, দেখুন ইংরেজী-টিংরেজী ভুল আছে কিনা। আর কি লিখলাম, সেন্সর করে দিন। পরে যে বলবেন, শালা পূর্ণ দারোগা চুক্‌লি কেটেছে, সে বদনাম আমি নিতে পারবো না। সারা জেলায় আমার বদনাম, গ্রামের দেওনিয়াদের ধরে দশ ধারার মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম বলে। কিন্তু শেষ বয়সে আর কেন?

সত্যি, অদ্ভুত মানুষটি। স্পেডকে ইনি স্পেডই বলেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বকথার অন্তরালেই এঁর গভীর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়!......

সরকারী আদেশের ফলে কদিন পরই এক সন্ধ্যায় বিলু আত্রেয়ীকে নিলে এল। তাদের নিয়েও পূর্ণ বড়াল এক হাত কটু কথা ঝাড়লেন।

আরে মশাই, আপনি ওদিকে যাচ্ছেন যে? আপনার বোন দ্বিজেনবাবুর বাসায় যাবেন, তা জানি। সরকারী হুকুমই তাই। কিন্তু তাই বলে আপনি বোনাইয়ের বাসায় কী করে যাবেন শুনি! এই থানার বারান্দাতেই অপেক্ষা করুন, না হয় মাঠে বেরিয়ে হাওয়া খান। ফিরতি ট্রেণে চলে যাবেন।

সে তো ভোরবেলা।—বিলুর কপালে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল।

দারোগা বললেন: তা আর আমি কি করতে পারি। রামশুকুল সিপাই সদরে গেছে, না হয় তার খাটেই শুয়ে সারা রাত খট্‌মল্ মারুন। রাতটা কাটবে ভাল।

ভারী বিরক্তি লাগছিল বিলুর। লোকটা কি পাষণ্ড!

একটু পর বড়াল সাহেব বললেন: বাজার থেকে চিড়ে গুড় আনিয়ে দিই? একেবারে উপোস করবেন না। তাতে নাকি গৃহস্থের অকল্যাণ হয়! শত্ত হলেও আপনি অতিথি। অতিথি নারায়ণ। —তবে হ্যাঁ, সতীশ দাদা যদি হুকুম করেন, তাহলে কাছেই মতিয়ার হোটেলে খাওয়া ও রাতটুকু থাকবার ব্যবস্থা হয়তো করা যেতে পারে। থানার কর্ত্তা তো উনি, আমি শুধু নামে। কি বলেন সতীশ দাদা?

দাদা মুচকি মুচকি হাসছিলেন, বললেন: তাই করুন।

পূর্ণ জিজ্ঞেস করলেন: কি মশাই, রাজী তো?—তা খাবেন ভাল।

বিলুর শরীর জ্বলে যাচ্ছিল! বললো: থাক্, আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না।

না, না, সে হয় না।—বলতে লাগলেন দারোগা: মতিয়া খুব ভালো রাঁধে, চার্জ্জও কম। আপনার কাছ থেকে নাও নিতে পারে। সহজ কথা তো নয়,

আপনি ডেটিনিউবাবুর শ্যালক!—যান দাদা, পৌঁছে দিয়ে আসুন ভদ্রলোককে। কিন্তু ভোরের ট্রেণেই যেন ফুলবাড়ী ত্যাগ করবেন, ভুলবেন না।

সতীশ জমাদার বিলুকে আমাদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মতিয়া আমারই রাঁধুনী ও ভৃত্য। এবার সব পরিষ্কার জানা গেল। তিনজনে মিলে খুব আমোদ উপভোগ করলাম।

দুচার দিনের মধ্যেই পূর্ণ বড়াল খুকুকে আত্রাই-মা বলে ডাকতে সুরু করলেন। পাড়ায় যেসব ছেলে ম্যাট্রিক দেবে, সবাইকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন: এদের কাছ থেকে বই নিয়ো, নোট নিয়ো। পাশ করা চাই। তবে তোমাদের তো বিশ্বাস-টিশ্বাস নেই। রাজবন্দীর স্ত্রী কিনা, আবার তারকবাবুর কন্যা। এককালে জুরির কাজ করতেন। হয়তো আমার চাকরিই খেয়ে দেবেন।

আমরা কিন্তু পরম বিশ্বাসে ও নির্ভরতায় ফুলবাড়ীর দিনগুলি কাটাতে লাগলাম ফুলেরই মতো!···

সতীশ জমাদারের একমাত্র মেয়ে পরীর সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, আত্রেয়ী দুচার দিনের মধ্যে তার সঙ্গে বন্ধুত্বই পাতিয়ে ফেললো। আত্রেয়ীকে সে ডাকতো, নদী, আর আত্রেয়ী ডাকতো, বারি। বারি আর নদীকে কখনোও পৃথক করা যায়? তারাও ভাবতো, তাদের বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য। দুজনে সাইকেল চালাতো থানা কম্পাউণ্ডে, ব্যাডমিণ্টন খেলতো আর হাজারো বার থানায় গিয়ে পূর্ণ বড়ালের কাছে নালিশ জানাতো এ ওর নামে। বড়াল বলতেন: গেল, এবার আমার চাকরিটা গেল। দুটো সংমা শেষ বয়সে আমায় দেখছি পথে বসাবে!···

মাসখানেক পর আত্রেয়ীকে একবার ফিরে যেতে হলো তার স্কুলের ব্যাপারে।

অকস্মাৎ ১৯৩৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ পূর্ণ বড়াল সকালবেলায় আমায় ডেকে পাঠালেন। ভাবলাম হয়তো আবার কিছু কটূক্তি করে এ সপ্তাহের কন্‌ফি-ডেন্‌শিয়াল রিপোর্টখানা আমার সামনে মেলে ধরবেন কিংবা মতিয়া রান্নাবান্না কি কি আর শিখলো, তার হিসেব চাইবেন। লোকটি থাকেন একা, কুকারে ভাত আর আলু সেদ্ধ খান। আমার এখান থেকে কিছু পাঠালে সসম্মানে ফেরৎ দিয়ে বলে পাঠান: বিশ্বাস নেই মশায়, রাজবন্দীদের পক্ষে সম্ভব সবই। হয়তো বিষ-টিষই দিয়েছেন নাকি মিশিয়ে, কে জানে!

যাই হোক, গেলাম থানায়। দেখলাম, সতীশ জমাদারও কাজ করছেন। কিন্তু তুজনেই আজ যেন ভারী গম্ভীর। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না।

নীরবে উপবেশন করতেই সুরু করলেন বড়াল : আত্রাই-মা বোধহয় আপনার মুক্তির জন্য দরখাস্ত করেছিলেন ?

জবাব দিলাম : তা তো মাস খানেক আগে না-মঞ্জুর হয়ে ফিরে এসেছে।

কী লিখেছিলেন সরকার বাহাদুর ?

লিখেছিলেন, আপনার স্বামীকে এখন মুক্তি দেওয়া হবে না।—কেন, সে প্রশ্ন কেন দারোগাবাবু ?

ডায়েরীতে চক্ষু নিবদ্ধ রেখেই জবাব দিলেন পূর্ণ বড়াল : না, বিশেষ কিছুই নয়। শুধু আপনার transfer order এসেছে।

আবার কোথায় ?

কোথায় যেন সতীশদা ?

গম্ভীরমুখে মুখ না তুলেই জবাব দিলেন জমাদার : দেওলিতে।

পূর্ণ বড়াল জের টানলেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, দেওলিতে। চমৎকার জায়গা শুনেছি। রাজপুতনার মরুভূমিগুলো খুব কাছেই। বেশ বেড়াতে-টেড়াতে পারবেন। কি বলেন ?

বলবার আর কি আছে ? তাই চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, এতদিনেও বৃটিশ সরকারের ক্ষোভ মেটেনি। তাই এবার একেবারে রাজপুতনার আমন্ত্রণ এসেছে ! পূর্ণ বড়াল হাঁক দিলেন : দরওয়াজা !

বুটের আওয়াজ তুলে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো সিপাই।

ডিড বক্স্ লেতে আও।

এলো সেই কালো বাক্সটি। তালা খুলে পূর্ণ বড়াল ভেতর থেকে একখানা কাগজ বার করে আমার হাতে দিতে-দিতে বললেন : এখনই রওনা হতে হবে। রান্না না হয়ে থাকলে না-খেয়েই যেতে হবে। কিছু চিড়ে-গুড় রুমালে বেঁধে নিন। রাস্তা কম নয়। একেবারে round the Cape of Good Hope-এর সামিল ! সরকার বাহাদুরের জরুরী হুকুম। তামিল করাই আমাদের কর্ত্তব্য। হুন খাই, গুণ গাইবো না ? বুড়ো বয়সে তো আর—

বাধা দিলাম শুধু ওঁর মুখের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করে। কাগজখানা নিঃশব্দে পাঠ শেষ করে ওঁর হাতে ফিরিয়ে দিতেই এবার বেশ সহজভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি : মানে ? চুপ করে পড়ে আবার কথা না বলেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?

নিঃশব্দে হাসলাম, বোধহয় তা ম্লান দেখা গেল। বলে উঠলেন পূর্ণ বড়াল: আরে মশাই, আপনি কি মানুষ, না পাথর? সাড়ে ছ বছর তো হতে চললো। পেলেন আজ মুক্তির আদেশ। চুপ করে বসে রইলেন?

কি করবো তবে?

কি করবো! আরে আমি হলে তো এখন রাস্তায় ছুটে বেরিয়ে চীৎকার করতাম, লাফাতাম, গান করতাম, গাছে চড়তাম, পাগলামী করতাম—

যোগ করে দিলেন জমাদার: আর আমি পরণের ধুতিখানা দিয়ে মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বেঁধে নিতাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন ওঁরা দুজন। পারলাম না যোগ দিতে। শান্তস্বরে বললাম: আমার দীর্ঘ রাজবন্দী জীবনের শেষদিকে যে শান্তিময় পরিবেশে দিন কাটছিল, সত্যি বলছি দারোগাবাবু, তা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে আমার। দীর্ঘ সাড়ে ছ বছর নানা হাঙ্গাম, নানা মনোমালিন্য ও মামলা-মোকদ্দমার মধ্য দিয়ে কেটেছে। সবে এই ফুলবাড়ীতে এসেই—

বাধা দিলেন পূর্ণ বড়াল: ওসব কথা রাখুন। আপনাকে এমন কিছু খাতির করিনি আমি। যতটুকু পারা যায় আমাদের চাকরি-বাকার বাঁচিয়ে তাই করেছি। ওটুকু সবাই করবে।

বললাম: দারোগাবাবু, আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনলে আপনাদের লাইনটার ওপরই ঘেন্না ধরে যাবে আপনার।—সে কথা যাক। সত্যিই বিশ্বাস করুন, এই মুক্তি আমায় স্বাধীনতা দিলেও এখানকার আনন্দময় জীবনের কথা ভুলতে পারবো না কোনোদিন।

পূর্ণ বড়াল বললেন: আমারও এইটুকই সান্ত্বনা যে, চাকরির শেষ দিকে আপনাদের মতো দেশহিতৈষীদের দর্শন পেলাম, সাহচর্য্য পেলাম ও সাধ্যমত আপনাদের সেবা করবার সুযোগ পেলাম।—

এই হচ্ছে পূর্ণ বড়াল, যাঁর নামে কত বদনাম শুনেছি! কেউ কেউ বলেছিলেন যে, ফুলবাড়ী এসে একটি মাসও তিষ্টিতে পারবো না আমি!······

বড়াল বললেন: সারা জীবন পুলিশের চাকরি করে যে পাপ করেছি, শেষ জীবনে তা থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেলাম। ভগবানের কাছে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি। আত্রাই-মাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন, বলবেন, বুড়ো ছেলের অত্যাচার যেন তিনি মাপ করেন!······

গোছগাছ করে নিতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি নেমে এলাম থানার ঘর থেকে। একদা কেয়টখালী থেকে রওনা হয়েছিলাম এমনিভাবে গোছগাছ করে ব্রাজেন দারোগার সঙ্গে। আজ যাবো একা, স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে। কিছুই কাউকে জানাবার দরকার নেই। অকস্মাৎ খানসামায় গিয়ে সবাইকে একেবারে চমকে দেবো। এই তো, মাত্র গোটা চার পাঁচ ষ্টেশন, তারপরই সেই দারোয়ানী। সেখান থেকে সেই গরুর গাড়ী। সেই ট্যাঙ্গস-ট্যাঙ্গস্ করে এগিয়ে যাবে। হেঁটেও বোধহয় ওর চাইতে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। হাঁটবো তবে?······

মুক্তি!···বার বার উচ্চারণ করলাম মনে মনে! মুক্তি! মুক্তি! প্রায় সাড়ে ছ বছর পর মুক্তি! একেবারে সর্ত্তহীন মুক্তি! বন্দীত্বের শৃঙ্খল পরেছিলাম সেই একুশ বছর বয়সে আর তা থেকে মুক্তি পেলাম যখন, তখন সাতাশ পেরিয়ে গেছি। জীবনের অনেকগুলো মূল্যবান বৎসর পেছনে ফেলে এলাম। বাবাকে হারিয়েছি, মাকে হারিয়েছি, ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি তাঁদের কত-না আশা, কত-না কল্পনা! দ্বিজেন বিলেত যাবে, লিঙ্কলন্স ইন্-এ তার এক্সটেম্পোর ভাষণ অবিসংবাদিত প্রশংসা লাভ করবে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রশস্ত হল্ তার অগ্নিগর্ভ সওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে!······

বাবা-মার, আত্মীয় পরিজনের, বন্ধুদের, শুভাকাঙ্ক্ষীদের, পাড়া-প্রতিবেশীর সমস্ত আশা ও ভরসার দেউল কালাপাহাড়ের মতো একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে একুশ বছরের যুবক যখন আটাশ বছরের পরিণত মানুষ হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন আর যা-ই হোক, সেই পুরাণো দ্বিজেন গাঙ্গুলীকে সারা অন্তরেও আর খুঁজে পেলাম না!

—স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সার্জ্জেণ্ট, বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী, বি ভি বিপ্লবী দলের অন্যতম কর্ম্মী, আই বি পুলিশের চিরকালের ভীতি দ্বিজেন গাঙ্গুলীর তখন মৃত্যু হয়েছে!······

আজ পেছনে ফেলে-আসা সেই অগ্নি-জীবনের পানে মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে তাকাই। চুরি করে তাকাই। শাহারার বুকে অকস্মাৎ যেন মৌসুমী বায়ুর আর্দ্রতা নেমে আসে, বিসুভিয়সের শীর্ষে গৌরীশঙ্করের তুষার জমে ওঠে······ভাবি,

চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে
দিনগুলি মোর কোথায় গেল···